প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক
আয়নুল হক খাঁ
নবযুগ প্রকাশনী
২১বি, নাসিরুদ্দীন রোড
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

াতৃদেবীর শ্রীচরণে—

মুখবন্ধ

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

হাসি ও কান্না মানুষের দুইটি সহজাত বৃত্তি। সাহিত্যসৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই এই দুইটি বৃত্তি বাহ্য ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে মানবের মানস লীলার বৈচিত্র্যসাধন করিয়া আসিতেছে। প্রথম হাসি জীবনের উল্লাস ও মেজাজের প্রসন্নতা-প্রসূত; প্রথম কান্না শারীরিক বেদনা বা প্রহারের যন্ত্রণা হইতে উদ্ভূত। একেবারে আদিম স্তরের মানুষ অকারণেই হাসিয়া তাহার জীবনানন্দকে প্রকাশ করে ও ক্রন্দনমূলক চীৎকারের দ্বারা তাহার দৈহিক ক্লেশবোধকে মুক্তি দেয়। গোড়ার দিকে এগুলি বিশেষ মানস-সম্পর্কহীন শারীরিক প্রক্রিয়ামাত্র। এই স্থূল জৈব ব্যাপারে কোন সূক্ষ্মতর মানস-প্রেরণা দুর্নিরীক্ষ্য।

মানব সভ্যতা আর একটু অগ্রসর হইলে হাসির মধ্যে কিছুটা উপহাস-পরিহাসের তির্যক তাৎপর্য ও কান্নার মধ্যে মানববেদনার কিছুটা স্পর্শ মেশে। হাসি আনন্দেরই দ্যোতক। কিন্তু এই আনন্দে পরের উপর শ্রেষ্ঠতাবোধ, অপরের দুর্দশার কৌতুককর উপভোগ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ জীবনানন্দের সঙ্গে কৌতুকরসের সংমিশ্রণ ঘটে। মানুষের সামাজিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবেশী ও সহকর্মীরা তাহার হাসির উপাদান যোগায়। হাসি আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া অপরকেন্দ্রিক হইয়া উঠে। দিনান্তে শিকারের শেষে যখন আদিম মানবগোষ্ঠী গুহার আঁধারে বসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করে, তখন কাহারও কাহারও অপটুত্ব বা দুর্ভাগ্যের কাহিনী বা লাঞ্ছনার স্মৃতি গুহাবাসী মানবের হাস্যকে উতরোল করিয়া তোলে। এখনও মানুষের মনে মাত্রা বা ঔচিত্যবোধের একটা সার্বভৌম মানদণ্ড গড়িয়া উঠে নাই। সে অপরের পা পিছলাইয়া আছাড় খাওয়া, লক্ষ্যভেদে অসামর্থ্য, বন মধ্যে পথ হারাইয়া শিকার-অন্বেষণে ব্যর্থতা, একত্র-আহারের সময় নিজ ন্যায্য ভাগে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনাকেই হাসির উপাদানরূপে ব্যবহার করে। ইহার কিছুকাল পরেই চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের উৎকেন্দ্রিকতা ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া

হাস্যরসের উত্তেজনাকর আমোদ যোগায়। তখন বাহিরের দুর্ভাগ্যের পরিবর্তে অন্তরের বিকৃতিই হাসির মূলে রসসিঞ্চন করে, কোন কোন লোক এমন অদ্ভুত পোষাক পরে, এমন উদ্ভট অঙ্গ-ভঙ্গী করে, কথায়-বার্তায় ও আচার-আচরণে এমন অসঙ্গতির পরিচয় দেয় যে তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্য দিয়াই অনিবার্যভাবে হাস্যরসের উদ্রেক করে। এই চরিত্রগত অসঙ্গতির সূক্ষ্মতর উপলব্ধিই হাস্যরসকে সহজ জীবন হইতে সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়নের হেতু হয়। এইখানে প্রকৃতির অধিকার শেষ হইয়া মানবের শিল্পরস সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

আদি-যুগের সাহিত্যে যে স্থূল হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে জীবনানুকৃতিমূলক—লেখকেরা যেন জীবনের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কৌতুকরসসিক্ত পাতা ছিঁড়িয়া তাঁহাদের গ্রন্থে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং এই নীতি অনুসারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য প্রায় সকল দেশের সাহিত্যেই আদি গ্রন্থগুলি মহাকাব্য জাতীয়। এগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুণসম্পন্ন। মহাকাব্যের পূর্ববর্তী খসড়া খণ্ডকাব্যগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে—ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের পূর্বগামী প্রেরণার পরিচয় আজ বিস্মৃতি-বিলীন। এই মহাকাব্যগুলি খুব উন্নত ও পরিণত শিল্পকলার নিদর্শন—ইহারা পুরাকালের জীবন বিবৃতি—কেবল এইটুকু ছাড়া ইহাদের মধ্যে আদিম স্তরোচিত শিল্পগত অপরিণতির কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে হাসির ছবি পাওয়া যায়, তাহাতে আধুনিক যুগের সূক্ষ্ম অন্তর্মুখিতা না থাকিলেও যথেষ্ট শিল্পসুষমা ও কারুকুশলতা আছে। বাল্মীকিতে রাক্ষস বানর প্রভৃতির যে উপহাস্য চিত্র আছে, তাহা স্থূল-উপাদান-গঠিত হইলেও উহাদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক উপযোগিতা ও গ্রন্থের সমগ্র ভাবাবহের সঙ্গে কলাসম্মত সঙ্গতি আছে। কুম্ভকর্ণের অপরিমিত ঔদরিকতা তাহার চরিত্রগত বীভৎসতারই একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। বানরদের সময় সময় উদ্ভট ও অসঙ্গত আচরণ তাহাদের ভক্তির আত্মবিলোপী-আতিশয্যের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যে বিধৃত। মহাভারতে এই হাস্যকরতা শুধু গৌণ চরিত্রে সীমাবদ্ধ নাই, ইহা ভীম, শকুনী, দুঃশাসন প্রভৃতি মুখ্য নায়কদের মধ্যেও সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান ও তারতম্যবোধের সহিত প্রসারিত হইয়াছে। ভীমের হাস্যকরতা তাহার আকর্ষণীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বরং বাড়াইয়াছে; তাহার চরিত্রের হঠকারিতা ও ক্ষাত্রশৌর্যের পরিণামচিন্তাহীন আতিশয্যই অনেক ক্ষেত্রে হাস্যজনক পরিস্থিতির হেতু হইয়াছে। শুধু ভীম কেন, দুর্যোধন,

ধৃতরাষ্ট্র অশ্বত্থামা, কর্ণ এমন কি অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত এই লঘু রংএর ছোপ হইতে মুক্ত থাকেন নাই—হাসির আবির খেলায় সকলের অঙ্গ কম-বেশী রঞ্জিত হইয়াছে। হাসি যে কেবল কয়েকটি খেয়ালী, উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের একচেটিয়া অধিকার নহে, ইহা যে মহৎ চরিত্রেরও উপাদান, সার্বভৌম মানব প্রকৃতির সম্ভাব্য অঙ্গ—এই সত্য মহাভারতকারের মানব-প্রকৃতির সর্ববিধ বৈচিত্র্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। হোমারেও Thessites Pandorus প্রভৃতি ইতর ব্যক্তি শুধু নয়, Achilles, Agamemnon, Paris, Troilus প্রভৃতি উভয়পক্ষীয় বীর ও উদারপ্রকৃতি যোদ্ধাগণও মাঝে মধ্যে উপহাস্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। সুতরাং এই সুদূর অতীতের মহাকাব্যসমূহেও যে হাস্যরসের দর্শন মিলে তাহাতে প্রকৃতির একমেটে রংএর উপর সূক্ষ্ম শিল্পকার্যের সুদক্ষ তুলিকাপ্রয়োগের স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। খনি হইতে উদ্ধৃত অপরিচ্ছন্ন রত্নের ন্যায় মানব প্রকৃতির সহজাত ক্লেদাক্ত হাসিটি শিল্পমার্জনায়, বৈপরীত্যনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে ও সামগ্রিক পরিবেশের সহিত নিপুণ মিশ্রণরীতিতে এক অপরূপ দ্যুতি-ভাস্বরতা অর্জন করিয়াছে।

মহাকাব্যোত্তর যুগে সমাজবিন্যাসের দৃঢ়তর ও জটিলতর রূপের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সাহিত্যিক হাস্যরসের কতকগুলি নূতন পর্যায় ও প্রকাশ-ভঙ্গী দেখা দেল। হিমালয়ের বিশাল বক্ষপটে নানাজাতীয় ভূ-স্তর, উদ্ভিদ-জীবন ও দৃশ্যবৈচিত্র্যের ন্যায় মহাকাব্যের উদার আশ্রয়ে হাস্যরস অন্যান্য রসের সহিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সহজ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। হাসিটা মানব মনের আর পাঁচটা বৃত্তির ন্যায় একই যৌথ পরিবারভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই সমষ্টিগত মিলনের পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিশেষ সচেতনতা উদ্ভূত হইল। তখন পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য হাসির প্রসঙ্গ ও উপলক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রবর্তিত হইতে সুরু করিল। হাস্যকর পরিস্থিতির সংযোজনা ও উপহাস্য চরিত্রসৃষ্টির দিকে লেখক সচেতনভাবে মনোনিবেশ করিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই প্রবণতার প্রথম আবির্ভাব ঘটিল দেবপ্রশস্তিমূলক আখ্যান, কাব্য বা নীতি কবিতার মধ্যে মানবিক রস সঞ্চারের জন্য। প্রথম বাংলা রচনা চর্যাপদে ধর্মতত্ত্বের একনিষ্ঠ চর্চার মধ্যে হাসির কথার কোন স্থান ছিল না তথাপি চর্যাকারেরা নিজেদের আবেশমত্ততা ও সাংসারিক ঔদাসীন্য বুঝাইবার

জন্য প্রবাদবাক্যের তির্যক-দ্যোতনায়, সাধারণ অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যমূলক চমকপ্রদ উক্তির সাহায্যে ওষ্ঠে হাসি না ফুটাইলেও মনে হাসির পূর্ববর্তী অবস্থা-রূপ একটা বিস্ময় উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন। পরোক্ষভাষণ বা উদ্ভট উপমা প্রয়োগ যে সাহিত্যিক হাস্যরসের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা এইখানে প্রথম উদাহৃত হইল। প্রাকৃত জনসাধারণের কাছে ইহার সূক্ষ্মতর তাৎপর্য অনধিগম্য ; শুধু মার্জিতরুচি রসিকই ইহার উপভোগে সক্ষম। এইরূপে হাসি উহার প্রাকৃত স্থূলতা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক পরিশীলিত রূপ গ্রহণের দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হইল। উপহাস্য পরিস্থিতির উচ্চকণ্ঠ হৈ-হুল্লোড় ছাড়াইয়া উহা মৃদুব্যঞ্জনাময় মানস-আবেদনের রূপ ধারণ করিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদ ও বড়াইবুড়ীর রূপ-বিকৃতি বর্ণনায় ও রাধাকৃষ্ণের তুমুল, উত্তর-প্রত্যুত্তরপূর্ণ, নিপুণ ঘাতপ্রতিঘাতে উপভোগ্য কলহে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় ধারারই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এখানে একদিকে যেমন হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস আছে, তেমনি বর্ণনা ও বাক্‌প্রয়োগের সুমিত ভঙ্গিমায় ও কুশল রীতিতে উচ্চতর সাহিত্যিক উৎকর্ষেরও পরিচয় মিলে। দৈহিক অসঙ্গতি নিখুঁত রসোচ্ছল বাণীচিত্রে লেখক নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। তেমনি, রাধাকৃষ্ণের কলহে পল্লীসুলভ ইতর কোন্দল কেবল প্রকাশের তীক্ষ্ণ অনবদ্যতায়, নিছক আঘাত-প্রতিঘাত-নৈপুণ্যে উচ্চতর আর্টে উন্নীত হইয়াছে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগেরও যে একটা আর্ট আছে, বাছিয়া-গুছিয়া গালির শব্দ ব্যবহার করিলে তাহারও যে একটা আকর্ষণ আছে তাহাই এখানে প্রমাণিত। এই আদি মধ্যযুগের ভক্তি ও কামরস মিশ্রিত কাব্যে fun ও wit স্থূলকৌতুক ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি এক সংশ্লেষমূলক মিলনে সংযুক্ত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে হাস্যরসের মান নিম্নগামী। হাস্যকর পরিস্থিতির সংযোজনাই এখানে হাস্যরসের প্রধান উৎস। নারীগণের পতিনিন্দা, চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যিক শঠতা ও মনসার রোষে তাহার শারীরিক পীড়ন ও লাঞ্ছনা—এ সবই স্থূল হাস্যরসের উপাদান। বাচনভঙ্গীতে এমন কোন উপভোগ্য মনোহারিতা নাই। যাহাতে বিষয়ের তুচ্ছতার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। মূল আখ্যানের সঙ্গেও ইহাদের সংযোগ অত্যন্ত শিথিল। মঙ্গলকাব্যে হাস্যরসের স্থূলতা একমাত্র ব্যতিক্রম মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরামের হাস্যরসের মধ্যে একটা নূতন উপাদান মিশিয়াছে—উহা চিত্তপ্রসন্নতামূলক স্নিগ্ধতা, সমাজ-সমালোচনায় উদার, জ্বালাহীন রঙ্গপ্রিয়তা। এইখানে একদিকে হাসির পরিধি-

বিস্তার ও গভীরতা-সম্পাদন অন্যদিকে humour-এর অমৃত-নিষ্যন্দী সুস্বাদুতা মুকুন্দরামের হাসি সমগ্র সমাজের উপর প্রসারিত—সমাজমনের ও সামাজিক-বৃন্দের মানস অসঙ্গতির সরস, উদ্‌ঘাটন বেদনার রূপান্তরিত, কল্পনারঞ্জিত, পাত্রান্তর-ন্যস্ত প্রতিচ্ছবি এবং অমর অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টির মূল প্রেরণা। তিনি নিজের দুঃখকে লঘু করিয়াছেন, দেশব্যাপী অরাজকতা ও উৎপীড়নকে পশু-সমাজের করুণ, অথচ অপপ্রয়োগে উপভোগ্য আতিতে বিস্ময়-মধুর রূপ দিয়াছেন। মুরারিশীল ও ভাঁড়ুদত্তের শঠতার রন্ধ্রপথে তাহাদের অন্তর-রহস্য অনাবৃত করিয়াছেন, লহনা-খুল্লনার সপত্নীবিরোধ বিড়ম্বিত গৃহস্থালীতে বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের ঈষৎ-বিক্ষুব্ধ, কৌতুককর বিমূঢ়তার আদলটি দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরামে আসিয়া হাসি কারুণ্যরসসিক্ত, জীবনবোধে প্রজ্ঞাময়, সংসারের সমস্ত বৈষম্য-অসঙ্গতির ঊর্ধ্বে এক উদার, সমন্বয়কারী ভাবনিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

মুকুন্দরাম পর্যন্ত আমরা হাসির যে বিভিন্ন পর্যায়গুলির সঙ্গে পরিচিত হইলাম তাহাদের মধ্যে চিন্তালেশহীন, তরল জীবনোল্লাস কৌতুককর অবস্থা বিপর্যয়, সমাজমানের উল্লঙ্ঘনজাত হাস্যাস্পদ আচরণ ও চারিত্রিক উৎকেন্দ্রিকতা তির্যক ভাষণের চারুতা (wit) ও জীবনরসের স্নিগ্ধতা (humour) -এই কয়েকটি স্তরকে পৃথক করা যায়। মুকুন্দরামের গভীর জীবনবোধপ্রসূত হাস্য-রসিকতা প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত অননুকরণীয়ই ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভাবতন্ময়তার মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে মৃদু, সস্নেহ তিরস্কার ও অম্লমধুর শ্লেষের সাক্ষাৎ পাই। শাক্তপদাবলীতে মাতা পুত্রের মান-অভিমানের ভিতর দিয়া কপট অনুযোগ ও ছদ্মতিরস্কারের সুরটি কখনও কখনও শোনা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে হাস্যরস তাহা ভক্তিরসকে ঘনীভূত করিবার একটা গৌণ উপায় মাত্র, ইহার কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা নাই। এলোকেশী বিবসনা—শ্যামা মায়ের বীভৎস রূপ বর্ণনায়ও যদি কিছু হাস্যকর উপাদান থাকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভক্তিরসের অধীন। এই ধর্মসাধনার পরিবেশে যে ক্ষীণ হাস্যরসের বিকাশ হইয়াছে তাহা ইহার বৈচিত্র্য ও সর্বব্যাপিত্বের নিদর্শনরূপেই আমাদের মনে একটু অভিনবত্বের স্পর্শ আনে। হাসি যে কেবল হাস্যকর পরিস্থিতির ফল নহে, ইহা যে করুণ, ভক্তিসাধনাত্মক প্রভৃতি বিপরীত-ধর্মী

পরিবেশেও নিজ শক্তির পরিচয় দিতে পারে তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন হাস্যরসধারার শেষ কবি বলা যায়। ইনি মুকুন্দরাম অপেক্ষা রাজসভা-কবি বিদ্যাপতির অধিকতর অনুবর্তী। মধ্যযুগ হইতেই রাজসভা ও জমিদারের বৈঠক একপ্রকার রুচিবিকারগ্রস্ত, অথচ কারুকার্যময় হাস্যরসের অনুশীলনের প্রেরণা দিয়াছিল। এই পরিবেশে যে হাসির উদ্ভব তাহা আদিরসের আবিলতাকে বিদগ্ধ ভাষণের আভাস-ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলার মধ্যে নিহিত। অশ্লীল মনোভাবের উপর সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর আবরণ দেওয়ার শিল্পকৌশলই ইহার মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় ব্যাপার। ভাবিতে গেলে দেহসম্ভোগ, ইন্দ্রিয়লালসার রসাল বর্ণনার মধ্যে কিছুটা কাব্য-সৌন্দর্য থাকিতে পারে, কিন্তু হাসির উপাদান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এখানে হাস্যরস উদ্রিক্ত হয় লেখকের প্রকাশচাতুরীর রহস্যসঙ্কেতে, নিষিদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ভদ্র আবরণের পিছনকার চটুল ইঙ্গিতটুকুর উপলব্ধিতে। এ যেন দুর্বোধ্য হেঁয়ালির সমাধানে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়, কতকটা তাহারই অনুরূপ। কামকলার মধ্যে যেমন আবেশ-মত্ততা আছে, তেমনি একটা উত্তেজনাময় হর্ষেরও শিহরণ অনুভূত হয়। ইহাতে হাসির আবেদন যুগপৎ শিরা-স্নায়ু ও মননের প্রতি প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। গোপনতার বেড়া ভাঙ্গায় যে চাতুর্যময় আনন্দ—ভারতচন্দ্রের কবিতায় আমরা প্রায় সেইরূপ আনন্দই আস্বাদন করি।

আর একদিক দিয়া মুকুন্দরামের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পার্থক্য অনুভূত হয়। ভারতচন্দ্রের হাসি রঙ্গ অপেক্ষা ব্যঙ্গের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছে। অবশ্য বিদ্যা ও সুন্দরের কামকেলিকলা লইয়া যে হাসি তাহা রঙ্গপ্রধান। কিন্তু পরিবেশ-চিত্রণে আঘাতের দিকে প্রবণতা যেন তীব্রতর হইতেছে। হীরার আচরণ-বর্ণনায় নিছক কৌতুকরস যেন শ্লেষাত্মক মনোভাবের স্পর্শে উগ্র ও ঝাঁজালো হইয়া উঠিয়াছে। হীরার প্রতি কবির সহানুভূতি ও জুগুপ্সা যেন দুই-এরই সংমিশ্রণ আছে। কোটাল প্রভৃতি রাজানুচরবৃন্দের এমন কি খোদ রাজা-রাণীর আচরণে হাঁক-ডাক লম্প-ঝম্প আড়ম্বর-আস্ফালনের মধ্যে এই কৌতুক ও শ্লেষ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অবশ্য ভারতচন্দ্র ইহাদের সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে অতিক্রম করেন নাই—উগ্র সংস্কারক মনোবৃত্তি সে যুগের কোন লেখকেরই ছিল না। তিনি রাজসভার কবি হইয়া ধীরে ধীর রাজসভার উপহাস্য দিক্‌টা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। আগামী যুগের ব্যঙ্গপ্রাধান্য, আধুনিক

সমাজ চেতনার সংশয়—তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সুদূর পূর্বাভাস তাঁহার হাস্য-বিস্ফারিত ওষ্ঠাধরের এক কোণে বঙ্কিম রেখায় অর্ধস্ফুট।

৪

ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সমাজে প্রথম সমাজের অনুসরণ সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ হইল। হাসি পূর্বের সরল একমুখীনতা হারাইয়া- ব্যঙ্গে ধারালো, বিদ্রূপে অশালীন ও শ্লেষে বক্র-বঙ্কিম হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে ইন্দ্রধনু বর্ণালী সংশ্লেষের ন্যায় নানাপ্রকার রং-এর বৈচিত্র্যও স্ফুরিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুকরণে সমাজে এমন সব হাস্যকর আতিশয্য দেখা দিল, যাহা কেবল হাসির উদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আঘাত করিবার প্রবণতা জাগাইল। এই সমাজ দেহ-মনে উদ্ভূত অসঙ্গতিগুলি শুধু হাসিয়া উড়াইবার ব্যাপার নহে। ইহারা দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় সমস্ত সমাজের রক্তধারাকে বিষাক্ত করিবে এই আশঙ্কা বিশুদ্ধ হাস্যোচ্ছ্বাসকে এক নিগূঢ়তর অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত করিল। "নীচ যদি উচ্চ-ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" বা "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"—ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত-নির্দিষ্ট এই নীতি সংযম উল্লঙ্ঘন করার উত্তেজনা ক্রমশঃ উগ্রতর হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের পৌষ-পার্বণের পিঠা ও তপ্‌সে-মাছ খাওয়াইয়াছেন কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁহার রঙ্গ-কৌতুক প্রায়ই তাপমাত্রা চড়াইয়া ব্যঙ্গতীব্রতার উঁচু পারদরেখায় পৌছাইয়াছে। বাঙ্গালী বাবুদের ইংরাজী-খানা খাইবার ধুম, স্ত্রী-স্বাধীনতার উগ্র আতিশয্য, নাস্তিকতার ক্রমবর্ধমান প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি সামাজিক অনাচার ও অশালীনতা তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই তাঁহার রসিকচিত্তের উপভোগকে বার বার ব্যাহত করিয়া তাঁহাকে কঠিন আঘাত হানিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই সর্বব্যাপী ব্যঙ্গ-প্রিয়তাই হাসির আধুনিক বিবর্তনেব প্রধান লক্ষণ। সমস্ত আধুনিক হাস্যরসিকের মনোভাবে এই বিস্ফোরক শক্তির কম-বেশী উপস্থিতি লক্ষণীয়। হাসির মিষ্টজলের নদী আধুনিকতার সমুদ্র-মোহনায় পৌছিয়া ব্যঙ্গলবণাক্ত, অম্লক্ষারের ঝাঁজযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে রাজশেখর বসু পর্যন্ত সকলের হাস্য-রচনায় এই সমাজ-সংস্কারক মনোভাব, এই সংশোধনী প্রেরণা কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকটভাবে বিদ্যমান।

এই ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের বিষয়ভেদে অনেকগুলি স্তর আছে। উনবিংশ

শতকের প্রথম পাদে (১৮০০—১৮২৫) এই হাস্যরস ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বাদবিতণ্ডার সঙ্গে প্রধানভাবে জড়িত ছিল। কবির লড়াই-এর অশালীন ঐতিহ্য, স্থূল ব্যক্তিগত আক্রমণ, নিছক গালাগালির ইতর আতিশয্য প্রথম যুগের মননশীল বিচার-বিতর্কেও উদাহৃত হইয়াছে। রামমোহন রায় এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতির নানা কারণের মধ্যে হাস্যরসিকতাকে গণনা করা যায় না। যাঁহারা ধর্মবিতণ্ডার শুষ্ক শাস্ত্রবচন-কণ্টকিত পথ ত্যাগ করিয়া "বাবু" সম্প্রদায়ের বিলাসব্যসনের কুসুমাস্তৃ, সুরা-সঙ্গীত-চাটুবাক্যবীজিত পথখানি বাছিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা যে হাস্যদেবীর অধিক অনুগ্রহভাজন হইবেন তাহা স্বাভাবিক। এই জাতীয় রচনায় রঙ্গের মধু ও ব্যঙ্গের হুল স্বভাববৈরিতা ত্যাগ করিয়া এক সাময়িক মৈত্রীবন্ধনে মিলিত হইয়াছিল। হুতোম প্যাচার নক্শায় যে সমস্ত ব্যসনধর্মী প্রমোদের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে যেন লেখক একহাতে আলিঙ্গন ও অপর হাতে কশাঘাত করিয়াছেন। এই সমস্ত নিষিদ্ধ আমোদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভূত ও রোজা একই দেহে বিরাজ করেন—সুতরাং ইহারা সাধু-সমাজ ও বেল্লিক-সমাজ উভয়েরই আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠে। কাজেই হাস্যরসের প্রধান ধারা এই জাতীয় নক্শার মধ্যেই আবিল, উদ্দাম স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার সহিত পরাধীনতার জ্বালা, স্বাজাত্যবোধের ও গভীর জীবন-দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটিলেই ও প্রতিভার কটাহে এই মিশ্র পানীয়কে জ্বাল দিলেই কমলাকান্তের দিব্য সোমরস তৈয়ারীর ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়।

জাতির ইতিহাসে এমন একটা যুগ আসে যখন তাহার সমস্ত স্তিমিত চেতনা, সমস্ত অর্ধস্ফুট বিচ্ছিন্ন প্রয়াস, তাহার আনন্দ-বেদনা জীবনবোধের সমস্ত খণ্ডিত অনুভূতি, হাসি-কৌতুক-ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া ভাবকেন্দ্র অন্বেষণের সবটুকু আকুতি অপূর্ব সংহতিতে মিলিত হইয়া ও জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণতম প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া এক অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রে এই সমীকরণ-প্রক্রিয়ার আরম্ভ ও রবীন্দ্রনাথে ইহার বিস্তার ও পরিণতি। এই সম্পূর্ণ ভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে হাসিকে কেবল একটা স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে দেখা যায় না—ইহা মানসদীপ্তির ঝলকরূপে, মনন-স্বচ্ছতা ও প্রকাশ প্রাণোচ্ছলতার লীলাচ্ছন্দরূপে সমস্ত সাহিত্যকৃতির জীবনধর্মকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। বেগবান নদী-প্রবাহের তরঙ্গশীর্ষলগ্ন শুভ্র ফেনরেখার ন্যায় ইহা যেন উচ্ছল ও পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিরই একটা দ্যুতিবিকিরণ। বঙ্কিমের জীবনানুভূতি নিজ গতিবেগেই থাকিয়া

থাকিয়া হাসির ঝিলিক দিয়া উঠে। এই হাসি আলোছায়ার দ্রুত আবর্তনে ইন্দ্রধনুর বর্ণরঞ্জিত হয়। জীবনের গম্ভীর প্রকাশে ইহার ছটা গাম্ভীর্যকে ঘনীভূত করে, অশ্রু আর্দ্র পটভূমিতে ইহার উচ্ছলতা আরও করুণ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথেও এই হাস্যদ্যুতি বিষয়নিরপেক্ষভাবে সমস্ত রচনার প্রসন্নতা ও সৌষ্ঠব বিধান করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসে স্থূল ও সূক্ষ্ম, আদিম ও আধুনিক সব স্তরেরই সহ-অবস্থিতি ঘটিয়াছে। তাঁহার গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের দুরবস্থা ও উহার সহিত আশমনির প্রেমাভিনয়, বিষবৃক্ষে হীরার আয়িবুড়ী, মৃণালিনীতে দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সম্মার্জনীমাজিত প্রেমকাহিনী, দেবী চৌধুরাণীতে গোবরার মা, সীতারামে রামচাঁদ শ্যামচাঁদ ও মুরলা দাসী, চন্দ্রশেখরে রামচরণ এ সবই প্রাচীন যুগের হাস্যকর চরিত্র ও পরিস্থিতির অনুবর্তন, সনাতন রসিকতারই পুনরভিনয়। চাকর-চাকরাণী, নিম্নশ্রেণীর লোক উহাদের সুপ্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার লইয়া, নূতন যুগের অনুপযোগী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে আবদ্ধ থাকিয়া, চিরকাল হাসির উৎস উন্মোচন করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা মার্জিততর রসিকতার নিদর্শনও বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রচুর। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, মৃণালিনীতে গিরিজায়া, কৃষ্ণকান্তের উইলে ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি চরিত্র ও কিছু কিছু হাস্যরসপ্রধান দৃশ্য এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের উদাহরণ। কিন্তু তাঁহার হাস্যরস প্রধানত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার জীবন সমালোচনা ও মন্তব্য, আখ্যান, ও সংলাপের সূক্ষ্ম স্পর্শের মধ্য দিয়া। তাঁহার লাঠি ও তাম্রকূট মহিমা কীর্তনের মধ্যে গুরুগম্ভীর সন্ধিসমাসস্ফীত শব্দাবলীর মাধ্যমে ছোটখাট ভাব প্রকাশের বৈপরীত্য দ্যোতনা সূক্ষ্ম রসিকতার হেতু হইয়াছে। আবার ইহার উলটা ফলও উদ্ভূত হইয়াছে লঘু-তরল বঙ্কিম কটাক্ষে তির্যকভাবদ্যোতক বর্ণনাভঙ্গীর সাহায্যে গুরুতর মানস-বিপর্যয়ের চিত্রাঙ্কন দ্বারা—যেমন, কতলু খাঁর হত্যার দৃশ্যে বিমলার হাব-ভাব লীলা এ অভিনয়ের অন্তরালে তাহার গোপন জিঘাংসার ইঙ্গিতে বা কুন্দনন্দিনীর ছেলেমানুষী লজ্জা সম্মানের মাধ্যমে তাহার প্রথম প্রেমের উদ্‌ভ্রান্তিকর অনুভূতির উদঘাটনে। এই সব দৃশ্যে হাসির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নাই, কিন্তু সমস্ত আকাশ বাতাস অন্তরালবর্তী হাস্যদীপ্তি-বিকিরণে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বঙ্কিমের হাস্যরসিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁহার প্রবন্ধাবলী ও বিশেষতঃ 'কমলাকান্তের দপ্তর'এ। এখানে হাস্যরস যে জীবনের সত্যানুসন্ধানের একটা

প্রধান উপায় তাহা আশ্চর্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সত্য ভীষ্মের মাথা রাখিবার উপাধান দুর্যোধনের সযত্ন আহরিত সুকোমল শয্যাদ্রব্যে গঠিত হয় নাই, হইয়াছে অর্জুনের ভূগর্ভভেদী তীক্ষ্ণ শরজালে। উন্মার্গগামী জাতির চোখ ফুটাইতে হইলে উহার উপর স্তূপীকৃত উপদেশের অজস্র বর্ষণ করিলে কাজ হইবে না, পরিহাসের অভ্রান্তলক্ষ্যভেদী অস্ত্রে উহার স্থূল গণ্ডারচর্মকে বিদীর্ণ করিতে হইবে। 'বাবু' চরিত্রের উপর শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই অবিরল বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়া আসিতেছিল। তাহাতে হয়ত সুরাগণিকাসক্ত, বিলাস-ব্যসন-প্রমত্ত, স্থূলমস্তিষ্ক বাবু সম্প্রদায়ের খেয়ালী আচরণ কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু যেমন ভারতের পাঠান রাজত্বের ইতিহাসে এক দাসবংশের বিলুপ্তির পর আবার নূতন নূতন দাসবংশ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ গবেট, গোবরগণেশবাবুর তিরোধানের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, দেশের সাহিত্যসংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাশীল, পরানুকরণপুষ্ট ও আত্মমর্যাদাহীন আর এক নূতন বাবুবংশ শামলা পাগড়ির রাজবেশ-সজ্জিত হইয়া বাংলার সমাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছে। প্রথম যুগের ন্যায় শুধু মদ ও ব্যভিচারের নিন্দা করিয়া ইহাদিগকে হঠানো যাইবে না। শুধু সনাতন নীতিবাদের গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া এই বদ্ধমূল চিত্তবিকারকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এই নতুন যুগের বাবু-সম্প্রদায় কিছু সদ্‌গুণের অধিকারী— শিক্ষায় ও জ্ঞানে অগ্রগামী, রুচিতে প্রগতিশীল ও সমাজে নিজ গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত কবির এলোপাথারি বাড়িতে ইহাদের আত্মম্ভরিতার শিরস্ত্রাণ স্খলিত হইবার নহে। তাই বঙ্কিম এই নব অসুরের ধ্বংসের জন্য নূতন মন্ত্রপূত অস্ত্র ধারণ করিলেন—তিনি বাবু স্তোত্র রচনা করিয়া, নিজ স্ত্রীর কাছে ইহাদের অতলস্পর্শী অজ্ঞতা উদ্ঘাটিত করিয়া, ইহাদিগকে সাহেবের সবুট পদাঘাতের পাত্ররূপে দেখাইয়া, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের আত্মবঞ্চনা-অমর্যাদায় ইহাদিগকে ভূষিত করিয়া ইহাদের মর্মস্থানের দুর্বলতম অংশটির প্রতি নিদারুণ আঘাত হানিলেন। তাঁহার নিজের ভাষায় অভিমন্যুবেষ্টনকারী কুরুসৈন্যের ন্যায় তাঁহার এই তীক্ষ্ণ অস্ত্রে এই নববাবুবংশ ধরাশায়ী হইল। একদা মর্যাদার প্রতীক 'বাবু' অভিধাটি অধুনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-জর্জরিত হইয়া অপমানের কলঙ্ক-চিহ্নবৎ পরিত্যক্ত হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্রীয় হাস্যরসের উজ্জ্বলতম ও প্রগাঢ়তম বিকাশ। হাসির এমন একটি সুগভীর রূপান্তর, এমন কি গোত্রান্তর বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

হাসি মানুষের একটা প্রান্তিক বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা বড় জোর জীবনরূপ বস্ত্রের শেষে বোনা একটি সরু পাড়ের মত। কিন্তু কমলাকান্তে এই প্রান্তিক একটি কেন্দ্রীয় বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা জীবনের সবটুকু প্রজ্ঞাঘন অনুভূতি, উহার করুণ, অশ্রুসজল, বেদনাবিধুর মর্মবাণী, উহার বন্ধনহীনআনন্দ ভাবুকতা ও পরম তাৎপর্য সন্ধান সকলকে সংহত করিয়া এক ব্যাপকতম পরিণততম জীবন দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হাসির এইরূপ সার্বভৌম মর্যাদা, জীবন রহস্যভেদী, তত্ত্বরূপ-উদ্ঘাটন-ক্ষম দিব্য চেতনা বাংলা সাহিত্যে আর কোথায়ও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ওষ্ঠাধরে যে রহস্য-মধুর, লীলাদ্যোতনাময় হাসিটি সর্বদা বিকশিত হইয়া আছে। তাহাই কি জীবন-স্বরূপের ইঙ্গিতধর্মী? স্মিতহাস্যের আড়ালেই কি জীবনের সবটুকু অজ্ঞেয়তা আত্মগোপন করিয়া আছে? ইহা সত্য হইলে এই স্মিতহাস্যের কিছুটা আভাস কমলাকান্তের হাস্যরসিকতায় বিধৃত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হাস্যরস প্রাকৃত পরিহাস্যতা, উদ্ভটকল্পনা, বৈপরীত্য দ্যোতনা সমাজ ও পদ-বৈষম্যজাত অসঙ্গতির সঙ্গে Humour প্রভৃতির উন্নততর কলা-কৌশলের সার্থক প্রয়োগ ও জীবনসত্যের গভীরে অনুপ্রবেশ প্রভৃতির সংশ্লেষ ঘটাইয়াছে। বঙ্কিমের ঠিক পরবর্তী যুগে একদল হাস্যস্রষ্টা—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ব্যঙ্গানুকৃতি mock heroic parody উদ্ভট কল্পনা ও শ্লেষাত্মক বিপরীত-ভাষণের সংযোগে এক নূতন ধরণের রসিকতা প্রবর্তন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু আদর্শ ও সমাজ-প্রথার একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে সমস্ত আধুনিক স্বৈরাচার ও আদর্শ শিথিলতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম উহার রুচিবাগীশ চাল-চলন সাড়ম্বর ভণ্ডামি ও সমাজ সংস্কারের অজুহাতে সমস্ত সমাজনীতি ভঙ্গ করার প্রবণতার জন্য তাঁহাদের তীক্ষ্ণতর বিদ্রূপের বিষয় হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ সমস্ত প্রকার গোঁড়ামির বিরোধী ও উদার মানবিকতার পক্ষপাতী; তাঁহার অদ্ভুত খেয়ালী চরিত্রসৃষ্টি, উদ্ভট পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নিপুণতা ও ভৌতিক ও অতিমানবিক সত্তার সার্থক প্রবর্তন তাঁহাকে অনেকটা আধুনিক মনোধর্মী করিয়াছে। তিনি কিছুটা রাজশেখর বসুর অগ্রগামিত্বের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী যে হাস্যরসিক বলিয়া তাঁহার কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। তাঁহার হাসি নির্মল, শুভ্র, শরৎ

সূর্যালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী ও সকলের সৌন্দর্যবিধায়ক। মনে হয় যে এই হাস্যরস তাঁহার অনুভূতির স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, কোন বিশেষ মানস প্রবণতার দ্যোতক নহে। যিনি সমস্ত জীবনকে উদার, মোহমুক্ত সার্বভৌম দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত, হিমালয়ের তুষারাবৃত উচ্চশৃঙ্গের উপর সূর্যকিরণ-সম্পাতের ন্যায় সেই দৃষ্টি স্বতঃই হাস্যোজ্জ্বল ও প্রসাদস্নিগ্ধ হইয়া থাকে। দুরূহতম বিষয়ের আলোচনাতেও, জটিলতম গ্রন্থি-উন্মোচন প্রয়াসেও এই রহস্যভেদী অন্তর্দৃষ্টি, এই অন্তস্তলাবগাহী অনুভূতি যেন বিশ্বনিয়ন্তার সর্বজ্ঞতার লীলাচাতুরী-মণ্ডিত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ হাসি অসঙ্গতির উপলব্ধিতে নহে সৃষ্টির গভীর অভিপ্রায়ের স্বচ্ছন্দ আবিষ্কারে। ইহা একটা নৈষ্ঠিক গুণের মতই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকার রচনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সূক্ষ্ম সৌরভের ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট। মানবমনের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির মধ্যে লঘু শ্রীমণ্ডিত সরস প্রসন্নতারও একটা স্থান আছে—রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁহার হাস্যরস চর্চা এই সুষমাময় অন্তর সৌকুমার্যের একটা বিকাশরূপেই গ্রহণীয়। অবশ্য তাঁহার প্রথম তরুণ বয়সের রচনায় মনের একটি সহজ প্রীতিমাধুর্য বাস্তব বাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন যৌবন স্বপ্নের আবেশ, সকল প্রকার হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার ও উহাদিগকে অতিক্রম করিবার দুর্বার প্রাণোচ্ছ্বাস এই আনন্দময় হাসির ঝরণার মধ্য দিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম যুগের নাট্য প্রহসনগুলির মধ্যে মার্জিত বাগ্‌ভঙ্গীর দীপ্তি ও তরুণ কল্পনার উতলা উচ্ছ্বাস এক অপূর্ব মধুর সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। তাঁহার ছোট গল্প সংগ্রহ, উপন্যাস, প্রবন্ধাবলীর ও লঘু কবিতা সমূহের মধ্যেও অনাবিল হাস্যরস কোথাও বিষয়ের মর্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া ও লেখকের মনোভঙ্গীর কোন অতিরঞ্জন প্রবণতা প্রকাশ না করিয়া আশ্চর্য সংযম ও সুসঙ্গতির সহিত রজতশুভ্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ সুন্দর কলা-নৈপুণ্যের মধ্যে হাস্যরসিকতা একটি স্থায়ী কিন্তু অনতিপ্রকট উপাদান।

অতি আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সমকালীন বিচিত্র ভাব সংঘাত ও নব নব অসঙ্গতি প্রকরণের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইতেছে। কেদার-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও জীবিতদের মধ্যে বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), পরিমল গোস্বামী ও প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Verbal wit, বিস্ময়কর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য করুণরসের আতিশয্য, ভাবালুতা ও যুগগত

পরিবর্তনের জন্য একপ্রকার উদ্ভ্রান্ত-বিমূঢ় মনোভাব এই সমস্ত মিলিয়া এক সর্বজনসংবেদ্য অথচ খানিকটা স্থূলরীতি রসিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজশেখর বসুর প্রবণতা হইল উদ্ভট কল্পনা ও আধুনিক সমাজে ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতি সমূহের বিসদৃশ সমাবেশে। বর্তমান মানুষের এক পা এক জগতে, অপর পা অন্য জগতে; মনের এক অংশ সুপ্রাচীন গুরুবাদে অন্য অংশ প্রগতিশীল বিজ্ঞান চেতনায়; চিন্তার এক শাখা পৌরাণিক ঋষির আশ্রমে অপর শাখা শিক্ষিত তরুণ তরুণীর প্রেমচর্চার প্রমোদকুঞ্জে। এই সমস্তের একত্র সমাবেশে যে জগাখিচুড়ী উৎপন্ন হয় তাহাকেই রাজশেখর হাসি ফুটাইবার সরস কাজে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার নরনারী সচেতনভাবে রসিক নয়; প্রতিবেশের সঙ্গে ধাক্কায় তাহাদের হাস্যরস অজ্ঞাতসারে স্ফুরিত হয়। পরিবেশের অসঙ্গতিপূর্ণ বিমিশ্রতা তাহাদের মনের তারে আঘাত করিয়া উহাতে যে পরস্পর-বিরোধী সুরবৈষম্য জাগায় তাহাই অনিবার্যভাবে হাস্যরস উদ্রিক্ত করে। হাস্যরচনাগুলি প্রায় বরাবরই রোষজ্বালামুক্ত ও অবিমিশ্র কৌতুকরসে অভিষিক্ত ছিল। তবে তাঁহার জীবনের শেষদিকে কষ্টনিরুদ্ধ ক্রোধোচ্ছ্বাসে তাঁহার ভাবপ্রশান্তি কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে মনে হয়।

জীবিত হাস্যরসিকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভূতিভূষণের রচনায় বাঙালী পারিবারিক জীবনের স্নেহমায়া মমতার আতিশয্য বা একটু অসাধারণ রকমের বাঁকা পথে চলিবার প্রবণতা মৃদু হাস্যরসের উদ্রেক করে। রাণুর অকালপক্ব গৃহিণী-পনার অভিনয় বা বৌ-ঝির শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে নিজের মতে চালাইবার জন্য কৌশল প্রয়োগ নির্দোষ ধাপ্পা দিবার বুদ্ধি হাস্য সঞ্চারের হেতু হইয়াছে। একটা প্রাচীন চিরাচরিত সংসার-কলানৈপুণ্য আধুনিক যুগের অত্যন্ত পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন রসব্যঞ্জনা সহযোগে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। কৌশলটা পুরাতন, উহার প্রয়োগপদ্ধতিটাই যা কিছু বদলাইয়াছে। বনফুলের রচনায় আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিণতি আমাদিগকে প্রথমে চমকিত করিয়া পরে হাসিতে উচ্চকিত করিয়া তোলে। লেখকের হাসাইবার উদ্দেশ্যটা একটু বিলম্বে আমাদের বিপর্যস্ত অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয়। প্রমথ বিশী, পরিমল গোস্বামীর মধ্যে উপভোগ্য বাগ্-বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে হাস্যকর পরিস্থিতির সুষ্ঠু সম্মিলন দেখা যায়, তবে হাস্যরস উদ্বোধনের উপযোগী কোন মৌলিক অনুভূতি বিশেষ লক্ষ্যগোচর হয় না। ইঁহারা হাসির ধারাকে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রবাহিত রাখিয়াছেন,

বিশেষ কোন নূতন স্রোতাবেগ সঞ্চার করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। বিশী মহাশয় কমলাকান্তীয় ঢং বজায় রাখিয়াছেন, কমলাকান্তীয় প্রজ্ঞাগভীরতা ও মর্মানুপ্রবেশশীলতা যে সব তাঁহার আয়ত্তাধীন তাহা মনে হয় না। সে কালের মাসিক আর এ কালের দৈনিক পত্রিকায় যে পার্থক্য, বঙ্গদর্শনের ও আনন্দবাজারের কমলাকান্তের পার্থক্য প্রায় তদনুরূপই।

বর্তমান কালে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস কোন অভিনব জীবনদর্শন প্রসূত নহে, চলতি জীবনের সদ্যসঙ্কলিত চটুল টীকাটিপ্পনী মাত্র। আমাদের সম্মুখে দৃশ্যপট এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে, এত অসংখ্য রকমের অসঙ্গতি জীবনে পুঞ্জীভূত হইতেছে, বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর এত অদ্ভুত বিপর্যয় আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে দিশাহারা করিতেছে যে কোন স্থির বিচারের মানদণ্ড আমাদের অনধিগম্য রহিয়া গিয়াছে। কোনটা স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক, কোনটা ব্যতিক্রম কোনটা সাধারণ নিয়ম কোনটা সুস্থ মস্তিকের কোনটাই বা উৎকেন্দ্রিকতার নিদর্শন এ বিষয়ে এখন আমাদের নিজেদেরই কোন নির্ভরযোগ্য প্রত্যয় দৃঢ়তা নাই। আমাদের নিন্দা সমর্থন আমাদের হাসি-কৌতুক ও বিভ্রান্তি-বিমূঢ়তা আমাদের প্রেম-ভালবাসা পারিবারিক স্নেহপ্রীতির সহজ ছন্দ নির্ণয়, আমাদের সামাজিক প্রথানিয়মের অবশ্য পালনীয়তা স্বেচ্ছালঙ্ঘন—এ সমস্ত বিষয়েই আমাদের মতের স্থিরতা অনিশ্চয়তায় বিড়ম্বনাগ্রস্ত। মানুষের কতকগুলি জৈব নিয়ম মাত্র এই সর্বব্যাপী বিপর্যয়ে ঠিক আছে। এখন কোন ব্যক্তি যদি পায়ে না হাঁটিয়া মাথায় হাঁটে বা আর কোন সুনির্দিষ্ট জৈব নিয়মের উৎকট অন্যথাচরণ করে তবেই আমরা হাসিতে পারিব। আগে ভাঁড়ু দত্তের প্রবঞ্চনায় কৌতুক অনুভব করিতাম। এমন জগৎ-জোড়া প্রবঞ্চক মহা-সম্মেলনে ভাঁড়ু দত্তই আদর্শ চরিত্রের পদবীতে অধিরূঢ়। পরাভূত কাঞ্চী-রাজ যখন পায়ে হাঁটিয়া অদৃশ্য রাজার চরণতলে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছে তখন ঠাকুরদাদা বলিয়াছে যে যাহাতে কাঁদা উচিত তাহাতে লোকে হাসে। আমরাও আজ এই উলট পুরাণের প্রাদুর্ভাব-যুগে হাসি কান্নার পার্থক্য ভুলিতে বসিয়াছি।

হাস্যরসের প্রকরণ-বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ-তারতম্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ডাঃ অজিতকুমার ঘোষের 'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' নামে উপাদেয় গ্রন্থের পরিচিতিস্বরূপ। ডাঃ ঘোষ সম্প্রতি এই গবেষণামূলক গ্রন্থখানি লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি, ফিল উপাধি

লাভ করিয়াছেন। এই মূল্যবান নিবন্ধে তিনি হাস্যরসের প্রকৃতি ও দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভ হইতে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইহার বিকাশ ও বিভিন্ন সমাজ প্রতিবেশে ও নানা উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্বাদ-বৈচিত্র্য চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। হাস্যরসের সূক্ষ্ম-স্থূল, নির্মল-আবিল, তিক্ত-স্নিগ্ধ, আক্রমণাত্মক ও সংস্কারধর্মী প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ তিনি উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনেক দুর্লভ, বিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থ হইতে তিনি হাসির উদাহরণ সঙ্কলন করিয়া আমাদের কৌতূহল ও জ্ঞানের পরিধি উভয়েরই বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন ও নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা সমাজের সহিত উহার সম্পর্ক ও প্রেরণার ইঙ্গিতটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। অধ্যাপক ঘোষের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে হাসির আলোচনায় তিনি গুরুগম্ভীর আলোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আমাদের হাস্যের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করেন নাই—পাণ্ডিত্যের গুরুভার শিলার অবরোধে ইহার সরস প্রবাহকে ব্যাহত করেন নাই। তাঁহার রচনা-ভঙ্গীর মধ্যেও স্মিত হাস্যের স্নিগ্ধ দ্যুতি বিকীর্ণ হইয়াছে—তাঁহার আলোচনার লঘু সরসতা সম্পূর্ণরূপে বিষয়োপযোগী হইয়াছে। গম্ভীর বিশ্লেষণের মধ্যেও তিনি মাত্রাজ্ঞান হারান নাই—হাস্যরসিক বিদগ্ধ পাঠকের নিকট যেরূপ প্রসন্ন অভিনন্দন ও রসাস্বাদনের অনায়াসলীলা প্রত্যাশা করেন অজিতকুমারের আলোচনায় তাহা অক্ষুণ্ণ আছে। হাস্যতত্ত্ব ও হাস্যরস সম্বন্ধে এই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ পড়িয়া কেহ যে গাম্ভীর্যের আতিশয্য দ্বারা প্রতিহত হইবেন না ও হাসিকে বিভীষিকার চক্ষে দেখিবেন না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার কেবল যে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যধারার প্রথাগত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রসিকতার স্বরূপটি আমাদের বোধগম্য করিয়াছেন তাহা নয়, হাস্যরস সম্পর্কিত সাধারণ মন্তব্য ও বিভিন্ন হাস্যরসিকের তুলনামূলক বিচারের দ্বারাও তাঁহার আলোচনাকে মননসমৃদ্ধ করিয়াছেন। একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন লেখকের হাতে কিরূপ নূতন নূতন ধরণের হাস্যসৃষ্টির হেতু হয় তাহাও তিনি নিপুণভাবে ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমি আশা করি যে, এই সুকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত গ্রন্থখানি হাস্যরস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য কোষগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিবে ও হাসির অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া আমাদের নিকট উহার উপভোগ্যতা আরও বাড়াইয়া তুলিবে।

নিবেদন

হাস্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে আমার দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা ও গবেষণার ফল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। হাস্যরস সম্পর্কিত আলোচনার আত্যন্তিক অভাবের কথা চিন্তা করিয়াই এ-সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং আমার গবেষণানির্দেশক পরমপূজ্য আচার্য ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক বৎসর ধরিয়া গবেষণা চালাইয়া এই গবেষণা-গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার জন্য ডি, ফিল, উপাধি দ্বারা আমাকে ভূষিত করিয়াছেন। আমার গবেষণার অন্য দুইজন পরীক্ষক অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আমার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ঐ উপাধির জন্য ইহাকে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার গবেষণাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি, যথা, হাস্যতত্ত্ব, হাস্যরস ও বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস। হাস্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া আমি হাসির শারীর ও মানসতত্ত্ব, হাসির উৎস ও প্রকাশবৈচিত্র্য, হাসির বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও হাসির সমাজ-পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছি। হাস্যরসের আলোচনায় আমি চারপ্রকার প্রধান সাহিত্যিক হাসি গ্রহণ করিয়াছি, যথা, Humour, Wit, Satire ও Fun। এই চারপ্রকার হাস্যরসের কোন সর্বজনস্বীকৃত বাংলা নাম নাই, আলোচনার সুবিধার জন্য আমি বাংলায় যথাক্রমে ইহাদের নাম দিয়াছি—করুণ হাস্যরস, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অথবা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস, ব্যঙ্গরস ও কৌতুকরস। এই চারপ্রকার হাস্যরস লইয়া বিদেশী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্তসহ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছি, হাস্যরসের এই কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস লইয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি। তাহাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত হাস্যরসের ধারা লইয়া ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ করিয়াছি। বোধ হয় কোন উল্লেখযোগ্য

সাহিত্যধারা ও কৃতী হাস্যরসিকের হাস্যরস আমার আলোচনার বহির্ভূত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া আমি প্রত্যেক লেখকের সমকালীন সামাজিক পরিবেশ, তাঁহার প্রতিভার ধর্ম এবং তাঁহার হাস্যরসের উৎস, কোন্ শ্রেণীর হাস্যরসে তাঁহার প্রবণতা, তাঁহার হাস্যরসের কলা-নৈপুণ্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি।

এই গ্রন্থরচনায় অনেক প্রামাণ্য পুস্তক হইতে বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। পাদটীকায় যথাস্থানে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জীও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর একটি কথা। হাসির আলোচনা যদি নীরস ও ভারগ্রস্ত হয় তবে তাহার মূল্য নাই। এজন্য আমার আলোচনা যথাসম্ভব সরস ও উপভোগ্য করিতেই চেষ্টা করিয়াছি।

আমার এই গবেষণা-কার্যে যাঁহাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য ও উপদেশ পাইয়াছি তাঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রথমেই আচার্য ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিব। তাঁহার কাছে আমি যে কতভাবে ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। যে সতর্ক যত্ন ও স্নেহশীল আগ্রহ লইয়া তিনি আমার গবেষণা পরিচালনা করিয়াছেন তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও স্নিগ্ধ সরসতার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। তাঁহার শতপ্রকার কাজের মধ্যেও এই গ্রন্থের জন্য তিনি একটি অতিমূল্যবান মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরণে আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বরাবর আমার গবেষণা সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও অশেষ প্রীতিভাজন বন্ধুমণ্ডলী, যথা, ডক্টর সাধন ভট্টাচার্য, ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়, ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী এবং আরো অনেকের নিকট হইতে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাইয়াছি তাহাও আজ বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি। আমার বহু ছাত্রছাত্রী গবেষণা সত্বর সমাপ্ত করিবার জন্য আমাকে নিরন্তর উত্তেজিত করিয়াছে, তাহাদের সকলকে দূর হইতে প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি। আমার উপাধিপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া যে-সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে

অভিনন্দন জানাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিমুগ্ধ চিত্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহাদের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীতুলসী দাস এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে এবং ইহার সর্বপ্রকার পারিপাট্য বিধানে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে এই বইয়ের প্রকাশক জনাব আয়নূল হক খাঁ ও কৃতী কথাশিল্পী শ্রীঅবিনাশ সাহাকেও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তাঁহারা কোনদিকে কার্পণ্য করেন নাই। আমার সর্বপ্রকার অনুরোধ তাঁহারা সাগ্রহে রক্ষা করিয়াছেন।

ইতি

বিনীত **অজিতকুমার ঘোষ**

৩, উমেশ দত্ত লেন

কলিকাতা-৬

১লা ডিসেম্বর। ১৯৬০

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

হাস্যতত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

হাস্যরস

তৃতীয় খণ্ড

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

পরিশিষ্ট

হাস্যতত্ত্ব

হাসির শারীর তত্ত্ব

হাসি মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় ইহাও আদিম, সনাতন এবং সাধারণ। এই প্রবৃত্তির উৎপত্তি মানুষের মনে এবং ইহার অভিব্যক্তি মানুষের দেহে। সাধারণত মনের মধ্যে যখন কোন প্রফুল্লতা জন্ম লাভ করে তখন হাস্যের মধ্য দিয়া সেই প্রফুল্লতার বাহ্য অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে প্রফুল্লতা না থাকিলেও কোন কোন সময় হাসি ফুটিয়া উঠে, সেই হাসির সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ **William McDougall** তাঁহার **Social Psychology** নামক পুস্তকে হাস্যের সাত প্রকার লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে—

১। ইহা সর্বসাধারণের মধ্যে সুলভ। ২। ইহা সহজাত ও শিক্ষা-নিরপেক্ষ। ৩। ইহা একটি অনুভূত প্রবৃত্তির দ্বারা সঞ্জাত হয় এবং কমবেশী মানুষের আয়ত্তাধীন। ৪। ইহা অন্য সব শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়াকে দমন করিয়া রাখিতে পারে। ৫। ইহার সহিত আমোদ, প্রফুল্লতা, কৌতুক প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়া থাকে। ৬। ইহাতে যে কেবল মাত্র শারীরিক উত্তেজনা হয় তাহা নহে, পরন্তু ইহার মধ্য দিয়া কোন জটিল পরিস্থিতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম মননশীলতা জন্মে। ৭। ইহা আমাদের স্বভাবের সহানুভূতি-প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন—অন্যকে হাসিতে দেখিলে অথবা অন্যের হাসির কথা শুনিলে আমাদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হাস্য-প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয়। এই লক্ষণগুলি লইয়া যথাস্থানে বিশদ বিশ্লেষণ হইবে। প্রথমে আমরা মানুষের দেহে হাসি কিভাবে অভিব্যক্ত হয় তাহা আলোচনা করিব।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার **The Physiology of Laughter**[1] নামক প্রবন্ধে হাস্যের দেহতত্ত্ব (**Physiology**) লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। স্পেন্সারের মতবাদ লইয়া পরবর্তী কালে অনেক হাস্যতত্ত্ববিশারদ নানা রকমের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেন্সার বলিয়াছেন যে কোন আবেগ বা অনুভূতির দ্বারা আমাদের শিরা উত্তেজিত হইলে,

1. Essays: Scientific, Political & Speculative by Herbert Spencer (1872)

সেই শিরা-সংযুক্ত পেশীসমূহে সেই উত্তেজনার সঞ্চার হয়।[১] হাস্যোৎপাদক অনুভূতির বিপরীত কোন অনুভূতি মনের মধ্যে উদ্রিক্ত হইলে হাস্য দমিত হইয়া যাইবে; যেমন,—হাস্যজনক আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যদি মন বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে হাস্যের বিকাশ হইবে না। তাহা না হইলে হাস্যোৎপাদক অনুভূতি বিশেষ বিশেষ পেশীকম্পন ও সঞ্চলনের মধ্য দিয়া আত্মবিকাশ করিবেই। মনের মধ্যে হাস্যময় অনুভূতির জন্ম হইলে অধরোষ্ঠের আকুঞ্চন-প্রসারণ হয় এবং দন্তরুচি-কৌমুদী বিকশিত হইয়া পড়ে—ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া স্পেন্সার বলিয়াছেন যে বাগ্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়াই অনুভূতির অভিব্যক্তি প্রায়শ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য হাস্যের বিকাশ প্রথমত মুখের কয়েকটি শিরা-উপশিরা ও পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণের মধ্য দিয়া দেখা যায়। হাসিবার কালে মুখবিবর বিবৃত হয়, মুখের কোণ দুইটি পশ্চাৎ-প্রসারিত এবং ঈষৎ উন্নীত হয় এবং ওষ্ঠ উপরের দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে।[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডারউইন তাঁহার **The Expressions of Emotions** নামক গ্রন্থে হাস্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ডারউইন বলিয়াছেন যে আমাদের ওষ্ঠের সহিত চোখের গোলাকৃতি পেশীর (**Orticular muscles**) সংযোগ রহিয়াছে। হাসির সময় ওষ্ঠ এবং সেই পেশীর ক্রিয়া একসঙ্গে লক্ষিত হয়।[৩]

1. Nervous excitation always tends to beget muscular motion, and when it rises to a certain intensity always does beget it. Not only in reflex actions, whether with or without raised sensation, do we see that special nerves when raised to states of tension, discharge themselves on special muscles with which they are indirectly connected ; but those external actions through which we read the feelings of others, show us that under considerable tension, the nervous system in general discharges itself on the muscular system in general either with or without the guidance of the will. The Physiology of Laughter, P. 453.

2. Well, it is through the organs of speech that feeling passes into movemant with the greatest frequency. The jaws, tongue and lips are used not only to expess strong irritation or gratification, but that very moderate flow of mental energy which accompanies ordinary conversation, finds its chief vent through this channel. Hence it happens that certain muscles round the mouth, small and easy to move, are the first to contract under pleasurable emotion. Ibid, P. 459.

3. Judging from the manner in which the upper teeth are always exposed during laughter and broad smiling as well as from my own sensations, I can not doubt that some of the muscles running to the

মুখের কোণ দুইটির পশ্চাৎ প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডদ্বয়ও পশ্চাতে এবং ঊর্ধ্বে আকর্ষিত হইতে থাকে এবং চোখের নীচে চর্মকুঞ্চন দেখা দেয়। হাসির সময় চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও সিক্ত হইয়া উঠে। ইহার কারণ, চোখের গোলাকৃতি পেশীর সংকুচন এবং ঊর্ধ্বে উন্নীত গণ্ডের পেষণ।[১]

হাস্যকালে একপ্রকার সবিরাম (Intermittent) শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ, ফুসফুস হইতে শ্বাসনালীর মধ্য দিয়া বায়ু নিঃসৃত হইবার সময় নালীর মুখে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য হাস্য-প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলে বায়ু অতি বেগে নির্গত হইতে চায় বলিয়া নালীপথে একেবারে আটকাইয়া যায় এবং তখন কোন শব্দই ধ্বনিত হয় না। হাহা, হিহি, হোহো, হেহে ইত্যাদি নানা প্রকারের হাস্যধ্বনি শোনা যায়। মুখবিবর এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংবৃতি, বিবৃতি এবং অর্ধসংবৃতির ফলে বিভিন্ন ধরণের হাসি ধ্বনিত হইয়া থাকে।

বাংলায় আমরা সর্বপ্রকার হাসির নাম একই রাখিয়াছি, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার হাসির বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজ স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত অপহসিত, এবং অতিহসিত এই ছয় প্রকার হাসির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২] ইংরেজীতে স্বল্পহাসিকে Smile এবং উচ্চহাসিকে Laughter বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হাস্যজনক আনন্দানুভূতি মনকে স্বল্পভাবে উত্তেজিত করিলে স্মিতহাসি (Smile) এবং প্রবলভাবে উত্তেজিত করিলে সশব্দ হাসির উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্মিতহাসিতে ওষ্ঠাধর ঈষৎস্ফুরিত এবং দন্তাবলী কিঞ্চিৎ বিকসিত হয়, এবং উচ্চহাসিতে ওষ্ঠাধর আকর্ণ-বিসারিত, নয়নযুগল অনতি-নিমীলিত, কুঞ্চনসংকুল এবং নির্গমনশালী বায়ুপ্রবাহে শব্দায়মান হইয়া

---

upper lip are likewise brought into moderate action. The upper and lower orbicular muscles of the eyes are at the same time more or less contracted, and there is an intimate connection between the orbiculars, especially the lower ones, and some of the muscles running to the upper lip. The Expressions of the Emotions, P. 202-206.

1. Their brightness seems to be chiefly due to their tenseness, owing to contraction of the orbicular muscles and the pressure of the raised cheeks. Ibid, P. 206.

২। ঈষদ্বিকাসি নয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরং।
কিঞ্চিল্লক্ষ্যদ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ॥
মধুর স্বরং বিহসিতং সাংসশির কম্পমবহসিতং।
অপহসিতং সাস্রাক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবত্যতিহসিতম্॥

পড়ে। উচ্চ হাসিতে আনন্দানুভূতির সাবলীল বিকাশ হয়, স্মিতহাসিতে বিমিশ্র অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চহাসি স্বতঃস্ফূর্ত এবং আমাদের আদিম প্রকৃতিজ, কিন্তু স্মিতহাসি ইচ্ছাচালিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, শৈরিক উত্তেজনা বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করিতে পারিলে প্রবলতর এবং অধিকতর দুর্দমনীয় হইয়া উঠে।[1] নীরব শোক সর্বাপেক্ষা অসহনীয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশ করে না সে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্রোধাবিষ্ট এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ থাকে। তেমনি হাস্যপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে যদি দমন করিবার চেষ্টা হয় তবে সেই প্রবৃত্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। গুরুগম্ভীর আবেষ্টনীর মধ্যে হাসি চাপিবার চেষ্টায় মুখ জোর করিয়া বন্ধ করিলে অনেক সময় নাকের মধ্য দিয়া আকস্মিক আবেগে হাস্যবায়ু নির্গত হয় এবং বিবৃত হাসি শব্দিত হইয়া পড়ে। হাসির প্রকৃতি এমনই মজার যে যখন আমাদের হাসা উচিত নয় তখনি হাসি যেন ঠেলিয়া উঠিতে চায়, হাস্যজনক যে ব্যাপার ভুলিতে চেষ্টা করা যায় তাহা যেন সজোরে মনের মধ্যে জাঁকিয়া বসে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের গম্ভীর বক্তৃতাকালে প্রাণবান ছাত্রকে হাসির আবেগ দমন করিতে যাইয়া কত বেগ পাইতে হয় তাহা তো আমরা সকলেই জানি। হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া নিরীহ ছাত্রকে হয়তো শাস্তি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় যদি জানিতেন যে ছাত্রটি এই অবস্থায় কত নিরুপায় তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন। নীতি এবং ধর্মোপদেশ, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতির সময় যখন আমাদের গম্ভীর হওয়া উচিত তখনি যেন দুষ্ট হাসি মনের মধ্যে কিলবিল করিয়া উঠে।[2]

হাসির প্রারম্ভিক অবস্থায় কেবলমাত্র মুখমণ্ডলের শিরা ও পেশী আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। ক্রমে হাসির আতিশয্য আসিলে শরীরের অন্যস্থানেও শিরা ও পেশীর ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অত্যধিক হাসির সময় শ্বাসযন্ত্র দ্রুত-ক্রিয়াশীল, শরীরের উত্তমাঙ্গ ক্রিয়াচঞ্চল, মস্তক পশ্চাৎদিকে আনমিত এবং মেরুদণ্ড ভিতরের দিকে বক্র হইয়া পড়ে। তখন মুখবিবর পূর্ণবিবৃত, মস্তক এবং মুখমণ্ডল রক্তবেগে পরিপূরিত এবং শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকে।

1. The Physiology of Laughter by Herbert Spencer, P. 457.

2. The consciousness, however it may arise, that there is something that we ought to look grave at, is almost always a signal for laughing outright. We can hardly keep our countenance at a sermon, a funeral or a wedding. Wit and Humour by W. Hazlitt P. 8.

প্রবল হাসিতে পেটের উপর চাপ পড়ে বলিয়া অনেক সময়েই পেটে ব্যথা জন্মিয়া যায়। সেই কারণেই লোকে বলিয়া থাকে, হাসতে হাসতে পেট ব্যথা। গভীর দুঃখে শরীরের মধ্যে যেরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয় অত্যধিক হাসিতেও সেইরূপ শারীরিক ক্রিয়া দেখা যায়। অশ্রু শোকের বাহন, কিন্তু অশ্রু আবার হাসিরও লক্ষণ। বিরুদ্ধ অনুভূতির অভিব্যক্তির মধ্যে এই সাদৃশ্যের জন্য বিকৃতমস্তিষ্ক, হিষ্টিরিয়া রোগী এবং শিশুদিগকে আমরা পর পর হাসিতে এবং কাঁদিতে দেখি।[১]

ইতর প্রাণীদিগের হাসি

সাধারণত আমরা মানুষকেই হাস্যময় প্রাণী বলিয়া থাকি, এবং ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে এই মানবসুলভ প্রবৃত্তি নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে হাসি মানুষের একচেটিয়া নহে, ইতর জন্তুর মধ্যেও হাসির বিশেষ সদ্ভাব আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হাসিতে মানসিক আনন্দময় অনুভূতি অভিব্যক্ত হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে আনন্দ সঞ্জাত হইলে তাহারাও মানুষের হাসির অনুরূপ মুখভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গি করিয়া সেই আনন্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। গৃহপালিত কুকুর প্রভুকে দেখিলে ঘন ঘন লাঙ্গুল আন্দোলন করিয়া তাহার দংষ্ট্রা প্রদর্শন করিয়া যে সাদর সম্ভাষণ জানায় তাহা আমরা কুকুরের হাসি বলিয়াই মনে করিতে পারি। ঘোড়ার চিহিঁ শব্দময় মধুর প্রাণমাতানো হাসি কে না শুনিয়াছেন? আমাদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ বানর এবং বানর গোত্রীয় জীবদের হাসি যে আমাদের হাসির অনুরূপ তাহা আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি। কাতুকুতু দিলে মানুষের মত বানরকেও হাসিতে দেখা গিয়াছে।[২] ডারউইন বলিয়াছেন যে বেবুন

1. Hence, it is scarcely possible to point out any difference between the tear-stained face of a person after a paroxysm of excessive laughter and after a bitter crying fit. It is probably due to the close similarity of the spasmodic movements caused by those widely different emotions that hysteric patients alternately cry and laugh with violence and that young children sometimes pass suddenly from one to the other state.
The Expressions of Emotions by Darwin, P. 208.

2. The anthropoid apes, as we have seen likewise utter a reiterated sound, corresponding with our laughter, when they are tickled, especially under the armpits. The Expressions of the Emotions by Darwin, P. 201.

খুশি হইলে ঠিক মানুষের ন্যায় নীচের চোয়াল ঘন ঘন নাড়িয়া হাসিতে থাকে।[১]

অসভ্য জাতিদিগের হাসি

সুসভ্য মানুষে কেবল হাসে তাহা নহে। অসভ্য মানুষও আনন্দপ্রকাশক হাসি হাসিয়া থাকে। বরং তাহাদের হাসি আরও বেশি খাঁটি, অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক। উল্লম্ফন এবং করতালিযোগে উচ্চ শব্দায়মান হাসি অসভ্য জাতিদিগের হাসির বৈশিষ্ট্য।[২] সাধারণত আনন্দানুভূতি ব্যক্ত করিবার জন্যই অসভ্য মানুষ হাসিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় দুর্বোধ ও বিস্ময়জনক ব্যাপার দেখিয়া ভয় ও কৌতুকবশতও সে হাসিতে পারে। অন্যের ভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও অক্ষমতা দর্শনে হাসি উদ্রিক্ত হয়। অসভ্য মানুষের হাসিও পরাজিত শত্রুর ভীরুতা ও দুর্বলতা বর্ণনে অথবা শ্বেতাঙ্গ লোকদিগের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অনুষ্ঠান দর্শনে সঞ্জাত হয়। অনুকরণ-কৌতুক অসভ্য লোকদের মধ্যে বিশেষ পরিদৃষ্ট এবং প্রায়ই দেখা যায় বিপক্ষ শত্রুদলের পরাজয়ের পর অসভ্যলোকেরা উৎসবের সময় কেহ পরাজিত শত্রুর ভীরুতা ও অসঙ্গতি অনুকরণ করে এবং তখন সমবেত অসভ্য নরনারী সুউচ্চ হাসিতে গড়াইয়া পড়ে। যাহাকে দেখিয়া আমরা হাসি তাহার অপেক্ষা আমরা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠতর মনে করি। হাসির অন্যতম কারণ এই শ্রেষ্ঠতাবোধ (feeling of superiority)। এসম্বন্ধে পরে বিশদভাবে বলা হইবে। অসভ্য লোক সভ্য লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুতরাং সাধারণত সভ্যলোকদিগের আচরণ অসভ্য লোকের হাস্য উদ্রেক করিবে ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। তবে সভ্য লোকের ব্যবহার ও আচরণে এমন অসঙ্গতি ও ত্রুটি অসভ্য লোকের চোখে পড়িতে পারে যাহাতে সভ্য লোককে সে উপহাস করিতে পারে। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী এক কথা বলে আর ভিন্ন রকম আচরণ করে, এই বিসদৃশ অসঙ্গতি দেখিয়া অসভ্য লোক অবজ্ঞার হাসি হাসিতে পারে।[৩]

---

1. Ibid, P. 2)2.

2. Loud laughter accompanied by jumping and clapping of the hands and frequently carried to the point of a flooding of the eyes—these are conspicuous characteristics to be met with among the Australian and other savage tribes. An Essay on Laughter by James Sully, P. 224.

3. Yet it is possible that the savage may, once and again in making merry at our expense show himself really our superior. His good sense

অন্যকে বিরক্ত করিয়া অথবা বিপাকে ফেলিয়া অসভ্য লোক বিশেষ মজা বোধ করিয়া থাকে। শ্লেষ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, ঠাট্টা তামাসা প্রভৃতিতে তাহাদের অতিশয় প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময়ে তাহারা স্ত্রীলোক লইয়া অশ্লীল ও দুর্নীতিমূলক রঙ্গব্যঙ্গ করিয়া থাকে। তাহাদের হাস্যকৌতুক যে সভ্য লোকের মত উচ্চাঙ্গের হইবে না তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

শিশুর হাসি—বিভিন্ন বয়স ও রুচির হাসি

'কচি কচি গাল ভরা খিলখিল হাসি
আমি বড়ই ভালবাসি।'

কে না ভালবাসে? নব কিশলয়নিভ বদনে ঈষদ্‌ভিন্ন দন্তরাজির চকিত দীপ্তি কে না ভালবাসে? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'শিশু আননের হাসির মত পরিব্যাপ্ত বিকসিত চারিধার'। এই হাসি অকারণ, অনাবিল, অফুরন্ত। জন্মের একমাসের মধ্যেই শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। প্রথমে শিশুর মুখে যে হাসি দেখা যায় তাহা স্মিত হাসি—দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মৃদু ভাতি। ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে মাতৃস্তন্যপান-তৃপ্ত শিশুর মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠে তাহাই শিশুর প্রথম হাসি।[১] সেই হাসি খাঁটি অর্থাৎ বিশুদ্ধ আনন্দজাত হাসি। তাহাতে চিন্তার রেশ নাই, বেদনার লেশ নাই—তাহা অবিমিশ্র প্রফুল্লতায় সম্পূর্ণ

may be equal to the detection of some of the huge follies in the matter of dress and other customs to which enlightened European so comically clings. And he has been known to strike the satirical note and to look down upon and laugh at the stupid self-satisfied Europeans who preached so fiinely but practised so little what they preached.

An Essay on Laughter by James Sully, P. 244.

1. According to the best of my knowledge the grimances and contortions of the corners of the mouth that characterise laughter appear first in the satisfied and satiated nursling when he drowsily quits the breasts. There it is a correct motion of expression since it bespeaks the determination to take no more nourishment, an "enough so to speak" or rather a "more than enough." This primal sense of pleasurable satiation may have furnished the smile, which even remains the basis phenomenon of Laughter, the later connection with the pleasurable processes of discharge.

Wit and its relation to the unconscious, by S. Freud, P. 226.

অমলিন।[1] হাস্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচক জেমস সালি তাঁহার গ্রন্থে (An Essay on Laughter) শিশুর হাসি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রথম দুই তিন মাসের মধ্যেই দৈহিক ও মানসিক আমোদ-জাত স্মিত ও উচ্চ হাসি পরিদৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষে কাতুকুতু-জনিত হাসি দেখা যায়। এই হাসিই তামাসা অথবা কৌতুকক্রীড়ার আদি স্তর।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যকৌতুকের বৈচিত্র্য ও জটিলতা দেখা যায়। অনুকরণ-মূলক কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস প্রভৃতি ছোট ছোট বালক-বালিকার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যৌবনে প্রাণশক্তির প্রাচুর্যের জন্য হাস্যপ্রবৃত্তি অতি সহজেই উত্তেজিত হয়। ইহা বাহিরে আতসবাজির ন্যায় অসংখ্য ফুলকি ছড়াইয়া চতুর্দিক দীপ্ত করিয়া তোলে। যুবতীর হাসির কথা আর কি বলিব! তাহা কাব্য-সাহিত্যের সামগ্রী। সেই রূপকথার যুগের নায়িকা—যাহার হাসিতে মানিক ঝরিত—তাহার সময় হইতে কত শিখরি দশনা, কত কুন্দবিনিন্দিত দন্তধারিণী, কত মুক্তাপংক্তি-গঞ্জিনী যে সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে তাহা সাহিত্য-রসিকের অবিদিত নাই। বুড়া বয়সের হাসি—স্খলিতদন্তের হাসি—চিন্তা ভাবনা পীড়িত মনের হাসি বড় শুষ্ক, বড় জটিল, বড় নিরানন্দ। বুড়া কমলাকান্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসি-কান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে, এখন হাসি কান্না। ছিঃ!—কেবল লোক হাসান।' তবে এমন অনেক বুড়া আছেন যাঁহারা চুলে কলপ মাখিয়া, মুখে নকল দাঁত লাগাইয়া নয়নাভিরাম হাসি হাসেন। তাঁহাদের কথা অবশ্য আলাদা।

আমরা পরে হাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিব। কিন্তু একটি বিষয় প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে হাস্যবোধ আপেক্ষিক ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। একটা ব্যাপারে একজন লোক হাসিয়া গড়াইতে পারে, অথচ আর একজন লোক তাহাতে হাসিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়াছেন—

I am Sir Oracle
And when I ope my lips, let no dog bark.

1. It is a pure primitive gaiety, uncomplicated by reflection and sadness. An Essay on Laughter by Sully, P. 219.

এই ধরণের লোক দার্শনিক হেরাক্লিটাস-এর শিষ্য, ইহারা জগতের হা-হুতাশ, কান্না ও বিলাপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। ইহারা কেবল মুখ গম্ভীর করিয়া তত্ত্বকথা শোনায় ও মন ভার করিয়া উপদেশ দেয়। ইহারা লোকের অহিতকামী, সমাজের অনিষ্টকারী, পৃথিবীর দুঃখ-বেদনা ইহারা অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়। কবি কিটস পৃথিবীর মধ্যে 'The weariness, the fever and the fret'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সবের পক্ষে হাসি অব্যর্থ ধন্বন্তরি বটিকা। যাহার সঙ্গীত ভাল লাগে না শেক্‌স্‌পীয়র তাহাকে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তেমনি যে কখনও হাসে না তাহাকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে। তাহার মনে কুটিল ষড়যন্ত্র ভাসিতেছে। তাহার মনের মলিন বাষ্প নির্গত হইতে না পারিয়া সমস্ত দেহমনকে গাঁজাইয়া তুলিতেছে।

যে অনবরত হাসে সেই যে প্রকৃত হাস্যরসিক তাহা নহে। প্রকৃত হাস্যরসিক নিজে খুব কম হাসে কিন্তু অপরকে সেই বেশি হাসায়। তাহার আপাতগম্ভীর মুখের নীচে অফুরন্ত হাসির ধারা লুকাইয়া আছে।[1] হাস্যপ্রবৃত্তি যদি বাহ্য হাস্যের মধ্য দিয়া অনবরত বাহির হইয়া যায় তবে হাস্যবোধ মনের মধ্যে জন্মিতে পারে না। হাস্যানুভূতি যদি মনের মধ্যে থিতাইতে পায় তবেই তাহা মানুষকে অধিক হাস্যরসিক ও কৌতুকপ্রিয় করিয়া তোলে।

হাসির উপকারিতা

হাসির দৈহিক ও মানসিক উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। যাহারা হাসিতে পারে তাহারা ভাগ্যবান, সংসারের দুঃখদৈন্যের ভার তাহাদের কাছে লঘু হইয়াছে। জীবনের সমস্যা তাহাদের কাছে সহজ হইয়া আসিয়াছে। স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ হাস্যকে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ কার্যকর ও উপকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অ্যারিস্টোটলের সময় হইতে বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, হাসি ফুসফুস এবং দেহ-যন্ত্রকে সবল এবং সক্রিয় করিয়া তোলে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের শিরা ও পেশী সঞ্চালিত হইয়া শরীরকে সুস্থ ও সতেজ করিয়া তোলে। সাধারণের মধ্যে যে ধারণা আছে যে ভালভাবে হাসিতে

1. Similarly, men who, as proved by their powers of representation, have the keenest appreciation of the comic are usually able to do and say the most ludicrous things with perfect gravity.

The Physiology of Laughter by H. Spencer, P. 457.

পারিলে হজমশক্তি বর্ধিত হয় তাহা মোটেই অমূলক নহে। হাসিতে মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া রক্তচলাচল দ্রুততর করিয়া মস্তিষ্ককে মুক্ত ও হাল্কা করিয়া তোলে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে হাসিতে শিরা, পেশী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফীত এবং বর্ধিত হয় এবং দুঃখবেদনা ঐগুলিকে সংকুচিত করিয়া তোলে।[১]

হাসি মানুষের স্বর্গীয় সম্পদ, হাসিতে জীবন সুখী এবং মধুময় হইয়া উঠে। যে কষ্ট-ভাবনা মনের মধ্যে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া রহিয়াছে হাসির এক ফুৎকারে তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়। হাসি পরকে আপন করে, আপনকে অন্তরতম করিয়া তোলে।[২] এক সঙ্গে বসিয়া যাহার সঙ্গে হাসা যায় তাহার প্রতি মনের গোপন কোণে এক অজ্ঞাত সহানুভূতি জমা হইতে থাকে। ঘৃণ্যতম শত্রুও হাসির আশ্চর্য প্রভাবে পরম মিত্রে পরিণত হইতে পারে। ক্রোধে যে অধীর হইয়াছে তাহাকে কোনোক্রমে হাসাইতে পারিলে ক্রোধ এক নিমেষে জল হইয়া যাইবে। হাস্যবান লোক চুম্বকের ন্যায় অব্যর্থ আকর্ষণে সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে। তাহার কাছে যাইতে, তাহাকে ভালবাসিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। দুঃখ-পীড়িত, বিষাদ-ক্লিষ্ট মন এক মুহূর্তেই হাস্যের আলোকে প্রদীপ্ত ও সতেজ হইয়া উঠে।

হাস্যরসিক ব্যক্তি সমাজের সকলেরই প্রিয়পাত্র। যে আমাদিগকে হাসাইতে পারে তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও ভালবাসা জন্মিয়া থাকে, তাহার দর্শনেই আমাদের মন খুশিতে ভরপূর হইয়া ওঠে। প্রাচীন যুগের রাজাদের আমলে বিদূষক অথবা ভাঁড় থাকিত। তাহারা সকলকে হাসাইত, সকলেই তাহাদিগকে ভালবাসিত। সেই প্রাচীন যুগের বিদূষক (Jester) হইতে আধুনিক কালের হাস্যরসস্রষ্টা (Humorist) পর্যন্ত সকলেই সমাজের কাছে অবিচ্ছিন্ন স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। সিনেমা থিয়েটারে যাহারা

---

1. It (laughter) illustrates the broad generation laid down by psychologists that a state of pleasure manifests itself in vigorous and expansive movements whereas a state of pain involves a lowering of muscular energy and a kind of shrinking into oneself.

An Essay on Laughter by J. Sully, P. 3১.

2. Nothing, indeed, seems to promote sympathy more than the practice of laughing together. Family affection grows in a new way when a reasonable freedom is allowed to laugh at one another's mishaps and blunders. Ibid, P. 417.

হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় অভিনয় করে তাহারা সকল দর্শকের কাছেই অত্যধিক প্রিয়। চার্লি চ্যাপলিন এবং লরেল-হার্ডি অথবা বাংলা সিনেমা-থিয়েটার জগতের নবদ্বীপ হালদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতাকে দেখিবা মাত্রই সকল দর্শকের মন খুশির হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমরা যখন গম্ভীর ও রাসভারী হইয়া থাকি তখন ছদ্মবেশের নীচে আমরা আমাদের স্বাভাবিক সত্তা লুকাইয়া রাখি আর আমরা যখন প্রাণ খুলিয়া হাসি তখন আমাদের সত্যকার প্রকৃতি প্রকাশিত হয়।[1] আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা আমাদিগকে অনেক মিথ্যার ভূষণে ভূষিত করিয়াছে। হাসি সেই মিথ্যা ভূষণ ছিন্ন করিয়া, কপট আচরণ ভিন্ন করিয়া আমাদের আদিম, সহজ প্রকৃতিকে অনাবৃত করিয়া দেয়। সেই প্রকৃতি কোন নিয়মের শাসন মানে না, কোন নীতির চোখ-রাঙানি গ্রাহ্য করে না। আমাদের প্রতিদিনকার সমাজ-শাসিত, সভ্যতা-চালিত পথে অতি সতর্ক পাদক্ষেপে চলিতে হয়, কিন্তু হাসির কাদামাটির প্রাঙ্গণে আমরা প্রাণ খুলিয়া ছুটাছুটি, লুটোপুটি করিতে পারি।

বিভিন্ন ধরণের হাসি

পূর্বে আমরা হাসির উচ্চতা, লঘুতা ও বিভিন্ন বয়স এবং রুচির হাসির কথা আলোচনা করিয়াছি, এইবার আমরা হাসির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিব। আমরা স্থূল হাসি হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম ও জটিল হাসি সমূহে অগ্রসর হইব।

কাতুকুতুজনিত হাসির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। এই হাসি নিতান্ত স্থূল ও শিশু-সুলভ। ইহাতে মানসিক অপেক্ষা দৈহিক অনুভূতিরই কার্যকারিতা বেশি। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কাতুকুতু দিলেই বেশি

1. The serious and the mirthful are in perpetual contrast in human life ; in the characters of men and in the occasions and incidents of our every day experience. The mirthful is the aspect of ease, freedom, abandon and animal spirits. The serious is constituted by labour, difficulty, hardship and the necessities of our position which give birth to the severe and constraining institutions of government, law, morality, education etc. It is always a gratifying deliverance to pass from the severe to the easy side of affair ; and the comic conjunction is one form of the transition. The Emotions and the *Will* by A. Bain (1899), P. 261.

হাসি পায়।[১] বগল, পায়ের তলা ইত্যাদি জায়গায় সুড়সুড়ি দিলে আমরা হাসি দমন করিতে পারি না। ডাঃ সালি দেখাইয়াছেন যে কাতুকুতু দিলে আমাদের শরীরে দুই রকম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়—

১। কাতুকুতু প্রতিরোধ করিবার জন্য আমরা আত্মরক্ষামূলক উপায় অবলম্বন করি। ২। কাতুকুতুর ফলে প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে আমরা চঞ্চল হইয়া উঠি। কাতুকুতুর মজা এই যে, ইহাতে আমরা একসঙ্গে আমোদ ও বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকি। কাতুকুতুর হাসি দৈহিক অনুভূতি-জাত ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মনের অংশ যে একেবারেই নাই তাহা নহে। একটি শিশুকে কাতুকুতু দিলে তখনই হাসিবে যখন সে বুঝিবে যে হাস্যোৎপাদক ব্যক্তি তাহার সহিত ঠাট্টাতামাসা করিতেছে। তখন তাহারও মন হাস্যকৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং কাতুকুতু দিলে সে হাসিয়া উঠিবে।

মানসিক কোন প্রকার অনুভূতি ব্যতীত আর একপ্রকার হাসি উদ্রিক্ত হইতে পারে, তাহাকে স্বস্তির হাসি (Laughter of relief) বলা যাইতে পারে। কোন কষ্টজনক অনুভূতি, যথা—চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় ইত্যাদি মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিলে এই স্বস্তির হাসিতে অনেক সময় মন ভারমুক্ত হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়, কোন বিপদ আপদ, দুর্ঘটনা ও দৈবদুর্বিপাকে মন ভয়ে আচ্ছন্ন হইলে, সেই ভয়ের কারণ অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হাস্যবেগে দেহ দুলিয়া উঠে। এখানে হাসি ভয়মুক্তির একটি শারীরিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। বিপন্ন অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, সেই অবস্থার চিন্তা এবং বর্ণন হাস্য উদ্রেক করিয়া থাকে। শিকারীদের বিপদ-পূর্ণ শিকার-কাহিনী অনেক সময়েই প্রবল হাস্যের খোরাক হইয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে আকস্মিক দুঃখশোকের আঘাতেও হাস্য নির্গত হইতে পারে। গভীর শোকাহত হইয়া অনেক লোককে হাসিতে দেখা গিয়াছে। মানসিক কষ্ট অসহনীয় হইয়া উঠিলেই এই রকম হাসির শারীরিক প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিষাদান্তক নাটকের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন বিষাদজনক ঘটনা শিরার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে বলিয়া হাস্যময় দৃশ্যের অবতারণার দ্বারা শৈরিক স্বস্তি বিধান করা হইয়া

---

1. The parts of the body which are most easily tickled are those which are not commonly touched, such as the armpits or between the toes, or parts such as the soles of feet, which are habitually touched by a broad surface, but the surface on which we sit offers a marked exception to this rule. The Expression of the Emotions, P. 201.

থাকে।[১] একঘেয়ে অবস্থার ক্লান্তি ও বিরক্তি যখন নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে তখন হাস্যকে আমরা পরম আরাম ও স্বস্তির উপায় বলিয়া সাদর আহ্বান জানাই। বিদ্যালয়ে গম্ভীরানন শিক্ষক মহাশয়ের গুরু তত্ত্বকথার সময় অথবা ভাড়াটিয়া রাজনৈতিক বক্তার সুদীর্ঘ ও মামুলী বক্তৃতা স্রোতের মধ্যে যখন সকলের মধ্য হইতে বিরক্তির হাই উঠিতে থাকে তখন সামান্য একটুকরা হাসির জন্য মন আঁকুপাঁকু করে। সামান্য কোন কারণ উপস্থিত হইলেই তখন সুউচ্চ হাসির মধ্য দিয়া দেহ ও মনকে সতেজ করিয়া লইবার ইচ্ছা হয়।

হাসির প্রধান কারণ আনন্দানুভূতি, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই আনন্দজাত হাসিই আদি, অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ হাসি। এই হাসিই ইতর প্রাণী, অসভ্য-মানুষ, শিশু ও বয়স্ক লোকের সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। মন যখন খুশিতে ভরপুর হইয়া থাকে তখন হাসি সেই খুশির বাহ্য প্রকাশ রূপে নির্গত হয়। অনেক সময় কোন হাস্যজনক ঘটনা কিংবা চরিত্র উপস্থিত না থাকিলেও অন্তরের আনন্দ আপনা হইতেই হাসির ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিলেও মনের মধ্যে হঠাৎ কোন আনন্দ জন্মাইলে লোকে হাসির মধ্যে দিয়া সেই আনন্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। একটা ঘটনা অথবা চরিত্র দেখিয়া এক সময় হাসি পায় আবার অপর সময় হাসি পায় না, অথবা একজনের হাসি পায় অন্যজনের হাসি পায় না—ইহার কারণ, যখন যাহার মনে আনন্দ থাকে তখন সেই কেবল হাসিতে পারে। ডাঃ সালি হাসিকে খেলার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়াছেন। খেলার সময় দেহ ও মনের যে ভাব হয় হাসির সময়ও তাহা হয়। খেলাতে মন সতেজ ও প্রফুল্ল এবং দেহ সবল ও সক্রিয় থাকে। হাসির সময় দেহ ও মনের সেই অবস্থা দেখা যায়। খেলার সময় দেহমন যেমন একটা শাসন-হারা, বাঁধন-ছেঁড়া জগতে উদ্দামভাবে ভাসিতে থাকে হাসির সময়ও ঠিক সেই রকম হয়।

কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারায়ে কোন বনে যাই,

1. It is, I believe, the specially severe strain which is the essential pre-condition of the laughter. It makes the attitude a highly artificial one, and one, which it is exceedingly difficult to maintain for a long period...Hence the readiness with which such a means of temporary relief as laughter undoubtedly supplies is seized at the moment.

An Essay on Laughter by Sul'y, P. 68.

কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।

হাসি আমাদিগকে এই চঞ্চল ক্রীড়ার সীমাহীন ক্ষেত্রে, এই অবিরাম ছুটি, নিশ্চেষ্ট অবসর ও নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে লইয়া যায়।

হাসি সম্মিলিতভাবে উপভোগের সামগ্রী। বহুলোক একত্রিত হইলে হাস্যকৌতুক ভালভাবে জমিতে পারে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব একত্রে সমবেত হইলে সেখানে হাসি বিশেষ উপভোগ্য হয়। বহুলোক সমাগমে প্রেক্ষাগৃহ যখন গমগম করিতে থাকে তখন হাস্যরস উপভোগ করিবার পক্ষে মন বিশেষ ইচ্ছুক ও অনুকূল হইয়া উঠে। সামান্য হাসির কথা অথবা হাসির দৃশ্যে তখন হাসির অর্কেস্ট্রা চতুর্দিক ধ্বনিত ও নন্দিত করিয়া তোলে। দূর হইতে সেই সুবিপুল হাস্যমত্ততা লক্ষ্য করিতে বেশ মজা লাগে। ঘনসন্নিবিষ্ট হাস্যচঞ্চল লোকগুলিকে ক্রীড়াশীল ফেনিল সমুদ্র তরঙ্গ বলিয়া মনে হয় এবং সম্মিলিত কণ্ঠ-প্রসূত প্রবল হাস্যধ্বনি গম্ভীর সমুদ্রমন্দ্র বলিয়া বোধ হয়। মন অনুকূল অথবা প্রস্তুত না থাকিলে অনেক হাস্যজনক ব্যাপার হাস্য উদ্রেক করিতে পারে না। সেই জন্য সুচতুর হাস্যরসিক আস্তে আস্তে শ্রোতার মন রসানুকূল করিয়া তারপরে হাস্য উদ্রেক করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা হাস্য-প্রকৃতির এই গোপন রহস্যটি জানেন না তাঁহারা আনাড়ির মত আসরে নামিয়া প্রথমেই হাসাইবার চেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য তাঁহাদের হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা অসময়ে মাঠেই মারা যায়, এবং উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে নিজেরাই তাঁহারা বেয়াকুব ও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়েন। যিনি হাসাইবার চেষ্টা করেন তিনি যদি হাসাইতে না পারেন তবে লোকে হাস্যের উপহার তাঁহার কাছ হইতে গ্রহণ না করিয়া উপহাস্যের মালার দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করে। অপর পক্ষে মন যদি একবার হাস্যের প্রতি অনুকূল ও প্রবণ হইয়া পড়ে তবে হাস্যবেগ মুহূর্তে শিলা-অবরোধমুক্ত ঝরনার ধারার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। তখন হাসি লক্ষ্য এবং হাসির কারণ উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে।[১] যে কোন তুচ্ছ কারণে তখন হাসি ঠিকরাইয়া বাহির হয়। হাসির দৃশ্য এবং ধ্বনির মধ্যে

---

1. It is probable, too, that the tendency during a prolonged state of mirth to recommence laughing after a short pause is referable to a like cause, the physiological springs of the movements being once set going the explosive fit tends to renew itself.

An Essay on Laughter by Sully, P. 74.

একটা সংক্রামকতা আছে। হাসি দেখিলে মনের মধ্যে হাস্যপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। যে হাসিবে না বলিয়া মন দৃঢ় ও কঠোর করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া বসিয়া থাকে সেও কিছুক্ষণ পরে গাম্ভীর্যের আগল সরাইয়া হাসির বেগকে মুক্তি দেয়। হাসির জগতে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই, ছোট বড় পার্থক্য নাই। এই জগৎ পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক জগৎ। এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের গায়ে হাসির রঙ লাগাইয়া মজা দেখিতেছে। নবাগত যে আসিতেছে সেই স্বাতন্ত্র্য ও ভদ্রতার জামাকাপড় খুলিয়া এই রঙ মাখামাখিতে যোগ দিতেছে। অনেক সময় দেখা যায় হাসির বেগ লোককে এই ভাবে আক্রমণ করে যে, না বুঝিয়াও লোকে সকলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্য হাসিতে বাধ্য হয়।

এই পর্যন্ত আমরা প্রকৃত হাসির বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এইবার বিকৃত হাসির বিষয় আলোচনা করিব। হাসির সময় শরীরের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় সে-সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি। হাসি যখন মনের ভিতর হইতে সহজ ও সাবলীলভাবে উৎসারিত না হয় তখন হাস্যজনিত সেই সব প্রতিক্রিয়া ঠিক লক্ষিত হয় না। বিকৃত অথবা নকল হাসি একমাত্র ওষ্ঠাধর বিকৃত ও দন্তরেখা প্রকাশিত করে। শরীরের অন্য কোনস্থল চঞ্চল করে না। মন খারাপ, হাসি আসিতেছে না, অথচ অন্য সকলে হাসিতেছে, সেজন্য ভদ্রতার অনুরোধে হাসিতে হয়। অথবা হাসির কারণ বুঝিতেছি না, মর্ম ধরিতে পারিতেছি না, তবুও পাছে লোকে বেরসিক অথবা অজ্ঞ ভাবে সেজন্যও হাসিতে হয়। এই ভদ্রতার হাসি অথবা অজ্ঞতার হাসির সময় মুখমণ্ডল করুণ ও কুঞ্চিত হয়, উজ্জ্বল প্রসারিত হয় না। সেই হাসি দেখিয়া অনুকম্পা জাগে, প্রসন্নতা জন্মে না। শীতকালের ঠোঁট-ফাটা হাসির ন্যায় সেই হাসি বড়ই করুণ ও বিকৃত। ক্রূর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক অনেক সময় তাহার অন্তরের ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আর এক রকম হাসি হাসিয়া থাকে—শেক্স্পীয়রের কথায় **'One may smile and smile and yet be a villain'**। এই ধরণের লোক হাসির ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বাহিরে সর্বসমক্ষে প্রমাণ করিতে চায় যে সে কোমল ও সহানুভূতিশীল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার পর কঠোরপ্রকৃতির লোক নির্মমহাসির মধ্য দিয়া অমানুষী পরিতৃপ্তির ভাব জানাইয়া দেয়। শয়তান প্রকৃতির লোক কোন নৃশংস কাজ করিয়া পৈশাচিক অট্টহাসিতে সকলের মনে নিদারুণ ত্রাস ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে। নিরো রোমের

ধ্বংস দেখিয়া, শয়তান আদিম মানবকে প্রতারিত করিয়া, ইয়াগো ওথেলো-ডেসডিমনার সর্বনাশ করিয়া এবং শাইলক তাহার শত্রুকে হাতের মধ্যে পাইয়া বোধ হয় এই রকম হাসি হাসিয়াছিল। আর এক হাসি আছে, তাহাকে শ্লেষাত্মক হাসি বলা যাইতে পারে। সেই হাসি সম্পূর্ণ ইচ্ছা-চালিত। সেই হাসির মধ্য দিয়া তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বর্ষণ করা হইয়া থাকে। সাধারণত যাহাকে আমরা সমর্থন করি অথবা সহানুভূতি দেখাই তাহাকে হাস্য দ্বারা পুরস্কৃত করি। কিন্তু যাহাকে আমরা অপছন্দ করি তাহাকে এই শ্লেষাত্মক হাসির দ্বারা তিরস্কৃত করি। বাগ্‌যুদ্ধের সময় একজন অন্যজনের প্রতি যে কটু হাসি বর্ষণ করে, অথবা আইন পরিষদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে যে তিক্ত হাসির দ্বারা সম্ভাষিত করে তাহা এই শ্লেষাত্মক হাসি।

হাসির কারণ সমূহ

আমরা হাসির প্রকৃতি ও বিকৃতি হইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা হাসির কারণ সমূহ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কোন্ কোন্ বিষয়, ঘটনা ও চরিত্র আমাদিগের হাস্য উৎপাদন করে সেই সম্বন্ধে হাস্য বিশেষজ্ঞগণ বহুতর মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমেই একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে হাসির উপাদান হয় কোন ঘটনা (comic in situation) অথবা কোন চরিত্রে (comic in character) নিহিত রহিয়াছে। কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা অথবা অদ্ভুত চরিত্র সাধারণত হাস্যের কারণ হইয়া থাকে। অন্যের ত্রুটি, অসঙ্গতি ও দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াও আমরা হাসিয়া থাকি। কৌতুকজনক বাক্য এবং অভিনয়ও আমাদের হাস্য উৎপাদন করিতে পারে। নিম্নে আমরা হাস্যতাত্ত্বিকদের মত উদ্ধৃত করিয়া হাস্যের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অদ্ভুত উদ্ভট ও বিস্ময়জনক ঘটনা অথবা চরিত্র আমাদের হাস্য উদ্রেক করে। সার্কাসের খেলোয়াড় যখন দড়ির উপর দিয়া সাইকেল চালায় অথবা আগুনের গোলক লুফিতে থাকে তখন এই রকম আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিয়া আমরা হাসি। কোন লোক মুখে রঙ মাখিয়া সং সাজিয়া যদি রাস্তায় নাচিতে থাকে তবে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়ে গোলাম হোসেনের অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া অথবা 'মিসর কুমারী'র কাকাতুয়ার ডাক শুনিয়া আমরা কৌতুক বোধ করি। শিশুর কাছে যদি একটি কলের

গাড়ি আনিয়া দেওয়া যায় অথবা অসভ্য লোকের মধ্যে যদি একটি গ্রামাফোন কিংবা ক্যামেরা দেওয়া যায় তবে তাহারাও ঐ জিনিসগুলিকে অদ্ভুত ভাবিয়া হাসিবে। তবে ঐ সব স্থলে উহাদের মনে প্রথমে বিস্ময় এবং ভয় এবং পরে হাসি আসিবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং এখনও পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে হাসি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। একজন যাহা কৌতুকময় ও বিস্ময়জনক মনে করিবে অন্যজন তাহা মনে করিবে না। পুতুল নাচ দেখিয়া শিশু কৌতুকে গড়াইয়া পড়িবে কিন্তু বয়স্ক লোক ঐ নাচের অন্তর্নিহিত রহস্য জানে বলিয়া তেমন কৌতুক বোধ কবিবে না। অজ্ঞ পল্লীবাসী শহরে আসিয়া টেলিফোন অথবা রেডিও শুনিয়া কৌতুক বোধ করিবে কিন্তু শহরবাসীর কাছে ঐগুলি সাধারণ বলিয়া কৌতুকহীন।

অসঙ্গত, বিসদৃশ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা চরিত্র হাস্য উদ্রেকের একটি প্রধান কারণ। স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যাহা সঙ্গতি রাখিতে পারে না তাহাই আমাদের হাস্যের খোরাক যোগাইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এইরকম অসঙ্গতি প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, এবং প্রতিনিয়ত আমরা হাস্যের উপাদান খুঁজিয়া পাইতেছি। যেখানে সাধারণ বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানের অভাব সেখানেই হাস্যের কারণ নিহিত। ডন কুইক্সোট অথবা পিকউইক ভাল চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও হাস্যাস্পদ, তাহার কারণ তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি ও সঙ্গতি-বোধের নিতান্ত অভাব। একটি চরিত্র হইতে আমরা সাধারণত যাহা প্রত্যাশা করি তাহা যদি সে পূরণ করিতে না পারে তবেই তাহাকে আমরা অসঙ্গত ও হাস্যাস্পদ বলি।[1] বিদ্যালয়ে নানা গুরু তত্ত্ব আলোচনার সময় যদি শিক্ষক মহাশয় রান্নাঘরের অন্নব্যঞ্জনের কথা বলেন তবে আমরা হাসি, কারণ বিদ্যালয়ে তাহা অসঙ্গত। শিশু চলিতে যাইয়া যদি পড়িয়া যায় তবে আমরা হাসি না, কারণ পড়াটা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু জেলার দোর্দণ্ড-প্রতাপ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা ইস্কুলের ছাত্র-দমন হেডমাষ্টারমহাশয় যদি পড়িয়া যান তবে আমরা হাসি, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব অথবা হেডমাষ্টারমহাশয়ের পক্ষে পড়াটা সম্ভব হইলেও স্বাভাবিক নহে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্পে বৃদ্ধকে যুবার ন্যায় ছ্যাবলামি এবং যুবাকে বৃদ্ধের

1. The ludicrous is where there is the same contradiction between the object and our expectations, heightened by some deformity or inconvenience, that is by its being contrary to what is customary or desirable.

Wit & Humour (English Comic Writers) by W. Hazlitt. P. 5.

ন্যায় জ্যাঠামি করিতে দেখিয়া আমরা হাসি, তাহার কারণ তাহাদের আচরণ তাহাদের বয়সের পক্ষে নিতান্ত বেখাপ্পা ও বেমানান।

অন্যের বিকৃতি, ভুল, দোষ ও দুঃখে আমরা হাসি। যাহারা ঐ সব কারণে হাস্যাস্পদ আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করি। হাস্যের এই কারণের উপর দার্শনিক হবস এবং বেন প্রভৃতি খুব জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতবাদ সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। কিন্তু হাস্যের এই কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, অন্যের বিকৃতি ও দুঃখ প্রভৃতি যখন সামান্য থাকে তখনই কেবল আমাদের হাস্য জাগ্রত হয়। পরিমাণে অধিক হইলে আমাদের হাস্য জাগ্রত হইবে না, তৎপরিবর্তে অনুকম্পা ও সমবেদনা সঞ্জাত হইবে।[১] দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাপারটা বুঝা যাক। একটি লোক চলিবার সময় পা যদি সামান্য টানিয়া চলে তবে লোকে হাসিবে। কিন্তু সে যদি সম্পূর্ণ খোঁড়া হইয়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া যায় তাহা হইলে লোকে আর না হাসিয়া দুঃখিত হইবে। একটি লোক যদি পড়িয়া যায় তবে আমরা হাসিব কিন্তু সে যদি পড়িয়া যাইয়া পা ভাঙিয়া ফেলে তবে আমরা হাসিব না, সহানুভূতিশীল হইব। হাস্যের এই কারণের কথা নিম্নে বিশ্লেষিত হইতেছে।

দৈহিক বিকৃতি হাস্যোদ্রেকের অন্যতম কারণ। বামন অথবা খুব লম্বা লোক দেখিয়া আমরা কৌতুক অনুভব করি। সুইফটের **Gulliver's Travels**-এর মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের আঘাত থাকিলেও লিলিপুট ও ব্রবডিংন্যাগদের দৈহিক অস্বাভাবিকতার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ কৌতুক বোধ করি। তোতলা, ট্যারা, কুঁজো, মুলো ও খোঁড়া চিরদিন হাস্য উদ্রেক করিয়াছে। বার্গসোঁ বলিয়াছেন, যে দৈহিক বিকৃতি অনুকরণীয় সেই বিকৃতিই বিশেষভাবে হাস্যোদ্দীপক।[২]

চরিত্রগত সামান্য দোষ হাস্যোদ্দীপকতার একটা কারণ। জগতের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টারা, যথা—শেক্‌স্‌পীয়র, মলিয়ের প্রভৃতি এই দোষ লইয়া হাস্যরস

১। বার্গসোঁ হাস্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হাস্য উপভোগ করিতে হইলে মনকে সম্পূর্ণ স্থির, উদাসী ও বুদ্ধি-প্রবণ করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, Indifference is its natural environments, for laughter has no greater foe, than emotion. Laughter by Bergson. P. 4.

2. A deformity that may become comic is a deformity that a normally built person could successfully imitate. Ibid. P. 23.

সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পুনরায় মনে রাখিতে হইবে—সামান্য দোষ, দোষ গুরুতর হইলে তাহাতে আমাদের ঘৃণা ও নৈতিক বোধ জাগ্রত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরেখা মেঘাচ্ছন্ন সৌদামিনীর ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে।[1] চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতিতে হাস্য উদ্দীপিত হইবে না। কিন্তু কৃপণতা, প্রেমাসক্তি, ভণ্ডামি প্রভৃতিতে হাস্য জাগরিত হইবে। কৃপণ লোক সমাজের অহিতকর, সেজন্য হাস্যাস্পদ। মলিয়েরের The miser (L' Avare) নামক নাটকে এবং অমৃতলাল বসু 'কৃপণের ধনে' কৃপণের জব্দ হওয়ার সরস কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য নারীর প্রতি নিষিদ্ধ প্রেমাসক্তি লইয়া হাস্যরসিকরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের Merry Wives of Windsor, মলিয়েরের Tartuffe, দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' এবং মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই নিষিদ্ধ অথচ কৌতুকাবহ প্রেমাসক্তির বর্ণনা আছে। ভান এবং ভণ্ডামি হাস্যের একটি প্রধান উপাদান। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়াছেন, 'There is no art to find mind's construction in the face.' মুখে এক রকম অথচ মনে অন্য রকম এবং নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া সৌভাগ্যবান ও সমৃদ্ধরূপে জাহির করা অনেক লোকের স্বভাব আছে। হাস্যরসিকদের সুতীক্ষ্ণ হাস্যবাণ তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মলিয়েরের The Cit Turned Gentleman (Le Burgeois Gentilhomme) নাটকের মিঃ জর্ডন, Pickwick Papers-এর জব ট্রটার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অলীকবাবু, এবং শরৎচন্দ্রের রাসবিহারী চরিত্রটিরও নাম করা যাইতে পারে। রাসবিহারীর ভণ্ডামি ও এই ভণ্ডামি গোপন রাখিবার অসাধারণ কৌশল, তাহার আত্মভাবগোপনের অতুলনীয় উপায়-উদ্ভাবনশীলতা তাহাকে হাস্যকর চরিত্রের মর্যাদা দিয়াছে।

উপরের আলোচনাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, সামান্য দোষ যাহাতে আমাদের নীতি-বোধ জাগ্রত হইবে না তাহাই আমাদের কাছে হাস্যাবহ। সমাজের মধ্যে যাহা অচল, অসুলভ ও অমানান তাহাই আমাদের আমোদ

---

1. In the case of what are palpable vices we have counteractive tendencies, not merely the finer shrinking from the ugly, but the social or the moral sense in the distressed attitude of reprobation. Hence it may be said that the immoral trait must not be of such volume and gravity as to call forth the moral sense within us.

An Essay on Laughter by Dr. Sully, P. 93.

জাগায়। সুতরাং চরিত্রের দুর্নীতি অপেক্ষা তাহার অসামাজিকতাই হাস্যের কারণ হইয়া থাকে।[1] হাস্যরসিক সমাজের নীতিশাসক নহেন, নীতির পাঁচন অপেক্ষা হাসির আসব পরিবেষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সমাজের বিস্ফোটক সারাইতে চান বটে, কিন্তু নীতির অস্ত্রোপচারের দ্বারা নয়, হাসির প্রলেপের দ্বারা। সেজন্য নৈতিকতাকে হাস্যরসিক খুব উঁচু স্থান দেন না, বরং নীতির আতিশয্যকে হাস্যরসিক পরিহাসই করেন।

টমাস গ্রে তাঁহার 'Ode on the Spring' কবিতায় বলিয়াছেন,

"Poor Moralist and what art thou ?
A solitary fly :
Thy joys no glittering female meets,
No hive hast thou of hoarded sweets.
No painted plumage to display,
On hasty wings thy youth is flown
The sun is set, thy spring is gone.
We frolic while't is May"

নীতিবাগীশের প্রতি হাস্যরসিকের দৃষ্টিও ঠিক এই রকম। যেসব নিতান্ত সুবোধ সুশীল, সুশান্ত বালক, বাইবেলের Ten Commandments অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তাহারা জগতের সর্বরস হইতে বঞ্চিত, তাহারা আমাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে না। এই সব Bowdlerরা সুন্দর জিনিসের উপর কাঁচি চালাইতে পারে, কিন্তু অসুন্দর জিনিসের উপর রঙ লাগাইতে পারে না। ফ্রয়েড হয়তো বলিবেন যে, ইহাদের নৈতিকতা অবদমিত দুর্নীতিকতারই লক্ষণ। যাহা হউক, ইহারা সব সময়েই আমাদের হাস্য উদ্দীপন করে। 'শেষ প্রশ্নে'র অক্ষয় এইরকম নীতিপরায়ণ চরিত্র। সতী গল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্র উৎকট সতীপনাকে সরস ব্যঙ্গের আঘাত করিয়াছেন। Alceste চরিত্র অতিশয় সাধু হইয়াই হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে। কৌমারব্রতধারী যুবকেরা রবীন্দ্রনাথের হাতে কম নাস্তানাবুদ হয় নাই—'চিরকুমার সভা' তাহার নিদর্শন। যে ছাত্র চুলে চিরুনি দেয় না;

1. We may therefore admit, as a general rule, that it is the faults of others that make us laugh, provided we add that they make us laugh by reason of their uns[illegible]ather than of their immorality.

Laughter by Bergson, P. 139.

মার্লোন ব্র্যাণ্ডো, গ্রেগরি পেক, ডন ব্র্যাডম্যান অথবা ধ্যানচাঁদের কথা কিছুই জানে না সে বিদ্যালয়ে Good conduct-এর পুরস্কার পাইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ ছাত্রের কাছে সে উপহাসের পাত্র। কলিকাতার একজন স্বর্গত স্বনামধন্য অধ্যাপকের নৈতিক শুচিবায়ু সম্বন্ধে যে-সব সরস গল্প প্রচলিত তাহা সকলের কাছেই সুবিদিত। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এককালে যে ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে উৎকট আতিশয্য দেখা গিয়াছিল তাহা লইয়া অমৃতলাল বসু ও শরৎচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা গম্ভীর, রাসভারী ও অসামাজিক সমাজ তাহাদিগকে পছন্দ করে না, তাহাদিগকে সম্মুখে কিছু না বলিলেও পিছনে তাহাদের ভাবভঙ্গি নকল করিয়া হাস্য উপভোগ করে। অবশ্য ইহার কারণ ঠিক নৈতিকতার আতিশয্য নহে; তাহাদের আন্তরিকতায় আমাদের সন্দেহ।

অন্যের সামান্য দুঃখ-কষ্ট আমাদের হাস্যোদ্দীপনের অন্যতম কারণ। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, আনন্দময় অনুভূতি হাস্যের কারণ, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকডুগাল এই সর্বজনগ্রাহ্য মত স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ও আদিম প্রকৃতিজ সহানুভূতি বর্তমান, কিন্তু সংসারে দুঃখ-কষ্টের মাত্রা এত অধিক যে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের জন্য সহানুভূতি বোধ করিতে হইলে মানুষের অন্তর নিশ্চয়ই নিরন্তর পীড়িত থাকিত এবং তাহাতে তাহার জীবনশক্তি নষ্ট হইয়া যাইত। সেজন্য প্রকৃতি সামান্য দুঃখ-কষ্টের আঘাত হইতে মানুষকে মুক্ত রাখিবার জন্য তাহার মধ্যে হাস্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছে। এই হাস্যের দ্বারা মানুষ সামান্য দুঃখ-কষ্টের আঘাত ভুলিতে পারিয়াছে। দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া হাসি, কি নিষ্ঠুর! আমি পড়িয়া পা মচকাইয়া ফেলিলাম, আর আপনি বেশ মজা পাইয়া হাসিতে লাগিলেন! মন্দিরে উঠিয়াছি দেবদর্শন করিতে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিয়াছে হালে কেনা সোয়েড জুতা জোড়াটির উপর। তাড়াতাড়ি নামিয়া দেখি—হায়, হায়, আমার জুতা জোড়া অদৃশ্য হইয়াছে! আপনারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, অথচ নগ্ন পদে ভগ্ন মনে যাইতে যাইতে আঠারটি টাকার কামড়ে যত ব্যথা পাইলাম নূতন জুতার কামড়েও তত ব্যথা পাই নাই। ট্রামের ভিড়ের মধ্যে পরিপক্ক হস্তের চাতুরীতে ভদ্রলোকের মনিব্যাগ স্থানচ্যুত হইয়াছে। কণ্ডাকটারকে পয়সা দিতে যাইয়া দেখেন পকেট গড়ের মাঠ! তখন ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া, আত্মারাম

খাঁচাছাড়া, অথচ পাশের ভদ্রলোকগুলি মুরুব্বি চালে মৃদু হাসির দ্বারা তাঁহার এই ক্ষতি সম্বর্ধিত করিলেন! চূড়ামণি যোগে সুদূর পল্লী হইতে একদল আসিয়াছে কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে। পাছে কেহ হারাইয়া যায় সেজন্য প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ, অথচ সতর্কতা সত্ত্বেও দলের ছোট ছেলেটি কেবলরাম ওরফে ক্যাবলা ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। ক্যাবলার মা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া 'ওরে ক্যাবলা, গেলি কোহানে' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, অথচ শহরবাসী লোকগুলি এই দৃশ্য দেখিয়া পরম কৌতুক বোধ করিতেছে! অনেক সময়ে অন্যকে আঘাত ও বেদনা দিয়া আমরা মজা পাই। **Aesop's Fables**-এর কথা মনে পড়িতেছে, **what is joke to you is death to us**। ফ্রয়েডের ভাষায় ইহাই **Sadism**। তবে পরের দুঃখ-কষ্টে আমোদ অনুভবের যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যায় তাহা একটা বিশেষ উপলক্ষ্যের খোঁচা না পাইলে হাসিতে ফাটিয়া পড়ে না। সুতরাং এখানে উপলক্ষ্যটাই প্রধান, চরিত্র-প্রবণতা অন্তরালবর্তী বলিয়া গৌণ। ছোট ছোট শিশুরা কীটপতঙ্গ অথবা পশুপক্ষীকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পায়। পূর্বকালে **Amphitheatre**-এ হিংস্র পশুর সঙ্গে নিরস্ত্র ক্রীতদাসকে অসহায় অবস্থায় লড়াই করিতে দেখিয়া রোমবাসীরা আনন্দ পাইত। বর্তমানেও কত কি কারণে লোকে আমোদ পায়! মিলমালিক শ্রমিককে কষ্ট দিয়া আমোদ পায়, মহাজন খাতককে ঠকাইয়া আমোদ পায়। পুরুষজাতি নারীজাতিকে কষ্ট দিয়া একটা সনাতন মজা বোধ করে। নারীজাতি অবশ্য অবলা, অখলা ও সরলা, সহ্য করাই তাহার কর্তব্য; তবে কোন কোন নারী অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পক্ষের স্বাধীনভর্তৃকা স্বামীকে যে একটু আধটু বিব্রত ও উদ্বিগ্ন করেন না তাহা বোধ হয় কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না। আধুনিকা, আলোকপ্রাপ্তা, গর্বিণী, বহিশ্চারিণী রমণীর হাতে স্বামীরা একটু আধটু যে নিপীড়িত হন না তাহা নহে। অমৃতলাল বসুর 'বৌমা', 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রভৃতি প্রহসন তাহার প্রমাণ। দৈহিক নিপীড়নে কোমলকরপল্লবিনী বিশেষ যে আমোদ পান তাহা তো মনে হয় না, তবে আজকালকার কথা বলিতে পারি না, কারণ নারী-পুলিস নাকি নিয়োগ করা হইতেছে। কেবল এক সময়ে দৈহিক শাস্তি বিধানে নারী পটীয়সী হইয়া থাকেন, বিবাহ রাত্রে মধুর শ্যালিকার মধুরতর কর্ণ-বিমর্দনের কথা অভিজ্ঞলোক এখানে নিশ্চয়ই মনে করিবেন।

অজ্ঞতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া আমরা কৌতুক অনুভব করিয়া থাকি। শহরবাসী গ্রামবাসীকে শহরের চালচলনে অজ্ঞ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। আধুনিক কোন ফ্যাসান অথবা স্টাইল সম্বন্ধে যে জানে না তাহাকে আমরা সেকেলে বলিয়া উপহাস করি। বুড়া, প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল লোকদের মধ্যে যাহাদের অজ্ঞতা মাত্রাতিরিক্ত ও যাহাদের অজ্ঞতার প্রকাশভঙ্গী আতিশয্যদুষ্ট তাহারা হাস্যাস্পদ। **Rivals** নাটকের **Mrs. Malaprop**কে অথবা লীলাবতীর নদেরচাঁদ-হেমচাঁদকে না জানিয়া পণ্ডিতী শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমরা হাস্য বোধ করি। ডিকেন্সের হাস্যরসের খনি **Pickwick Papers**-এর মধ্যে পিকউইকের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং উইংকিলের পাখীশিকারে অদ্ভুত পটুতার কথা স্মরণ করিয়া কে হাস্য দমন করিয়া রাখিতে পারে? এখানে অজ্ঞতা হাসির কারণ নহে, বিজ্ঞতার সিংহচর্মে আবৃত বলিয়াই অজ্ঞতার গর্দভ হাস্যোদ্দীপক। গাধাকে আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, কিন্তু সে যদি ঘোড়ার মত কসরৎ দেখাইতে যায় তবেই উপেক্ষা সশব্দ কৌতুকহাস্যে রূপান্তরিত হয়।

ভুল এবং অন্যমনস্কতা অনেক সময়েই হাস্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হাস্যোচ্ছ্বাসের কারণ ভুল করার পরের প্রতিক্রিয়া, ভুলের পরবর্তী আচরণ। মানুষ ভুল করে কেন তাহা বিচার করিতে গেলে ফ্রয়েডের **Psychopathology of Every-day Life**-এর কথা আলোচনা করিতে হয়। সে আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে, তবে একথা ঠিক যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের ভুলের মধ্যে হাসির অসংখ্য উপকরণ নিহিত রহিয়াছে। মিঃ পিকউইক হোটেলের মধ্যে ভুল করিয়া অন্য এক ঘরে ঢুকিয়া যে কি সরস সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে পড়ে। ইহার রহস্য পিকউইকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে নিহিত। এরকম ভুল প্রায়ই ঘটে, কিন্তু পিকউইকের মত কাহাকেও চুক্তিভঙ্গের দায়ে আদালত পর্যন্ত দৌড়িতে হয় না। **'The Comedy of Errors'**-এর মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়র ভুলের চূড়ান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে অনর্গল হাস্যে রঞ্জিত করিয়াছেন।

আত্মভোলা অন্যমনস্ক লোকের ভ্রান্ত আচরণ দেখিয়া আমরা প্রীতিস্নিগ্ধ, কৌতুক বোধ করি। এই ধরণের চরিত্র শরৎচন্দ্রের হাতে বেশ ভালভাবে ফুটিয়াছে। সাধারণত দেখা যায় কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির হইয়া থাকেন। এক এক বিষয়ে

তাঁহারা গুণী এবং কৃতী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ বিষয়ে তাঁহারা শিশুর মত অজ্ঞ ও অসহায়, ইহা দেখিয়া আমাদের বিস্ময় ও কৌতুক লাভ হয়। যিনি সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্বত্র খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারিবেন তিনিই এই সংসারের হাস্যাস্পদ।

উপরের আলোচনার সূত্র ধরিয়া আমাদিগকে হাস্যের একটি বহু-আলোচিত উপাদানে উপস্থিত হইতে হইবে। বার্গসোঁ তাঁহার Laughter নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই উপাদানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে যন্ত্রভাব (Mechanism) সম্প্রসারণ-অক্ষমতা (Inelasticity), স্বয়ংক্রিয়তা (Automatism) এবং জড়তা দেখিয়া আমাদের হাস্য উদ্রিক্ত হয়।[1] মানুষের ধর্মই হইতেছে যে মানুষ বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন কালে নিজের সক্রিয় ইচ্ছা ও সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। এই নানা ভাব ও রূপে প্রকাশ ক্ষমতা মানুষের আছে, যন্ত্রের নাই। যন্ত্র কেবল এক ভাবেই কাজ করিয়া চলে। মানুষ যখন যন্ত্রের ন্যায় সব সময়ে একই রকম আচরণ করে তখনই সে হাস্যাস্পদ। অন্যমনস্ক কবি অহোরাত্র কল্পনা-জগতে বিচরণ করিতেছেন, অন্যমনস্ক বৈজ্ঞানিক সর্বক্ষণ তাঁহার গবেষণায় নিমগ্ন আছেন, সেজন্য তাঁহারা সাংসারিক লোকের কাছে হাস্যাবহ। যাহারা কোন আতিশয্য প্রকাশ করে তাহারাও যান্ত্রিকের ন্যায় আচরণ করে। রবীন্দ্রনাথের নাম করিতে অনেক রবীন্দ্রভক্ত নিমীলিত-নয়ন, আপ্লুত-হৃদয় হইয়া পড়েন অথবা কার্ল মার্কসের কথা উঠিলেই কেহ কেহ সাম্যবাদী বক্তৃতা করিবার জন্য আস্তিন গুটাইতে থাকেন। ইহারাও সকলের কাছে হাস্যের পাত্র। কোন বিশেষ প্রবৃত্তি, স্বভাব ও আচরণ যাহার মধ্যে বার বার দেখা যায় তাহার চরিত্রই হাস্যাস্পদ। সিনেমা-থিয়েটারে দেখা যায় চরিত্রের মুখে কোন বিশেষ কথা বার বার বলাইয়া হাস্যরস সঞ্চার করা হইয়া থাকে। মানে, ইয়ে, মনে করুন ইত্যাদি ঠিক যন্ত্রের মত বার বার বললে কৌতুক-রসের সৃষ্টি হয়। মুদ্রাদোষের মধ্যে জড়তা ও যন্ত্রভাব আছে বলিয়াই প্রত্যেক মুদ্রাদোষ হাস্য উদ্রেক করে। কেহ কেহ বক্তৃতা করার সময় হাত দুখানা পিছনে রাখেন। কেহ বা থিয়েটারী ভঙ্গিতে হাত নাড়িতে থাকেন। আবার কেহ কথা বলিবার

1. The comic is that side of a person which reveals his likeness to a thing, that aspect of human events which, through its peculiar inelasticity, conveys the impression of pure mechanism, of automatism, of movement without life. Laughter by Bergson, P. 37.

সময় এক বিশেষ মুখভঙ্গি করেন। তাঁহারা সকলেই যন্ত্রের ন্যায় আচরণ করেন বলিয়াই হাস্যাস্পদ। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বার্গসোঁর মতে যাহা অনুকরণীয় তাহাই হাস্যজনক, এবং মানুষের বিশেষ ঢঙ, স্বভাব ও আচরণ যাহা যন্ত্রের অনুরূপ তাহাই অনুকরণযোগ্য বলিয়া হাস্যাস্পদ।[1]

বার্গসোঁ তাঁহার সূত্র অবলম্বন করিয়া আরও তিন রকম হাস্যের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—১। পৌনঃপুনিকতা (Repetition) ২। বৈপরীত্য (Inversion) এবং ৩। দ্ব্যর্থবোধকতা (Reciprocal inversion of series)।[2] একই রকম জিনিস পুনঃ পুনঃ ঘটিলে আমরা মজা বোধ করি। Corsican Brothers নামক ছবিখানির মধ্যে দুই ভ্রাতার একই রকম চেহারা বিশেষ কৌতুকময় হইয়াছে। কমেডি লেখকেরা এই ধরণের প্রকৃতি-বিশিষ্ট যুগল চরিত্রের সমাবেশ করিয়া অথবা একই রকমের ঘটনার দুইবার সংঘটন করাইয়া হাস্যরস সৃজন করিয়া থাকেন। পৌনঃপুনিকতার ন্যায় বৈপরীত্যও হাস্যের কারণ। বিপরীত স্বভাব ও আকৃতির দুইজন লোককে পাশাপাশি দেখিলে আমরা হাসি। লরেল ও হার্ডির আকৃতির মধ্যে চেহারার বৈষম্য থাকাতে তাহাদিগকে দেখিলেই আমাদের কৌতুক জন্মিয়া থাকে। সাদৃশ্যের ন্যায় বৈসাদৃশ্যের উপরও কমেডিলেখকগণ খুব জোর দিয়াছেন, সেই জন্য বিসদৃশ ঘটনা অথবা চরিত্র পাশাপাশি দেখাইয়া তাঁহারা হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যসমালোচক মোলটন এই দুইরকম বৈশিষ্ট্য Parallelism এবং Contrast বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[3] একই রকম ঘটনার দুইরকম অর্থ অথবা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। নাট্যকারেরা এই প্রকার ঘটনার সমাবেশ করিয়া আমাদের কৌতুকজনক প্রত্যাশা ও উদ্বেগ জাগাইয়া থাকেন। একই প্রকার শব্দ অথবা বাক্যের দুই অর্থ আমাদের কৌতুক সঞ্চার করিয়া থাকে, উইট-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হইবে।

আমরা পূর্বে স্বস্তির হাসির কথা আলোচনা করিয়াছি। আমাদের অবদমিত ইচ্ছা ও বাসনা অনেক সময়েই সমাজ ও সভ্যতার বাধা অপসারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। মনঃসমীক্ষকেরা এই বিষয় লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সাধারণত বাহিরে যৌন ও অশ্লীল বিষয়ে আমাদের বিরক্তি দেখাইয়া

1. Every comic character is a type. Inversely, every resemblance to a type has something comic in it. Laughter by Bergson.

২। বার্গসোঁর পুস্তকের (Laughter) ৯০—১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Shakespeare as a Dramatic Artist by R. G. Moulton.

থাকি বটে কিন্তু আসলে এই সব বিষয়ে আমাদের গোপন আসক্তি বিদ্যমান এবং এই আসক্তি অনেক সময়েই প্রবল হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়। অবশ্য অশ্লীলতা হাসির উৎস নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে দ্বৈত ভাষণ-কৌশল থাকে তাহাই হাসি উৎপাদন করে। কামের সঙ্গে হাসির সম্পর্ক নাই। কামাবিষ্ট ব্যক্তির আচরণে যে যন্ত্রবৎ অচেতনতা বা নানা অপমানকর অবস্থা মানিয়া লওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তাহা গৌণভাবে হাসির উৎপাদক। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, অশ্লীল হাসি যে স্ত্রীলোক কাম উদ্দীপন করে তাহার প্রতি বর্ষিত হয়, এবং সেই হাসি যাহার প্রতি উদ্দিষ্ট হয় তাহাকেই আবার কামার্ত করিয়া তোলে।[১] অশ্লীল ও যৌন বিষয়ের আলোচনায় হাসি যত প্রবল ও উচ্ছ্বসিত হয় অন্য কোন বিষয়ে তত হয় না।[২] প্রায়ই দেখা যায় অন্তরঙ্গ কয়েক বন্ধুর মধ্যে নারীঘটিত কোন আলোচনা হইতেছে ফিসফিস শব্দে অথচ হাসি হইতেছে সুউচ্চ ঝড়ের আবেগে। ইহার কারণ রীতিলঙ্ঘনে, যাহা গোপন থাকে, তাহার আচরিত প্রকাশ্যতায়।

হাস্যবাদ

হাস্যের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে আমরা উপরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখন হাস্যসম্পর্কে দার্শনিক মতবাদ লইয়া আমরা আলোচনা করিব। হাস্য সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে,—(১) নিকৃষ্টতাবাদ (Theory of Degradation) এবং (২) অসঙ্গতিবাদ (Theory of Incongruity)। উভয় পক্ষেই প্রসিদ্ধ দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিকরা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

অ্যারিস্টোটল, হবস এবং বেন প্রভৃতি দার্শনিক প্রথম মতবাদটি প্রচার করিয়াছেন। হবসের মতই এই মতবাদটিকে বিশেষ শক্তিশালী ও প্রচলিত করিয়া তোলে। হবস বলিয়াছেন যে, আকস্মিক গৌরববোধে আমাদের হাস্য

1. It must be added that the smutty joke is directed toward a certain person who excites one sexually, and who becomes cognizant of the speaker's excitement by listening to the smutty joke, and thereby in turn becomes sexually excited.

"Wit & its relation to the unconscious' by Freud, P. 140.

2. At all events, the sphere, of the sexual or obscene offers the richest opportunities for gaining comic pleasure besides the pleasurable sexual stimulation. Ibid, P. 360.

উদ্দীপিত হয়।[1] হবসের মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে। বিপক্ষবাদীরা বলিয়াছেন যে, আমরা যে সব সময়ে আমাদের গৌরব অথবা শ্রেষ্ঠতা-বোধের জন্য হাসি তাহা নহে, কারণ অনেক সময়ে আমরা সহানুভূতিশীল হইয়া সমত্ব-বোধের জন্যও হাসিতে পারি। হবসের মতের আর একটি ত্রুটি হইতেছে যে অন্যের নিকৃষ্টতা দেখিয়া অনুকম্পা এবং বিরক্তি জাগরিত হইতে পারে এবং তখন হাস্য উদ্রিক্ত হয় না—এই কথা হবস্ উল্লেখ করেন নাই। হবসের পরে তাঁহার মতবাদ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং শক্তিশালীভাবে প্রচার করিলেন প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ আলেকজাণ্ডার বেন। বেন বলিয়াছেন যে, অন্য কোন সবল অনুভূতির অনুপস্থিতিতে কোন গম্ভীর লোক অথবা ব্যাপারের অবনতিতে আমরা হাস্য বোধ করিয়া থাকি।[2] বেন নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের মতবাদ সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বসিয়াছেন যে আমরা স্থির থাকিয়া অনেক সময়েই অন্যকে ভয় দেখাইয়া অথবা রাগাইয়া আমোদ অনুভব করি। এইসব স্থলে আমরা নিজেদের উচ্চ অবস্থা হইতে অন্যের অক্ষমতা ও অবনতি দেখিয়াই কৌতুক বোধ করিয়া থাকি। ডাঃ ফ্রয়েডও এই মতটি কিছু সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'our laughing is the expression of a pleasurably perceived superiority.' হবস্-বেনের মতের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও ইহাতে যে কিছু সত্যতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা হাস্যাস্পদ ব্যক্তি অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিতে না পারিলে হাসিতে পারি না। সেজন্য যাহার প্রতি হাস্য বর্ষিত হয় সে অপমান ও অসন্তোষ বোধ করে। অবশ্য উচ্চতর হাস্যরসে হাস্যবান ও হাস্যাস্পদ এক হইয়া যায়, সে বিষয়ে পরে বিশদ ব্যাখ্যা হইবে।

দ্বিতীয় মতবাদটির প্রচারক হইতেছেন দার্শনিক-প্রবর কাণ্ট এবং শোফেন হাওয়ার। কাণ্টের মত হইতেছে যে, 'The comic is an expectation dwindled into nothing !' আমাদের প্রত্যাশা পূরণ না হইলে যে হাস্য

1. The passion of laughter is nothing else but sudden glory arising from sudden conception of some eminence in ourselves, by comparison with the inferiority of others, or with our own formerly ?

2. The occasion of the Ludicrous is the Degradation of some person or interest possessing dignity, in circumstances that excite no other strong emotion. The Emotions and the will by A. Bain, P. 257.

উদ্রিক্ত হয় সে সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিচার করিয়াছি। শোফেনহাওয়ারের দ্বারা অসঙ্গতিবাদ ভালোভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। শোফেনহাওয়ার বলিয়াছেন, **In every instance the phenomenon of laughter indicates the sudden perception of an incongruity between a conception and a real object which is to be understood or thought through this conception.** কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-পোষিত ধারণার সহিত সেই বস্তুর যদি অসঙ্গতি দেখা যায় তবেই হাস্য জন্ম লাভ করিবে, অসঙ্গতি যত বেশী হইবে, হাস্য তত বর্ধিত হইবে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, বড় জিনিসের ছোট অবস্থায় পরিণতিতে যে অসঙ্গতি দেখা যায় সেই অসঙ্গতি হাস্য উদ্রেক করে।[1]

উপরিউক্ত দুই মতবাদ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে। অনেকে সেই কারণে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্যিক হ্যাজলিট ও বৈজ্ঞানিক স্পেন্সার এই সামঞ্জস্য-বিধানে অগ্রসর হইয়াছেন। কেহ কেহ বা [illegible]বার বলিয়াছেন যে ঐ দুই মতবাদ হাস্যের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, যেমন—অসঙ্গতি-জাত হাস্যকে বলা যাইতে পারে **ludicrous** এবং নিকৃষ্টতা-জাত হাস্যের নাম দেওয়া যাইতে পারে **ridiculous**। হ্যাজলিট তাঁহার **Wit and Humour** নামক প্রবন্ধে পরিমাণ অনুযায়ী হাস্যের তিন রকম বিভাগ করিয়াছেন—১। আমাদের প্রত্যাশা এবং প্রকৃত ঘটনার মধ্যে আকস্মিক বিরোধজনিত হাস্য ২। **Ludicrous** ৩। **Ridiculous**। হ্যাজলিট **Ridiculous**কে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাস্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

হাস্যপ্রকৃতি এবং সমাজ

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে হাসি সমাজের লোক সমূহকে একত্রিত করে এবং সম্মিলিত হাসি বিশেষ উপভোগ্য। হাসির প্রকৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, হাসির উৎপত্তি সামাজিকতার মধ্যে। সমাজের লোকের পারস্পরিক মেলামেশার মধ্যে বহু ত্রুটি, অসঙ্গতি, দোষ

1. Laughter naturally results only when consciousness is unawares transferred from great things to small—only when there is what we may call a descending incongruity.

The Physiology of Laughter by H. Spencer.

এবং দুঃখ চোখে পড়ে, সেগুলিই হাস্যের উপাদান রূপে উপস্থিত হয়। রবিনসন ক্রুশের জীবনের মধ্যে কোনো হাস্যের উপকরণ নাই, কিন্তু যে মানুষ সমাজের নানা নিয়ম-নীতি, ধারণা-সংস্কার, ধারা-পদ্ধতির মধ্যে বাস করে সে হাসে এবং হাসায়। হাসি যখন এমন কারণ হইতে উদ্ভূত যাহা সকলের মনে আবেদন করিতে পারে তখনই তাহা সঙ্গত, শোভন ও স্বাভাবিক। যে-কারণ একজনকে হাসায়, অন্য সকলকে হাসাইতে পারে না তাহা অনর্থক ও মূল্যহীন। ঠিক সেজন্য দেখা যায়—যেমন সকলের মধ্যে একজন যদি না হাসে তবে সে বেরসিক পদবাচ্য হয়, তেমনি অন্য কেহ হাসিতেছে না, অথচ কেহ যদি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে তবে সে নির্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সমাজের সকল লোকই যদি একই রকম স্বভাব, প্রকৃতি ও আচরণশীল হয় তাহা হইলে হাসিবার কারণ কিছুই থাকে না। যে সব কারণে হাসির উৎপত্তি হয় সেই কারণগুলি যদি সকলের মধ্যেই দেখা যায় তবে কেহই হাসিবে না। সুতরাং হাসির উৎপত্তির জন্য সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা দরকার। বস্তুত এই সামাজিক বৈচিত্র্যের জন্যই হাসির এত উপাদান সর্বক্ষণ সমাজের মধ্যে জমা হইতে থাকে। তবে এই বৈচিত্র্য যেন ব্যক্তিগত না হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মানুষের মুখ যে রকম বিভিন্ন প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি যদি সে রকম বিচিত্র হইত তবে কখনও হাস্য উৎপন্ন ও উপভুক্ত হইত না। সেজন্য মর্যাদা, স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সমাজের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী অথবা দল থাকা দরকার।[1] একদল অন্যদলের দোষ ও বিকৃতি দেখিয়া হাসিবে, আর এক দল অন্য আর এক দলের ক্রিয়া ও আচরণ দেখিয়া উপহাস করিবে। স্ত্রীসমাজকে ব্যঙ্গ করিলে পুরুষ-সমাজ পরুষ হাসি হাসিবে এবং পুরুষ-সমাজকে বিদ্রূপ করিলে স্ত্রী-সমাজের কোমল কণ্ঠ হাস্য-কলিত হইয়া উঠিবে। পুঁজিবাদী হাসিলে সাম্যবাদী কাশিবে এবং সাম্যবাদী হাসিলে পুঁজিবাদী কাশিবে। গ্রাম্য স্ত্রীলোক যদি পায়ে মল, নাকে নথ এবং হাতে মকরমুখো অনন্ত পরিয়া কলিকাতার রাজপথে চলে তবে শহরের আলোক-

1. Some differentiation of groups within the community seems necessary, not merely for the constitution of a society, but for the free play of the laughing spirit. Diversity in thought and behaviour is a main condition of the full flow of social gaiety.

An Essay on Laughter by Dr. Sully, P. 258.

প্রাপ্তা আধুনিকা ফ্যাসান-দুরস্ত মহিলা অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন এবং শহরের আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকা মহিলা যদি সরু খুরওয়ালা জুতা পরিয়া মুখ রাঙাইয়া, ঠোঁট বাঁকাইয়া পল্লীর রাস্তা দিয়া চলেন তবে পল্লীবাসিনী পুরাতনী কৌতূহল-মিশ্রিত হাসি হাসিবে। অমৃতলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর নাটকের মধ্যে ডাক্তার ও উকীলের প্রতি শ্লেষ বর্ষিত হইয়াছে দেখিয়া ডাক্তাররা বোধ হয় ছুরি শানাইবেন এবং উকীলরা আদালতে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করিবেন, কিন্তু অনেক রোগী এবং মক্কেল যে গোপনে প্রসন্ন হাসি হাসিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হাসিতে সকল লোক একই স্তরে আসিয়া অন্তরঙ্গ হইয়া পড়ে বলিয়া সমাজ বিধান দিয়াছে যে যাঁহারা গুরুজন, সম্মান-ভাজন তাঁহাদের সম্মুখে হাসিও না, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান নষ্ট হয়। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, শিক্ষক, গুরুজন, মনিব ইত্যাদি যাঁহাদের সম্মুখে হাসিতে নাই তাঁহাদের সম্বন্ধেই যেন হাসি মনের মধ্যে বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা ধর্মগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত, সমাজ-নেতার পদে অভিষিক্ত এবং ধনলক্ষ্মীর ক্রোড়ে অবস্থিত তাঁহাদের প্রতি সাধারণ লোকের সভয় ঈর্ষা এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের উপলক্ষেই তাহার হাস্য উচ্ছ্বসিত বেগে প্রকাশ পাইবে।

হাসি স্থানিক সমাজের রুচি, ধারা ও ধারণার উপর নির্ভর করে। সে-জন্য যে-কারণে এক সমাজের লোক হাসে সে-কারণে অন্য সমাজের লোক নাও হাসিতে পারে। ভাষা, বাক্যপ্রণালী, প্রবাদ, ঐতিহ্য, রুচি ইত্যাদির মধ্যে হাস্যের উপাদান মিশিয়া থাকে। সেজন্য এক সমাজ অথবা এক দেশের হাস্যরস অন্য সমাজ অথবা দেশের মনে সব সময়ে সঞ্চার করা যায় না। **J. B. Priestly** তাঁহার **English Humour** নামক গ্রন্থে ইংরাজ জাতির হাস্যরস সম্বন্ধে বলিয়াছেন, **'English humour is curiously private and domestic offering nothing to the casual arrival from other countries, it is part of the atmosphere of the place, a hazy light on things ; it manifests itself in innumerable slow grins and chuckles ; it is not something that can be picked up with the language, but something that must be given time to filter through ; and thus, while it is everywhere, a traveller in a hurry might be excused for not noticing that it is here at all (P. 5)**

প্রিস্টলী ইংরাজ জাতির হাস্যরস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায় সব জাতির হাস্যরস সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। কোন সমাজের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ না করিলে সেই সমাজের হাস্যরস বুঝা যাইবে না। দেবর ভ্রাতৃবধূ অথবা শালা-ভগ্নীপতির মধুর সম্পর্ক হইতে যে হাস্য উৎসারিত হইতেছে তাহা বাঙালী ভিন্ন অন্য জাতির কাছে দুর্বোধ ও হাস্যলেশহীন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ এবং দীনবন্ধু মিত্র পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের কথা লইয়া যে হাস্য-পরিহাস করিয়াছেন তাহা অবাঙালী দর্শকের কাছে অর্থহীন। তেমনি **Merry Wives of Windsor** নাটকের মধ্যে **Dr. Caius** ও **Sir Hugh Evans**-এর ভাষা লইয়া শেক্‌স্‌পীয়র যে হাস্যরস সৃজন করিয়াছেন তাহা ইংরাজেতর দর্শকের কাছে অনধিগম্য। ঘরজামাই ও সপত্নী-সমস্যা লইয়া দীনবন্ধু যে প্রহসন রচনা করিলেন তাহা আমাদের কাছে পরম উপভোগ্য অথচ ইংরাজের কাছে দুর্বোধ, তেমনি **Wycherly** অথবা **Congreve** ইংরাজ সমাজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সব নাটক লিখিলেন তাহা তাঁহাদের কাছে হাস্যজনক হইলেও আমাদের কাছে আবেদনহীন।

মানুষের সমাজ পরিবর্তশীল। এককালের সামাজিক পরিবেশ, আচার ব্যবহার নিয়মকানুন পরবর্তী কালে বদলাইয়া যায়। সমাজের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যবোধও পরিবর্তিত হইতে থাকে। এক সময় যাহা হাস্যোদ্দীপক, অন্য সময়ে তাহা বিরক্তিকর অথবা অশ্লীল, আবার একসময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত অন্য সময়ে তাহাই হাস্যজনক। কৃত্তিবাসের সময়কার লোক শূর্পনখার নাসা-কর্ণচ্ছেদ অথবা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনা শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত কিন্তু এখন ঐগুলি নিতান্ত স্থূলরসাত্মক। কবিওয়ালারা এককালে পরস্পরকে জব্দ করিবার জন্য যে-সব ভাষা ব্যবহার করিত বর্তমান শিক্ষিত রুচির কাছে সেগুলি নিতান্ত অশ্লীল ও বিসদৃশ মনে হইবে। বিপরীত পক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বহুবিবাহ আমাদের প্রাচীন সমাজে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে বহুবিবাহ হাস্যকর, অবজ্ঞেয় ব্যাপার। ফ্যাসান ও স্টাইলের বৈচিত্র্য অনেক সময়ে হাস্যের উপাদান হইয়া থাকে। পোষাক-পরিচ্ছদের অভিনব পরিবর্তন সমাজের মধ্যে অতি দ্রুত ঘটিতে থাকে। যাহারা সমাজের মধ্যে শিক্ষিত, সমৃদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত তাহারাই ফ্যাসানের প্রবর্তন করে। কিন্তু তাহারা প্রথম যখন পরিচ্ছদে ও

আভরণে কোন নূতনত্ব সঞ্চার করে তখন সাধারণ লোকের মনে একটু বিস্ময়মিশ্রিত কৌতুকেরই উদয় হইয়া থাকে। নথশোভিত অজ্ঞ গ্রাম্যবধূ যদি হঠাৎ আবিষ্কার করে যে আধুনিক শহরবাসিনী তরুণী নথ নাকে পরে না বটে কিন্তু নথকল্প অলঙ্কার কানে ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তবে সে কৌতুকবোধ করিবে, তেমনি অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক যদি লক্ষ্য করে যে সাম্প্রতিক যুবকেরা কলারযুক্ত পাঞ্জাবি পরিতে আরম্ভ করিয়াছে তবে সেও হাসিবে। কারণ সে এতদিন জানিয়া আসিয়াছে যে শার্টেরই কলার থাকে, পাঞ্জাবির থাকে না। ফ্যাসানের অভিনবত্ব প্রথমে হাস্যকৌতুক উৎপাদন করিলেও যখন সেই অভিনব ফ্যাসান সমাজের মধ্যে চালিত ও স্বীকৃত হইয়া যায় তখন তাহা হাস্য-কৌতুকের পরিবর্তে স্বাভাবিক বলিয়া গৃহীত হইবে। উপরিউক্ত গ্রাম্যবধূ যখন জানিবে যে নথ কানে পরাই আজকালকার দিনের রেওয়াজ তখন ঐ অলঙ্কারের জন্য সে স্বামীর কাছে আবদার জানাইবে, এবং গ্রাম্য যুবকটি যখন বুঝিবে যে হাল ফ্যাসানের পাঞ্জাবির কলার [illegible]ইতেছে তখন ঐ পাঞ্জাবি তৈরি করিবার জন্যই সে দরজীকে নির্দেশ দিবে। নূতন ফ্যাসান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে এককালে যাহা স্বাভাবিক ছিল তাহাই ক্রমে কৌতুকজনক হইয়া পড়িবে। পূর্বোক্ত গ্রাম্য স্ত্রীলোক ফ্যাসান-দুরস্ত হইবার পর নথপরিহিত আত্মীয়কে নিশ্চয়ই অবজ্ঞার হাসি দেখাইবে এবং যুবকটি শহরের হাওয়া গায়ে লাগিবার পর কলার-দেওয়া শার্টধারী গ্রাম্য বন্ধুকে নিতান্ত সেকেলে মনে করিবে।

হাসি সামাজিক পরিবেশ, ধারণা, সংস্কার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে তাহা পূর্বে আলোচিত হইল। কিন্তু হাসি ও হাসির উৎপত্তি কি কেবল বিশেষ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ? তাহা কখনও নহে, কখনও হইতে পারে না। হাসির মধ্যে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন উপাদানও রহিয়াছে। সেই কারণে হাসি বিশ্বমনের সামগ্রী, চিরকালের উপভোগ্য অক্ষয় সম্পদ। চার্লি চ্যাপলিন অথবা লরেল-হার্ডি বিশ্বের সকল দর্শকের মধ্যেই সমান হাস্য বিতরণ করিতেছেন। ডন কুইক্সোট এবং পিকউইক চিরকাল বিশ্বের সকল পাঠককে পরিতুষ্ট করিয়াছে। চসার, শেক্স্পীয়র এবং মলিয়ের বিশ্বের সমস্ত লোককে হাস্য-কৌতুকে আমোদিত করিয়াছেন। ওয়াল্ট ডিসনের ছবি অথবা লো এর কার্টুন কেবল পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপভোগ্য সম্পদ নহে পাশ্চাত্য

দেশের Fool অথবা Jester এবং ভারতের বিদূষককে দেখিয়া মনে হয় যে মানুষের হাস্যবোধ কত অভিন্ন। লৌকিক হাস্য যখন সাহিত্যের হাস্যরসে পরিণত হয় তখন তাহা সর্বজন-আস্বাদ্য হয়। ঘটনাগত এবং চরিত্র-গত হাস্য বিশ্বের সর্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য। কিন্তু যে হাস্যের উৎপত্তি বুদ্ধির পালিশ-করা পাথরে, যাহার অবস্থান বাক্যের শাণিত দীপ্তিতে—ইংরেজিতে যাহা Wit রূপে পরিচিত তাহার আবেদন স্থানিক, এবং সাময়িক।

মানুষ হাসিয়াছে, চিরকাল হাসিয়াছে—Paliolithic যুগ হইতে অধুনাতন Atomic যুগ পর্যন্ত তাহার হাসির বিরাম ঘটে নাই। কিন্তু তাহার হাসির প্রকৃতি ও পরিমাণ বদলাইয়াছে। পূর্বকালের হাসির মধ্যে যে অবিমিশ্র আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল, যে অবাধ সংকোচহীনতা ছিল এবং যে অপরিমেয় প্রাণশক্তির অফুরন্ত প্রাচুর্য ছিল, আজকাল সেগুলির নিতান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। এখন লোকে হাসে বটে, কিন্তু সেই হাসি ওষ্ঠাধরের সামান্য কম্পনে সীমিত—তাহা মৃদুপবন-চালিত ঈষৎ বীচি-বিক্ষেপ, উদ্দাম ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নহে। সভ্যসমাজে বর্তমানে সশব্দ হাসি নিন্দিত, রুমাল-অবরোধের ফাঁক দিয়া এনামেল-করা মুখের পালিশ-করা হাসি এখনকার রীতি; শব্দায়মান, শান্তিভঙ্গকারী হাসি বর্তমান রুচিমান সমাজে অসভ্যতার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু সত্যই কি মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পূর্বাপেক্ষা বহু উন্নত হইয়াছে? বর্তমান মানুষের রুচির ছদ্মবেশের নীচের, তাহার গিল্টি-করা ভব্য আচরণের তলায় আদিম প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল লীলা চলিতেছে, সেখানকার পঙ্কপল্বলের দূষিত হাওয়া চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা প্রবেশ করিব না, কিন্তু সভ্যতার সহিত মানুষের অন্তর-প্রকৃতি বিশেষভাবে বদলাইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। সুতরাং বর্তমান হাসির স্বল্পতা আমাদের চরিত্রের উন্নতির পরিচায়ক নহে। হাসি অনবরত চাপিয়া মানুষ তাহার দেহ ও মনের অস্বাস্থ্য অনেক বেশি বাড়াইয়া ফেলিতেছে। হয়তো মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি রসিক হইয়াছে, তাহার হাসির অস্ত্রগুলি অধিকতর তীক্ষ্ণ ও শাণিত হইতেছে। সেজন্য মনের গহন ক্ষেত্রে হয়তো তাহার গতাগতি হইতেছে, বাহ্য প্রকাশ আর তত লক্ষণীয় নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্তমানকালকার লোকের হাস্যবোধের চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আগেকার

রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন। মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু ল্যানসেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।' কিন্তু রসবোধ-বৃদ্ধির ফলেই যে মানুষের হাসি কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে তাহা নহে। ইহার অন্য কারণও আছে। আধুনিক জীবনের বহু জটিল সমস্যা, ধনসম্পদ-লাভের জন্য মানুষের প্রাণপণ প্রচেষ্টা, প্রধূমিত ক্ষোভ ও অসন্তোষের সর্বত্র ব্যাপ্তির ফলে মানুষের হাসি কমিয়া আসিতেছে।[1] কিন্তু মানুষ যদি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিত তবে তাহার অনেক সমস্যা লঘু হইয়া আসিত এবং অনেক দুঃখকষ্ট হালকা হইয়া যাইত। হাসির দ্বারা শরীর ও মনের কিরূপ উন্নতি হয় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মানুষের এই অশেষ উপকারী বন্ধুটি সমাজকে শোধিত ও উন্নত করিতেও বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। লোকে লাঠির আঘাত ভুলিতে পারে কিন্তু হাসির আঘাত ভুলিতে পারে না। এই আঘাতের বিরুদ্ধে রাগা যায় না, নালিশ করা যায় না, অথচ এই আঘাত ঠিক মর্মস্থল স্পর্শ করে। এই আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য লোকে সতর্ক ও সাবধান হয়, নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানাইতে চেষ্টা করে, চরিত্রের দোষ ও অসঙ্গতি সযত্নে পরিহার করিতে প্রয়াসী হয়। হাসি মরজগতে অমর ঈপ্সিত সম্পদ। যে হাসে ও যে হাসায় তাহারা ভাগ্যবান, তাহারা দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ কান্তারকে সুখৈশ্বর্যময় নন্দন-কাননে পরিণত করিয়াছে।

---

1. The seriousness of to-day, which looks as it had come to pay a long visit, may be found to have its roots in the greater pushfulness of men, the fiercer eagerness to move up in the scale of wealth and comfort, together with the temper which begets the discontent—

'The weariness, the fever and the fret'

which kill the capacity for a whole-hearted abandonment to simple pleasure. An Essay on Laughter by Sully, P. 430,

হাস্যরস

আমরা হাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। লৌকিক হাস্য যখন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় তখন তাহা অলৌকিক হাস্যরসে পরিণত হয়।[১] সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা হাসকে হাস্যরসের স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[২] কেহ কেহ হাসকে স্থায়ী ভাব বলা যায় কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৩] তাঁহাদের মতে হাসকে কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তি এই নাম দেওয়া সঙ্গত। হাসি যখন সাহিত্যের সামগ্রী তখন তাহা বিশ্বমনের আস্বাদ্য, তাহা চিরন্তন কালের অক্ষয় সম্পদ।

Shakespeare, Cervantes, Moliere, Sterene, Lamb, প্রভৃতি সাহিত্যিক চিরকাল সবদেশের পাঠকের মন পরিতুষ্ট ও দ্রবীভূত করিয়া আসিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে হাস্যরসের চুল-চেরা বিশ্লেষণ হইয়াছে এবং নানাপ্রকার হাস্যরস ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে হাস্যরস অদ্বিতীয় এবং অনন্যনামা। সুতরাং আমাদিগকে অনেক সময়েই পাশ্চাত্য নাম ব্যবহার করিতে হইবে।

করুণ হাস্যরস (Humour)

হাস্যরসের যত রকম বিভাগ আছে তন্মধ্যে হিউমার শ্রেষ্ঠ। এই হিউমার অথবা বিশুদ্ধ হাস্যরস এক বিচিত্র ও রহস্যময় সামগ্রী। ইহাতে আমাদের

১। সাহিত্যদর্পণে হাস্যরসের ভাব, অনুভাব, বিভাব এবং ব্যভিচারী ভাব সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছে—

বিকৃতাকার বাগ্‌বেশ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্য স্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥
বিকৃতাকার বাকচেষ্টং যদালোক্য হসেজ্জনঃ।
তদত্রালম্বনং প্রাহু স্তচেষ্টোদ্দীপনং মতম্।
অনুভাবোঽক্ষি সঙ্কোচবদনস্মেরতাদিকঃ।
নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥

২। অথ হাসো নাম হাস স্থায়িভাবাত্মক—নাট্যশাস্ত্র

৩। ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় প্রণীত 'কাব্যালোক' গ্রন্থের ২০০—২০৩ পৃঃ

পূর্বালোচিত হাস্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই নাই, অথচ ইহা মানুষের সাধারণ হাস্যকে অসাধারণ সাহিত্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, অনুকম্পা ও সমবেদনা হাস্যের প্রবল শত্রু, ইহারা হাস্যকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু হিউমার-এর মধ্যে এই অনুভূতিগুলি সজাগ ও সক্রিয়রূপে অবস্থান করিতেছে। হাস্যের বুদ্ধির দ্বারা মার্জিত হইলেও ইহার অধিষ্ঠান অনুভূতি-সজল অন্তরে। হাস্য জলের উপরিস্থ ভাসমান বুদ্বুদ, বুদ্বুদের ন্যায়ই ক্ষণিক ও চঞ্চল কিন্তু হিউমার জলের তলশায়ী প্রবল ঘূর্ণিপাক—স্থায়ী এবং দূরপ্রসারী। জীবনের প্রতি সমবেদনাশীল দৃষ্টি, সকলের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয়তার এক মিশ্রিত অনুভূতি এইগুলিই হইল হিউমার-এর বৈশিষ্ট্য।[1]

হিউমার-এর হাসি প্রবল এবং উতরোল নহে, ইহা মৃদু এবং অনুচ্চ। হিউমার-এর হাসিতে আনন্দময় অন্তরের অবারিত উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। এই হাসির স্রোতের বিরুদ্ধে এক অন্তঃশায়ী বেদনার প্রতিকূল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই প্রতিকূল স্রোতের প্রতিক্রিয়ায় হাসির বেগ বাধাপ্রাপ্ত ও মন্দীভূত। হিউমার-এ আমরা হাসি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর বেদনার সুতীক্ষ্ণ কণ্টক সুতীব্রভাবে আমাদের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। আমাদের বাহ্য হাস্যের প্রসন্ন দীপ্তি আন্তর বেদনার গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসে। প্রকৃত হাস্যরস-স্রষ্টার মন কৌতুকে উজ্জ্বল নহে, তাহা বিষাদে অভিষিক্ত।[2] মলিয়ের সম্বন্ধে শুনা যায়, তিনি যখন একা থাকিবেন তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়া থাকিতেন। শেরিডানকে লোকে খুব কমই হাসিতে দেখিয়াছে।

1. Humour সম্বন্ধে, সালির ন্যায় এরকম মনোজ্ঞ আলোচনা কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি Humour-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—A quiet survey of things, at once playful and reflective; a mode of greeting amusing shows which seems in its moderation to be both an indulgence in the sense of fun and an expiation for the rudeness of such indulgence, an outward, expansive movement of the spirits met and retarded by a cross current of something like kindly thoughtfulness, these clearly reveal themselves some of the dominant traits.

An Essay on Laughter, P. 299.

2. Meredith-এর উক্তি স্মরণীয়—'The stroke of the great humorist is worldwide with lights of Tragedy in his laughter'

The Idea of Comedy, P. 84.

হিউমার-এর অন্তর্নিহিত এই বেদনাময়তার কারণ, হিউমারিস্ট মানব জীবনের প্রতি এক সর্বব্যাপী সহানুভূতি লইয়া দৃষ্টিপাত করেন। একটি কথা আছে যে, জীবন সম্বন্ধে যাঁহারা অনুভব করেন জীবন তাঁহাদের কাছে বিষাদময়।[1] খাঁটি হাস্যরস-স্রষ্টা জীবনকে দূর হইতে ভাবেন না বা বিচার করেন না, তিনি জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার রস মর্ম দিয়া গ্রহণ করেন। হাস্যরসস্রষ্টা জীবনের অসঙ্গতি, দোষ ও অধঃপতন লইয়া আলোচনা করেন বটে, কিন্তু তিনি দ্রষ্টা নহেন, ভোক্তা। যাঁহাদের লইয়া তিনি হাসান, তিনি তাঁহাদেরই একজন, যে রঙ তিনি মাখাইতে যান সেই রঙ তিনি নিজেও মাখিয়া লন।[2] তিনি যে বিকৃত, ভ্রান্ত ও অসঙ্গত জগতে প্রবেশ করেন সেই জগৎকেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। কখনও তিনি একথা জানান না যে, সেই জগতের বাহিরে আর একটি জগৎ আছে, যাহা সুস্থ সঙ্গত, ভদ্র ও ভব্য। হাস্যের আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে হাস্যের দ্বারা সমাজকে সংস্কার ও শোধন করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত হাস্যরসের (Humour) মধ্যে এই সংস্কার ও শোধনের প্রবৃত্তি প্রবল নহে। সমাজের দোষ ত্রুটি, ভুলভ্রান্তি হাস্যরস স্রষ্টার হাতে স্নিগ্ধ ও অনুকম্প্য হইয়া উঠে।

কার্লাইল হিউমার-এর সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, **'Humour is sympathy with the seamy side of things.'**

হাস্যরসস্রষ্টা এক উদারতা-স্নিগ্ধ, সহানুভূতি-কোমল এবং অভিজ্ঞতা-করুণ দৃষ্টি লইয়া জগৎ ও জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ভ্রান্ত, পতিত ও অনিয়মিত জীবনের পরিচয় দিয়া তিনি আমাদের হাসান বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখের হাসি কান্নার স্রোতে ভাসিতে থাকে।[3] তিনি তাঁহার বিচিত্র এবং গভীর অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছেন যে, ভুল ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি লইয়াই জগৎ, সুতরাং এইগুলি পরিহার করিলে জগৎকেই পরিহার করিতে

---

1. Life is a comedy to those that think and a tragedy to those that feel.

2. Humour is the laughter of the eccentric directed against himself
—The Theory of Drama by A. Nicoll. P. 99.

3. Humour সম্বন্ধে Meredith-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— If you laugh all round him, tumble him, roll him about, deal him a smack and drop a tear on him, own his likeness to you and yours to your neighbour, spare him as little as you shun, pity him as much as you expose, it is a spirit of Humour that is moving you. The Idea of Comedy by Meredith, P. 79.

হয়। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে, যাহারা আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, সুস্থ ও সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাদের মধ্যেও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দোষ-অপরাধ রহিয়াছে। সুতরাং দোষাতীত আদর্শ ব্যক্তি কেহও নহেন। জীবনের সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিয়া তিনি নিজের অন্তরকে উদার, অপক্ষপাতী ও সমদর্শী করিতে পারিয়াছেন। তিনি সেই কারণে সকলকে লইয়া পরিহাস করেন, কিন্তু কাহাকেও উপহাস করেন না। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলিয়াছেন—

> **'I am not the poet of goodness only,**
> **I do not decline to be poet of badness also.'**

হাস্যরস-স্রষ্টার মতও তাহাই। যাহাকে সকলে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে তিনি তাহাকেই স্নিগ্ধ হাস্যের দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া আনেন। হাস্যরসের মধ্যে মৃদুবারিবর্ষণের সহিত প্রসন্ন রৌদ্রসম্পাতের সংমিশ্রণ হয়। ইহা আমাদের মন আনন্দে উজ্জ্বল করে এবং হৃদয় সহানুভূতিতে সিক্ত করে। হাস্যরস-স্রষ্টার মন এক সর্বব্যাপী উদার সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়াই কোন নির্দিষ্ট জীবন-আদর্শের প্রতি তাঁহার অন্ধ অনুরাগ নাই। তিনি জীবনের মধ্য দিয়া নীতি ও আদর্শের সন্ধান করেন, নীতি ও আদর্শের মধ্য দিয়া জীবনকে সন্ধান করেন না। সেজন্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম অথবা সুস্পষ্ট মতবাদ তাঁহার সাহিত্যে ধরা যায় না।[1] যিনি আমাদিগকে হাসান তাঁহাকে কোন মত অথবা দলভুক্ত বলিয়া ধরিতে পারিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের মনের মধ্যে চাপা বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতে থাকে। সেজন্য শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টা সর্বপ্রকার মত ও দলের ঊর্ধ্বে, তিনি সকলকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু কাহারও কাছে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দেন না।

বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস (Wit)

আমরা হিউমার-এর আলোচনায় দেখিলাম যে, ইহার অবস্থান সহানুভূতিশীল হৃদয়ে। কিন্তু আর এক রকম হাস্যরস আছে যাহার আবেদন বুদ্ধিশীল মস্তিষ্কে—ইংরেজিতে তাহাই উইট-রূপে আখ্যাত। হিউমার-এর জগতে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই, লঘু-গুরু তফাত নাই, ইহাতে কে সত্য ও কে

---

1. J. B. Priestly-র উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'It is as difficult for the snob to be a humorist as it is for the doctrinaire.' English Humour—P. 12

ভ্রান্ত বুঝিবার উপায় নাই। এখানে হাস্যোৎপাদক ও হাস্যাস্পদ এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উইট-এর জগৎ সজ্ঞান, সচেতন ও মননশীল। উইট-এর মধ্যে লেখক তাঁহার প্রাধান্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন; তিনি হাসান কিন্তু নিজে হাসেন না, নাচান কিন্তু নিজে নাচেন না।[1] হিউমার মানব জীবনের গভীর ও মৌলিক সমস্যাগুলি এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়া উপভোগ করে, উইট আমাদের ভাসমান জীবনের বুদ্বুদগুলি চকিত আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে।

হিউমার মৃদু ও গভীর কিন্তু উইট তীব্র ও ক্ষণিক। হিউমার আমাদিগকে আবিষ্ট ও অভিভূত করে, কিন্তু উইট-এ আমাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। হিউমার-এ অভিজ্ঞতার প্রকাশ, উইট পাণ্ডিত্যের বিকাশ। হিউমার-এর রস চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু উইট-এর দীপ্তি তীব্র, তীক্ষ্ণ, বিরুদ্ধধর্মী বাক্যের উপর নির্ভর করে।

দৃশ্যমান বস্তুর সহিত অদৃশ্য বস্তুর বৈষম্য লইয়া উইট-এর কারবার। আপাত দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অথচ প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ নয়, আবার আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ অথচ বাস্তবিকপক্ষে ঐক্যমূলক—বাহিরের আকৃতির সহিত ভিতরের প্রকৃতির এই যে বৈষম্য, ইহাই উইট-এর জগৎ। K. Fischer যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'Wit must unearth something hidden & concealed.' সুচতুর যাদুকর যেমন যাদুর খেলা দেখাইতে যাইয়া কিছুটা আমাদের জ্ঞাত এবং কিছুটা অজ্ঞাত রাখিয়া দেন এবং কিছুক্ষণ পরে অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও বিমূঢ় করিয়া দেন, বিদগ্ধ হাস্যরসিকও তেমনি এক কথা বলিয়া ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত ও হতভম্ব করিয়া দেন। উইট ভাসমান মেঘের একমুখী প্রবাহ নহে, ইহা বিপরীতমুখী মেঘের সঘন সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে সুতীব্র বিদ্যুতের শাণিত দীপ্তি চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং শিক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া ইহার আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত নহে। দ্বিতীয়বার চিন্তার পর ইহার মর্ম বোধগম্য হয়। উইটলেখক উদ্ভট ও অসম্ভব বাক্যবর্ষণের দ্বারা আমাদিগের চিন্তা ও বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দেন, আমরা যখন অর্থ

---

1. The man of wit—the consciously entertaining person of lively speech and quick intelligence is usually a solemn fellow at the heart. He takes the world in vain that he may himself be taken in earnest.

Comedy by John Palmer (Martin & Secker), P.24.

বাহির করিতে হাতড়াইয়া মরি, তিনি তখন দূর হইতে মৃদু হাসির সহিত মজা দেখিতে থাকেন।

উইট গতানুগতিক স্বাভাবিক জগৎকে এলোমেলো ও ওলটপালট করিয়া দেয়। শিশু যেমন তাহার খেলার জিনিসগুলি তছনছ করিয়া পুনরায় সেগুলি সাজাইতে বসে উইট তেমনি পরিপাটি ও বিন্যস্ত চিন্তা ও ধারণা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। তবে পুনরায় সাজাইবার ও গুছাইবার কাজ সে করে না, সে কাজ করিতে হয় আমাদের বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের দ্বারা। কোন পুরাতন ও প্রচলিত উদ্ধৃতি অথবা বাক্যাংশ যদি বিশেষ চাতুর্যের সহিত অপ্রচলিত বা অভিনব ভাবে ব্যবহার করা হয় তবে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] এক ধরণের বাক্যপ্রবাহের মধ্যে যদি হঠাৎ অন্য আর এক ধরণের কোন বাক্য ঢুকাইয়া দেওয়া যায় তবে আমাদের কৌতুক উদ্রিক্ত হয়। বক্তা গভীর শব্দ-মায়ায় শ্রোতাদের মন ভুলাইয়া বহু উচ্চগ্রামে লইয়া গিয়াছেন, হঠাৎ যদি তিনি কোন হাল্কা ঘরোয়া বাক্য প্রয়োগ করিয়া বসেন তবে সাধারণ জগতে আকস্মিক পতনের ফলে শ্রোতার মন কৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠে। এই ভাবে গম্ভীর বাক্যস্রোতের মধ্যে লঘু কথা অথবা লঘু কথার ধারার মধ্যে গম্ভীর বাক্য প্রয়োগ করিয়া হাস্যরস সৃজন করা হইয়া থাকে। বার্গসোঁ ইহাকেই বলিয়াছেন Transposition।[২] অনুপ্রাস, শ্লেষ এবং ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রের Antithesis, Paradox, Oxymoron প্রভৃতি অলঙ্কার উইট লেখকের শাণিত অস্ত্র। বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের কারবার অনেক স্থলেই যে শুধু মাত্র অনুপ্রাস, শ্লেষ ও যমক প্রভৃতি লইয়া সেই বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখাইব। সুপ্রসিদ্ধ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ লেখক প্রমথ চৌধুরীর লেখায় Antithesis এবং Paradox-এর সুচতুর সমাবেশ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্য হিউমার এবং শেষ জীবনের সাহিত্যে উইট-এর নিদর্শন পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে উইট এবং হিউমার-এর চমৎকার সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। King Lear-এর

1. A quotation or a hackneyed phrase dexterously turned or wrested to another purpose, has often the effect of the liveliest wit.

Wit & Humour by Hazlitt, P. 23.

২। বার্গসোঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য—A comic effect is always obtainable by transposing the natural expression of an idea into another key.

Laughter by Bergson P, 123.

Fool ও As you Like It-এর Touchstone উইট-এর দৃষ্টান্ত। বর্তমান জগতে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির কদর বেশি, সেজন্য বর্তমান সাহিত্যেও হিউমার অপেক্ষা উইট-এর আধিপত্য অধিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা ঠিক যে হিউমার-এর আবেদন সর্বদেশে এবং সর্বশ্রেণীতে এবং উইট-এর আবেদন বিশেষ দেশে, বিশেষ শ্রেণীতে।

ফ্রয়েড তাঁহার Wit and its relation to the Unconscious নামক গ্রন্থে উইট-এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি উইট এর দুই বিভাগ করিয়াছেন, Harmless Wit এবং Tendency Wit। ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে, বাক্য ও চিন্তা লইয়া যথেচ্ছ খেলা করিয়া উইট আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে।[১] উইট-এর উৎপত্তির কারণ আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে অবদমিত প্রবৃত্তি উইট-এর মধ্য দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন যে পরপীড়নেচ্ছু লোকেরা (Sadist) উইট সৃষ্টি করিয়া অন্যকে আঘাত দিতে বিশেষ পটু ও সক্ষম হইয়া থাকে। তাঁহার মতে উইট-এর মধ্য দিয়া আমরা আমাদিগের শত্রুকে হাস্যাস্পদ করিয়া আমোদ অনুভব করি।[৩]

ব্যঙ্গরস (Satire)

যে হাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না করিয়া বিষণ্ন করিয়া তোলে, যাহা আমাদের মন আমোদে উজ্জ্বল না করিয়া আঘাতে দীর্ণ করিয়া ফেলে তাহা ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গকার বড় কঠোর, বড় নির্মম; তিনি মানুষের দোষ ও ব্যাধি নগ্ন করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার হাসি একক, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে তাহা প্রতিধ্বনিত হয় না। হিউমার এবং উইট-এর মধ্যেও উপহাস আছে, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে হাসির শীতল প্রলেপে উপহাসের তপ্তজ্বালা

1. Wit has remained true to its nature from beginning to end, It begins us play in order to obtain pleasure from the free use of words and thoughts. Wit & its relation to the Unconscious by Freud (Fisher & Unwin, 1916), P. 211

2. The existence of numerous inhibited impulses whose suppression retains some weakness produces a state fovourable for the production of tendency wit. Thus certain single components of the sexual constitution may appear as motives for wit formation. Ibid, P. 219

3. Ibid, P. 150.

জুড়াইয়া যায়। কিন্তু ব্যঙ্গের মধ্যে উপহাসের জ্বালা নিদারুণ রূপে বিদ্যমান। সেই জ্বালা আমাদের মনের মধ্যে তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি করিয়া আমাদের দরদ সহানুভূতি সব শুষ্ক করিয়া ফেলে।[1] ব্যঙ্গের হাসিতে যোগ দিতে যাইয়া দেখি সেই হাসি সপাং করিয়া আমাদের পিঠে চাবুক বসাইয়া দেয়, সেই চাবুকের আঘাতে মুখের হাসি বেদনায় বিকৃত হইয়া পড়ে।

Satire কথাটি **Satura** হইতে আসিয়াছে। **Satura**-র অর্থ হইতেছে মিশ্রণ (mixture)। পূর্বকালে ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের মিশ্রিত আমোদ-কৌতুক **Satura** নামে অভিহিত হইত। তাহারা বিকৃত অঙ্গভঙ্গি ও তামাসা কৌতুকের মধ্যে দিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান সমূহ উপহাস করিত। তাহাদের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যঙ্গকারগণ সকলেই তাহাদের ধারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্য শোধন করা, শিক্ষা দেওয়া। সমাজের যেখানে যত দোষ, যত অসঙ্গতি যত রোগ সঞ্চিত হইয়া আছে তিনি তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া সে সব অনাবৃত করিয়া ফেলেন। যে-সব আমরা ভুলিয়া যাইতে চাই, উপেক্ষা করিতে চাই, ক্ষমা করিতে চাই ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি সে-সব বিষয়েরই উপর নিবদ্ধ থাকে। তাঁহার কাছে ক্ষমা নাই, পরিত্রাণ নাই, তুচ্ছতম ত্রুটি এবং সামান্যতম দুর্বলতাও তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারে না। তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে ভয় হয়, কি জানি কখন তিনি কোন্ ছিদ্র দেখিয়া আবার কশাঘাত করিয়া বসেন। রাশভারী স্কুলমাষ্টারের ন্যায় তিনি সব সময়েই বেত্র হস্তে শিক্ষার তিক্ত বটিকা খাওয়াইতে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু সেই বটিকা যে আমাদের গলায় আটকাইয়া যায়, পেট পর্যন্ত পৌঁছায় না সে সংবাদ তিনি রাখিতে চান না। মাঝে মাঝে তিনি রস বিতরণ করিতে চান কিন্তু তাহা কষ হইয়া আমাদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত, আড়ষ্ট করিয়া ফেলে। ব্যঙ্গকার সকলকে বিদ্রূপ করিবার স্পর্ধা রাখেন, সেজন্য নিজে তিনি দোষ ও দুর্বলতার অতীত হইয়া থাকেন।[2] খাঁটি হাস্যরসের মধ্যে হাস্যরসিক ও হাস্যাস্পদ এক হইয়া যায়। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে

1. If you detect the ridicule, and your kindness is chilled by it, you are slipping into the grasp of Satire

The Idea of Comedy by Meredith, P. 79.

2. Satire is a very delicate operation, and no man will trust himself with it except he be in possession of a thorough training, a clear purpose and a sound knowledge of moral anatomy.

Satire by Gilbert Cannan (Martin Secker), P. 37.

হাস্যোৎপাদক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন বটে কিন্তু তিনিও মজা ও কৌতুক উপভোগ করিতে চান, কিন্তু ব্যঙ্গে লেখক নিজেকে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত রাখিয়া নিম্নতলাশ্রয়ী মানবদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা দেখিয়া আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া উঠেন; স্যাটায়ার হিউমার-এর বিপরীত, উইট এই উভয় জাতীয় রচনারই সাধারণ বাচনভঙ্গী। উইট ঠিক একটা স্বতন্ত্র জাতি নহে। সর্বপ্রকার হাস্য-রচনারই সাধারণ উপাদান। লেখকের মনোভাব ও জীবনদর্শনের উপর উইট-এর প্রয়োগ নির্ভরশীল। স্যাটায়ার-এর মধ্যেও উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে; ব্যক্তিগত বিদ্রূপ, কুরুচিপূর্ণ কুৎসা-রটনা (lampoon) ইহার নিম্নতম নিদর্শন। কিন্তু উন্নততম ব্যঙ্গরচনার পিছনে একটা নৈর্ব্যক্তিক ন্যায়নিষ্ঠা আছে—একটা গুরুতর সামাজিক অসঙ্গতিকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য ইহা অনেক সময় আমাদের অনুমোদন লাভ করে। ব্যঙ্গকার বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় নিজের জন্য এক গর্বিত আসন রচনা করিয়াছেন বলিয়া সামান্য ও সাধারণ লেখকের প্রতি তাঁহার কোন সম্ভ্রম নাই, শ্রদ্ধা নাই। অন্যের দোষ ও দুর্বলতা সহজেই তাঁহার চোখে ধরা পড়ে এবং সেই সব দোষ ও দুর্বলতা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের খোঁচায় বিদ্ধ করিয়া তিনি এক বিকৃত কৌতুক বোধ করেন। ব্যঙ্গকার ক্ষমাহীন sadist—মানুষকে ব্যথা দিয়াই তিনি আনন্দ পান,[১] সুইফটের ন্যায় জীবনে যাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং আশা বিফলীভূত হইয়াছে তাঁহারাই নিজেদের মনের সঞ্চিত গ্লানি এবং পুঞ্জিত বিদ্বেষ মানব-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া উদ্‌গীরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঈর্ষাদগ্ধ শ্বাসে মানবের সুখ ও বিলাস ছুটিয়া যায়, আশা ও আদর্শ টুটিয়া যায়।

ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য আঘাত করা, শোধন করা সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ব্যঙ্গকার সোজাসুজি গালাগালি করেন না, নীতি উপ-দেশও দেন না—তাহা হইলে তাহার লেখা আর্ট-এর বহির্ভূত হইয়া পড়িত। সাধারণত দেখা যায় তিনি সরলতার ভান করিয়া একটি বিষয়ের বর্ণনা করিয়া যান অথচ পরিখার মধ্যে অদৃশ্য সৈন্যদের ন্যায় তাঁহার বিদ্রূপের কাঁটাগুলি আত্ম-

১। সুইফট কবি পোপের কাছে লিখিত এক পত্রে Gulliver's Travels লিখিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, 'When you think of the world give it one lash the more at my request. Upon the great foundation of mis-anthropy though not in Timon's manner, the whole building of my Travels is erected, and I never will have peace of mind, till all honest men are of my opinion'.

গোপন করিয়া থাকে। সেই বর্ণিত বিষয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে গেলেই সেই কাঁটাগুলি অদৃশ্য সৈন্যদের সঙ্গীনের ন্যায় আসিয়া বিদ্ধ হয়। অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যায় লেখক যে সব চরিত্রকে আঘাত করেন সে-সব চরিত্রের প্রতি বাহ্যত তিনি একটা নির্দোষ সহানুভূতির ভাব দেখান। কিন্তু তাঁহার বাহ্য সরলতা ও সহানুভূতির নিম্নে সে গূঢ় উদ্দেশ্য ও কঠোর আঘাত নিহিত রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া পাঠক কৌতুকান্বিত ও চমৎকৃত হয়। সুইফট Gulliver's Travels-এর মধ্যে সরাসরি কোথাও তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। অথচ আমরা সকলেই জানি ঐ বইখানির প্রতি অক্ষরে মানবের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যক্ত হইয়াছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' ব্যঙ্গাত্মক রচনার একটি সুন্দর নিদর্শন। ঐ বইয়ের মধ্যেও দেখি লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের ধারা প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। নববাবু হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুমহাশয়, মুনসী, স্কুল মাষ্টার, রঙ্গিণী বারবিলাসিনী প্রভৃতি অনেককেই তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই বিদ্রূপ প্রশংসার ছদ্মবেশে ভূষিত। ব্যঙ্গের অস্ত্র শিয়াকুল কাঁটার ন্যায় কেবলই নিরবচ্ছিন্ন কাঁটা নয়, তাহা মধুমক্ষিকার হুলের ন্যায় গুপ্ত থাকে এবং বিঁধিবার আগে খানিকটা মধুও দেয়।

হাস্যরসের সব রকম বিভাগের মধ্যে ব্যঙ্গ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এই সম্বন্ধে অনেকেই একমত। কিন্তু তবুও দেখা গিয়াছে জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক ব্যঙ্গমূলক রচনা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গ্রীক নাট্যকার অ্যারিস্টোফ্যানিস ব্যঙ্গমূলক নাটকের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেন জনসন Volpone নামক নাটকে লোভার্ত মানুষের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি লইয়া কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ফরাসী লেখক ভলটেয়ারও ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গের মধ্যে সুইফটের আত্যন্তিক তিক্ততা ও যুক্তিহীনতা নাই। ব্যঙ্গের সর্বাপেক্ষা সক্ষম লেখক বোধ হয় সুইফট। সুইফট তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যক্ত করিবার জন্য উদ্ভট ঘটনা ও অদ্ভুত প্রাণীদের বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বর্ণনা এত নিখুঁত আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিযুক্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যে বইখানা পড়িবার সময় ক্ষণকালের জন্য আমরা বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া বিশ্বস্তভাবে লেখকের অনুবর্তী হই। লিলিপুট এবং ব্রবডিংন্যাগদের মধ্য দিয়া তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন, Laputa খণ্ডে তিনি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক-দিগকে উপহাস করিয়াছেন এবং সর্বাপেক্ষা বীভৎস খণ্ড—Houyhuhumsদের

বর্ণনায় তিনি মানব চরিত্রকে পশু অপেক্ষাও অধম রূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার অস্বাভাবিক মানববিদ্বেষ ব্যক্ত করিয়াছেন। আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নার্ড শ তাঁহার প্রত্যেকখানা নাটকের মধ্যে সমাজের রীতিনীতি, ধর্ম-অনুষ্ঠানের প্রতি সুতীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রচারপন্থী লেখক বলিয়া তাঁহার ব্যঙ্গ অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধারালো হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে খাঁটি ব্যঙ্গ-রচনার প্রবর্তক হিসাবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' ও 'নবদূতী বিলাস' বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ-রচনার নিদর্শন। 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মধ্যে সমসাময়িক সমাজের কৃত্রিমতা, অনাচার ও অবনতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছড়াছড়ি রহিয়াছে। রসরাজ অমৃতলাল বসু বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গমূলক নাটকের লেখক। তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রগতিপন্থী সমাজকে মর্মান্তিক আঘাত করা হইয়াছে। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী ও সজনীকান্ত দাসকে ব্যঙ্গ-রচয়িতা রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা হইবে।

কৌতুকরস (Fun)

হিউমার, উইট ও স্যাটায়ার-এর মধ্যে হাসি আছে, কিন্তু সেই হাসি মানস-সংযুক্ত ও চিন্তাপ্রসূত, সেই হাসি অবারণ ও অকারণ নহে। ঐ সব হাস্য-রসাত্মক রচনায় লেখক আমাদের মুখের উপর দিয়া শুধু হাসির তুলিকা বুলাইয়া যান না বটে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে চিন্তা ও কল্পনার অশেষ শাখা ও পল্লবও সৃষ্টি করিয়া তোলেন। যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তিপ্রবণতা বা আমোদপ্রিয়তা কোন সূক্ষ্মতর কলা-কৌশলের বা গভীর জীবনানুভূতির নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্রকল্পনার সহায়তায় আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে সেখানে কৌতুকরসেরই প্রাধান্য। মানুষের সভ্যতা যত বিবর্তন লাভ করিয়াছে ততই তাহার হাসি অনুচ্চ ও চিন্তাযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে যখন বিদূষক রাজসভায় হাসাইত, যখন সাধারণ লোকে গ্রামে বাজারে স্থূল রঙ তামাসার মধ্য দিয়া মজা বোধ করিত তখন হাসি কেবল আমোদিত প্রাণের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি ছিল, তাহার সহিত চিন্তার যোগ ছিল না কিংবা তাহার কোন গূঢ় ব্যঞ্জনাও ছিল না।

কৌতুকময় হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ থাকে। যাহা সহজেই মনকে ধাক্কা দিয়া সচকিত ও আমোদিত করিয়া তোলে তাহাই এই হাস্যরসের প্রাণ। যাহা স্বাভাবিক ও সচরাচরদৃষ্ট তাহাতে হাসিতে হইলে বিদ্যা ও বুদ্ধিকে সক্রিয় রাখিতে হয়, কিন্তু যাহা অতিরঞ্জিত ও নিয়মবহির্ভূত তাহা দেখিয়াই আমাদের হাসি উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কৌতুকের জগৎ এক অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জগৎ, সেখানে প্রবেশ করিয়া আমরা সীমা, সংযম ও শালীনতা ভুলিয়া অনিয়ন্ত্রিত আমোদ-প্রমোদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া পড়ি। **Farce** অথবা উতরোল হাস্যাত্মক প্রহসনে আমরা এই জগতেরই সন্ধান পাই। ফার্স-এর মধ্যে হিউমার-এর কারুণ্য নাই, উইট-এর দীপ্তি নাই এবং স্যাটায়ার-এর নির্মমতাও নাই, ইহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন হাসির প্রসন্ন প্রবাহ আছে। শেক্‌স্‌পীয়রের **Merry Wives of Windsor** অথবা মলিয়েরের **The Cit Turned Gentleman** নামক প্রহসনে যে হাস্যরস আছে তাহা উচ্ছ্বসিত ও উতরোল। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে এবং অমৃতলাল বসুর 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' ও 'তাজ্জব ব্যাপার'এ কৌতুকের হাসিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৌতুকপূর্ণ হাস্যরস সাধারণত স্থূল, গ্রাম্য ও আদিরসাশ্রিত হইয়া থাকে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই হাস্যরসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হনুমানের লঙ্কা দাহ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, লহনা ও খুল্লনার যুদ্ধ, নারীদের পতিনিন্দা, শিবের কোঁচনীপাড়ায় ভিক্ষা ইত্যাদিকে আমরা কোন সূক্ষ্ম হাস্য রসের পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। এই সব বিষয়কে নিতান্তই স্থূল কৌতুক রসের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়।[১]

১। Louis Cazamian তাঁহার The Development of English Humour নামক গ্রন্থে ফরাসী হাস্যরসের বিবরণ দিতে যাইয়া অবিমিশ্র কৌতুককে Humour of release এবং যথার্থ হাস্যরসকে Humour de finesse নামে বিশ্লেষিত করিয়াছেন।

(উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অবতরণিকা

বাঙালীর হাস্যবোধ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কোন সাহিত্যের হাস্যরস আলোচনা করিতে হইলে সেই সাহিত্য কি সামাজিক ও জাতীয় পরিবেশের মধ্যে লেখা হইয়াছে তাহা জানা দরকার। ফরাসী জাতি উচ্ছ্বসিত কৌতুক ও প্রমত্ত আমোদপ্রিয় জাতি, সেজন্য তাঁহাদের সাহিত্যে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ জাতি গম্ভীর ও চিন্তাশীল জাতি, সেজন্য তাঁহাদের সাহিত্যে করুণ হাস্যরসের (Humour) সন্ধান আমরা পাই।[১] বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাইয়াও আমরা দেখিব যে বাঙালী জাতির হাস্যবোধের প্রকৃতি তাহার সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাঙালী হাসিতে জানে কিনা এবং জানিলেও কি ধরণের হাসি হাসে তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাহার সাহিত্যের হাস্যরসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে আমরা সক্ষম হইব।

বাঙালীর হাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গেলেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিব যে বাঙালী হাসিতে জানে না, হাসাটা পছন্দও করে না। তাহার ধারণা হাসি মস্ত একটা বাজে খরচ এবং এই বাজে খরচ কমাইবার জন্য সে সতত সাবধান হইয়া থাকে। তাহার কাছে কান্নাটা হাসি অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিস, সেজন্য তাহার মত কাঁদিতে ও কাঁদাইতে বোধ হয় আর কেহ পারে না। বাংলা সাহিত্যে সেই কারণেই কান্নার জোয়ার দুই কূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, জায়গায় জায়গায় যে হাসির বুদ্বুদ দেখা দিয়াছে তাহা ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার পাকে উদ্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ হাস্যরসের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে বাঙালী হাস্যরসকে ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে

১। ফরাসী ও ইংরেজ জাতির হাস্যবোধের তুলনামূলক আলোচনা Louis Cazamian তাঁহার The Development of English Humour নামক গ্রন্থে সুন্দরভাবে করিয়াছেন। ৩২—৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হাস্যরস পরিমাণে অল্প ও প্রকরণে অতি ক্ষীণশক্তি। ইংরেজি সাহিত্যেও চসারের পূর্ব পর্যন্ত হাস্যরসের পরিচয় মিলে না। সুতরাং হাসির সাহিত্যে অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার। বাঙালী মাঝে মাঝে সাহিত্যের মধ্যে যে যে হাসির বুঁদ ছাড়িয়াছে তাহা কেবল কান্না ও হা-হুতাশের জন্য আমাদের মনকে তাজা ও প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য।

বাঙালীর হাস্যের স্বল্পতার কারণ তাহার আত্যন্তিক ভাবপ্রবণতা। বাঙালীর মন অতি সহজেই এবং অতি সামান্যতেই ভাবাবেগে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। সে স্বদেশ-অনুরাগে উত্তেজিত হইয়া উঠে, রুদ্র অত্যাচারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দেয়, পরের বেদনায় কাঁদিয়া অস্থির হয়, আবার প্রেমে ব্যর্থ হইয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরে এবং গোঁপের কাল রেখা দেখা যাইবার পূর্বেই অদ্বিতীয় প্রেমের কবি হইয়া পড়ে। এ সবকিছুর পশ্চাতে তাহার ভাবাবেগ ক্রিয়া করিতেছে। ভাবপ্রবণ মন সব সময়েই জীবন সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন ও দার্শনিক ভঙ্গিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। এই মনের মধ্যে হাস্যবোধ প্রবেশ করিতে সাহস করে না। খাঁটি হাস্যরস ভাবমগ্ন ও বেদনাসিক্ত মন হইতে জন্ম লাভ করে সত্য কিন্তু বাঙালীর ভাবমগ্নতা ঐহিক অপেক্ষা পারত্রিক, লৌকিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতিই অধিকতর অভিনিবিষ্ট। সুতরাং, যে ভাবমগ্নতা হইতে করুণ রসিকতার জন্ম, বাঙালীর ভাবমগ্নতা সে জাতীয় নহে। বাঙালীচিত্ত কৌতুক ও আমোদপ্রিয়তা এবং যথার্থ হাস্যরস কোনটির পক্ষেও অনুকূল হয় নাই।

হাসি বাস্তব পৃথিবীর ঈপ্সিত সম্পদ। যেখানে পাঁচজন সামাজিক লোক মিলিত হইয়া গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে সেখানেই হাস্য উদ্রিক্ত হইবার ফুরসত পায়। বাস্তব জীবনের সহিত গভীর পরিচয় ও গাঢ় অনুভূতি না থাকিলে হাস্যবোধ কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। বাঙালী ধর্মপ্রাণ ও অধ্যাত্মবিলাসী জাতি। জাগতিক জীবন অপেক্ষা পারমার্থিক জীবন তাহাকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছে। যে চিত্ত সব সময়ে দেবতার মাহাত্ম্য ও অলৌকিক কার্যকারণ-তত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া আছে তাহা কঠিন মৃত্তিকাময় মানবিক সমাজের বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় লক্ষ্য করিতে উৎসুক হইবে কেন? ভাবের জগতে, কল্পনার জগতে হাস্যরসের স্থান নাই। হাস্যরস কেবলমাত্র ধূলামাটির বাস্তব পরিবেশের মধ্যে জন্ম লইতে পারে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য সম্পূর্ণ ধর্মমূলক ও আধ্যাত্মিক ভাববিশিষ্ট বলিয়া সেখানে হাস্যরসের

এত অপ্রাচুর্য দেখা যায়। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য—যাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাহার মধ্যে হাস্যরসের স্বল্পতম চিহ্নও নাই। দেবলীলার মধ্যে হাস্যরস নাই, আধ্যাত্মিক ভক্তি ও সাধনার মধ্যেও হাস্যরস নাই। কেবল যেখানে দেবতারা মানুষের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন সেখানেই তাঁহারা হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। শিব যেখানে শাঁখারী অথবা কৃষক, চণ্ডী যেখানে মানুষী সাজিয়া ফুল্লরার ঈর্ষা উদ্রেক করিতেছেন, স্বর্গের পূজ্য দেবতারা যেখানে মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইতেছেন,[1] সে[illegible]ই কেবল তাঁহারা হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। প্রাচীন কবিগণ দেবলী[illegible]না করিতে যাইয়া তাঁহাদের শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য দেবচরিত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া মানবচরিত্রের মত দেখাইয়া হাস্যরস সৃজন করিতে চেষ্টা করিতেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি লক্ষণ ইহার অনুকরণপ্রিয়তা ও পুচ্ছ-গ্রাহিতা। প্রায় একই রকম ঘটনার বিবরণ, একই রকম সৌন্দর্যের বর্ণনা, এবং একই রকম সুখদুঃখের লীলা সব লেখকের লেখায় দেখা যায়। হাস্যরসের উদ্দীপনাতেও এই একঘেয়েমি ও গতানুগতিকতা আমরা লক্ষ্য করি। যে হাস্যরস আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে তাহা স্থূল, গ্রাম্য ও অশ্লীল। প্রাচীন সাহিত্যিকগণ যাহাদের জন্য সাহিত্য রচনা করিতেন তাহারা ছিল অশিক্ষিত, স্বল্পবুদ্ধি ও নিম্নরুচি জনসাধারণ, সুতরাং তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্যই তাঁহারা এই ধরণের হাস্যরস উদ্রেক করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা আমাদের ব্যক্তিমানস সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দিল তখন হইতে আমাদের সাহিত্যে খাঁটি হাস্যরসের অস্তিত্ব দেখা যায়। পাশ্চাত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও তখন বিভিন্ন ধরণের হাস্যরস উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র বার বার বিভিন্ন লেখকের লেখায় হাস্যরস উৎপাদন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় বিদূষকের। বিদূষক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত চরিত্র। কিন্তু ইহার ঔদরিকতা ও ভাঁড়ামি বাংলা সাহিত্যেও বহু জায়গায় হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে। কলহ-পটীয়ান নারদও আর একটি হাস্যোৎপাদক চরিত্র। নারদ প্রায়ই দেবতার সংসারে কলহ ও বিভ্রাট বাধাইয়া কৌতুক উদ্রেক করিতেন। কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতিতে রাধার মাতামহী বড়াই হাস্যরসের খোরাক যোগাইয়াছে।

১। শূন্যপুরাণের অন্তর্গত নিরঞ্জনের রুষ্মা দ্রষ্টব্য।

বড়াই বৃদ্ধার চেহারা লইয়া রাধা ও কৃষ্ণের সহিত রঙ্গরসিকতা করিয়া শ্রোতাদের প্রাণে যথেষ্ট আমোদ সঞ্চার করিত। কৃষ্ণলীলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিহাস-রসিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়ী নারী হইতেছেন বৃন্দা। বৃন্দা রাধার পক্ষ লইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সমানে লড়িয়াছেন এবং তাঁহার কথায় কথায় তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ বর্ষিত হইয়াছে। চতুরশিরোমণি কানাইকেও অনেক সময় বৃন্দার চতুরালির কাছে হার মানিতে হইয়াছে। আর একটি হাস্যাস্পদ চরিত্র হইতেছে হনুমান। রামলীলায় হনুমান একটি প্রধান চরিত্র তো বটেই, যে লীলা অথবা পালায় হনুমানের কোন অংশ নাই সেখানেও অনাবশ্যকভাবে হনুমানকে টানিয়া আনিয়া শ্রোতাদের হাস্য উদ্রেক করিবার চেষ্টা হইত। হনুমান যখন এক মুখোস পরিয়া, লম্বা লেজ লাগাইয়া আসরের মধ্যে আসিয়া লাফাইয়া দাপাদাপি আরম্ভ করিত তখন দর্শকবৃন্দ হাসিতে গড়াইয়া পড়িত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিষয় ও চরিত্রগুলির মধ্যে হাস্যরস ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ ছিল না, সেজন্য লেখকগণ হাস্যরসের প্রয়োজনে গ্রন্থবহির্ভূত অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রের আমদানী করিতেন।

মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের যথেষ্ট দুর্গতি ও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রতিকারহীন, অত্যাচারিত হিন্দুগণ নীরবে সব সহ্য করিয়া নিরুপায়ভাবে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাইত। তবে সাহিত্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ তাহারা পাইয়াছিল।[১] মধ্যযুগীয় সাহিত্যে অনেক স্থলেই বিদেশাগত, বিধর্মী মুসলমানদের অদ্ভুত পোষাক-পরিচ্ছদ, বিজাতীয় ভাষা ও কৌতুকজনক রীতিনীতি লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে এবং বংশীবদনের মনসা-মঙ্গলে এরূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপের দৃষ্টান্ত আমরা পাই।

বাঙালী ঝগড়া ও কোন্দলে বিশেষ পটু। সেজন্য তাহার সাহিত্যেও ঝগড়া ও কোন্দলের অনেক বর্ণনা থাকা স্বাভাবিক। এই সব বর্ণনার মধ্য দিয়া লেখকগণ কৌতুকরসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিব ও পার্বতীর ঝগড়া বহুপ্রসিদ্ধ। বহু খ্যাত ও অখ্যাত কবি এই ঝগড়ার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মনসা ও চণ্ডীর ঝগড়াও খুব সরস ও উপভোগ্য। সর্বাপেক্ষা সেরা ঝগড়া বোধ হয় দুই সতীনের ঝগড়া। মুকুন্দরাম হইতে

১। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের Glimpses of Bengal Life নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Humour in Old Bengali Poetry নামক পরিচ্ছেদ পঠিতব্য।

আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত বহুতর লেখক দুই সতীনের পরম রসাল কোন্দল অতি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব মধ্য যুগে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এ দ্বন্দ্বের বিবরণ মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও পাওয়া যায়। শাক্ত সাহিত্যে বৈষ্ণবদের উপহাস এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে শাক্তদের নিন্দা দেখা যাইত। এই শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিরপেক্ষ পাঠক এবং শ্রোতার কাছে অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। পূর্বকালের বীরগণ বাহুযুদ্ধের আগে বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া লইতেন। এই বাগ্‌যুদ্ধের মধ্য দিয়া সম্ভবত তাঁহারা পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করিতেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা আয়ত্ত করিয়া লইতেন। বাহুযুদ্ধ অবশ্যই ভয়াবহ এবং উত্তেজক কিন্তু বাগ্‌-যুদ্ধটা সব সময়েই হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিত।

বাঙালী ঘরের কয়েকটি আত্মীয়তা-সম্পর্ক আছে যেগুলির মধ্যে হাসি-ঠাট্টার সরস মাধুর্য আমরা চিরকাল উপভোগ করিয়া আসিতেছি। শালা-ভগ্নীপতি, দেবর-ভ্রাতৃবধূ, দাদামহাশয়-নাতিনাতনীর সম্পর্ক অত্যন্ত রসাল ও মধুর। বাঙালী পরিবারের হাস্যকৌতুকের খোরাক ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে। বাংলা সাহিত্যেও এই সব সম্বন্ধযুক্ত পাত্রপাত্রীদের ক্রিয়া ও কথাবার্তার মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃজন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,' 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যকৌতুকের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের রূপ দেখিয়া বিবাহিত রমণীগণ নিজেদের অক্ষম ও অপদার্থ স্বামীদিগের বিবরণ দিতে দিতে বিলাপ করিয়াছে। কিন্তু সেই বিলাপ প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও গূঢ় রসিকতায় পাঠকের মনে হাস্যরসই উদ্রেক করিয়াছে। বলা বাহুল্য অন্যান্য বহু হাস্যাত্মক বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়ও অশ্লীলতার রঙে রঞ্জিত। কিন্তু এই ধরণের বিষয়ের বহুব্যাপিতা দেখিয়া মনে হয় কবি এবং শ্রোতা উভয়ের কাছেই এগুলি বিশেষ প্রিয় ও রোচক ছিল। বাসরঘরে শালী এবং অন্যান্য রমণীদের সহিত নব জামাতার চটুলরসাত্মক আলাপ ও আচরণ বর্ণনার মধ্যে অনেক স্থলেই হাস্যকৌতুকের প্রসন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি কবি বাসরঘরের উদ্দাম ঠাট্টা-রসিকতার অতি সরস চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ বাঙালী লেখকদের, বিশেষত রাঢ়ীয় লেখকদের অতি প্রিয় উপাদান। এই বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মুকুন্দরাম,

সপ্তদশ শতাব্দীর কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর দীনবন্ধু মিত্র সকলেই বঙ্গজ লোকেদের লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন। মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষাও খারাপ। কিন্তু সেই সব ভাষা লইয়া তো কোন কটাক্ষ করা হয় নাই। কিন্তু হতভাগ্য বাঙালদের ভাষা এত উপহাসের জিনিস হইয়া উঠিল কিরূপে? পশ্চিমবঙ্গের কবিই সংখ্যায় অধিক ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সহিত সর্বভারতীয় ভাব ও সংস্কৃতির যোগ নিকটতর ছিল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাষাই ক্রমে আদর্শ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেজন্য পূর্ববঙ্গের ভাষা লইয়া অবাধ কৌতুক করিয়া কবিরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের মনে সন্তোষ সঞ্চার করিতেন।

(যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার-যুক্ত বাক্যের মধ্য দিয়া বাঙালী কবিগণ হাস্যরস উৎপাদন করিতে চাহিয়াছেন। এ-বিষয়ে পথিকৃৎ বোধ হয় অদ্বিতীয় অলঙ্কারজ্ঞ কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে বিচিত্র অলঙ্কারের নয়নাভিরাম সমাবেশ। এই সব অলঙ্কারের মধ্য দিয়া গূঢ় ব্যঞ্জনা, প্রখর কৌতুক এবং তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চিত্তকে চমৎকৃত করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত যাত্রা, পাঁচালী, তর্জা, কবিগান প্রভৃতি লৌকিক সাহিত্যরসের উপাদানের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অলঙ্কার-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়) এই সব সাহিত্যের কবিগণ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে যাইয়া কোথায় থামিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতেন, সেজন্য তাঁহাদের অলঙ্কার হাস্য উদ্রেক না করিয়া অনেক সময়েই বিরক্তি উৎপাদন করিত। তাঁহাদের অলঙ্কার একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন ছিল বলিয়া ইহা ক্রমে ক্রমে লোকের কাছে নূতনত্ববর্জিত ও হাস্যলেশহীন হইয়া পড়িয়াছিল। যাত্রা কবিগানে দেখা যাইত উত্তর প্রত্যুত্তরের স্থলে একজন কোন বাক্য বলিলে অন্য আর একজন সেই বাক্যের কোন শব্দ অথবা বর্ণ লইয়া যমক অনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়া চলিতেন এবং মূল অর্থ হইতে বহু দূর সরিয়া যাইয়া শ্রোতাদের চিত্তে চমৎকারিত্বের আঘাত দিতে থাকিতেন।[১]

১। গোবিন্দ অধিকারীর নৌকাবিহার পালা হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। বৃন্দা ও সখীগণ যমুনা পার হইবার জন্য আসিয়াছেন, বৃন্দার সহিত কাণ্ডারীবেশী কৃষ্ণের কথোপকথন হইতেছে—

বৃন্দা—এক আনায় হব পার, একা নায় হব পার,
(ভাল) আট আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,
আট আনা আট আনা—আ— টানা রেখো না,
কৃপা ক'রে টেনে নাও

ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের প্রভাবের দ্বারা পুষ্ট ছিলেন, তাঁহার কবিতার মধ্যেও যমক-অনুপ্রাসের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রভাবান্বিত সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যমক-অনুপ্রাসের বাহুল্য দ্বারা হাস্যোদ্দীপকতার রীতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন কালে অশ্লীল না হইলে হাস্য জমানো যাইত না। অবশ্য অশ্লীলতার আদর্শ কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আধুনিক দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা অশ্লীল বলি পূর্বে তাহা মোটেই অশ্লীল ছিল না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব জিনিস ঢাকিতে ও গোপন করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু পূর্ব-কালের সরল লোক নিঃসঙ্কোচে নিজের মন ও মুখ উন্মোচন করিয়া দিত। নারীগণের পতিনিন্দায় নারীগণ যেখানে স্বামীদের দৈহিক অপটুতার বিষয় উল্লেখ করিতেছে সেখানে আমরা বর্তমানে উৎকট অশ্লীলতা লক্ষ্য করিব। কবিগণের খেউড় ও লহরের মধ্যে যখন উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিত তখন তাহা বীভৎস রুচিবিকৃতির পরিচয় দিত। বড়াই, সখীগণ ও কৃষ্ণের মধ্যে যখন রসের উত্তর প্রত্যুত্তর হইত তখন তাহা দেখিতে দেখিতে মাধুর্য হারাইয়া তিক্ত, ঝাঁঝালো মাদকতায় বিকৃত হইয়া পড়িত। এই মাদকতা না হইলে তখনকার লোকেদের মন মাতানো যাইতে পারিত না। মিষ্টমধুর নির্দোষ রসে তাহাদের নেশা হইত না।

প্রত্যেক ভাষাতেই বিশিষ্ট শব্দ ও বাক্যের আধারে হাস্যরস জমা হইয়া থাকে, হাস্যরসস্রষ্টা সেই বাক্য ও শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া তাঁহার ভাষাকে হাস্যরসে স্নিগ্ধ ও সিক্ত করিয়া তোলেন। বাংলা সাহিত্যেও ছড়া ও প্রবাদের মধ্যে হাস্যকৌতুকের অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে সুকৌশলে ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহার করিতে পারিলে তাহা চমৎকারিত্ব লাভ

কৃষ্ণ—আট আনা আট আনা—তাতে আঁটে না
মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আধুলি ছুঁই না।
(এক গোপীর চরণধূলি বিনা)
বৃন্দা—নয় আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি
আমরা হরিণ নয়না—নয় আনা নয় আনা
এ পারে আমরা নয়ানা নয়ানা
তরীখানি নয় না, (ঝলকে ঝলকে জল ওঠে)
কেবল মাঝিটি পুরাণা, তাও আবার পুরা না
তিন জায়গা ভাঙা তার, তাও আবার পুরাণা।

করে। ছড়া ও প্রবাদ সাধারণত মেয়েদেরই সম্পত্তি, মেয়েদের কথায় ইহাদের প্রয়োগ করিয়া লেখকগণ অনেকস্থলেই চমৎকারী রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ছড়া ও প্রবাদে সাহিত্য যে কতখানি রসোজ্জ্বল হইয়া উঠে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনসমূহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস

আমরা বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব, তৎপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস কি স্থান অধিকার করিয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সংস্কৃত সাহিত্যেও হাস্যরস বিশেষভাবে আদৃত ও অলোচিত হয় নাই। সেখানে আদিরস ও করুণ রসের পারাবার উথলিয়া উঠিয়াছে, হাস্যরসের ক্ষীণ স্রোত সেখানে কাহারও দৃষ্টি ও সমাদর আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যরসের প্রধান পাত্র হইতেছে বিদূষক। এই বিদূষক সর্বত্রই একজন ঔদরিক স্থূলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ হইত। সে রাজার বয়স্য হইয়া রাজসভায় রাজা ও পারিষদবর্গের হাস্যকৌতুক উদ্রেক করিত। চেটিকা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত তাহার কলহও খুব উপভোগ্য হইত। তাহার অস্বাভাবিক ঔদরিকতা ও স্থূল রসিকতা সকলের মনেই কৌতুক ও প্রীতি উৎপাদন করিত। বিদূষকের আর একটি কাজ ছিল। সে রাজার প্রেমব্যাপারে সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিল। প্রেমাসক্ত রাজা বিদূষকের কাছেই নিজের প্রণয়জ্বালার কথা ব্যক্ত করিতেন। বিদূষক পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন রাজাদের **Fool** অথবা **Jester**-এর সহিত সম্পূর্ণ সমগোত্রীয় ছিল। ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে একই ধরণের চরিত্র কি ভাবে বিভিন্ন দেশে দেখা যাইতে পারে।[1]

বিদূষক ব্যতীত হাস্যরসাত্মক চরিত্র খুব কমই আছে। তবে জায়গায় জায়গায় পরিহাস, শ্লেষ ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যে হাস্যরসের আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের অতিরিক্ত কল্পনাশীলতা ও সৌন্দর্যানুরক্তির ফলেই সেখানে হাস্যরস ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। যেখানে বাস্তব

1. **Fool-এর চরিত্র অবগত হইলে এই সাদৃশ্য বুঝা যাইবে—The fool's business was to amuse his master, to excite him to laughter by sharp contrast, to prevent the overburden of state-affairs and in harmony with a well-known physiological precept, by his liveliness at meals to assist his lord's digestion.** **Encyclopaedia Britannica.**

বিষয় লইয়া সহজভাবে আলোচনা আছে সেখানেই কেবল হাস্যরসের কিঞ্চিৎ বিকাশ ঘটিয়াছে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে হাস্যরসের উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কথাসরিৎ সাগরের গল্পগুলির মধ্যেও অনেকস্থলে হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের দৈন্য সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। (নাথগীতিকায় হাস্যরসের অতি ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। হাস্য-রসের প্রাচুর্য আছে শিবায়নে। শিবায়নের শিব সংসারী গৃহস্থ, পার্বতীও সাধারণ দোষ ও গুণবিশিষ্টা গৃহস্থ বধূ, সেজন্য তাঁহাদের দৈনন্দিন কলহ ও অনুরাগের মধ্যে প্রচুর হাস্যকৌতুকের সমাবেশ রহিয়াছে। শিবায়নের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টা হইতেছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে হাস্যরস আছে বটে তবে বিভিন্ন কবির কাব্যে একই ধরণের হাস্যরস আমরা লক্ষ্য করি। মনসা-মঙ্গলের মধ্যে বিজয়গুপ্ত এবং বংশীবদনই রঙ্গরস জমাইয়াছেন সর্বাপেক্ষা বেশী। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম দুঃখকষ্টের বর্ণনার ন্যায় হাস্য-পরিহাসের বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার মুরারিশীল ও ভাঁড়ুদত্ত হাস্যরসাত্মক চরিত্ররূপে চিরকাল অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের কবি হইতেছেন ভারতচন্দ্র। তাঁহার কবিতায় আদিরস ও হাস্যরসের গঙ্গাযমুনার সঙ্গম ঘটিয়াছে। দেবতা ও মানুষ সকলের প্রতিই তিনি তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের বাক্য নিক্ষেপ করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদের মধ্যেও অনুবাদকেরা বাঙালী শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হাস্যরসাত্মক চিত্র আঁকিয়াছেন। হনুমান, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া যথেষ্ট কৌতুক উদ্রেক করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মহাভারতের শকুনি, কীচক প্রভৃতি চরিত্র হাস্যরসাত্মক। যাত্রাগান ভক্তিমূলক হইলেও জনসাধারণকে খুশি করিবার জন্য ইহার মধ্যে জনপ্রিয় স্থূল হাস্যোদ্দীপক ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করা হইত। বড়াই, বৃন্দা প্রভৃতি চরিত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবি ও তর্জাগানে হাস্যরসের অধিকতর প্রাচুর্য দেখা যাইত)

(উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিক্ষণে জন্ম লইয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁহার কবিতা ব্যঙ্গপ্রধান ছিল। সমসাময়িক সমাজের

আচার-ব্যবহার, বিকৃতি ও অসঙ্গতি লইয়া তিনি কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের লেখক। তাঁহার প্রহসনে অজস্র হাস্যরসের অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। গম্ভীর-চিত্ত মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার প্রহসনের মধ্যে সম্পূর্ণ লঘুচিত্ত হইয়া হাস্যকৌতুকের রঙ চতুর্দিকে ছিটাইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসহনের মধ্যেও যথেষ্ট পরিহাস-রসিকতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলি তৎকালীন নব্যসমাজের বাবু ও বিবিদিগের পৃষ্ঠে কড়া চাবুকের ঘা দিয়াছিল। ভবানীচরণের ধারা অনুসরণ করিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্শা'র মধ্যেও কতকগুলি অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে হাস্যরসের স্নিগ্ধ ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার রচনারীতি সর্বত্র বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতায় উজ্জ্বল, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের ন্যায় অবিমিশ্র হাস্যরসাত্মক চরিত্রও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের রচনা হইল 'কমলাকান্তের দপ্তর'। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ন্যায় বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় আর একখানা বইও নাই। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সাহিত্যের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যঙ্গরচয়িতা। তাঁহার 'ভারত উদ্ধার কাব্য' এবং 'কল্পতরু,' 'ক্ষুদিরাম' প্রভৃতি উপন্যাস অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'মডেল ভগিনী,' 'কালাচাঁদ,' 'চিনিবাস চরিতামৃত,' 'নেড়া হরিদাস' ও 'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি হাস্যরসমূলক উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলির মধ্যে রঙ্গের আদর ও ব্যঙ্গের আঘাত সমানে রহিয়াছে। হাসির গান লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও যথেষ্ট হাস্য পরিহাস আছে। বাংলা সাহিত্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে হাস্যরসের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়াছে। হাস্যরসের সর্বপ্রকার ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করিয়াছেন, তবে তাঁহার প্রথম বয়সের রচনায় হিউমার এবং শেষ বয়সের রচনায় উইট-এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার হাস্যরস প্রসন্ন আকাশের নির্মল সূর্য কিরণের ন্যায়—, প্রদীপ্ত, শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলি সরস কৌতুকে উজ্জ্বল ও তৃপ্তিজনক। বাংলা সাহিত্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে। তাঁহার হাস্যরস

তীক্ষ্ণধার তরবারির শাণিত দীপ্তি বিকিরণ করিয়া আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দেয়। কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত পটু। তাঁহার 'কঙ্কাবতী', 'ফোকলা দিগম্বর' উপন্যাস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস যথার্থ হিউমার-এর পর্যায়ে পড়ে। তাহা দরদে সহানুভূতিতে টলমল করিতেছে। বেদনার সহিত হাস্যের মণিকাঞ্চন যোগ দেখা যায় তাঁহার সাহিত্যে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ঘরোয়া বৈঠকী হাস্যরসের পরিচয় পরিস্ফুট। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসের লেখক হইতেছেন পরশুরাম। 'কজ্জলী,' 'গড্ডলিকা' ও 'হনুমানের স্বপ্নে'র গল্পগুলি কোনদিন পুরাতন হইবে না। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিও হাস্যকৌতুকে অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ব্যঙ্গ কাব্য ও কঠোর সমালোচনা লিখিয়া কাহারও প্রীতি এবং কাহারও বা ভীতি উৎপাদন করিয়াছেন। বার্নার্ড শ-এর বাঙালী শিষ্য প্রমথনাথ বিশী তাঁহার নাটকের মধ্যে মৌচাকে ঢিল দিয়া অনেককে হুল ফুটাইয়াছেন।

বাংলা হাস্যরসের প্রকৃতি ও প্রাচীন ও আধুনিক হাস্যরসের লেখকদের উল্লেখ মোটামুটি উপরে করা হইল। পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস ও হাস্যরসিকদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিব।

চর্যাগীতিকা

বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাগীতিগুলির মধ্যে সিদ্ধাচার্যগণের গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সন্ধ্যা ভাষায় রচিত এই গীতিগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব লইয়া প্রসিদ্ধ ভাষা-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-গবেষক পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। হাস্যরসের আলোচনায় সেই তত্ত্বব্যাখ্যা নিরর্থক। কিন্তু চর্যাগীতিগুলির আভ্যন্তরীণ রহস্যময় ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও একটা বাহ্য, সহজবোধ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ আছে বোধ হয়, সব লৌকিক ধর্ম-সাহিত্যেরই এ-রকম একটি সর্বজনবোধ্য, সরস রূপ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৈষ্ণব পদ, শাক্তপদ, বাউল গান প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়চেতনা জন্মের পর হইতেই সহজাত, কিন্তু তাহার অতীন্দ্রিয় চেতনা কঠিন সাধনার দ্বারাই তাহাকে অর্জন করিতে হয়। ধর্মব্যাখ্যাতা ও ধর্মসাহিত্য-রচয়িতা সেজন্য সাধারণ মানুষের মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মায়া দ্বারা ভুলাইয়া সুকৌশলে অতীন্দ্রিয় জগতের পথে চালিত করেন। তাঁহাদের ধর্মব্যাখ্যার মধ্যে তাঁহারা সুর আরোপ করেন, এবং সেই সুর নীরস ধর্মতত্ত্বকেও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। আবার সেই ধর্মব্যাখ্যার মধ্যে লৌকিক জগতে ব্যবহৃত নানা চিত্র, ঘটনা ও রসের অবতারণা করেন। অনেক সময়ে তত্ত্বটি ভিতরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহারা লৌকিক রসাত্মক বিভিন্ন রূপক বর্ণনা করেন।[১] তাঁহাদের উদ্দেশ্য রূপকের মধ্য দিয়া রূপাতীতের ব্যঞ্জনা দেওয়া। কিন্তু রূপাতীতের তো কোন বর্ণ নাই, সুর নাই ; তাহা তো সাধারণ লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অথচ রূপকের বর্ণ আছে, সুর আছে, জীবনের উত্তাপ আছে, বাস্তব মাটির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ আছে। তাহা সাধারণ মানুষকে কাঁদায়, হাসায় ও বক্তব্যবস্তুর প্রতি গভীরভাবে আগ্রহান্বিত করিয়া তোলে।

(চর্যাগীতিকাগুলির মধ্যেও গূঢ়, ছায়াচ্ছন্ন তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও ইহাদের বাহ্যরূপের মধ্যে তৎকালীন বিচিত্র রসাত্মক যে জীবনযাত্রার বর্ণনা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাই সাধারণ ভক্তের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত।)

১। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, 'ধর্মমতের ভিতরে আছে চিন্তা ও অনুভূতি—দুই-ই অমূর্ত, এই অমূর্তকে মূর্ত করিয়া তুলিতে না পারিলে সাহিত্য হয় না।

(সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে এখনকার মত চর্যার যুগেও ছিল স্নেহপ্রীতি, হাসিকান্নার সহিত নানা বিকৃতি ও অসঙ্গতির উপকরণ। চর্যাকারগণ জীবনের মধুর ও করুণ দিকগুলির পাশে স্থূল ও উদ্ভট দিকও উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সমাজে শবর, ডোম, ব্যাধ, চণ্ডাল, কৈবর্ত, তন্তুবায়, সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মধারা ও পারিবারিক জীবনযাপনের মধ্যে যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের আবর্ত উত্থিত হইত, যে শ্লেষ ও নিন্দার বাক্য তির্যক ভঙ্গিতে পরস্পরের প্রতি বর্ষিত হইত তাহাদের মধ্যে হাস্যকৌতুকের অনেক উৎসই নিহিত ছিল। চর্যাকারগণ যে শুধু গুহ্য ধর্মসাধনা লইয়াই মগ্ন ছিলেন তাহা নহে। তত্ত্ব ও দর্শনের মেঘাবরণ হইতে হাস্যকৌতুকের বিদ্যুৎ বাণ নিক্ষেপ করিতেও তাঁহারা পটু ছিলেন।)

(কতকগুলি চর্যায় প্রাণিজগতের উদ্ভট ক্রিয়া ও ঘটনার রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে। তত্ত্বব্যাখ্যা করিলে হয়তো সে-সব স্থলে সম্পূর্ণ সঙ্গত অর্থই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু বাহ্যত দেখিতে গেলে ঐ সব ক্রিয়া ও ঘটনার এমন একটি উৎকট বিসদৃশতা ও একান্ত-বিরূপ অসম্ভাব্যতা দেখা যায় যে হঠাৎ আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও চিরাভ্যস্ত সংসারকে রূঢ় আঘাতে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে এবং প্রবল কৌতুকরসে আমাদের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে।)

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥

অর্থাৎ, কচ্ছপী দোহন করিয়া পাত্রে ধরিতেছে না। গাছের তেঁতুল কুম্ভীর খাইতেছে।)

দুইটি নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। কচ্ছপীর দুগ্ধ যেমন একটা অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য পদার্থ, কুমীরের তেঁতুল খাওয়াটাও তেমনি এক বিসদৃশ উদ্ভট ঘটনা। শুনিবামাত্রই আমাদের বিস্ময়-উত্তেজিত চিত্ত উতরোল কৌতুকহাস্যের মধ্য দিয়াই যেন সমতা লাভ করে।

যাহা করিতেই চাই রূপক, চাই অন্যান্য অলংকার। জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিকের রূপ ব্যতীত রূপক তাহার রূপ পাইবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালী জীবন এবং তাহার পারিপার্শ্বিক বাঙলা দেশকে পদে পদে এই দোহাগানগুলির ভিতরে আসিতে হইয়াছে। দর্শনের জটিলতম তত্ত্ব সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করিতে হইয়াছে স্থূলজীবনের চিত্রে ও ভাষায়।'

বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১০৬।

আর একটি চর্যার কথা উল্লেখ করা যাক্—

বলদ বিআএল গাবিয়া বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥

অর্থাৎ, বলদ প্রসব করিল, গাই রহিল বন্ধ্যা। এ-তিন সন্ধ্যায় দোহন পাত্রে দোয়া হয়।

বলদের প্রসব করা ও গাইয়ের বন্ধ্যা থাকার মধ্যে এমন একটি স্বভাব-বৈপরীত্য আছে যে তাহা আমাদের কৌতুকরস প্রবলভাবে উদ্রেক করে। 'নিতে নিতে ষিআলা ষিঁহেঁ ষম জুঝঅ'—অর্থাৎ, নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সঙ্গে লড়াই করে। সিংহের সঙ্গে শিয়ালের লড়াইও নিঃসন্দেহে একটি হাস্যোদ্দীপক ঘটনা।

কতকগুলি চর্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দোষ ও দুর্বলতা লইয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপের শাণিত শর নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণরা ডোম বা ডোমনীদের ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিত। সেই ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্লেষাত্মক উক্তি একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে পাওয়া যায়—'ছুই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ।' এখানে নেড়া ব্রাহ্মণ বলিয়া শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যে ঘৃণাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ডোমজাতীয় লোকেদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে ডোমনীর দ্বারা স্পর্শ করাইয়া তাহার জাত্যভিমান ভাঙিয়া ফেলিবার ইঙ্গিতই ব্যক্ত করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ-বাসীদিগের প্রতি যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের অনেক স্থানেই দেখা যায় তাহার প্রথম নিদর্শন চর্যাগীতির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। ৩৯ ও ৪৯ নম্বর চর্যায় বঙ্গ ও বাঙালদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ৩৯নং চর্যায় আছে—'বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা'—অর্থাৎ, বঙ্গে জায়া নিয়াছ, পরে তোমার বুদ্ধি (বিণাণা<বিজ্ঞান) ভাঙ্গিয়াছে। এখানে পূর্ববঙ্গীয় নারী বিবাহ করিবার মধ্যে যে বুদ্ধিভ্রংশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে পূর্ববঙ্গীয় সমাজের প্রতি গভীর অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইয়াছে। ৪৯নং চর্যায় বলা হইয়াছে 'অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ'[১]—অর্থাৎ, 'বঙ্গ বড় দয়াহীন—তাই নৌকায় যাহা কিছু ছিল ডাকাতে লুটপাট করিয়া লইল।[২] এখানেও পূর্ববঙ্গের অনিয়ম ও

১। ডক্টর সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি-পদাবলীতে আছে— অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
২। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা।

অরাজকতার কথা উল্লেখের মধ্যে বিদ্রূপাত্মক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। গৃহবধূর কথাও চর্যা হইতে বাদ যায় নাই। ২নং পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ পদে রহিয়াছে—

সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥

এখানে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয়ে ভীত ও অলঙ্কার অপহরণে সন্তপ্তা বধূকে লইয়া একটু সমবেদনা-মিশ্রিত পরিহাসই করা হইয়াছে। শ্বশুর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বধূটি জাগিয়া আছে। কর্ণভূষণ চোরে নিল, এখন কোথায় গিয়া আর মাগিবে। শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে কিন্তু বধূর চারিত্রিক অসংযমের কথা উল্লেখ করিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্রূপই বর্ষণ করা হইয়াছে। 'দিবসে বহুড়ী কাকের ডরে চীৎকার করিয়া উঠে। রাত্রি হইলে কোথায় চলিয়া যায়?'[১] এখানে বধূর দিনের বেলাকার আচরণে সঙ্গে রাত্রিবেলাকার আচরণের গুরুতর অসঙ্গতি দেখাইয়াই কঠোর ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। দিনের বেলায় যে কাকের ভয়েই ভীত হইয়া পড়িবার ভান করে, রাত্রিতে সেই আবার সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপদের ভয় উপেক্ষা করিয়া নিজের কামনা পূর্ণ করিতে[২] গৃহের বাহিরে চলিয়া যায়। বধূর কপটতা ও গোপন ইন্দ্রিয়াসক্তিই এখানে বিদ্রূপবিদ্ধ হইয়াছে।

কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন খোঁচা বাদ দিয়া গালাগালির প্রত্যক্ষ আঘাতই করা হইয়াছে। গালাগালির যে বিচিত্র ভাষা ও চমকপ্রদ বিশেষণ পরবর্তীকালে সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রাথমিক নিদর্শন চর্যাপদেই পাওয়া যায়। 'কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী' ও 'ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী'—এই দুইটি বাক্যের মধ্যে ভাভরিআলী ও চ্ছিণালী কথা দুইটির মধ্য দিয়া ডোমনীর আচরণের প্রতি আপাত-ভর্ৎসনার ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

কয়েকটি চর্যায় বাংলার বিশিষ্ট বাগ্‌রীতি ও প্রবাদ-বাক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব বাগ্‌রীতি ও প্রবাদ-বাক্য প্রয়োগের ফলে বর্ণনীয় বিষয়

১। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যা।
২। 'রাত্রিতে চলিয়ে যায় কামে হতে প্রীত।' মণীন্দ্রমোহন বসুর ভাবানুবাদ।

আকস্মিক দীপ্তত্ব লাভ করে এবং তাহার ফলে আমাদের চিত্ত হঠাৎ অনুভূত কোন সত্যের সংঘাতে আলোড়িত হইয়া উঠে। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং বোড়ো খাই'—অর্থাৎ রজ্জুসর্প দেখিয়া যে চমকায় তাহাকে যথার্থ কি সাপে খায়? 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'—আপনার মাংসেই হরিণ আপনার বৈরী 'বরসুণ গোহালী কিমো দুট্ঠ বলন্দে'—বরং শূন্য গোয়াল (ভাল), দুষ্ট বলদে কি হইবে? 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়'—দোয়া দুধ কি আর বাঁটে ফেরে? 'জো সো চৌর সোই দুষাধী'—যে সেই চোর সেই কোটাল। এই বাক্যগুলি এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নিত্য-নৈমিত্তিক কথোপকথনে অবিরাম ব্যবহৃত হইতেছে। গুহ্য ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই সব লোকপ্রচলিত সরস ও হাল্কা বাক্যগুলির ব্যবহারের ফলে বক্তব্য বিষয় ও বক্তব্যরীতির মধ্যে আমরা যে ব্যবধান লক্ষ্য করি তাহাতেই আমাদের কৌতুকপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

(কোন কোন চর্যায় আবার নানা লঘু ও উপভোগ্য রঙ্গ ও ক্রীড়ার রূপকের মধ্য দিয়া কোন রহস্যময় ধর্মতত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।) ১২নং চর্যায় যে নঅ-বল অথবা দাবা খেলার সঙ্গে রূপকটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে দাবা খেলার দান দেওয়া, বড়ে, গজ, মন্ত্রী, দুয়া ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি খেলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১০নং চর্যায় ডোমনীর নৃত্য, ১৭নং চর্যায় বুদ্ধনাটক অভিনয় উপলক্ষে নাচ, গান ও বাজনা এবং ১৯নং চর্যায় ডোম্বীবিবাহের যে সব বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে চর্যাকারদের কৌতুকপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(কোন কোন স্থানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ অথবা একই শব্দের পুনরুক্তি করিয়া যে ধ্বনিগত পৌনঃপুনিকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা শ্রুতিসুখকর একপ্রকার কৌতুকময় অনুভূতিই জাগ্রত করিয়াছে।) দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ধমণ-চমণ, 'তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না', 'জিম জিম করিণা', তিম তিম্ম তথতা,' 'ছোই ছোই জাহ সো' ইত্যাদি বাক্যাংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিবায়ন

বাংলা দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে শিবের গীত প্রচলিত ছিল। শাক্ত ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্বে শৈব ধর্মই বঙ্গদেশের মধ্যে প্রবল এবং প্রতিপত্তিশালী ছিল। তখন শৈব ধর্মের সাহিত্যও যে দেশের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন কোন শৈব গীতিকা বা কাব্য স্বতন্ত্রভাবে অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শৈবলীলা এবং মহিমার বিবরণ আমরা প্রাচীন কালের অন্যান্য কাব্যের মধ্যে পাই। 'গোরক্ষ বিজয়,' 'সূর্য পুরাণ,' 'চণ্ডী মঙ্গল,' 'মনসা মঙ্গল,' 'চৈতন্য ভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থে শিবের লীলা-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এইসব গ্রন্থে শিবকে আমরা এক অনার্য নীচ কর্মনিরত কৃষক দেবতারূপে দেখিতে পাই। এই শিবই বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা। পরবর্তী শিবায়নগুলির মধ্যেও শিবের এই রূপই আমরা প্রধান রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু লৌকিক শিবের পাশেই ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক শিবের লীলা ও মহিমা বর্ণিত হইতে থাকে।[১] এই পৌরাণিক শিবই পরবর্তী কালে সকলের আরাধ্য হইয়া উঠেন এবং লৌকিক শিব আস্তে আস্তে লোকের ধারণা হইতে অপসৃত হইতে থাকে। বর্তমান কালে গাজন, গম্ভীরাগান প্রভৃতির মধ্যে ছাড়া লৌকিক শিবের অস্তিত্ব আমাদের সমাজে নাই। (পৌরাণিক যোগীশ্বর মহেশ্বরের ধারণা এখন আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে বলিয়া লৌকিক শিবের লীলা ও আচরণ এখন আমাদের মনে কেবল হাস্যরস উদ্রেক করে।)

প্রাচীন শৈব সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম মৃগলুব্ধ। এই মৃগলুব্ধের চারজন কবির সন্ধান মিলিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইতেছেন রতিদেব। এক মৃগ ও এক লুব্ধের (ব্যাধ) কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই শৈব গ্রন্থের নাম মৃগলুব্ধ হইয়াছে। মৃগ ও লুব্ধের প্রসঙ্গ বর্ণনচ্ছলে ইহাতে শিব-চতুর্দশীব্রতের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। মৃগলুব্ধে

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' বলিয়াছেন যে, এই দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্বে কোচ জাতির মধ্যে এক কৃষকের দেবতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিস্তৃত হইবার পর ইনি পৌরাণিক শিব আখ্যা প্রাপ্ত হন। (ঐ গ্রন্থের ৪৬—৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পৌরাণিক শিবের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কেবলই নীতি ও ধর্মোপদেশ, সুতরাং ইহার মধ্যে কোন হাস্যরস ফুটিয়া উঠে নাই।

শিবায়নের যে সমস্ত কবির নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, শঙ্কর, দ্বিজভগীরথ ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব কবির কাব্যের বিষয়ের মধ্যে মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও রামেশ্বর ভট্টাচার্য-কৃত শিবায়নই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলন ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। রামেশ্বরের কাব্য অবলম্বন করিয়াই আমরা শিবায়নের হাস্যরস বিচার করিব।

(শিবায়নের মধ্যে শিবের যে রূপ আমরা দেখি তাহা আমাদের হাস্যরস উদ্রেক করে। শিব দেবাদিদেব যোগীশ্বর, তাঁহার মহিমা অপার, মাহাত্ম্য অপরিসীম। সেই শিবকে যখন আমরা সাধারণ মানুষের ন্যায় নীচ-কর্মনিরত, ইন্দ্রিয়-বশীভূত দেখি তখন আমরা কৌতুক বোধ করি। কোন বিষয় অথবা চরিত্র সম্বন্ধে, যদি আমাদের এরূপ ধারণা থাকে, তবে তাঁহাকে অন্যরূপ অবস্থায় দেখিলে আমাদের হাসি পায়। গম্ভীর ও মহিমমণ্ডিত চরিত্রে লঘু ও হাল্কা ভাবের সমাবেশে তাহা হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়ে। বার্গসোঁ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Laughter-এ বলিয়াছেন, A comic effect is always obtainable by transposing the natural expression of an idea into another key, শিবায়নের শিব ও পার্বতী দেবত্ব হারাইয়া সাধারণ মানুষের সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ক্রিয়া, আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে বহু হাস্য-কৌতুকের উপাদান নিহিত রহিয়াছে।)

(গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ এক পরম কৌতুকজনক ব্যাপার। মহাদেব বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সাজপোষাক ঠিক বরের অনুরূপ নহে। কটিতে সামান্য যে ব্যাঘ্রচর্ম ছিল তাহাও অবিধবাদের সম্মুখে স্খলিত হইয়া পড়িল। নারদ আবার একটু রঙ্গ করিবার জন্য মামাকে মেয়েদের মধ্যে এক ঠেলা মারিলেন।) তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। শিবায়নের মধ্যে এই অবস্থার বর্ণনা কবি দিয়াছেন—

ছেড়ে ব্যাঘ্র ছাল যদি ছুটিল ভুজঙ্গ।
শাশুড়ী সম্মুখে শিব হইল উলঙ্গ ॥
নন্দী ছিল মশাল যোগায়ে দিল কাছে।
ভ্রুকুটি করিয়া ভূত চতুর্দিকে নাচে ॥

মহেশের কাছে থাকি মুনি মারে ঠেলা।
কান্দি ঘরে গেল রাণী আছাড়িয়া থালা॥
আই আই আয়োর উঠিল কলরোল।
জামাই মাইলো ঠেলা বলি গণ্ডগোল॥

শিবের রূপ ও সাজসজ্জা দেখিয়া তাঁহার শাশুড়ী মেনকা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আদরের দুলালীকে এ রকম একজন বুড়া বেদিয়ার হাতে তুলিয়া দিতে যাইতেছেন বলিয়া বিলাপ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বিলাপের মধ্যে কবির কৌতুক-উদ্দীপনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। (মেনকার বিলাপের যদি সত্যকার কারণ থাকিত তবে তাহাতে আমাদের হাস্য উদ্রিক্ত হইত না, কিন্তু মেনকা শিবের ন্যায় দুর্লভ জামাতা পাইয়াও তাঁহার বাহ্য রূপ দেখিয়া খেদ করিতেছেন ইহা আমাদের কাছে হাস্যোদ্দীপক। মেনকা খেদ করিতেছেন :—

আই মাগো একি লাজ হায় হায় হায়,
বর্বর বেস্তের বুড়া বেটী দিব তায়॥
আইবড় বাছা মোর বেঁচে থাকু ঘরে।
মোর বিভার দায় নাই আচাভুয়া বরে॥
বদনে রদন পড়ে মিঞ্জি মিঞ্জি আঁখি।
এমন বিপাক্য বর বয়সে নাঞি দেখি॥
সর্ব অঙ্গে কিলি কিলি করে কাল সাপ।
তাকে বেটী দিতে চায় নিদারুণ বাপ॥

মেনকা শিবকে দেখিয়া খেদ করিলেও উপস্থিত অন্য সব পুরাঙ্গনা শাশুড়ী কিন্তু শিবের রূপ ও আকৃতির বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং নিজেদের অক্ষম ও বিকলাঙ্গ জামাইদের কথা বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কবি শাশুড়ীদের মুখে তাঁহাদের অন্ধ, কুঁজা, কুরণ্ড, গোদা, বুড়া—এই সব জামাইদের বর্ণনা দিয়াছেন। (জামাইদের দৈহিক বিকৃতি অত্যন্ত বাস্তব ও হাস্যজনক হইয়াছে।) অন্ধ জামাতার শাশুড়ী এইভাবে খেদ করিতেছেন—

ছকি বলে আরে মোর হায় কপালে ছি।
অন্ধ বরে বিভা দিনু খুদি হেন ঝি॥
শুয়ে থাকে শয্যায় সুন্দরী করি কোলে।
হাবা তাকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে॥

ষোড়শী সুন্দরী নারী সে কি তাকে সাজে।
পাদ কুড়া পোক হেন যেন পদ্মফুল মাঝে ॥

এখানে হাস্যরস প্রথমত ঘটনাগত—অন্ধ স্বামী তাহার স্ত্রীকে পাইবার জন্য হাতড়াইতেছে এবং দ্বিতীয়ত বাগভঙ্গীর তীক্ষ্ণতায়—পাদকুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে—এই বাক্যের মধ্যে।

রামেশ্বর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন। লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি সরস হাস্যকৌতুকের ধারায় স্নিগ্ধ হইয়া কাব্য মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। শিবকে উপলক্ষ করিয়া তিনি এক ভাঙখোর, স্ত্রৈণ মানবচরিত্রই আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ভার্যার বিস্তর ভাগ্য ভাঙ্গী যার ভর্তা।
মুখসাট মারে মাগ মাগী তার বার্তা ॥
আঁট করে পাঁচ কথা কটু যদি কয়।
ভাঙ্গ খেলে ভেক্কা হলে ভালমন্দ সয় ॥

স্ত্রীর দ্বারা স্বামীর তিরস্কৃত হওয়ার মধ্যে যে অবস্থা-বিপর্যয় রহিয়াছে তাহাই এখানে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে। এখানে ভেক্কা কথাটি কবি এমন ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহা এক আকস্মিক কৌতুকবোধে আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

শিব যখন পার্বতীকে শাঁখা পরাইতে আসিয়াছেন তখন অলঙ্কারপ্রিয় চপলমতি নারীদের প্রতি কবি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন।

নগরের নিতম্বিনী নিলাজিনী বড়।
পর পুরুষের সনে পরিহাস দড় ॥
পার্বতীর মাসি পিসি মামী খুড়ী জেঠি।
বুড়াটিকে বেড়িয়া বাক্যের পরিপাটি ॥

শিব চাষ করিবেন, না বাণিজ্য করিবেন এই দ্বন্দ্বে যখন পড়িয়াছেন তখন কবি বণিকদের প্রতি শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন। শিব বাণিজ্য করিতে পারেন না, কারণ—

পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সে ত নাহি সকলি অমূল ॥

(শিবের সপুত্রক ভাত খাওয়ার বর্ণনা বিশেষ হাস্যাবহ হইয়াছে।) শিব

খাইতে বসিয়াছেন, সঙ্গে গণেশ ও কার্তিক। তাঁহারা বার মুখে (শিবের পাঁচ, কার্তিকের ছয় ও গণেশের এক মুখ) খাইতেছেন। পার্বতী যে অন্নব্যঞ্জন দিতেছেন তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। খাওয়ার বর্ণনা, বিশেষত ঔদরিকদের খাওয়ার বর্ণনা চিরকালই সাহিত্যক্ষেত্রে হাস্যজনক। আলোচ্য ক্ষেত্রেও কবির হাস্য উদ্রেকের চেষ্টা সুস্পষ্ট—

দঁড় বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধি দল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উল্বণ চর্বণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥

কলহের দেবতা নারদ কৈলাসে আসিতেছেন, তাঁহার বাহন ঢেঁকিটিকে তিনি অপরূপভাবে সজ্জিত করিয়াছেন, ঢেঁকির সজ্জা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন—

শুখান শোনের শুঁটি ঘাঘরের ঘটা।
শিরীষের শুঁটি সব শোভা পাইল পাটা॥
তিত পলা পুরুলের ছোট বড় ঘাটা।
মনোহর গজকা মাথায় মুড়া ঝাটা॥
ছোট বড় থোপ দিল থুপি ঝিঙ্গার জালি।
দুটি চক্ষু দান দিয়া চুন কালি॥

নারদ যেখান দিয়া যাইতেছেন সেখানেই ঝগড়া বাধিয়া উঠিতেছে। এই ঝগড়া ও কোন্দলের ঝড় বহাইয়া দিয়া তিনি মজা ভোগ করিতেছেন—

ঢক ঢক করি ঢেঁকি উঠাইল বাগ।
দোকাঠি বাজায়ে চলে বলে লাগ লাগ॥
পাড়াগাঁয়ে পড়ি গেল কুন্দলের গুঁড়া।
নগরের ভিতরে ভাঙ্গিয়া দিল পুড়া॥
ঝটপট ঝগড়া বহিয়া যায় ঝড়।
চলে যেতে চৌদিকে চালের উড়ে খড়॥

(কিন্তু সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য ঝগড়া হইতেছে মহাদেব-ভৃত্য ভীম ও বাগদিনীবেশী পার্বতীর ঝগড়া। আমাদের প্রাচীন কালের গ্রাম্য সমাজের ঝগড়া নিতান্ত প্রখর ও প্রবল হইত, শ্লীলতা ও শালীনতার গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া তাহা বহুদূর চলিয়া যাইত। শুধু কেবল পরস্পরের প্রতি নহে—পরস্পরের পিতৃপিতামহের প্রতিও গ'লাগালি বর্ষণের কোন বিরাম ছিল না। এই রকম ঝগড়ার একটি চিত্র কা় হাস্যরঞ্জিত- তুলিকায় অঙ্কন করিয়াছেন—)

বাগদিনী বলে আমার কি করিবে বুড়া।
ভীম বলে জানবি যখন ভেঙ্গে দিবে হাড়া॥
ভীমকে বলে ভরম লয়ে যারে বেটা বেসো।
শিবের হয়ে কন্দল করিস শিব নাকি তোর মোসো॥
ভীম বলে মুঞি বেসো বটি মামা বটে মোর।
তুই যে শিবের ধান ভাঙ্গিলি ভাতার তো নয় তোর॥
বাগদিনী বলে আমার ভাতার বটে যা।
শিব জানে আর আমি জানি তোর বাপের কি তা॥
ছার কপাল ছিরে বেসো ছার কপাল ছি।
ভীম বলে মর কি বলে রে ভাতারমুড়ির ঝি॥

বাগদিনী চড় উঁচাইয়া আসিলে বীরপুঙ্গব ভীম রড় দিয়া বাঁচিলেন, এবং ভগ্নদূতের ন্যায় শিবের কাছে যাইয়া সবিস্তারে বাগদিনীর অসাধারণ রূপ ও বীরত্বের কথা বর্ণনা করিলেন।

রামেশ্বরের কাব্য আদ্যন্ত অনুপ্রাসের অবিচ্ছিন্ন ঝঙ্কারে মুখর। তাঁহার অনুপ্রাস জায়গায় জায়গায় বিশেষ চিত্তচমৎকারী ও রসোদ্দীপক হইয়াছে কিন্তু আতিশয্য-দোষে তাহা বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে বোধ হয়। অনুপ্রাসের মধ্য দিয়া হাস্যরস উদ্রেকের প্রয়াস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। অনুপ্রাস প্রত্যক্ষভাবে হাস্যরসের কারণ নয়—ইহা বিষয়রস ও অসাধারণত্বের বোধ উদ্রেক করিয়া রচনাবলির চাতুর্যে এক হাস্যের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। ইহার সহিত উপহাস্য (ridiculous) অবস্থার সংযোগ হাস্যরসের তীক্ষ্ণতা সৃষ্ট হয়। রামেশ্বরের শিবায়নের মধ্যে সেই প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল। নিম্নে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

বাটি বাটি টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি করে।
গুলি গুলি দিতে দিতে ঝুলি এল পূরে॥

তখন গোবিন্দ গেয়ে গোয়ালার ঘরে।
গব্য নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে॥
অথবা—কাত্যায়নী কৌতুকে কান্তের কথা শুনি।
ঝম্পিয়া ঝটিতি ঝুলি ঝাড়ি দিল আনি॥

রামেশ্বরের শিবায়ন অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় পরবর্তী কালে কোন কোন কবি রামেশ্বরকে অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। হরিচরণ আচার্য নামক এই রকম একজন কবির কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে।[১] এই শিবায়নখানি রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে আকারে একটু ছোট। রামেশ্বরের বিষয়বস্তুর সহিত ইহার মোটামুটি মিল থাকিলেও জায়গায় জায়গায় কবি একটু তাঁহার মৌলিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্বশুরবাড়িতে শিব ঘর-জামাই হইয়া বাস করিতেছেন। কবি শিবের কথা বলিতে যাইয়া বাঙালী ঘরের ঘর-জামাইয়ের কথা বর্ণনা করিয়া একটু রসিকতা করিয়াছেন—

ঘর জামাতার হয় যে প্রকার
আদর শ্বশুর ঘরে।
ভুক্তভোগী যেই, জানিবেক সেই
বুঝিবে কি অন্যপরে॥
আদরে প্রথমে পরে সবে ক্রমে
অনাদরে নানা ছলে,
বিশেষ যে শালা তার বাক্য জ্বালা
অনল অধিক জ্বলে।

'ঘর-জামাইয়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ'—এই মেয়েলি প্রবাদটি যথার্থ বটে। দাসীদের সহিত নারদমুনির কথোপকথন খুবই কৌতুকজনক হইয়াছে। নারদ দাসীদিগকে কোন্দলের সার্থকতা সম্বন্ধে বুঝাইতেছেন—

চটিও না চন্দ্রমুখি কোন্দলে হইও সুখী।
হিন্দোলে শয়ন সুখ পাবে।
কোন্দল করিলে ঘোর ক্ষুধার বইবে জোর।
উদর পূরিয়া কত খাবে॥

১। হরিচরণ আচার্যের শিবায়ন বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপরে লেখা আছে—রামেশ্বর পদ শরণে হরিচরণ আচার্য বিরচিত।

জান না আমার ঢেঁকি ইহা কভু নহে মেকী
খাঁটী হয় মাটী নয় ধনি,
চড়ে দেখ একবার কি রগড় ঝগড়ার
বুঝিবারে পারিবে এখনি ॥

শিবায়ন এখন আর লিখিত হইতেছে না। কিন্তু লৌকিক শিবের লীলা এখনও কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে গাজন বা গম্ভীরা গানের মধ্যে।[১] আজও চৈত্রমাসে গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দল শিব, পার্বতী ও নানারূপ সং সাজিয়া গৃহস্থ বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া আমোদ বিতরণ করিয়া থাকে। শিব ও পার্বতীর যে লীলা তাহারা গানে, নৃত্যে, অভিনয়ে পরিস্ফুট করিয়া থাকে তাহার মধ্যে তাহাদেরই অমার্জিত ও অশ্লীল গ্রাম্যজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবায়নের কৃষক ও কোচজাতীয় শিব কি ভাবে গাজনের মধ্যে বজায় রহিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত গম্ভীরা গানটি হইতে বুঝা যাইবে—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া।
কুচনী পাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত।
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥

শিবনাথ কি মহেশ।

গম্ভীরা গানের পাঁচটি অঙ্গ, যথা—ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাসা, আহারা এবং চড়ক পূজা। ছোট তামাসা ও বড় তামাসার দিন নানা প্রকার কৌতুকপ্রদ অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে। বড় তামাসার দিন যে হনুমান মুখার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা বিশেষ আমোদজনক।[২] ঐ দিন রাত্রিতে

১। হরিদাস পালিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, গম্ভীরা গানই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাঁহার মত উল্লেখযোগ্য, 'গম্ভীরা কোথাও গাজন এবং কোথাও সাহীযাত্রাদি নামে পরিচিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ শিবের গাজন, ধর্মের গাজন বঙ্গ উৎকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত

২। সন্ধ্যার সময় একপ্রকার হনুমান মুখা (মুখা=মুখোস) অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমান-মুখাদ্বারা সজ্জিত হয় এবং কাঁচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করিয়া

যে সব নৃত্য অনুষ্ঠান হয় সেগুলিও বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক।[১] শিবের গাজনে অথবা গম্ভীরা গানে যে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, ভূত-প্রেতাদির অনুরূপ সং সাজা হয় তাহা নিরর্থক নহে। শিব ঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়। সুতরাং তদ্ভক্তদের তাহা স্বভাবসিদ্ধ।[২]

অগ্রভাগে শুষ্ক কদলীপত্রাদি বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং দুই ব্যক্তি একখণ্ড বস্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয়। হনুমান হুঙ্কার শব্দে সেই বস্ত্র উল্লম্ফনপূর্বক একবার এপার ও একবার ওপার হইয়া প্রস্থান করে। ইহা লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাভিনয় বলিয়াই বোধ হয়।
আদ্যের গম্ভীরা (পৃঃ ৩৯-৪০)—হরিদাস পালিত

১। নৃত্যগুলির বর্ণনা শুনিলেই তাহাদের কৌতুকোদ্দীপকতা সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে—রাত্রি নয় ঘটিকার সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্য আরম্ভ হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ীর নৃত্য, ঘোড়ানাচা, ঢালিনাচা, কার্তিকনাচা, পরীনাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। (ঐ, পৃঃ ৪০।)

২। ঐ, পৃঃ ১৫২।

মঙ্গলকাব্য

মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল মনসামঙ্গল অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতার ন্যায় মনসাও একজন লৌকিক দেবতা, বাংলা দেশের প্রতি গ্রামে ইঁহার পূজা প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে সর্পের আধিক্যবশত সেই সর্পদেবতা মনসার পূজা অধিক জনপ্রিয়। মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যেও অধিকাংশই পূর্ববঙ্গীয়। কেবলমাত্র কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ ব্যতীত[১] খুব প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলের রচয়িতা কেহ পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হন নাই। নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ ইঁহারাই মনসামঙ্গলের খ্যাতনামা কবি, ইঁহাদের কাব্যই পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গের বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইঁহারা ছাড়া বহু মনসামঙ্গলের কবির নাম পাওয়া যায়।[২] মনসামঙ্গলের মধ্যে কাহিনীর রূপ একই রকম, কেবল জায়গায় জায়গায় স্থান কাল ও পাত্র-পাত্রীর নামে একটু আধটু অদল বদল হইয়াছে।[৩] চরিত্রগুলি কোন কাব্যে সংস্কৃত নাম এবং কোন কাব্যে বা প্রাকৃত নাম পাইয়াছে।[৩] মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পদ্মার জন্ম, চণ্ডীর সহিত বিবাদ, জরৎকারুর সহিত বিবাহ, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত চাঁদ সদাগরের কাহিনীর সহিত একসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন মঙ্গলকাব্য, যেমন নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের মধ্যে পৌরাণিক অংশই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কাহিনীর অভিন্নতার জন্য হাস্যরসাত্মক ক্ষেত্র প্রায় সব কাব্যেই একরূপ। তবে কোন কোন কবির পরিহাসপটুতা ও বর্ণনা-ক্ষমতার জন্য কোন কোন কাব্যে হাস্যরস একটু বেশি ফুটিয়াছে এই মাত্র তফাত। (মনসামঙ্গল করুণ রসের প্রবাহিণী, ইহার মধ্যে হাস্যরসের স্থান খুবই সংকীর্ণ।) যেখানে যেখানে

১। অবশ্য চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নাদুড়্যা বটগ্রামের খ্যাতনামা বিপ্রদাসকেও পশ্চিম বঙ্গীয় বলা যাইতে পারে।

২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য ৭৮ জন কবির নাম করিয়াছেন।

৩। চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর প্রভৃতি কোন কোন কাব্যে সংস্কৃত প্রভাবে চন্দ্রধর, বিপুলা ও লক্ষ্মীন্দর হইয়াছেন।

হাস্যরস বিকাশ লাভ করিয়াছে আমরা সে সব স্থল বিভিন্ন কবির কাব্য হইতে আলোচনা করিয়া দেখাইব। (প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যের মধ্যে বাইশ কবি মনসার কাব্যই আমাদের কাছে সর্বাধিক হাস্যরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে।) কৌতূহলী পাঠক ঐ কাব্যখানা পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমরা শিবায়নের মধ্যে শিব-পার্বতীর কৌতুকজনক লীলা দেখিয়াছি। মনসামঙ্গলের মধ্যে শিব পার্বতীর কিছু বৃত্তান্ত আছে। এখানেও শিব ভাঙখোর, উদাসীন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। পুষ্পবাড়ী হইতে শিব যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন পথে খেয়া পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া দেখিতে পান যে এক রূপসী ডোমনী খেয়া নৌকার কাণ্ডারিণী হইয়া আছে। এই ডোমনী আর কেহই নহেন, স্বয়ং ছদ্মবেশী চণ্ডী। শিবের সঙ্গে কৌতুক করিবার জন্যই তিনি ডোমনী সাজিয়া নৌকার উপর বসিয়া আছেন। শিব পার করিয়া দিবার কথা বলিলে তিনি পারের কড়ি চাহিলেন—

কূলে আয় আয় বলি শিব ঘন ঘন ডাকে।
হাসিয়া বলে ডোমনারী, লাজ নাই তোর মুখে॥
যাবার কালে ভ্রূকুটি করি না দিছ খেয়ার কড়ি।
উফরী ফাঁকরী ডাক এখন কেন ছাড়ি॥

পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত।

ডোমনীর কটু কাব্যে মহাদেব রুষ্ট হইলেন না। কারণ ভাঙধুতুরা খাইয়া তিনি নেশায় মত্ত হইয়া ডোমনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশ্য ডোমনী যখন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মহাদেবকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

(চণ্ডী ও পদ্মার কলহের মধ্যেও কৌতুকরস যথেষ্ট আছে। চণ্ডীর ঈর্ষা সম্পূর্ণ অমূলক এবং নারী হইয়া তিনি পুরুষের ন্যায় মারামারি করিয়াছেন এই দুই কারণেই তাঁহাদের কলহ কৌতুকজনক হইয়া উঠিয়াছে)—

খল খল হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি।
চোপাড় চাপাড় মারে দেয় চুন কালি॥
বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারণের ঘায় পদ্মা করে থর থর।

পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত।

এ রকম ভীম প্রহার পুরুষের পক্ষেই শোভা পায়। অবশ্য এ হেন প্রহার-পটীয়সী অবশেষে পদ্মার এক কোপ-দৃষ্টিতেই একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন।

মহাদেব আর যাহাই করেন, পত্নীর প্রতি তাঁর প্রেমটা ছিল কিন্তু একেবারে খাঁটি। চণ্ডীর চৈতন্য হইলে তিনি মনের আনন্দে স্রেফ নাচিতে শুরু করিয়া দিলেন—

জগতমোহন শিবের দাস'
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিল গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক॥

এই ছন্দ ভারতচন্দ্রের ছন্দকে মনে করাইয়া দেয়। এখানে হাস্যরসের উৎস হইয়াছে উদ্ভট ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা-বৈপরীত্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অত্যাচার—কাতর হিন্দুগণ সাহিত্যের মধ্যে অত্যাচারী মুসলমানদের বিসদৃশ আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে হাস্যাস্পদ করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেন। গ্রামের কাজি ও মোল্লারা হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীর প্রতি কতখানি বিদ্বেষী ছিল তাহা আমরা প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের অনেক স্থলেই পাই। মনসামঙ্গলের অন্তর্গত হাসান হোসেনের[১] পালার মধ্যে এই রকম কাজি ও মোল্লার বর্ণনাই করা হইয়াছে। যাহারা বহু হিন্দু দেবদেবী ধ্বংস করিয়াছে তাহাদের দ্বারা মনসার পূজা করাইয়া মনসামঙ্গলের কবিগণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। (মোল্লা, কাজি এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজনের দুর্গতির মধ্যে কঠোর বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস স্ফূর্ত হইয়াছে।)

রাখালগণ যখন মাঠের মধ্যে পদ্মাকে পূজা করিতেছিলেন তখন তকাই মোল্লা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তকাই মোল্লার বর্ণনা বিজয়গুপ্ত এইভাবে করিয়াছেন—

তকাই নামে মোল্লা কেতাব ভালো জানে।
কাজির মেজমান হইলে আগে তারে আনে।
কাছা খুলিয়া মোল্লা ফরমায় অনেকে।
জপ সাঙ্গ করি মোল্লা মারয়ে মোরগে॥

পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত।

রাখালগণকে পূজা করিতে দেখিয়া মোল্লা রাগে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন।

১। হাসান হোসেন বাইশ কবি মনসার মধ্যে হাচান হোচেন হইয়াছে।

হিন্দুগণ তাহাদের পূজা করিবে এ অন্যায় তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারেন না—

বিছমিল্লা বলিয়া মল্লা হস্ত দিল কানে।
সৈদরাজপুরে কেন পূজে হিন্দুগণে॥
জানাইব গিয়া আমি যথা সৈদরাজ।
গোষ্ঠমাঝে হিন্দুর পূজার নাহি কাজ॥

বাইশ কবি মনসা[১]

মোল্লা কিছুতেই রাখালগণকে পূজা করিতে দিবেন না। ফলে রাখালগণের সহিত তাঁহার তুমুল লড়াই বাধিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত রাখালদের হাতে উত্তম মধ্যম প্রহার খাইয়া তিনি বেগতিক দেখিয়া তাহাদের পূজায় সায় দিলেন। কবি জগন্নাথ মোল্লা ও রাখালগণের মল্লযুদ্ধের সরস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

মল্লা বলে ভাঙ্গ ঘট উঠাও করণ্ডী পট
নাগগণে যাঁহা তাঁহা মার।
হারাম জাদাকে মার হালাল জাদাকে ছাড়
মারিয়া উঠাও হারাম ঘোর॥
মল্লা বেটা ডাক ছাড়ে গোপাল মিলিয়া ধরে
মল্লা সনে বাধে মহারণ।
গোপাল মল্লারে মারে বুকে হাঁটু দিয়া ধরে
মল্লা বলে যায়রে জীবন॥
মল্লা বলে আল্লা আল্লা আমার গোপাল পোলা
হয়াতে পাঠাও মোরে ঘর।
বিপ্র জগন্নাথে কয় মল্লা বলে সবিনয়
সুখে তোরা নাগপূজা কর॥

বাইশ কবি মনসা

অপমানিত, প্রহৃত, বিপর্যস্ত মোল্লা হাচান হোচেনের কাছে যাইয়া তাহার দুর্গতি বর্ণনা করিয়া বিস্তর কান্নাকাটা করিল। তাহার সকরুণ বিষাদের মধ্যে কৌতুকপ্রিয় কবির প্রচ্ছন্ন কৌতুক খেলা করিতেছে—

কাফের হিন্দুরা পূজে যাই আমি গোঠ মাঝে
দেখি করি হিন্দু পূজা মানা।

১। বাইশ কবি মনসা—শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সপ্তমবার প্রকাশিত।

গোয়াল গোয়ালী যত যুবা বৃদ্ধ শত শত
অপমান করিল লাঞ্ছনা ॥
জবা করিবারে মোরে বুকে হাঁটু দিয়া ধরে,
উফাড়িল আল্লার নুর দাড়ি।
ঘাড় ভাঙ্গে মোচড়িয়া নাক ভাঙ্গে লাথি দিয়া
লোহ্ পড়ে নিবারিতে নারি ॥
গোয়ালার হাত শানে রাখাল ধরিয়া টানে
গলে বান্ধে ছাগলের দাড়ী।
টানি আনে হিচড়িয়া উঠানেতে ফেলাইয়া
মার্গেতে দিবারে চাহে ছড়ি ॥
নাকে মুখে লোহ্ পড়ে ইসাদী করিব কারে
আরে মোরে রাখিল বান্ধিয়া।
পদদড়ি দাঁতে কাটী হাতে মুছি মুখ মাটী
রাতারাতি আসি পলাইয়া ॥

বাইশ কবি মনসা

মল্লার মুখে সব বিবরণ শুনিয়া কাজি এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ বিষম রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। বদমায়েস, বেতমিজ হিন্দুগণকে জব্দ করিতেই হইবে। কি করিয়া জব্দ করা যায় সে সম্বন্ধে সকলের মধ্যে গুরুতর পরামর্শ চলিল—

কালু মিঞা নাম টকিয়া জোলার পুত্র।
সে বলে মারি ফেলাও গোয়ালার গোত্র ॥
তাহান খালাত ভাই নাম হাজি মিঞা।
পা পোছার বেটা টুনিয়া জোলার ভায়্যা ॥
তাঞী বলে হিন্দু মারিয়া কার্য নাই।
আগুন লাগায়্যা ঘর পুড়ি কর ছাই ॥[১]

পদ্মাপুরাণ—দ্বিজ বংশীদাস

মনসার সহিত কাজির যুদ্ধ বাধিলে মনসার সর্পগণ কাজির পুরীতে আসিয়া

১। তাহান, খালাত ভাই, তাঞী ইত্যাদি মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিয়া কবি হাস্যরস সঞ্চার করিয়াছিলেন।

২। পদ্মাপুরাণ—বংশীদাস রায় বিরচিত, শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৩১৮ সন বৈশাখ।)

তাহার সৈন্য ও আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে এক বিপর্যয়-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। কাজি প্রথমেই তাঁহার বিবি সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই বিবির স্বামীভক্তির নমুনা দেখুন—

ধরে কাজি বিবি হাতে চাহে পলাইয়া যেতে
চৌদিকে বেড়িল বিষধরে।
কাজি বলে প্যাদা ভাই রাখ বিবি তোর ঠাঁই
নিয়ে যাও বনের ভিতরে॥
পেয়াদা ধরিয়া হাতে নিয়ে যায় বনপথে
বিবির মনেতে বড় রঙ্গ।
বিবি বলে ত্বরা চল কাজি হতে তুমি ভাল
যায় কাজি রণে দিয়া ভঙ্গ।
শুনিয়া বিবির কথা প্যাদা করে হেঁট মাথা
লুকাইয়া রাখে গুপ্ত স্থানে।

বাইশ কবি মনসা

সর্পগণ হারেমে ঢুকিয়া জেনানামহলে যে রসক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা অশ্লীল বলিয়া উদ্ধার করিতে পারিলাম না। কাজির লোকজনের মৃত্যুতে তাহাদের স্ত্রী পরিবারদিগের যে শোকের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শোক অপেক্ষা আমোদই বেশি ফুটিয়াছে। এক জোলার পত্নী মৃত স্বামীর জন্য কি গভীর শোক করিতেছে তাহা পড়িয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না—

তুমি হেন বিনোদিয়া গেলে আমাকে ছাড়িয়া
কিমতে স্বহস্তে দিব মাটী॥
মরি গেল জোলা শালা ভাতার ধরিব ভালা
মাটী দেও বলে করি ত্বরা।

(যমদূতের সহিত মনসার সর্পগণের যুদ্ধ হইলে যমদূত হারিয়া গেল, তখন সসৈন্যে যম যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যমের সৈন্য রোগগণ এক এক করিয়া আসিল, তাহাদের বর্ণনা অত্যন্ত কৌতুকজনক—)

প্রথমে চলিলা জ্বর যার তাপ ভয়ঙ্কর
মস্তক বেদনা তার সনে।
বাহনে সোয়ার হয়ে কামড়ি চলিল ধেয়ে
ভিন্নে ভিন্নে প্রাণ ধরি টানে॥

নানা দাউদের গতি পেঁচড়া যে নানা জাতি
ধলিকুষ্ঠ গায়ের পেঁচড়া।
নয়নে সোয়ার হয়ে কেতুর চলিল ধেয়ে
পিলাই চলিল আ.র জাড়া॥

বাইশ কবি মনসা

চাঁদ সদাগর সদাগরি করিতে দক্ষিণ পাটনে গেলেন। সেখানকার রাজা চন্দ্রকেতু যেমন ভীরু তেমনি নির্বোধ। চাঁদ সদাগরের আগমনে ভীত হইয়া তিনি পলাইয়া যাইয়া নিজের সাধের প্রাণটা বাঁচাইতে চাহিলেন। তিনি আটঘাট বাঁধিয়া অতি সুচারুরূপে পলায়নের ব্যবস্থা করিতেছেন—

তার সনে যুদ্ধ করি মম কার্য নাই।
সংগ্রাম করিলে পাছে জীবন হারাই॥
পরাণ থাকিলে পাছে সকল পাইব।
প্রকার করিয়া পরে ধন লয়ে যাব॥
ঠাঁই ঠাঁই চৌকি দেও সাবধান হ'য়ে।
যাবত পলাই আমি সব সম্বরিয়ে॥

বাইশ কবি মনসা

রাজার স্ত্রীগণ কিন্তু তাঁহাকে ভালো বুদ্ধি দিলেন—

মহাদেবীগণ বলে চিন্ত কি নিমিত্তে।
কোন চিন্তা নাহি রাজা আমরা থাকিতে।
আছয়ে উপায় রাজা শুন মন দিয়া।
দাসীগণ মধ্যে তুমি থাক লুকাইয়া॥
স্ত্রীবেশ ধরহ রাজা খোঁপা বান্ধ শিরে।
হাতে কাঁচ ধরিয়া থাকহ পাছ দ্বারে॥
পরদল আসি তোমা খুঁজিবে যখনে।
পাইলেও না মারিবে দাসী হেন জ্ঞানে॥
চণ্ডিকা মোদের যদি রাখেন কুশলে।
আমরা করিব যুদ্ধ তোমার বদলে॥

বাইশ কবি মনসা

রাণীদের কঠোর শ্লেষ গাঙারিক চর্ম ভেদ করিয়াছিল কিনা জানি না কিন্তু তিনি যে বীরাঙ্গনাদের নিরাপদ অঞ্চলতলে নিজেকে বিশেষ নিশ্চিন্ত ভাবিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ পাটনের রাজার সহিত মিত্রতা করিবার আশায় চাঁদ সদাগর তাঁহাকে নানা দ্রব্যের সহিত নারিকেল ও গুয়াপান খাইতে দিলেন। রাজা তো ভাবিলেন ইহা নিশ্চয়ই কোন বিষফল। এই বিষফল কাহার দ্বারা আস্বাদ করানো যায়? সকলেই তো 'আপ পিজিয়ে' 'আপ পিজিয়ে' আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে দুর্ভাগ্যটা গিয়া পড়িল গিরিবর দ্বারীর উপরে—হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র দ্বারী। নারিকেল খাইতে হইবে বলিয়া গিরিবর তো কাঁদিয়াই অস্থির। যাহা হউক নিরুপায় গিরিবরকে অবশেষে নারিকেল খাইতে হইল। গিরিবরের নারিকেল খাইবার প্রণালী কিন্তু অত্যন্ত মৌলিক—

নারিকেল হাতে করি কান্দে গিরিবর দ্বারী
প্রাণশক্তি দিলেক কামড়।
ছোলাতে কামড় ফুটি দন্ত পড়ে গুটি গুটি
প্রাণ তার করে ধড়ফড়।

দ্বারীর পর কোতোয়ালের পালা। কোতোয়ালকে রাজা গুয়াপান খাইতে দিলেন। কোতোয়ালের মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। গুয়াপান খাইয়া তাহার দুর্গতিও কম হইল না—

প্রথমেতে মুখ ভরি লইলেক চুন।
তার শেষে গুয়া পান দিলেক দ্বিগুণ।
গুয়া পান খেতে তার চুন লাগে গালে।
মুখেতে হইল ঘাও রক্ত পড়ে নালে॥

বাইশ কবি মনসা

(দেশে ফিরিবার পথে চাঁদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙা মনসার দ্বারা নিমজ্জিত হইল। সেই আত্যন্তিক দুর্বিপাকের সময় রাঢ়ীয় কবি কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদের দুঃখ-দুর্দশা লইয়া একটু হাস্য-পরিহাস না করিয়া পারেন নাই।) কেতকাদাস-ক্ষমানন্দের উপর কবিকঙ্কণের প্রভাব এস্থলে অতি সুস্পষ্ট। বাঙ্গালগণ এই ভাবে বিলাপ করিতেছে—

মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙ্গাল॥

পোস্তের হোলা ভাস্যা গেল ছাকনার কানি।
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছিড়া কাথা খানি॥
ধূলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে।
সাত গাঁঠ্যা টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই ঐ তাপে মরি।
এমন নাহিক বস্ত্র উভু কর্য্যা পরি॥
বিদেশে হারানু প্রাণ চাঁদ বান্যার পাকে।
ডাকাচুরি নহে ভাই কব গিয়া কাকে॥

মনসা মঙ্গল—কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ।[১]

অন্যান্য বহু স্থলের ন্যায় আলোচ্য স্থলেও বিলাপের মধ্য দিয়া হাস্যরস উদ্রেক করাই কবির লক্ষ্য। এখানে লক্ষণীয় যে, বাঙ্গালদের কথা লইয়া শুধু নহে, তাহাদের স্বভাব লইয়াও উপরিউক্ত অংশে ঠাট্টা করা হইয়াছে। ঘোর বিপদের মধ্যে সামান্য জিনিসের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে।

নৌকা নিমজ্জনের পর চাঁদ সদাগর মনসার চক্রান্তে নানা রকম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। এই সব লাঞ্ছনার মধ্যে হাস্যোদ্দীপনের চেষ্টা আছে কিন্তু চাঁদ সদাগরের প্রতি আমাদের মন এতই সহানুভূতিসিক্ত হইয়া থাকে যে তাঁহার লাঞ্ছনা আমাদের কোন হাস্যকৌতুক উদ্রেক করে না। কেবল চাঁদ সদাগরের গৃহে প্রত্যাগমনের পর যে তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্যের হস্তে তাঁহার দুর্গতিতে আমরা একটু কৌতুক বোধ করি। কারণ সেই দুর্গতি ঘটিয়াছে মিলনের পরিবেশে। চাঁদ বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া পরনে ছিন্ন বস্ত্র এবং মলিন চেহারা লইয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। কিন্তু লজ্জায় দিনের বেলায় সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। নিকটস্থ কলাবনে লুকাইয়া রহিয়াছেন। তখন যাহা ঘটিল তাহা বিশেষ কৌতুকজনক—

সন্ধ্যাকালে ঝাউয়া চেড়ী গেল কলাবন।
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজন॥
ধ্যায়া গিয়া ঝাউয়া চেড়ী সনকারে কয়।
কলাবনে কিটা লড়ে মনে পাইলু ভয়॥

১। মনসা মঙ্গল—কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শুনিয়া ধাইল নাড়া সনকা বেন্যানী।
কলাবনে কোথা নড়ে কর্ণ পাত্যা শুনি॥
কলাবনে চাঁদ বান্যা খুস খুস নড়ে।
লাফ দিয়ে নাড়া গিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে॥
চোর চোর বল্যা তারে মারে কিল লাথি।
চিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি॥
নাড়ার মারনে সাধু হৈল কাতর।
আর না মারিহ নাড়া আমি সদাগর॥

মনসা-মঙ্গল—কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ

(মনসা-মঙ্গলের আদ্যন্ত দুঃখময় সুরের মধ্যে লখিন্দর ও বেহুলার বিবাহ একমাত্র সুখের স্থল। কবিরা এই বিবাহ উপলক্ষে রঙ্গপরিহাসের বহু চিত্র আঁকিয়াছেন) বাঙালী ঘরের বিবাহ আনন্দ উৎসবের আকর। এই বিবাহের সময় ক্ষণকালের জন্য প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্লান্তিকর একঘেয়েমি সরিয়া যায় এবং হাস্য-পরিহাস, আমোদ-প্রমোদের বাধামুক্ত বন্যায় সকলে ভাসিতে থাকে। লখিন্দর ও বেহুলার বিবাহ খাঁটি বাঙালী ঘর হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই বিবাহেও লঘু-গুরু, উচিত-অনুচিতের বাঁধ ভাঙিয়া হাস্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। বাঙালী সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও বিবাহ-অনুষ্ঠানে অন্তঃপুরিকাদের কর্তৃত্ব সর্ববাদীসম্মত। লখিন্দর ও বেহুলার বিবাহেও মেয়েদের আগমন ও যোগদান সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বিবাহবাসরে কোন প্রকার নারীর আসিতেই আর বাকি নাই—সুন্দরী যুবতী তো আসিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে কুরূপা ও বৃদ্ধারাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের লইয়া সকল কবি বেশ মজা উপভোগ করিয়াছেন। কবি নারায়ণদেবের কাব্য হইতে কুরূপাদের বর্ণনা কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কুরূপের প্রধান আইয় নাম তার ইছি।
দুই হাত পাও গোধ হইয়াছে বিচি॥
তাহার পাছে আইয় বেটী সিগ্র আইল ধাইয়া।
মাথাহনে পায়ের তলা দাউদে নিছে খাইয়া॥
হাটীতে না পারে বেটী দারুণ চুলের ভরে।
টানিঞা বান্ধীল খোপা ঘাড়ের উপরে॥

লুট্‌নির ভরে তার ঘাড় ভাঙ্গি পড়ে।
খান চারি ঝাটা লইল দাউদ খাউজাইবারে ॥
তার পাছে আইয় চলে নাম তার ভালা।
গলায়ে গলগণ্ড তার দুই চক্ষু ঢেলা ॥

পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব

বিবাহবাসরে বহু বৃদ্ধা আসিয়া জুটিল। তাহাদিগকে কেহ বাসরে ঢুকিতে দেয় না। কিন্তু তাহারা সহজে রণে ভঙ্গ দিবে না, বিপুল শক্তিতে বাসরঘরের দরজা ভাঙিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহারা লখিন্দরের কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপ দেখিয়া কামে হতচেতন হইয়া পড়িল। লখিন্দর নবীন যুবক বটে, কিন্তু তাহারা কি তাহার উপযুক্ত নয়? তাহাদের বয়স একটু বাড়িয়াছে বটে, মাথার চুল একটু পাকিয়াছে, দাঁতগুলিও হয়তো পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা রতিরঙ্গে লখিন্দরকে হারাইয়া ঢিট করিয়া দিতে পারে। বুড়ী এই অপবাদ তাহারা কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়—

জে বলে মোরে বুড়ি ধরি মার লাথি গুড়ি
লাথিয়ে করো তারে পাত।
রবির তেজেতে মাথার কেশ পাকিছে
পানাপোকা খাইয়াছে দাত ॥
আর বুড়ি কয় কথা ধরিয়া চালের বাতা
সেহ বুড়ির আছে কিছু দোষ।
আদি কালের বুড়ি প্রিষ্ঠে মেজ ছয় কড়ি
দুই চক্ষু জেন পেয়াজের কোস ॥
আর বুড়ির পাকা কেস দন্ত পড়া তনু সেস
লড়ি হাতে মিলিল আসিয়া।
দেখিয়া লখাইর মুখ বুড়ির মনে বড় দুঃখ
কান্দে বুড়ি ভূমিতে বসিয়া ॥
চুল পাকা জে কারণ স্থন তার বিবরণ
ঔষধ করিল সতিনে।

পদ্মাপুরাণ— ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

অনেক খাইলাম কাফুর তেকারণে দন্ত চুর
বুড়ি হেন না ভাবিয় মনে ॥

পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব।

বৃদ্ধা সকল নিজেদের রূপ-যৌবনের সাফাই গাহিয়া লখিন্দরকে প্রেম নিবেদন করিতেছে। তাহাদের রঙ্গ-রসিকতা একটু রুচি-গর্হিত হইলেও অত্যন্ত উপভোগ্য—

এক বুড়ী বলে ওহে নাতিন জামাই।
স্ত্রী-কলা যতেক তুমি শিখ মোর ঠাঁই ॥
গিয়াছে আশি বৎসর এহি রঙ্গ করি।
আর আশি বৎসর তা শিখাইতে পারি ॥
আর বুড়ী বলে তব প্রথম যৌবন।
কভু দেখিছ বল কদলীর বন ॥
আর বুড়ী বলে প্রীতি কর মোর সনে।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র আনি দেখামু স্বপনে ॥
আর বুড়ী বলে তুমি রাজার কুমার।
পার কিনা পার হে ঘোড়ায় চড়িবার ॥

পদ্মাপুরাণ—দ্বিজবংশীদাস।

বিস্ময়ের বিষয়, লখিন্দর এরূপ যৌবনবতী, রসবতী কামিনীদের প্রেমের কোনই মর্যাদা দিল না। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তাহারা বিলাপ আরম্ভ করিল—

এক বুড়ী কহে কথা সদাই কম্পিত মাথা
লড়ি হাতে মিশিল আসিয়া।
দর্পণ হস্তেতে করি বলে নিজ মুখে হেরি
গেল রস না এল ফিরিয়া ॥
যখন যুবতী ছিনু নাগরালি না করিনু
হেন রূপ কোথা গেল মোর।
নারীর যৌবন ধন জোয়ারের জল হেন
ভাটা বহি চলয়ে সত্বর ॥

বাইশ কবি মনসা

বাঙালী সমাজে শ্যালক-বধূ ঠাট্টা পরিহাসের রসময়ী পাত্রী। মনসামঙ্গলেও কবিগণ লখিন্দর ও তাহার শ্যালক-বধূ তারকাসুন্দরীর হাসিঠাট্টার চিত্র

অঙ্কন করিয়াছেন। জামাতার সহিত নকল খাদ্য লইয়া শ্যালিকা ও শ্যালক-বধূর রসিকতা পূর্বে সুপ্রচলিত ছিল। তারকাসুন্দরীও লখিন্দরকে খাওয়াইবার সময় তাহাকে একটু বেয়াকুব বানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই—

আতপ তণ্ডুল ভাত আধা'পোড়া করি।
লক্ষীন্দর থালে দিল তারকা সুন্দরী॥
আদা বলি আনি দিল হরিদ্রার মুড়া।
চিনি বলি আনি দিল লবণের গুঁড়া।
মরিচ ব্যঞ্জন আনি দিল তার শেষে।
হস্ত দিয়া লক্ষীন্দর রাখে এক পাশে॥

বাইশ কবি মনসা

কিন্তু লখিন্দর অরসিক জামাতা নহে। তারকাসুন্দরীর রসিকতা সে সুদে আসলে ফিরাইয়া দিল। সে বলিতেছে—

রান্ধিয়াছ যে ব্যঞ্জন কতক না দিছ লোন
পুড়ি কত করিয়াছ ছালী
ঝোলের ব্যঞ্জন খানি দিয়াছ অধিক পানী
সাঁতারিতে পারয়ে বিড়ালী॥
যে হয় তোমার পতি তার জন্য রাখ কতি
খেয়ে তুষ্ট হইবে অন্তরে।
খাইয়া ব্যঞ্জন খানি সর্ব সুখ পাবে তিনি
প্রাণাধিক দেখিবে তোমারে॥

বাইশ কবি মনসা

বাসরঘরে জামাতার সহিত রঙ্গময়ী রমণীদের রসালাপ বোধ হয় বিবাহের সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক অঙ্গ। লখিন্দরের সহিত সমবেত নারীদের রঙ্গমত্ততা কোন কোন কবি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুরসিক সুরূপ বর দেখিয়া তারকাসুন্দরী ও অন্যান্য রমণী উদ্দাম রঙ্গরসে মাতিয়া উঠিয়াছে—

মদনে উন্মত্ত হয়ে তারকাসুন্দরী।
চন্দনের ছিটা দিল লক্ষীন্দরোপরি॥
একেত রসিক বর আর রস পায়।
ঝারী ধরি পানী ঢালে তারকার গায়॥

স্নগন্ধি চন্দনপুষ্প এক বাটা ভরি।
লক্ষ্মীন্দরে মেলি মারে তারকাস্নন্দরী ॥
শয্যায় যতেক পুষ্প একত্র করিয়া।
তারকাকে লক্ষ্মীন্দর মারিল মেলিয়া ॥
তারকাস্নন্দরী বাটা ভরিয়া চন্দন।
লক্ষ্মীন্দর মুখ চাহি মারে ঘন ঘন ॥

বাইশ কবি মনসা

ইহার পর রসক্রীড়ার যে বর্ণনা আছে তাহা অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া উদ্ধৃত হইল না।

বিবাহবাসরে সর্পদংশনের পর মনসামঙ্গল-কাব্যে করুণ রসের স্রোত বহিয়াছে। পতিব্রতা সাধ্বী স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় লইয়া যে অকূল যাত্রা করিয়াছে তাহার বর্ণনা যেমন বিষাদময় তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে বহু বাধাবিঘ্ন আসিয়াছে। সে-সব জয় করিয়া বেহুলা নিজের পরম সহিষ্ণুতা ও অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে। কবিগণ কারুণ্যসিক্ত লেখনী-দ্বারা এই যাত্রাপথের বিবরণ দিয়াছেন। তবে গোধাদের বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহারা একটু কৌতুকের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যে সব গোধা আসিয়া বেহুলাকে প্রণয় নিবেদন করিল তাহাদের রূপ ও স্বভাবের আর তুলনা নাই। একজন গোধা আসিয়া বেহুলাকে বলিল যে বেহুলার সঙ্গে তাহাকে মানাইবে ভাল—তাহার রূপও খারাপ নয় এবং বয়সও মোটে সত্তর বৎসর—

উঠানিঞা গোধা আইল বিপুলার কাছে।
স্নন্দরি দেখিয়া বেটা উভা পায়ে নাচে ॥
আমাকে দেখিয়া কন্যা না কর উপহাস্য।
তোমার আমার উচিত হয়ে করিতে গ্রিহবাস ॥
বয়েসে তোমার আমার নাহিক অন্তর।
এই সবে পাইছি আমি সর্ত্তরি বৎসর ॥

পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব।

দ্বিজ বংশীদাসের হাতে এক গোধার বর্ণনা কি অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল—

আচালীয়া গোদা বেটা নৌকার যে মাঝি।
হাঁটিয়া চলিতে নারে করে কাজি মাজি ॥

উভে পাঁচ হাত বেটা ডাঙ্গর শরীর।
বাসি দাদে চর্ম্ম দাদে সর্ব্বাঙ্গ চৌচির ॥
কাছি দিয়া কমরেত পিন্ধন কর্পটী।
রাত্রি দিবা গায়ে থাকে তেপুরাণী ভুটি ॥
মুখ ভরি গালে দাড়ি ভালে দীর্ঘ ফোটা।
দুই দিগের দুই মোছ যেন মুড়া ঝাটা ॥

পদ্মারপুাণ—বংশীদাস।

বেহুলার সুদীর্ঘ দুঃখভোগ শেষ হইল, সে অসাধ্য সাধন করিল—অবিচল পাতিব্রত্যের পুরস্কার স্বরূপ সে দেবতাদের কৃপায় স্বামীর জীবন লাভ করিল। দেবতাদের সভায় নৃত্য-পটীয়সী বেহুলা নৃত্যে একান্ত তন্ময়—নারদ ঝগড়া বাধাইবার এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পার্বতীর কাছে যাইয়া বলিলেন—

এক নটি য়ানিয়াছে দেব মহেশ্বর।
সুখে বসি নিত্য দেখে বাহীর দখল ॥
নটির সনে পৃত হইল ভাঙ্গড় সিবাই।
তাহার কড়াটেকের রূপ তোমার ঠাঞী নাই ॥

পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব।

শিবানী চণ্ডী হইয়া আসিয়া মহাদেবকে খর রসনা দ্বারা যথেষ্ট তাড়না করিলেন—

চণ্ডী বোলে সুন শিব জটিয়া ভাঙ্গর।
কার নারি য়ানিয়াছ বাড়ীর ভিতর ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও য়ার সতাবড়ি।
যথা তথা পাইয়া আন পরার নারি ॥
নিত্য উপবাসী কাল জায় বেড়াও ঘরে ঘরে।
দেব হইয়া হেন কর্ম্ম কোন দেবে করে ॥
বার বুড়ি ঠেকী পড়ে তের বুড়ি জমা।
নিত্য ২ কুটী দিব জটা ভাঙ্গের গুড়া ॥
প্রাতের্ককালে সিব ভাঙ্গের গুড়া খাইয়া।
কুচনি পাগল কর সিঙ্গাডম্বুরু বাজাইয়া ॥

পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব।

এই সব চোখা চোখা বাণের সম্মুখে অবশ্য শিবের কোন কথা যোগাইল না। পার্বতীর ক্রোধ অকারণ, সেজন্যই এই ক্রোধ হাস্যাবহ। বলা বাহুল্য এই ক্রোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। দেবতার লীলাই এই। দেবতার দ্বন্দ্ব—কলহ হইতে পারে, মিলনও হইতে পারে। শিব-পার্বতীর এই দ্বন্দ্বের উল্লেখ করিয়া আমরা মনসা-মঙ্গল প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

চণ্ডীমঙ্গল

ষোড়শ শতাব্দী হইতে চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের ধারা প্রবাহিত, অবশ্য তাহার পূর্বেই দেশের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী প্রচলিত ছিল।[১] মনসা-মঙ্গলের মনসার ন্যায় চণ্ডীও একজন অনার্য দেবতা।[২] অবশ্য পরবর্তীকালে এই চণ্ডীর উপর পৌরাণিক প্রভাব পড়িয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে ইনি পৌরাণিক চণ্ডী বা দুর্গার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন। মাণিক দত্তই চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি এইরূপ জনশ্রুতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।[৩] মাণিক দত্তের পরে চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা রূপে মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধবের নাম করিতে হয়। তাঁহার কাব্য পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রচলিত ছিল। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। ভারতচন্দ্র ব্যতীত মুকুন্দরামের ন্যায় শক্তিশালী কবি মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে আর নাই। মুকুন্দরামের পরে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবি হিসাবে সারদামঙ্গল-রচয়িতা মুক্তারাম সেন, রামানন্দ-যতি, লালা জয়নারায়ণ ও ভবানীশঙ্কর দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে হয়। আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল কাব্যখানিও চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিব। বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ন্যায় রসজ্ঞ, কুশলী কবি আর কাহারও নাম করিতে পারি না। পরবর্তী কালে তাঁহার ন্যায় এরকম সুদূর ও ব্যাপক প্রভাবও আর কেহ বিস্তার করিতে পারেন নাই।

১। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় সংস্করণ)—৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (২০৮-২৩৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, কালকেতু ব্যাধের চণ্ডী ওঁরাও জাতির চণ্ডী হইতে আসিয়াছে এবং ধনপতি সদাগরের গল্পের চণ্ডীই প্রকৃত মঙ্গলচণ্ডী। তিনি বৌদ্ধ সমাজ হইতে আগতা আদ্যা।

৩। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে মাণিক দত্তের পুথি পাওয়া যাইতেছে তিনি চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত নন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দুইটি কাহিনী আছে—১। কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী, ২। ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী। সকল কবির কাব্যের আখ্যানভাগের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে। তবে কেহ সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন আর কেহ বা ঘটনাকে রঞ্জিত, পল্লবিত করিয়া পরিবেষণ করিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নানা সুখদুঃখের অভিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞতার রসে তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য বাস্তব সত্যতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন ধরণের নরনারীর নিখুঁত চিত্র কবি নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়া আমাদের মন আগ্রহে, কৌতূহলে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা গুরুগম্ভীর আভিজাত্যে উজ্জ্বল আবার গ্রাম্য স্বাভাবিকত্বে সরল এবং ছন্দও গুরু ও লঘু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব সুষমায় বিচিত্র। ভাষা ও ছন্দের এই অশেষ বৈচিত্র্যে তাঁহার কাব্য এতখানি শক্তি ও প্রভাব লাভ করিয়াছে) অনেকেই মুকুন্দরামকে দুঃখের কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বর্ণনা থাকিলেও রঙ্গপরিহাসের অভাবও তাঁহার কাব্যে নাই। প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনের করুণ ও রঙীন উভয় দিকই সমান সহৃদয়তা লইয়া পর্যবেক্ষণ করেন, মুকুন্দরামও তাহাই করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার কাব্যে ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-বর্ণনা, মুরারী শীল ও ভাঁড়ুদত্তের ব্যঙ্গোদ্দীপক চরিত্রের পাশে কালকেতুর খেদ ও চৌতিশার কারুণ্য। (একদিকে যেমন খুল্লনার দুঃখ ধনপতি ও শ্রীমন্তের কষ্ট ভোগ দেখাইয়া কবি করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার তেমনি সপত্নী কলহ ও বাঙ্গাল মাঝিদিগের দুঃখ লইয়া পরিহাস করিতেও ভুলেন নাই।)

(মুকুন্দরামের হাস্যপরিহাস কোথাও স্নিগ্ধ ও করুণ এবং কোথাও বা ব্যঙ্গ-প্রধান ও আঘাতপ্রিয়।) সমাজের ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তিনি ইহার কৃত্রিমতা, কপটতা ও শঠতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। দুঃখ ও নির্যাতনের আঘাতে তাঁহার মন হয়তো একটু খিন্ন ও অসন্তুষ্ট ছিল কিন্তু তাঁহার সর্বব্যাপী সুগভীর সহানুভূতির কখনও অভাব হয় নাই।

(আমাদের সংসারের গৃহস্থালীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মতের সংঘর্ষে ও মনের অমিলে স্বল্পকালস্থায়ী কলহ ও অভিমানের ভিতরে যে সব হাস্যরসের

কারণ বিদ্যমান কবির সন্ধানী দৃষ্টি পরম কৌতুকের সহিত সেগুলি লক্ষ্য করিয়াছে। ভোজন-রসিক শঙ্কর গৌরীকে কি কি রাঁধিতে হইবে তাহার এক লম্বা ফর্দ দিয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে ঘরে তণ্ডুলকণা নাই তখন খামোকা বিষম রাগিয়া সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিলেন—এই দৃশ্য অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ। অপূর্ব লাবণ্যবতী চণ্ডীকে দেখিয়া ঈর্ষা ও আশঙ্কা পীড়িতা ফুল্লরার দীর্ঘ উপদেশ দান দেখিয়া আমরা যথেষ্ট মজা উপভোগ করি। লহনা ও খুল্লনার যুদ্ধ (বাক্য নহে প্রকৃতই বাহুযুদ্ধ) স্থূল ও গ্রাম্য হইলেও সেকালের সপত্নী-কলহের স্বাভাবিক চিত্র। এই চিত্র বাস্তবিকই উপভোগ্য—

মল্লা যেন কোন্দলে যুঝে দু' সতীন।
বিদেশে সদাগর পাইয়া শূন্যঘর
লাজভয় হইল হীন॥
বড় বড়ী প্রবলা ছোট জন একলা
কলহ হৈল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া রোষযুতা হইয়া
খুল্লনা হইল বলাধীন॥
চরণ থর থর আদেশে ধর ধর
কর্ণেতে দোলমান সোনা।
করিয়া মহাক্রোধ না মানে উপরোধ
খুল্লনা মারিল ঠোনা॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া ভূতলে পড়িয়া
দেখয়ে সরিষার ফুলে।
সম্বিত পাইয়া উঠিল কাঁপিয়া
দুহাঁরে ধরিল চুলে॥
চট চট চাপড় ছিণ্ডিলেক কাপড়
বেগে মারিলা কঙ্কণ।
দোঁহে করে ধূম কিলের গুম গুম
মেঘ যেন শিলা বরিষণ॥
কিঙ্কিণী কন কন বাজয়ে ঝন ঝন
ঘন বাজে সদাগর বাসে।

দেখি হুড়াহুড়ি বড় ঘরের বহুড়ি
নারীগণ পলায়ে ত্রাসে ॥
পায় পায় জড়ায়ে করে কর ধরিয়ে
ক্ষিতিতলে ত পড়িয়া।
দোঁহার অলঙ্কার ঝন ঝন ঝঙ্কার
শবদে তর তর হইয়া ॥
খুল্লনায় বিধি বাম দুজনার সংগ্রাম
লহনার হইল জয়।
যৌবনে ঢল ঢল হাসয়ে খল খল
শ্রীকবিকঙ্কণ কয় ॥

(লোকের সামান্য দুঃখ দেখিয়া আমরা যে অনুকম্পামিশ্রিত হাস্যরস উপভোগ করি কবিকঙ্কণ তাহা অনেক স্থলেই উদ্রেক করিয়াছেন। এই সব স্থানে কবির চাপা শ্লেষের তীক্ষ্ণ ধারগুলি স্নিগ্ধ সহানুভূতির কোমল আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া আছে। শিবের এবং ধনপতির বিবাহে নারীগণের পতিনিন্দার যে বর্ণনা আছে তাহাতে নারীগণের দুঃখ বর্ণনাচ্ছলে কবি হাস্যপরিহাসই করিয়াছেন। কালকেতুর অত্যাচারে পশুগণের খেদ ও ক্রন্দনের মধ্যেও কৌতুকরস উদ্রিক্ত হইয়াছে। পশুগণের মধ্যে মানুষের প্রকৃতি ও হাবভাব আরোপ করায় পাঠকের দুঃখ অপেক্ষা কৌতুকের মাত্রাই অধিকতর বৃদ্ধি পায়। পূর্ববঙ্গীয় নাবিকগণের রোদনের মধ্যেও কবির শ্লেষাত্মক পরিহাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি নিজে রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। সেজন্য পূর্ববঙ্গের লোকের কথা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয় যে, পূর্ববঙ্গীয় লোকের কথার বিকৃতি অপেক্ষা তাহাদের স্বভাবের অসঙ্গতি লইয়া পরিহাস করাই কবির উদ্দেশ্য।) কত তুচ্ছ বিষয়ে মাঝিরা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে তাহাই দেখাইয়া তিনি কৌতুক করিয়াছেন—

আর বাঙ্গাল কান্দে মাথায় দিয়া হাত।
কে না লয়্যা গেল মোর ভাত খাবার পাত ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে বলে বাপ বাপ।
কি ক্ষণে সিংহলে আস্যা পাল্য এত তাপ ॥
এক বাঙ্গাল কান্দে বলে বাপই বাপই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥

পালায় বাঙ্গাল সব হইয়া বিকল।
আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায়ে নাহি বল ॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি হইল অনাথ।
কে না লয়্যা গেল মোর সুকুতার পাত।
আর বাঙ্গাল বলে আমি পালা বড় লাজ।
হলদীর গুঁড়া গেল প্রাণে কিবা লাজ ॥

কবির ব্যঙ্গপ্রিয়তার নিদর্শন মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র। কৃপণ ধনলোভী বণিক মুরারি শীলের চরিত্র কবি বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। কালকেতু মুরারি শীলের কাছে মাংসের দাম পাইত বলিয়া কালকেতুর সাড়া পাইয়া মুরারি গৃহের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল, তারপরে যখন জানিল যে কালকেতু অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিতে আসিয়াছে তখন লোভার্ত বণিক খিড়কীর পথ দিয়া আসিয়া কালকেতুর সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা দেখাইল, এই দৃশ্য খুব চমৎকার—

পাইয়া ধনের বাস আসীতে বীরের পাশ
ধায় বান্যা খড়কির পথে,
মনে বড় কুতুহলী কাঙ্কেতে কড়ির থলী
হড়পী তরাজু লৈয়া হাথে।
করে বীর বান্যারে জোহার,
বাণা বলে ভাইপোএ ইবে নাহি দেখি তো এ
এ তোর কেমন ব্যবহার।

(কবিকঙ্কণের চরিত্র-চিত্রণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভাঁড়ুদত্ত। ভাঁড়ুদত্তের ন্যায় জীবন্ত চরিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। ভাঁড়ুদত্তের ধূর্ততা, শঠতা ও চাটুকারিতা অতি উজ্জ্বলভাবে কবির ব্যঙ্গনিষিক্ত লেখনীতে চিত্রিত হইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন অবস্থায় যে কোন রূপে নিজেকে জাহির করিতে পারে। কালকেতুর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সে কলিঙ্গ-রাজাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত ও প্রবৃত্ত করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে কালকেতুর মুক্তির পর সেই আবার অম্লান বদনে কিভাবে পরম হিতার্থীর ভান করিতেছে তাহা লক্ষণীয়—

জেই আপনার হয় সেই কভু ভীন্ন নয়
আপনা জানীবে ভাঁড়ুদত্তে।

রাজার সভাতে বাণী আমি সে করিতে জানী
ভাঁড়ু দত্ত বিদীত জগতে ॥
জখন দুপুর নীশী সম্ভাষীয়া পাবে বসী
অনেক বুঝাল্যা নরপতি।
ধরিয়া পাত্রের পায় মাগীয়া লইল দায়
খুড়ী সে জানেন মোর মতি ॥
খুড়া ! তুমি যে হইলা বন্দী আমি অনুক্ষণ কান্দী
বহু তব নাহী খায় ভাত।
দেখি খুড়া তুমি মুখ সবে পাষরিলা দুঃখ
দশদিক হৈলা অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাশনে থাক খুড়া
আমারে আরোপী সর্বভাব ॥

কবির ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। কালকেতুর রাজ্যে আগত বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির বর্ণনাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটক ব্রাহ্মণের বর্ণনা কবি করিয়াছেন—

গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপঞ্জি করিয়া বিচার।
জে নাহি গৌরব করে সভাতে বিড়ম্বে তারে
জাবত না পায় পুরস্কার ॥

মূর্খ বৈদ্যের অক্ষমতা তিনি অতি সরসভাবে আঁকিয়াছেন—

কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করিয়া যোগ
বুকে ঘাত মারি অঙ্গে পায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে করয়ে বিদায় ॥
কর্পূর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে রোজার পালান।

মুসলমানের বর্ণনা প্রসঙ্গে অত্যাচারপীড়িত কবি মন্তব্য করিয়াছেন—

বড়ই দানিশবন্ধ না জানি কপট ছন্দ
প্রাণ গেলা রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ
বুকে আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃড় নাড়ি।
জার দেখে খালী মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া মারয়ে ভাঁড়া বাড়ি॥

ভারতচন্দ্র

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাপতি ব্যতীত তাঁহার ন্যায় কুশলী, রসজ্ঞ ও শক্তিশালী কবি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর নাই এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। ভারতচন্দ্র নানা ভাষা ও বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন।[১]) এই পাণ্ডিত্যের ফলে তাঁহার কাব্যের সর্বত্র একটি বৈদগ্ধ্য-মার্জিত সযত্ন-সজ্জিত ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পূর্বে মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মধ্যে যে একঘেয়ে গতানুগতিক ও নিস্তেজ ভাব দেখা যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহা নাই। তিনি চির-প্রচলিত বিষয় লইয়া ভাষার চাকচিক্যে ও বর্ণনার অভিনব ভঙ্গিতে এবং বাস্তব পরিবেশে চিত্ত-চমৎকারী কাব্য রচনা করেন। তাঁহার শব্দবিন্যাস ও ভাষার লালিত্য সম্বন্ধে সব সমালোচকই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। অনুকার এবং অনুপ্রাস-যুক্ত শব্দ সমূহ ভারতচন্দ্র কন্দুকের ন্যায় লইয়া দুই হাতে খেলিয়াছেন।[২] তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, পারশী বিভিন্ন ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেজন্য

১। কবি অন্নদার মুখে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরান আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী॥

২। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

পায়স-পয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক-পর্বত কচমচিয়া॥

তাঁহার ভাষা নানা ভাষার দ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে। বিভিন্ন রঙের ফুলে মালার শোভা যে কত বর্ধিত হয় নিপুণ মালাকার রায় গুণাকার তাহা জানিতেন। ছন্দপ্রয়োগে ভারতচন্দ্রের অনুপম চাতুর্য সর্ববাদীসম্মত। কবি সত্যেন দত্ত ছাড়া এত বিভিন্ন প্রকার ছন্দ লইয়া যাদু দেখাইতে আর কেহ পারেন নাই। সংস্কৃত বাঁধা ছন্দ হইতে লৌকিক ছড়ার ছন্দ পর্যন্ত অজস্র বিচিত্র ছন্দ-গৌরবে তাঁহার কাব্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছন্দ কখনও দীর্ঘ কখনও বা হ্রস্ব, কোথাও গভীর আবার কোথাও লঘু ও চপল। তাঁহার ছন্দের অশেষ বৈচিত্র্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো সম্ভব নহে, কারণ প্রতিটি কবিতার পরেই তিনি নূতন ছন্দে কবিতা আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত একটানা ছন্দের বিরক্তিকর সুরে আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম মোহন সুরের ঝঙ্কারে আমাদের শ্রবণ পরিপূরিত করিয়া দিলেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাবের অভাব সম্বন্ধে অনেক সমালোচকই অনেক কথা লিখিয়াছেন। যাঁহারা করুণ রসের স্রোতে হাবুডুবু না খাইতে পারিলে সন্তুষ্ট হন না তাঁহারা ভারতচন্দ্রের কাব্যে বারমাস্যার কৃত্রিম কারুণ্য না দেখিয়া অপ্রসন্ন হইবেন কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় চরিত্র-চিত্রণে তিনি মুকুন্দরাম অপেক্ষা কম পটু নহেন। মুকুন্দরাম ফুল্লরা ও খুল্লনার মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিদ্যার ন্যায় মার্জিতা ও রস-রহস্যপূর্ণা নায়িকা অঙ্কন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তাঁহার ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীল অপেক্ষা রায়গুণাকরের হীরামালিনী অধিকতর উজ্জ্বল। বাঙালী সমাজে রমণী চরিত্র সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতার সহিত কাহারও অভিজ্ঞতা তুলনীয় নহে। বর্ণনা-ক্ষমতাতেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নহে। শুধু কেবল বিদ্যা অথবা সুন্দরের সৌন্দর্য-বর্ণনাতে নহে, কৈলাস-পর্বতের চিত্রণে অথবা মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের বিবরণে তাঁহার বর্ণন-ক্ষমতার অসাধারণ পটুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র সভাকবি ছিলেন, জয়দেব ও বিদ্যাপতির ন্যায় রাজসভার জ্ঞানী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই তাঁহাকে কাব্য লিখিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহার শ্রোতাদের হৃদয় আর্দ্র করা অপেক্ষা

চুক চুক চুক চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া।
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া

চিত্ত চমৎকৃত করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার কাব্য পড়িলেই মনে হয় যে তাঁহার ওষ্ঠাধর বুঝি সর্বদাই পরিহাসে রঞ্জিত ও ব্যঙ্গে বঙ্কিম হইয়া আছে। যিনি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন তিনিই মিঠেকড়া দু'একটি বচন তাঁহার কাছ হইতে না শুনিয়া নিষ্কৃতি পান নাই। আমরা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের সমালোচনা করিব।

হাস্যরসিকের পক্ষে সমাজ সম্বন্ধে ভূয়িষ্ঠ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে হাস্যরসের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এই রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা রায়গুণাকরের ছিল বলিয়াই তিনি আমাদের সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা হাস্যপরিহাসে স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেবলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পদে পদে সাংসারিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক বিপর্যয় ও অসঙ্গতি তাঁহার অভিজ্ঞতা-পুষ্ট লেখনীর মধ্য দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। অভাবগ্রস্ত সংসারীর দুঃখ ও অশান্তি, বাঙালী পুরললনার কৌতূহল ও ঈর্ষা, দুই সতীনের দ্বন্দ্ব, বেসাতির হিসাব—কিছুই তাঁহার তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সর্বত্রই তাঁহার পরিহাসোজ্জ্বল মুখ হইতে হাস্য-কৌতুকের কণা বিকীর্ণ হইয়া সকলকে বিদ্ধ করিয়াছে। যেখানে গম্ভীর হওয়া দরকার, দুই একটা উচ্চাঙ্গের কথা বলা দরকার সেখানেও আমাদের কবি একটু-আধটু রঙ্গব্যঙ্গের বুঁদ না ছাড়িয়া পারেন নাই। অদ্বিতীয় কুশলী ও ভাষাশিল্পীর হাতে সামান্য কথা অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে, তুচ্ছ বাক্য প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্বের বহু কবিকে অনুসরণ করিয়া শিবের চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট হাস্য-পরিহাসের উপাদান সঞ্চিত করিয়াছেন।[১] আমরা পূর্বেই অন্যত্র আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, দেবচরিত্র যখন মানুষের ন্যায় তুচ্ছ, ভ্রান্ত ও অসঙ্গত আচরণ করে তখনই সেই চরিত্র আমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে।[২] শিবকে লইয়া সকলেই হাস্য উদ্রেক করিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের

১। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' দেবচরিত্রের দুর্গতি ঘটাইবার জন্য ভারতচন্দ্রের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন শিবভক্তি-উপাসক কবির যোগ্য হয় নাই। কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে শিবকে লইয়া হাস্যরসের অবতারণা ভারতচন্দ্রের পূর্বের সব মঙ্গলকাব্যের লেখকগণই করিয়াছেন। সুতরাং এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে।

২। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চভূত নামক গ্রন্থের কৌতুকহাস্য শীর্ষক প্রবন্ধে, বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের হুঁকা হস্তে রাধার কুটিরে আগমন সম্বন্ধে গান শুনিলে আমরা হাসি, কারণ,—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

কাছে সেই হাস্য অনেক বেশি ধারালো ও চটকদার হইয়া উঠিয়াছে।[১] বিবাহের সময় শিবের কি বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী কবিগণও আলোচনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে এই দৃশ্য আঁকিয়াছেন—

বাঘছাল খসিয়া উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই ন্যাঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥
দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়।
শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥

মেনকা জামাইয়ের সহিত কন্যার তুলনা করিয়া যে বিলাপ করিয়াছেন তাহার মধ্যেও কবির কৌতুক-দৃষ্টি মজা উপভোগ করিয়াছে। হরগৌরীর কোন্দল কবিগণের আর একটি প্রিয় ও মজার বস্তু এবং ভারতচন্দ্রও সেই কোন্দল বাধাইতে কসুর করে নাই। তাঁহার হরগৌরীর কোন্দল পড়িলেই মনে হয় এ দেবতার দ্বন্দ্ব নয়, এ যে আমাদেরই সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক স্বামীস্ত্রীর কলহ। কবি হর-গৌরীর নাম দিয়া বাঙালী ঘরের দাম্পত্য কলহের চিত্র অবিকল আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন। তবে কলহে পুরুষ অপেক্ষা নারীর পটুতা অনেক বেশি। পুরুষের বাহু চলিলেও বাক্ তেমন সচল নহে কিন্তু নারীর বাক্ বিদ্যুৎগতিতে নির্গত হইয়া পুরুষের তেজ বীর্য নিমেষমধ্যেই পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। অন্নদাও এ সত্য প্রমাণ করিয়াছেন। মহাদেব কি একটু-আধটু বলিয়াছেন আর অমনি পার্বতীর রসনা ক্রোধে খরদীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল—

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥

আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে তাঁহাকে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটিরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক। কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দুঃখ দেয় আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। পঞ্চভূত—পৃঃ ১৭৬।

১। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'তবে ভারতচন্দ্রের চাঁচাছোলা উক্তি এই বর্ণনাকে অভিনব করিয়াছে।' বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪০

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিদ্ধুরের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কুট কথা কিসের লাগিয়া॥

এ-সব কথার পর কোন্ পুরুষ আর ঘরে থাকিতে পারে? শিবও ঘর ছাড়িলেন। ভিক্ষা করিয়া খাইবেন কিন্তু এ ঘরে আর নহে—

ঘর উজরিয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

এই চিত্রে কৌতুক থাকিলেও ইহার মধ্য হইতে একটি দারিদ্র্য-পীড়িত, সাংসারিক অশান্তিক্ষুব্ধ, উপায়হীন, অবলম্বনহীন চরিত্র আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

বেচারা শিব ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। কিন্তু তবুও লোকে তাঁহার সহিত রঙ্গ-পরিহাস করিতে ছাড়ে না—

দূরে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হইতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বা গাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

বাঙালী স্ত্রী-সমাজ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আমাদের স্ত্রী-সমাজের কোমলতা, মাধুর্য ও পাতিব্রত্য লইয়া তিনি আলোচনা করেন নাই। এই সমাজের কৌতূহল, চঞ্চলচিত্ততা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও দ্বন্দ্বপ্রবণতার মধ্যে যে অজস্র হাস্যকৌতুকের উপাদান সঞ্চিত হইয়া আছে তাঁহার রসলিপ্সু দৃষ্টি সে-সব দিকেই নিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙালী ঘরের মেয়ে বিবাহের নামে কি রকম সলজ্জ, সকৌতূহল ভাব অনুভব করে কবি উমার চিত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, নারদ উমার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছেন, তখন—

বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘর গেল ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরে গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥

শিব ও পার্বতীর বিবাহের সময় সমবেত অবিধবাগণ পরস্পরের সহিত কোন্দলে ব্যাপৃত হইল। কে কোন্ দেবতার দিকে তাকাইয়া আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহারা কলহে মাতিয়া উঠিল। কবি স্ত্রী-কলহের ভাষা ও ভঙ্গি অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন—

নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পরে এয়োগণে বাজিল কোন্দল॥
এ বলে উহার সই ওটা বড় ঠেঁটা।
আর জন বলে সই এই বটে সেটা॥

যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেঁটা।
গোবিন্দ সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানিলো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে॥

(নারীগণের পতিনিন্দা প্রাচীন সাহিত্যের আর একটি হাস্যাবহ বিষয়। ভারতচন্দ্র এই বিষয়ের আলোচনা কালে প্রাণ ভরিয়া কর্দমকেলি করিয়াছেন) মুনসী, বখশী, উকীল, খাজাঞ্চি, পোদ্দার, মুহুরী, দপ্তরী, ঘড়েল, কুলীন এবং কবির স্ত্রীদের আক্ষেপের মধ্যে কবি ঐ সব শ্রেণীর প্রতি পরিহাস-স্নিগ্ধ কটাক্ষ-পাত করিয়াছেন। কবির অভিজ্ঞতা কত গভীর ও বহু-বিস্তৃত ছিল নারীদের ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। নারীদের অনেকেরই উক্তি শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ঐ রকম অশ্লীল আলোচনা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত রমণীগণের পক্ষেই সম্ভব। আমরা শুধু প্রথম রমণীর পতিনিন্দা উদ্ধৃত করিতেছি—

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হইল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥

দুই সতীনের ঝগড়া আমাদের প্রাচীন সমাজে বিশেষ উপভোগ্য ও চিত্তরোচক ছিল, সেজন্য প্রাচীন সাহিত্যে এই বিষয়ের বিশেষ সদ্ভাব লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্র ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর কলহ দেখাইতে যথেষ্ট কৌতুক বোধ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র 'জামাই বারিকে' এই কলহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভবানন্দ মজুমদার বহুদিন পরে গৃহে ফিরিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে কাহার ঘরে যাইবেন। দুই সতীনই তাঁহাকে ছিনাইয়া নিজেদের ঘরে পুরিতে মারমুখী হইয়া

আছে। স্বামীকে লইয়া দুই সতীনের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলিল, আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

ছোট স্ত্রী পদ্মমুখী বলিতেছে—

পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিল স্বামী।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড় দিদি বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥

বড় স্ত্রী চন্দ্রমুখী উত্তর দিতেছে—

চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন আমি তখনি ছিনু বড়॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥
*　*　*　*　*
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

ভারতচন্দ্রের মালিনী বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় চরিত্র। চিরকাল যাহারা আদর্শ চরিত্রের সন্ধান করিয়াছে তাহাদের সাহিত্যে এরকম আদর্শভ্রষ্ট চরিত্র অভিনব, এমন কি বিস্ময়কর বলা যাইতে পারে। হীরা মালিনীর চরিত্র সর্বদোষে কলঙ্কিত, কিন্তু তবুও এই চরিত্র অকৃত্রিম বাস্তবতায় অত্যুজ্জ্বল। আমাদের গ্রাম্য সমাজে কেবল যে সীতা সাবিত্রীর বাস বোধ হয় একথা অতি বড় আদর্শবাদীও উচ্চারণ করিতে সাহসী হইবেন না। হীরার ন্যায় অসচ্চরিত্রা কুটনী চরিত্র আমাদের সমাজে যথেষ্টই আছে। ভারতচন্দ্র এই চরিত্রের প্রতিটি অসৎ বাক্য, প্রতিটি কুটিল ভঙ্গিমা, এবং প্রতিটি ক্রূর অভিসন্ধি নির্বিকার নিষ্ঠার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। অথচ কেহ বলিতে পারিবেন না যে তিনি এই চরিত্রের মধ্য দিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন। কারণ ইহার শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়া তিনি লোকানুমোদিত নীতিই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক আমরা এই চরিত্রের হসনীয় দিক লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সুন্দর যখন মালিনীকে প্রথম দেখিল তখন কবি মালিনীর রূপ ও প্রকৃতির সরস বর্ণনা করিয়াছেন—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজ দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁধে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥

সুন্দরের কাছে মালিনী যে বেসাতির হিসাব দিয়াছে তাহাও অত্যন্ত কৌতুকজনক। সুন্দর ও বিদ্যার গোপন মিলন ঘটাইয়া মালিনী মাসীর দিন কাটিতেছিল ভাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোরের সহিত চোরের মাসীকেও ধরা পড়িতে হইল। কিন্তু সুন্দর ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া মাসী যেন তাহাকে চেনেই না এইরকম ভাব দেখাইল। সুন্দর যত কৌতুক করে মালিনী ততই রাগিয়া যাইয়া তাহাকে গালাগালি করে, এই দৃশ্য খুব মজার—

সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী॥
কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর॥
যজ্ঞ কুণ্ড ছল পাতি সিঁদ কাট সারা রাতি
আইমা কিলাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি॥

যতদিন আর জীব .কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব ॥

* * * * *

সুন্দর হাসি আকুল যাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাসাস মোর আইশাস
পড়ি দিয়াছিল ফুল ॥

কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥

(ভারতচন্দ্রের কাব্যের হাস্যরস অনেক সময় অদ্ভুত ও অভিনব ঘটনাগত হইয়াছে। কবি অনেক.ক্ষেত্রে উদ্ভট ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার পরিবেশে উচ্ছ্বসিত কৌতুকরস জমাইয়া তুলিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞনাশের মধ্যে এই রকম কৌতুক তাণ্ডব দেখানো হইয়াছে। সুন্দরকে ধরিবার জন্য কোটালগণের স্ত্রীবেশ ধারণের মধ্যেও অবারিত কৌতুকরসের সঞ্চার হইয়াছে। সুন্দর বিদ্যার ঘরে প্রবেশ করিয়া বিদ্যার রূপধারী চন্দ্রকেতুর সহিত সম্ভাষণ করিতেছে, এ-দৃশ্য অত্যন্ত আমোদজনক—)

পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত আর একটি হাস্যজনক ব্যাপার। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ভবানন্দ মজুমদারকে বন্দী করিলে ভবানন্দ অন্নদার স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া অন্নদা ভূতপ্রেতদিগকে প্রতিশোধ লইবার জন্য আদেশ

করিলেন। তাহারা বাদশাহী সৈন্য সামন্ত ও মুসলমান পরিবারের মধ্যে যাইয়া বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিল। (হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণের বিপত্তিতে কবি যে একটু কৌতুক বোধ করেন নাই তাহা নহে। কবি মুসলমানী শব্দ প্রচুরভাবে ব্যবহার করিয়া এই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত হাস্যজনকতা অনেক বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন।) একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিড়া দিল ॥
চিতপাত হয়ে বিবি হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥
শুনি মিয়া তসবী কোরান ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥

(নিছক কৌতুকরসের অবতারণার জন্য কবি দাসু-বাসুর খেদ বর্ণনা করিয়াছেন।) ব্যাসের চরিত্র কবি হাস্যাস্পদ করিতে চাহিয়াছেন বটে কিন্তু ব্যাসের বিবরণ পড়িয়া হাস্য অপেক্ষা আমাদের সহানুভূতিই অধিক জাগ্রত হয়। দেবতাদের অকারণ ক্রোধ ও অদ্ভুত খেয়ালের ফলে ব্যাসকে অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার চরিত্রের মধ্য দিয়া কবির হাসাইবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।[১]

অলঙ্কৃত বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই হাস্যরস সৃষ্টি করা হইত। অলঙ্কারজ্ঞ পণ্ডিত কবির হাতে অনেক স্থলে রসাল অলঙ্কারের চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগে বৈদগ্ধ্যদীপ্ত হাস্য বিকীর্ণ হইয়াছে। অলঙ্কৃত বাক্যের অন্তর্নিহিত হাস্য রসজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল বুঝিতে পারেন। ভারতচন্দ্র ঐ ধরণের শ্রোতা ও পাঠককে উদ্দেশ্য করিয়াই জ্ঞানগ্রাহ্য হাস্যরস

১। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'ব্যাসের বর্ণনা ভারতচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণ অক্ষমতার শোচনীয় নিদর্শন। তবে তাঁহার পক্ষে এইটুকু বলা যায় তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে ভুলিয়া গিয়া তখনকার যাত্রা-নাটের বৈষ্ণববেশী ভাঁড় ব্যাসদেবকেই আঁকিয়াছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সংস্করণ, পৃঃ ৮৩৭)

পরিবেষণ করিয়াছেন। মালিনীর বেসাতির হিসাবের মধ্যে যমকের দৃষ্টান্ত আমরা পাই—

বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝরে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোঁটা।
ষটী টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়।
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি॥
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥

অন্নদার সহিত ঈশ্বরী পাটুনীর কথোপকথনের সময় অন্নদা যখন আত্মপরিচয় দিতেছেন তখন কবি শ্লেষ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহনিশ॥

দক্ষের শিবনিন্দাও ব্যাজস্তুতির উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। বিদ্যার রূপবর্ণনার প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র অলঙ্কারের বাহার দেখাইয়াছেন। অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা তিনি বিদ্যার চমৎকারী সৌন্দর্য-প্রতিমা গড়িয়াছেন। আতসবাজির অজস্র ফুলকির ন্যায় তিনি অলঙ্কারের

বিচিত্র ছটার দ্বারা আমাদের চোখ ঝলসাইয়া এবং মন চমকাইয়া মজা বোধ করিয়াছেন। বিদ্যার রূপ বর্ণনা হইতেছে—

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কত গুলা॥
কি ছার মিছার কামধেনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভাঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগ মদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥

ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুরের মহিমা লইয়া ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলি লিখিত। এই ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মত বহুদিন পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেহ কেহ এই মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন, ধর্মঠাকুর একটি মৌলিক দেবতা এবং বৌদ্ধধর্মের পূর্ব হইতেই ইঁহার পূজার প্রচলন ছিল।[১] ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে ধর্মঠাকুর হইলেন সূর্যদেবতা, বৌদ্ধধর্মের সহিত ইঁহার কোন সংশ্রব নাই।[২] ডাঃ সেন দেখাইয়াছেন যে ধর্মপূজা বর্তমানে রাঢ়দেশে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এককালে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে ও উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত ছিল।[৩] ধর্মমঙ্গল কাব্য পড়িলেও দেখা যায় যে ইহার মধ্যে ধর্মদেবতা অপেক্ষা পৌরাণিক হিন্দুদেবদেবীর প্রভাবই যেন বেশি। সমগ্র কাব্য আদ্যন্ত পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও আদর্শে পরিপূর্ণ।

১। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪৯।
২। ডাঃ সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৪৯২।

ধর্মমঙ্গলের বহু কবির কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশের কাব্যই এখন পর্যন্ত অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত হইয়া আছে। প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেরই সমধিক খ্যাতি ছিল। অবশ্য ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে রূপরামের কাব্যের প্রচারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল।[১] ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় আদি ও করুণরসে মধুর ও আর্দ্র নহে, ইহা বীররসে উদ্দীপিত এবং রণনাদে উত্তেজিত। বস্তুত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একঘেয়ে করুণরসের বর্ষণের মধ্যে এই কাব্যেই আমরা একটু আধটু বীরত্বের মেঘমন্দ্র শুনিয়াছি।

অবশ্য যুদ্ধের বাহুল্য দেখাইয়া কবিগণ যুদ্ধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা যে অনেকখানি হাল্কা করিয়া ফেলিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, 'ধর্মমঙ্গল কাহিনীর বীররস পুরাপুরি যাত্রাগানের বীররস নয়।' কিন্তু ধর্মমঙ্গল পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইয়াছে যে ইহা প্রকৃতই যাত্রাগানের বীররস। যাত্রার বীরগণের ন্যায় এই কাব্যের পাত্রপাত্রীগণও বুঝি ভোঁতা বল্লম উঁচাইয়া এবং মরচে-ধরা তলোয়ার ঘুরাইয়া দর্শকদিগকে উত্তেজিত করা অপেক্ষা হাসাইয়াছেন অনেক বেশি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে আমরা বাঙালী রমণীদের দুঃখভোগ ও পাতিব্রত্যের আতিশয্য দেখিয়াছি কিন্তু ধর্মমঙ্গলে আমরা স্বাতন্ত্র্যময়ী বীরাঙ্গনা নারীর পরিচয় পাইয়াছি। কানড়া, কলিঙ্গা, ধুমসী, লক্ষ্যা—ইহারা সকলেই বীর রমণী। জামতি এবং সোলাহাট পালাগুলির মধ্যে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার চিত্র আমরা দেখিয়াছি। অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরসেরও অল্পবিস্তর অবতারণা ধর্মমঙ্গল-কাব্যে রহিয়াছে। কামার্ত নারীদের পতিনিন্দা অথবা বৃদ্ধা নারীর প্রেমনিবেদন প্রভৃতি বিষয়ের সহিত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের হাস্যরসাত্মক বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি প্রাচীন সমাজে হাস্যরসের ধারা কত মামুলি ও গতানুগতিক ছিল। প্রকাশিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্মমঙ্গলের হাস্যরস বিচার করিব।

বাঙালীসমাজের মধ্যে শ্যালক-শ্যালিকা ও ভগ্নীপতির সম্পর্ক চিরকালই অত্যন্ত সরস। এই সরস সম্পর্কের চিত্র ঘনরামের কাব্যে আমরা পাই। ধর্মমঙ্গলের গৌড়েশ্বর বীর ছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে রসিক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে দেখিয়া তিনি বাম্মে

১। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৭০৯।

বসাইতে চাহিলেন, কিন্তু রঞ্জাবতীও কম যান না। উভয়ের বাকচাতুরী বেশ উপভোগ্য—

রাজা বলে এস তবে বৈস মোর বামে।
শ্যালী যদি ডেকে দেয় যৌবনের ডালি।
প্রণতি করিয়া রঞ্জনা কয় কৃতাঞ্জলি ॥
মোরে বটে বিবাহ করিবে মহীনাথ।
এখন ত বুড়া গালে দেখি দুটী দাঁত ॥
আঁতটী শুখান দেখি দাঁত দুটী যায়।
বদনে মদন বসে, বিভা কর রায় ॥

ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী[1]

রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেনের বিবাহপ্রস্তাব গৌড়েশ্বর করিলেন, কর্ণসেন বুড়া বটে, কিন্তু যুবক অপেক্ষা তিনি কম কিসে? গৌড়েশ্বর স্বয়ং বুড়া হইলেও তাঁহার কি কোন ঘাটতি আছে? গৌড়েশ্বর বুড়ার গুণ গাহিয়া বলিতেছেন—

বুড়া বলে কদাচ না ভেব বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন ॥
বুড়া নয়, খানিক বয়সে বটে বুড়া।
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া ॥
আমি যে এমন বুড়া ঘাটিয়াছি কি।
হাসিমুখ হেঁট হল বেণুরায়ের ঝি ॥

ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম, পৃঃ ২২

লাউসেন ও কর্পূর বারুই-পাড়ায় পৌছিলে বারুই রমণীরা তাহাদিগকে দেখিয়া পতিনিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে রমণীরা স্বামীদের দৈহিক বিকৃতি ও অপটুতা লইয়া খেদ করিতেছে। এই কপট খেদের মধ্যে কবির কৌতুকসৃষ্টি সঞ্চরণ করিতেছে—

মাধনি মোধিনী বলে শুন মরম সই।
এতদিন মনের কথা পুকুর ঘাটে কই ॥

১। শ্রীধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী প্রণীত (৩য় সংস্করণ)—শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কুঁজো মোর ভাতার কুশল নয় কাজে।
পোড়া পুঁটলির পাড়া পড়ে থাকে শেজে ॥
ভাজনি ভাবনা করে ভাতার কুকুড়ে।
ঠেলাঠেলি করি যত ঠায় থাকে পড়ে ॥
কল্যাণী কান্দিয়া কয় করে মনস্তাপ।
নয়নের মাথা থাক নিদারুণ বাপ।
পড়ে মরি প্রত্যহ গোদার পালে পড়ে।
অস্থিচর্ম সার হল অন্তর্জল ছেড়ে ॥

ধর্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ৮৪[১]

এবার একটু ত্রিপদীতে পতিনিন্দা শুনুন—

হীরা বলে অবা হাবা গোবা বোবা
বিধাতা ঘটালে মোরে।
সেবি সেই স্বামী বোবা হই আমি
কথা কই ঠারে ঠারে ॥
অধিক অবুঝা পিঠ ভরা কুঁজা
শুতে গেলে করে উঃ ॥
ঘাড়ে কুঁজ যুড়ে ভূমে যায় পড়ে
মিনসে রাজ্যের কু ॥

ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম, পৃঃ ১০৮

প্রাচীন সাহিত্যে পশুপক্ষী অথবা কোন অনুষ্ঠানে সমবেত নরনারীর উল্লেখ প্রসঙ্গে নামের সুপ্রচুর বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় অনুপ্রাস-যুক্ত নামের ব্যবহারে বর্ণনা কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠে। মাণিক গাঙ্গুলী সুরিক্ষার নাগরদের এবং কলিঙ্গার বিবাহে আগত এয়োদের উল্লেখ কালে অনুপ্রাসের মধ্য দিয়া এরূপ কৌতুক করিয়াছেন। সুরিক্ষার নাগরদের মধ্যে (একজন দুইজন নয়—'ছ কুড়ি নাগর তার অনধিক ছটা') কয়েকজনের নাম শুনুন—

গোবর্ধন গোপাল গোবিন্দ গদাধর।
সনাতন শিবরাম সার্থক শঙ্কর ॥

১। শ্রীধর্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী বিরচিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।

কৃষ্ণদাস কালাচাঁদ কৃপারাম কালু।
তুলারাম তিলোত্তম ত্রিলোচন তনু ॥

ধর্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ৯২

এবার এয়োদের মধ্যে কয়েকজনের নামের উল্লেখ করা হইতেছে—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাময়ী ক্ষীণোদর খুদি।
সনাতনী সুলোচনী সুয়াগী সমুদি ॥
ভগবতী ভানুমতী ভাগ্যবতী রতি।
শঙ্করী সারদা সীতা সত্যভামা সতী ॥

ধর্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৩০

বৃদ্ধা নারীর প্রেমনিবেদনের কৌতুকময়তা মনসামঙ্গল আমরা দেখিয়াছি। ধর্মমঙ্গলও ভাজনবুড়ীর প্রেমের সরস বর্ণনা দ্বারা কবিগণ যথেষ্ট হাস্যরস বিতরণ করিয়াছেন। লাউসেনকে দেখিয়া ভাজনবুড়ী প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িল কিন্তু প্রেম-সম্ভাষণের পূর্বে চেহারাখানাকে পছন্দ-সই করিয়া তোলা দরকার সেজন্য সে প্রথমে প্রসাধন আরম্ভ করিল। অপূর্ব সে প্রসাধন—

নাপানে রচিল কেশ কালি মেখে শোনে।
সাজিল পিশাচী যেন ছিল কেয়া বনে ॥
পরিল শোলার শঙ্খ অষ্ট আভরণ।
তুলিয়া তোবড়া গাল রচিল দশন ॥
সিন্দুর অভাবে পরে পাটকেল গুঁড়ি।
দুই চক্ষু কোটরে, কাজল দিল বুড়ী ॥
কালি চুন দিয়া মরা আঁতটা পূরায়।
কুঁজের ভরে উজন চলে প্রাণ বেগে ধায় ॥
মালিনী বলেন সাজ হয়ে গেল আচ্ছা।
উলুবন হতে যেন বার হয় পেঁচা ॥

ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম, পৃঃ ১১৮

এরূপ প্রসাধনে ভাজনবুড়ীর রূপ যে আহা মরি হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে। ভাজনবুড়ীর রূপ উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার রূপ কি অনিন্দ্য এবং বয়স কত কম তাহা দেখুন,—

হেনকালে তথাকার আইল ভাজন বুড়ী।
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুঁজ মাথা যেন ঝুড়ি ॥

গলায় গলগণ্ড গোটা গায় উড়ে ধূলা।
পচাগন্ধে মুখের মেতেছে মাছিগুলা।
বিরানই হইতে বাড়া হবেক বয়স।
তবু তার নাগর নিযুক্ত গো'টা দশ॥

ধর্ম্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ৯৩

এ হেন রূপবতী, প্রসাধিতা, রসিকা ভাজন রঙ্গরসে আঁসিয়া লাউসেনকে প্রেম নিবেদন করিল—

আইস ব'লে ইঙ্গিত করিলে বটে নাতি।
সমাচার তোমার শুনিনু এত রাতি॥
তুমি যদি রঞ্জাবতী ঝিয়ারীর বেটা।
তবে কেন মোরে ছেড়ে অন্য ঘরে লেঠা॥
না জেনে যা হবার হল এখন এস নাতি।
শিখে যাবে রতিরস হয়ে এক রাতি॥

ধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম, পৃঃ ১১৭

দুঃখের বিষয় লাউসেন কি কর্পূর এই রতিরসের মর্ম্ম বুঝিল না। কর্পূর তো কসিয়া এক চড়ই বসাইয়া দিল। সেই চড়ে ভাজনের কি দুর্দশা—

চড়ের চোটে রক্ত উঠে দশন গেল দূর।
খসে পড়ে শোলার শাঁখা ভেঙ্গে গেল ভুর॥

ঐ—পৃঃ ১১৮

ধর্ম্মমঙ্গলে যুদ্ধের বাহুল্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৌড়েশ্বরের সৈন্যদের সহিত কানড়ার সৈন্যদলের যুদ্ধের অবসান হইলে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। যত প্রেতিনী, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি মৃতসৈন্যদের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া এক মজাদারী হাট বসাইয়া দিল। অবশ্য এই হাটের বর্ণনায় হাস্যরস অপেক্ষা বীভৎস রসই বেশী ফুটিয়াছে—

পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী।
নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি॥
ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী।
কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি॥
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে তুল।
কেহ চাকে কেহ ভকে কেহ করে মূল

রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা।
বয়ে লয়ে কেহ কারে যে গাইছে তালা॥
মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি।
যাচিয়া যোগায় কত যোগিনীর ঝি॥

ঐ—পৃঃ ১৮০

ধর্মমঙ্গলের ইতস্তত আরও দুই এক স্থলে হাস্যরসের টুকরা ছড়াইয়া আছে। প্রাচীন সাহিত্যে ঝগড়া বিবাদের মধ্যে হাস্যকৌতুকের উপাদান সঞ্চিত থাকিত। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। মহামদ পাত্র ও লক্ষ্যার ঝগড়া কৌতুকপ্রদ কিন্তু আধুনিক রুচিতে এই ঝগড়া অশ্লীল। জাত ও বংশের সম্মান লইয়া কটূক্তি করিতে না পারিলে পূর্বে কোন কোন্দলই জমিত না, লক্ষ্যা-মহামদের কোন্দলের মধ্যেও এই রকম অশ্লীল কটূক্তি ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ রহিয়াছে।[১]

শুধু কেবল ঘটনার মধ্যে নহে ধর্মমঙ্গলের দুই একটি চরিত্রের মধ্যেও কৌতুকরসের উপাদান রহিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের একটি বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র হইতেছে কর্পূর। এই কাব্যের কৃত্রিম যুদ্ধবিগ্রহ এবং অস্বাভাবিক বীরত্ব ও উন্মাদনার মাঝে এই চরিত্রটির স্বাভাবিক সরসতা আমাদের মনকে স্নিগ্ধ কৌতুকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে।[২] কর্পূর লাউসেনের ভ্রাতা ও নিত্য সঙ্গী কিন্তু স্বভাবে ও আচরণে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। লাউসেনের ন্যায় সে কথায় কথায় যুদ্ধ করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। আত্মানং সতত রক্ষেৎ—ইহাই তাহার একমাত্র নীতি এবং এই নীতি রক্ষা করিতে যাইয়া বিপদের মুহূর্তে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে তাহার বাধে নাই। কর্পূর চরিত্রের এই ভীরুতা ও কাপুরুষতা বিলক্ষণ কৌতুকপূর্ণ হইয়াছে। লাউসেনের সহিত কামদল বাঘের ভীষণ যুদ্ধ বাধিলে কর্পূর দাদার ভাবনা ভুলিয়া নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে লুকাইয়া রাখিল। বাঘ সংহার করিয়া লাউসেন কর্পূরকে খোঁজ করিতে আসিল। লাউসেনের সাড়া পাইয়া কর্পূর ভাবিল বাঘটা বুঝি দাদাকে খাইয়া তাহাকে খাইতে আসিয়াছে। লাউসেনের অভয়বাণীতেও সে কিছুতেই গাছ হইতে নামিবে না। মাথায় হাত দিয়া শপথ করিলে তবে সে

১। ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী, পৃঃ ২৩৪।

২। 'একমাত্র কর্পূরের চরিত্র বাঙালীর খাঁটি নক্সা বলিয়া স্বীকার যাইতে পারে।'
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম সংস্করণ)—পৃঃ ২৭০

বিশ্বাস করিতে পারে। গাছ হইতে নামিয়াও তাহার ভয় যায় না। মৃত বাঘটিকে দেখিয়া তবে সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশ্য এখন বীরত্ব দেখাইতে তাহার কোন আপত্তি নাই। মৃত বাঘটিকে দুই এক কিল মারিয়া বুক ফুলাইয়া সে বলিতে লাগিল যে বাঘটিকে সেই তো মারিয়াছে—

নাসিকা বয়ান বাটে না বহে অনিল।
তবু ভূমে হাঁটু পেতে উভ মারে কিল॥
কিলিয়া বধিনু বাঘে দেখসিয়া ভাই।
সেন বলে ভাই তোর বলিহারী যাই॥

ধর্মমঙ্গল —ঘনরাম, পৃঃ ১০৩

বারুইপাড়ার বারুইরা যখন লাউসেনকে মারিতে আরম্ভ করিল তখনও কর্পূর তাহার চিরাচরিত পন্থা অনুসরণ করিয়া পলায়িত, অবশ্য এবার আর গাছের ডালে নয়, নলবনে। লাউসেন বিপন্মুক্ত হইয়াছে জানিয়া আস্তে আস্তে সে আত্মপ্রকাশ করিল। মিথ্যা বলিবে না এমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সে নয়। অম্লান বদনে সে বলিয়া ফেলিল, সে গৌড়ে সৈন্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল, লক্ষ সেনা লইয়া সে আসিতেছিল, পথে লাউসেনের বিজয়-সংবাদ শুনিয়া সে তাহাদিগকে এইমাত্র বিদায় দিয়া আসিতেছে—

কর্পূর বলেন যবে বন্দি হল ভাই।
রাতারাতি গৌড় গিয়াছিনু ধাওয়া ধাই॥
বাজারে আন্দাশ করি জামাতি লুঠিতে।
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥

ঐ—পৃঃ ১১৩

কর্পূর, বাঘ কুমীর কিংবা বীরপুরুষদের সহিত যুদ্ধ করিতে কিঞ্চিৎ ভীত হইতে পারে, কিন্তু অবলা নারীদের কাছে সে পরাক্রম প্রকাশ করিতে ভয় পায় এমন অপবাদ কেহই তাহাকে দিতে পারিবে না। বারুইপাড়ার জোয়ান পুরুষদিগকে সে হয়তো একটু ভয় করিতে পারে কিন্তু অপরাধিনী বারুই নারীকে শাস্তি দিতে সে তৎপর হইবে না কেন? সেই নারীর নাক কান কাটিয়া যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। ভাজনবুড়ী ও সুরিক্ষার বেলাতেও কর্পূরই শাস্তি দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কাহাকেও চড়

মারিয়া, কাহাকেও বা চুল ধরিয়া ভূমির সঙ্গে ঘষিয়া সে যথেষ্ট সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। কর্পূরের আচরণ এইভাবে আদ্যন্ত আমাদের অন্তর কৌতুকে ভরপূর করিয়া রাখে।

(ধর্মমঙ্গলের আর একটি হাস্যবহ চরিত্র ধুমসী। ধুমসী কানড়ার দাসী—বীরাঙ্গনার প্রকৃত বীর সহচরী। ধুমসীর বীরত্বের প্রথম পরিচয় পাই গৌড়েশ্বরের ভাটকে অপমান করিবার কালে। ভাট কানড়ার সহিত বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরের বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছে। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কানড়া ধুমসীকে আদেশ করিলেন ভাটকে ডাকিয়া আনিবার জন্য। ধুমসীর চেহারা ভাট কেন যে কোন সাহসী লোকের বুক দুরু দুরু করিয়া তোলে—

বদনে দিলেক ফেলে রেক টাক চালু।
করিবর প্রভা কিংবা কাপাসের মালু॥
অধরে দশন দাবে উড়াপাক খায়।
চাকপারা চক্ষু দুটা চৌদিকে ঘুরায়॥
চরণের দাপটে পাষাণ হয় চুর।
দেখিয়া ভাটের বুক করে দুর দুর॥
না জানি কি কবে আজি রক্ত মুখা মাগী।
বিদেশে পরাণ গেলে বনিতা অভাগী॥

ধর্মমঙ্গল—মাণিক গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৩৯

এই রক্তমুখী খাণ্ডারিণীর হাতে ভাটের যে অবস্থা হইল তাহা অত্যন্ত শোচনীয়ঃ—

ধুম ধুম ধুমসীর কিলের পরিপাটি।
দশ হাত কেঁপে গেল সিমুলের মাটি॥
চট চাট চাপড় সে গত চারি ভিতে।
ভূতলে পড়িয়া ভাট ভাবে ভূতনাথে॥
জামা যোড়া পটুকা পাগড়ি গেল উড়ে।
সিনি হার স্থচেল সকলি নিল কেড়ে॥
লঘু ডেকে নাপিত করায় পাঁচ চুল্যা।
সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেল্যা॥ ঐ, ১৩৯

ধুমসীর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব মহামদ পাত্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে। দুর্বৃত্ত মহামদ বার বার লাউসেনকে ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং

লাউসেনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার রাজ্য পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এখানেই বোধ হয় তাহার পাপের ভরা ডুবিল। কানড়া ও ধুমসীর বীরত্বে মহামদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইল। কানড়া মামাশ্বশুরকে বধ করিতে উদ্যত হইলে মহামায়ার নিষেধে নিবৃত্ত হন, কিন্তু ধুমসী তাহাকে ছাড়িল না। তাহার হাতে মহামদের উচিত শাস্তি হইল।

দাসীরে ঠেকায়ে দিতে দিল ঘাড় নাথা।
ভিজায়ে ঘুড়ীর মুতে মুড়াইল মাথা॥
বাইশ বিটল ভোতা বাদাইল ক্ষুর।
পীড়ায় পাত্রের প্রাণ করে ত্বর ত্বর॥
ছেঁড়া জুতা গলায় গাঁথিয়া দিল মালা।
কেহ বলে এই ভেড়ে ভূপতির শ্যালা॥
এক গাল চুণ দিল আর গালে কালী।
কেহ মারে নাথা মুথা কেহ দেয় তালি॥
কেহ বলে উহার বদনে লাগুক ভস্ম।
ঐ বেটা মজাইল সেনের সর্বস্ব॥
ঠক বলে মাথায় ঠোকার কেহ মারে।
গলায় বাঁধিয়ে দড়ি ফিরায় সহরে॥

ধর্মমঙ্গল, পৃঃ ২৫৩

রামায়ণ

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধির কারণ মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়,[১] কারণ তাহাদের উৎসাহে ও আনুকুল্যেই দীনা-হীনা বঙ্গভাষা সকলের আদর ও গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিল। অবশ্য দীনেশবাবুর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধুনা অনেকে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। তবে একথা সত্য যে মুসলমান সুলতান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণনায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ফলে ঐ সব গ্রন্থের বিষয়রস বঙ্গের সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ ও ভোগ্য হইয়া উঠিল।

আমরা সর্বপ্রথম অনূদিত রামায়ণ লইয়াই আলোচনা করিব। বহু অনুবাদক সংস্কৃত রামায়ণ বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পথিকৃৎ হইয়াছিলেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস শুধু কেবল সর্বপ্রাচীন অনুবাদক নহেন, তিনি সর্বপ্রসিদ্ধও বটে। তাঁহার রামায়ণের ন্যায় জনপ্রিয় পুস্তক সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে আর একখানিও নাই। বাল্মীকি রামায়ণের সহিত সাধারণ বাঙালীর কোন পরিচয় নাই। কৃত্তিবাসই তাহাদের ঘরে ঘরে শ্রীরামের পুণ্যকাহিনী হাসিতে অশ্রুতে মিশ্রিত করিয়া পরিবেষণ করিয়াছেন।[২] অবশ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের ভাবানুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাস বাঙালী মনের রুচি ও রসগ্রাহিতা অনুযায়ী তাঁহার রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার গ্রন্থ বাঙালীর কাছে এত প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালী শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্যই তিনি তাঁহার রামায়ণের বহু স্থানে

১। 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ৭২ (অষ্টম সংস্করণ)।

২। কবি রাজকৃষ্ণ রায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

সংস্কৃত অনভিজ্ঞ যে সকল নর।
অথচ পড়িতে চাহে রাম-গুণগান।
তব রামায়ণ পড়ি পুলকিত প্রাণ
হইয়া কৃতজ্ঞ হয় তোমার গোচর॥

অনেক হাস্যপরিহাসের অবতারণা করিয়াছেন। বাঙালী সমাজের মৃত্তিকা হইতে তিনি হাস্যরসের অফুরন্ত ধারা নিষ্কাসিত করিয়াছেন, সুতরাং সমাজের সহিত এই হাস্যরসের সম্পর্ক নাই। তাঁহার হাসি কোথাও বক্র শ্লেষোক্তিতে শাণিত, কোথাও দীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল এবং কোথাও বা উদ্ভট কৌতুকে উচ্ছ্বসিত। কৃত্তিবাসের সমাজ এখনকার শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী সমাজের ন্যায় ছিল না। তখন কথায় কথায় মাষ্টারী রুচি আসিয়া হাসির গলা টিপিয়া ধরিত না। সেজন্য স্থূল ও অশ্লীল হাস্যে শ্রোতাদের চিত্তবৃত্তির উদ্দাম বিলাস ঘটিত। হনুমানের সুদীর্ঘ লেজের বাহার ও শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদের ফলে বিকট আকৃতি দেখিয়া এবং কুম্ভকর্ণের নাসিকাগর্জনের তাণ্ডব শুনিয়া তাহারা হাসিতে গড়াইয়া পড়িত। রামায়ণের খণ্ড খণ্ড কাহিনী লইয়া যে অসংখ্য পালা ও গান আমাদের দেশে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও শ্রোতাদের রুচিকর অনেক হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের সমাবেশ করা হইত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকস্থলে নিছক হাস্যকৌতুকের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ একটি প্রসিদ্ধ কৌতুকজনক ঘটনা। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অকালে ভঙ্গ করা প্রয়োজন হইল, কিন্তু তাহা কি সহজ ব্যাপার! যেমন কুম্ভকর্ণ, তেমনি তাহার ঘুম। কৃত্তিবাস এই বিজাতীয় ঘুমের খুব সরস বর্ণনা করিয়াছেন—

রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন।
নাকের নিঃশ্বাস যেন প্রলয় পবন॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিঃশ্বাসে॥
টানিয়া নিঃশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতক ঢোকে নাকের ভিতর॥
যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ॥
অঙ্গভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই॥

কুম্ভকর্ণের নাসিকাগর্জনের মধ্যেও কি ম্যাজেষ্টিক ভাব—

বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥

শাঁখ নাক গর্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হ'য়ে থাকে স্তব্ধ॥

কুম্ভকর্ণের ভোজনও একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার—

শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি॥
মদ্যপান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তেরশত পশু খায় একেবারে॥

এত খাইয়াও কুম্ভকর্ণের তৃপ্তি নাই, যুদ্ধে যাইবার সময় সে আরও খাইতে চায়—

যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খেতে চায়।
রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষসে যোগায়॥
বহুদিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উজাড়িল শত শত হাঁড়ি॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান॥
মহারক্ত কত খাইল, সংখ্যা নাহি হয়।
পালে পালে শূকর মনুষ্য কুড়ি ছয়॥

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তো মহামারী কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। বানর-প্রবরেরা যুদ্ধে আঁটিতে না পারিয়া এক অভিনব উপায়ে কম্ভকর্ণকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিল। লক্ষ্মণের উপদেশে তাহারা কুম্ভকর্ণের কাঁধে চড়িয়া মহা নাচ স্বরু করিল—

লক্ষ্মণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর॥
কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুর দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে॥

কিন্তু এই সব নটবর বানরেরা কুম্ভকর্ণের কাছে বেশি সুবিধা করিতে পারিল না। কুম্ভকর্ণ বানরদিগকে ধরিয়া ধরিয়া বেদম আছাড় মারিতে আরম্ভ

করিল। তখন বড় বড় বানরের বড় বড় পেট হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা যঃ পলায়তি স জীবতি—এই নীতি অনুসরণ করিল—

দেখিয়া অঙ্গদ হনূমানে লাগে ডর।
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠি দিল রড়॥

বানরগণ বড় বড় রাক্ষসের সহিত তেমন সুবিধা করিতে না পারিলে কি হয় রাক্ষসবধূদের কাছে তাহারা বেশ প্রতাপ দেখাইতে পারে। দ্বিতীয়বার লঙ্কা দাহ করিতে যাইয়া তাহারা ইহার প্রমাণ দিয়াছে—

অন্তঃপুর নারী দেখি বানরের রঙ্গ।
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলঙ্গ॥
অঞ্চল ধরিয়া দন্ত খিঁচাইয়া উঠে।
বস্ত্র ফেলে যুবতী পালায় সব ছুটে॥
কিচ কিচ দন্ত করে, খিল খিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী॥

বানরেরা যে মানুষের পূর্বপুরুষ তাহা তাহাদের রসিকতা হইতেই বুঝা যায়। অগ্নির ভয়ে জলে পলাইয়াও রক্ষা নাই, সেখানেও বানরদের নির্মম রঙ্গরস। বীর হনুমানও অবলা নারীদের সঙ্গে কৌতুক করিয়া মজা পাইতেছে—

লঙ্কার ভিতরে যত ছিল বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি॥
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবরে শোভে যেন শত শতদলে॥
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনূ মহাবল।
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়ায় কুন্তল॥
জলেতে ডুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ।
মুখে অগ্নি দিয়া হনূ দেখিছে কৌতুক॥[১]
ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে।
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে॥
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায় বদন।[২]
লাফ দিয়া উঠে চালে পবন-নন্দন॥

১। হনুমানের নিজের মুখ পুড়িয়াছে বলিয়া সে সকলের মুখই পোড়াইতে চায় আর কি!
২। আমার কথার সত্যতা আরো প্রমাণিত হইতেছে।

বানরগণ যেমন রণ-রসিক তেমনি ভোজন-রসিকও বটে। লঙ্কাজয়ের পর যখন রামচন্দ্র সসৈন্যে-দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন। বহুদিন পরে নানাবিধ চর্ব্য, চুষ্য লেহ্য, পেয় খাদ্যাদি পাইয়া বানরগণের আহ্লাদের আর সীমা নাই, লোভের মাথায় সেদিন খাওয়াটা একটু অধিক পরিমাণেই হইয়াছিল, তাই খাওয়ার পরে তাঁহাদের অবস্থাটা একটু করুণ হইয়া পড়িয়াছিল—

দেবযোগ্য ভক্ষ্যভোগ রসাল সুমৃদু।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু॥
আকণ্ঠ পুরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে॥
উর্ধ্বদৃষ্টে রহে সবে, নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে চিত হ'য়ে শুইলেক খাটে॥

(হাস্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক দেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক প্রভৃতির মধ্যে হাস্যের উপাদান নিহিত রহিয়াছে। কৃত্তিবাস বাঙালী ছিলেন এবং তাহার হাস্যরসের উৎসও বাঙালী সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বাঙালীর ঠাট্টা রসিকতার যে বিশিষ্ট ভঙ্গি ও ভাষা রহিয়াছে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে তাহাই বিদ্যমান। রামায়ণের অনেক স্থানেই বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে ও মন্তব্যে হাস্যরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে এই সব উক্তি কোন কোন স্থলে কোমল ও পরিহাস-স্নিগ্ধ আবার কোথাও বা ধারাল ও বিদ্রূপ-নিষিক্ত। বিবাহ-বাসরে রঙ্গ-রসিকতা বাঙালী সমাজের চির-প্রচলিত প্রথা।) রাম-সীতার বিবাহবাসরেও রামচন্দ্রের সহিত নারীদের কৌতুকময় বাক্যালাপ হইয়াছিল—

পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকী-পতি এ নহে উচিত॥
এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী, তুমি হে বড় কাল॥

রামচন্দ্রের উত্তরও চমৎকার—

হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদি, ১০৮

সীতার অন্বেষণে আসিয়া হনুমান লঙ্কার মধ্যে তো ভীষণ তোলপাড় আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে ইন্দ্রজিৎ তাহাকে বন্দী করিল, কিন্তু বন্দী হইয়া হনুমানের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। বরং তাহার রসিকতা যেন অনেক বাড়িয়া গেল। দেহটি সত্তর যোজন করিয়া সে পড়িয়া রহিল। তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে সে হুকুম দিল—

হনূমান বলে, তোরা বাজারে দামামা।
রাজ সম্ভাষণে যাব, কান্ধে কর আমা॥

ঐ, সুন্দর—২৯৮

তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে রাক্ষসদের অবস্থা বড়ই কাহিল হইয়া পড়িল। দুই লক্ষ রাক্ষস কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে হিমসিম খাইয়া গেল। কিন্তু অকৃতজ্ঞ হনুমান প্রতিদানে যে কাণ্ড করিল তাহা অবর্ণনীয়। কৃত্তিবাসের বর্ণনা শুনুন—

দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্ধে করি নিল।
সাঙ্গিতে বসিয়া হনূ আনন্দে চলিল॥
যাইতে যাইতে বীর দিতেছে দাবড়ি।
ধীরে ধীরে চল যেন টলিয়া না পড়ি॥
মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে॥
রাক্ষস বলে, দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে।
হনূ বলে, দেবতা নয় মুতেছি ভাই ত্রাসে॥
আছাড়িয়া হনূমানে ফেলিল তথাই।
হনূ বলে, মোরে আর কেন মার ভাই॥

ঐ, সুন্দর—২৯৯

রাবণের সম্মুখে যাইয়া হনুমান রাবণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া রহিল, কারণ সে রাবণকে রাজা বলিয়া স্বীকারই করিতে চায় না। রাবণ কোথায় কোথায় যুদ্ধে হারিয়াছে ও জব্দ হইয়াছে সে সব বিষয় উত্থাপন করিয়া সে রাবণকে বিদ্রূপ করিল। কিন্তু রাক্ষস হইলেও রাবণের sense of humour ছিল, তাই হনুমানের কথায় সে রাগ করিল না, হাসিল—'হাসিতে লাগিল রাবণ হনূর কথা শুনে।' হনুমানকে দেখিতে রাবণের অন্তঃপুরের সকল নারী ছুটিয়া আসিল। নারীদের মধ্যে হনুমানের রসিকতা খোলে ভালো ইহার

অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। এস্থানেও রসিকপ্রবর এত রমণীর সন্নিধানে চূড়ান্ত রসিকতার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। রাবণের রমণীরা হনুমানের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হনুমানের জবাবে তাহারা আচ্ছা জব্দ হইয়া গেল। কৃত্তিবাসের বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

হাসি হাসি হনূমানে কহে নারীগণ।
ফুলের মালায় তুমি ভুবনমোহন॥
হনূমান বলে, ইহা নাহি জান নারী।
রাবণের কন্যা আছে পরম সুন্দরী॥
কুলীন ভাবিয়া বিভা দিবেক আমারে।
বিভা নাহি করি, তাই বান্ধিয়াছে করে॥
অপরূপ রূপ মোর করিয়া দর্শন।
আমারে জামাই করে, ইচ্ছিল রাবণ॥
এই দেখ বরমাল্য রহিয়াছে গলে।
জোর করে পিতা মোর দিবে সভাস্থলে॥
এখনো পণের কথা কিছু উঠে নাই।
এ হেন বরের পণ, লঙ্কা দেখি ছাই॥
আমি ত বানর জাতি, রাবণ রাক্ষস।
এহেন সম্বন্ধ হলে রাবণেরি যশ॥
পরম কুলীন আমি মৌলিক রাবণ।
কুলীনে মৌলিকে বিভা কিবা সুশোভন॥
রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী।
সুন্দরী শাশুড়ী পাব রাণী মন্দোদরী॥
ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর।
আর কি হনূর ভাগ্যে হয় অতঃপর॥
প্রমীলা শালাজ পাব পরমা রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি॥
কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর।
ইহা জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর॥

ঐ, সুন্দর—৩০১

কিন্তু হনুমানের মুখে এত মধুর বচন শুনিয়া রসিকা রমণীদের রস কমে না। তাহারা আবার বলিতেছে—

এতশুনি হাসি হাসি বলে নারীগণ।
ঠাকুর জামাই হ'লে, নাচ ত এখন।
ঠাকুরঝির হবে সুখ হেরিলে বয়ান।
লাঙ্গুল হেরিলে তার জুড়াবে নয়ান॥

হনুমানের উত্তর—

হনূ বলে, দণ্ড তুই থাক নারীগণ।
কত নাচ দেখাইব, কে করে গণন॥[১]
আমায় নাচের চোটে কাঁপিবে মেদিনী।
কত সুখ পাবে মনে, বুঝে লবে ধনী॥

(কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্তর্গত হনুমান-রায়বার অংশে কৃত্তিবাসের সুপ্রচুর হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।)

হনুমান-রায়বারের পর অঙ্গদ-রায়বার। হনুমান-রায়বারে তরল পরিহাস ও কোমল রসিকতা বিদ্যমান কিন্তু অঙ্গদ-রায়বারে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের উগ্র জ্বালা মিশিয়া রহিয়াছে। পরস্পরের প্রতি কটু কটাক্ষ ও তিক্ত তিরস্কার প্রয়োগ করিয়া রাবণ ও অঙ্গদ যে বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছে তাহা কলহরসিক বাঙালী পাঠক ও শ্রোতার কাছে যে চিরকাল পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই রকম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও গূঢ় শ্লেষাক্ত বাক্যের লড়াই পরবর্তী কালে কবি ও তর্জাগান প্রভৃতিতে দেখানো হইত। শ্রীরাম ও বিভীষণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অঙ্গদ রাবণের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃত্তিবাস কৌতুকে উৎফুল্ল হইয়া অঙ্গদের আগমনের বর্ণনা দিয়াছেন—

রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥
রাজার রক্ষক যত সাক্ষাৎ তক্ষক।
রড়ে যথা ভক্ষ লক্ষি সমক্ষে ভক্ষক॥[২]

ঐ, লঙ্কাকাণ্ড—৩৪৯

১। হনুমানের কথার শ্লেষ লক্ষণীয়।

২। অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া কৃত্তিবাস যে কৌতুকরস উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়।

অঙ্গদকে দেখিয়া রাবণ বোধ হয় একটু মজা করিবার জন্যই সভার সকল লোককে নিজের মূর্তি পরিগ্রহ করাইয়া বসিয়া রহিল। কেবলমাত্র ইন্দ্রজিৎ স্বমূর্তিতে আসীন ছিল। অঙ্গদ মহা ফাঁপরে পড়িল, কিন্তু বেয়াকুব হইবার পাত্র সে নয়। তীব্র বিদ্রূপের আঘাতে সে ইন্দ্রজিৎকে অস্থির করিয়া তুলিল—

অঙ্গদ বলে, সত্য করে কও রে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে, সবাই কি তোর পিতা॥

* * * * *

ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য রে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমন রাখে॥

ঐ, লঙ্কাকাণ্ড—৩৫০

অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে এমনভাবে বাপান্ত করিতে লাগিল যে রাবণের পক্ষে অপমান সহ্য করিয়া আর বেশিক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল—

রাবণ বলে, শোন ওরে বানরা তোরে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে॥

ঐ, লঙ্কাকাণ্ড—৩৫১

কিন্তু রাবণের ক্রোধ অঙ্গদ গ্রাহ্যই করিল না—

অঙ্গদ বলে, তোর ভয়েতে থরথরায়ে কাঁপি।
এখন এমন ধর্ম কথা, মর রে বেটা পাপী॥
তুই কোন্ ঠাকুরের বেটা, তোর ভয় কি।
আমি কে জানিস না তুই, শোন পরিচয় দি॥

ঐ—৩৫১

অঙ্গদ সেই বালির পুত্র। বালির কথা কি রাবণের মনে নাই? গলায় হাত দিলেই বোধ হয় কোন চিহ্ন টের পাইবে—'হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন।'

অঙ্গদের মুখে রামের কথা শুনিয়া রাবণ কপট ভয়ের দ্বারা রামের প্রতি গভীর উপেক্ষা প্রদর্শন করিল—

রাবণ বলে, বল্লি কি রাম লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি বা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে॥

রাবণ রামচন্দ্রকে ক্ষমা করিতে পারে যদি তিনি যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেন। সেতুবন্ধ ভাঙিয়া বৃক্ষপ্রস্তরসমূহ যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে। বিভীষণকে ক্ষমা চাইতে হইবে এবং ঘরপোড়াকে ধরিয়া দিতে হইবে, স্বয়ং রামকে ধনুর্বাণ ফেলিয়া নাকে খত দিতে হইবে।

রাবণের কথা শুনিয়া অঙ্গদ মনে মনে হাসিয়া বাহিরে রাবণের বশ্যতা স্বীকারের যে ভান করিল তাহাতে তীব্র ব্যঙ্গই প্রকট হইয়া উঠিল—

অঙ্গদ বলিছে, রাবণ আমরা তাই চাই।
কচকচিতে কাজ কি, মোরা দেশে ফিরে যাই॥
রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥

ঐ—৩৫২

ইহার পর অঙ্গদ রাবণকে যথেচ্ছ কটূকাটব্য করিয়াছে। রাবণের উত্তর কিন্তু সংক্ষিপ্ত—

রাবণ বলে, বানর তোর মুখে পড়ুক ছাই।
আমার জন্য দুঃখ পেয়ে মরবি কেন ভাই॥
আমার তরে তোরা কেন ধরবি রামের পায়।
যুদ্ধ করে মরব জানি, তোর বাপের কি দায়॥

অঙ্গদ খুব কড়া উত্তর দিতেছে—

হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোনরে বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীর্তি কল্পতরু॥
নৈলে বেঁচে থাকতে তোরে সাধ করে কি বলি।
লোকে বলবে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি॥
ঘুষিবে বাপের মোর কীর্তি জগন্ময়।
তাই দিনকতক বাঁচলে ভাল হয়।

অঙ্গদের রায়বারে এই পর্যন্ত শ্লেষ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়া রাবণ ও অঙ্গদের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছিল, কিন্তু ইহার পর উভয়ের মনের মধ্যেই পরস্পরের

প্রতি ক্রোধ সঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেজন্য শীঘ্রই অন্য সব ক্ষেত্রে যাহা হয় তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ, রসিকতা শেষ পর্যন্ত গালাগালিতে পরিণত হইল। উত্তেজিত রাবণ বলিল—

পুত্র হ'য়ে তুই তার কোন কর্ম কৈলি।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি॥
ধিক্ ধিক প্রাণে তোর মা যার কুলটা।
লোকেতে নিন্দিত হ'য়ে বাঁচে কেন সেটা॥

গালাগালিতে অঙ্গদও কম যায় না, রাবণের অশ্লীল মন্তব্য সে সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিয়াছে—

অঙ্গদ বলিছে ঠিক মা মোর কুলটা।
সত্য করে বল দেখি তুই কার বেটা॥
জন্ম তোর ব্রহ্মবংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তুই পৌলস্ত্যের নাতি॥
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যাঁর যশঃ।
তুই তাঁর বেটা তবে কেনরে রাক্ষস॥
মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব দুহিতা॥
কুম্ভনসী ভগ্নী তোর দৈত্য নিল হ'রে।
কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে ক'রে॥

আমরা যাহাকে পছন্দ করি না তাহার বিকৃতি ও লাঞ্ছনা দেখিয়া আমরা কৌতুক বোধ করি। এখানে কৌতুক বিশুদ্ধ নহে এবং ইহা নিরপেক্ষ মনেরও উপভোগ্য নহে, এখানে আমাদের সংস্কার ও ন্যায়নীতিবোধই কৌতুকের মধ্য দিয়া তৃপ্তি লাভ করে। কুঁজী, সূর্পনখা প্রভৃতি চরিত্রের লাঞ্ছনা বাঙালী শ্রোতা ও দর্শক চিরকাল পরম প্রসন্নতার সহিত উপভোগ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন কুঁজীকে যে শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা কুঁজী ছাড়া অন্য যে কোন লোককে দিলে তাহাতে আমাদের করুণার উদ্রেক হইত, যথা—

শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীকে সে ফেলে ভূমিতলে॥
হিছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে॥

মরি মরি বলি কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল সে কৈকেয়ী ঘরে ঢোকে॥

বিধবার ভালোবাসা লইয়া আধুনিক লেখকগণ কতই না সহানুভূতি দেখাইলেন, অথচ রামায়ণের কবি বিধবা সূর্পনখার প্রতি একবিন্দু সহানুভূতিও দেখাইলেন না। সূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ লইয়া তিনি আচ্ছা পরিহাস করিবেন অথচ রাম ও লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করিতে যাইয়া সে যে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা সহ্য করিল তাহা করুণ রসের উপাদান হইতে পারিত। রামায়ণকার রাবণের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা করিয়া শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের কম চেষ্টা করেন নাই। হরধনু ভঙ্গ করিতে জনকরাজার পুরীতে যাইয়া রাবণ কিভাবে ব্যর্থ হইল তাহার সরস বিবরণ পাওয়া যায় রামায়ণে—

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জয় ধনু অন্তরে ডরায়।
মনে ভাবে আমার ঘুচিল জারিজুরি।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখে আস্ফালন।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন॥
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে॥

রাবণ তো ধনুকখানি একটু নাড়িতে না পারিয়া করুণ দৃষ্টিতে মামা প্রহস্তের দিকে তাকাইল। মামা ভাগিনেয়কে খুব উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং শরীরের সব বল প্রয়োগ করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিতে বলিল। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। বেগতিক দেখিয়া উভয়ের রথে করিয়া চম্পট। কৃত্তিবাস এই পলায়নের দৃশ্যটি লইয়া পরিহাস করিতে ছাড়েন নাই—

আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥

বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুকে এড়িয়া ॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী ॥

রাবণ অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, অনেক জয় পরাজয়ই তাহার ঘটিয়াছে। কিন্তু বালির সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া সে যতখানি নাস্তানাবুদ হইয়াছে, অন্য কাহারও কাছে ততখানি হয় নাই। রাবণ তো বালির সহিত যুদ্ধ করিতে গেল, কিন্তু বালি যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই করিল না, সে পরম নিষ্ঠাবান সাধক, সাগরের তীরে যাইয়া প্রশান্ত চিত্তে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে লাগিল। রাবণের সম্বন্ধে তাহার কোন চাঞ্চল্যের কারণ ছিল না, তাহাকে শুধু কেবল লেজে বাঁধিয়া সে একটু সাত সাগরের জল খাওয়াইয়া দিল—

পূর্বদিকে সাগর যোজন চারি শত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত ॥
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোকে হাসে ॥
লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূর্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতালি।
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি ॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন।
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্বজন ॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে।
পশ্চিম সাগরে বালি গেল তার পরে ॥
ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥

লঙ্কাকাণ্ডে অনেক যুদ্ধ বর্ণনা আছে, কিন্তু সেই সব বর্ণনা অনেক স্থলেই বীররস কিংবা করুণরস উদ্রেক না করিয়া শুধু কেবল হাস্যরস উদ্রেক করে। বানরগণের বীরত্ব ও যুদ্ধরীতি সর্বত্র একটা মজার প্রহসন বলিয়া মনে হয়। কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পলায়নতৎপরতা দেখিয়া যেমন হাসি পায়,

ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র-বহির্ভূত ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া তেমনি কৌতুক বোধ করিতে হয়। রামায়ণের শ্রোতাগণ যখন রামায়ণ কাহিনী শুনিতেন তখন কোন গভীর রসাবেগে আলোড়িত না হইয়া হাস্যকৌতুকের টুকরা টুকরা বর্ণনা শুনিতেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। রামায়ণে করুণরস অনেক স্থলেই আছে কিন্তু সেই করুণ রসপ্রবাহের সহিত হাস্য-কৌতুকের হাল্কা ফেনা অবিরাম ভাসিতে ভাসিতে শ্রোতাদের চিত্ত রঞ্জিত করিয়াছে।

মহাভারত

রামায়ণে যেমন হাস্যকৌতুকের প্রাচুর্য দেখা যায়, মহাভারতে তেমন দেখা না। রামায়ণে কাহিনীর গতি সুসংবদ্ধ এবং তাহার চরিত্রগুলিও সুবিকাশের সুযোগ পাইয়াছে। সেজন্য রামায়ণকার তাঁহার কাহিনী ও চরিত্রগুলি লইয়া হাসাইবার ও রসাইবার অবকাশ পাইয়াছেন, কিন্তু মহাভারতে একটি চিত্রে রং দিতে না দিতে আর একটি চিত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই চলচ্চিত্রের শোভাযাত্রা দেখিতে দেখিতে আর হাসিবার বিশ্রান্ত মুহূর্ত পাওয়া যায় না। ঘটনার পর ঘটনা এবং চরিত্রের পর চরিত্র আসিয়া কাহিনীকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে, উদ্দেশ্যহীন আবর্তের মধ্যে হাস্যের ফেনোচ্ছ্বাস উদ্গত হইবার আর অবসর পায় নাই। রামায়ণে যুধ্যমান দুইটি পক্ষ হইল বানর ও রাক্ষস। এই বানর ও রাক্ষসের ভাব ও স্বভাব লইয়া কবি যেরূপ অনুকৃতি ও অতিরঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিতে পারিয়াছেন, মহাভারতের কবি তাহার সুযোগ পান নাই, কারণ সেখানে মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষের সহিত স্বাভাবিক মানুষেরই যুদ্ধ হইয়াছে।

মহাভারতের কবি হাস্যরস সৃষ্টি করিবার তেমন কোন সজ্ঞান চেষ্টা করেন নাই এবং তাহার সুযোগও বেশি পান নাই। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ঘটনা ও চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অসঙ্গতি ও উদ্ভটত্বের জন্য সরসতার সৃষ্টি হইয়াছে। অতিরঞ্জন হাস্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। এই অতিরঞ্জন দেখা গিয়াছে মহাভারতের দুইটি চরিত্র প্রসঙ্গে—ভীমসেন ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ। ভীমের বলবীর্য ক্রিয়াকলাপ সবই মহাকাব্যের যথার্থ বীরের ন্যায়, সেজন্য তাঁহার চরিত্রই বোধ হয় মহাভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়। তাঁহার সমস্ত কাজই এমন অসাধারণ ও অতিমানবীয় যে তাঁহার প্রতি সর্বদাই আমাদের একটি আতঙ্ক-মিশ্রিত কৌতুকদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তাঁহার বাল্যক্রীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া হিড়িম্ব, জরাসন্ধ, কীচক প্রভৃতির মৃত্যু ঘটানোর ব্যাপারগুলি এবং দুঃশাসনের রক্ত পান, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ প্রভৃতি অমানুষিক ক্রিয়াগুলি মহাভারতের পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে চিরকালই রোমাঞ্চকর বলিয়া মনে হইয়াছে। যেমন ভীম, তেমনি তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ যেন এক

মূর্তিমান বিপর্যয়। মহাভারতে তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া সত্যই রোমাঞ্চিত হইতে হয়—

সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
তদ্রূপ সে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন॥
পর্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্রের দোসর॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার কর্ণ মহাভয়ঙ্কর॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বীগগন মণ্ডল।
মহানন্দে ঘটোৎকচ হাসে খল খল॥
মুখ দেখি কুরু সৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন॥

(বিনাযুদ্ধেই শত শত কুরুসৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, এই বর্ণনা দিবার সময় মহাভারতকার যে সচেতন কৌতুকবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা কাহারও কাছে অস্পষ্ট থাকে না। মহাভারতের সুশিক্ষিত যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে ঘটোৎকচের যুদ্ধ যেন একটা বেপরোয়া ব্যতিক্রম। তাঁহার মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়াও শত্রুনাশে তাঁহার অন্তিম চেষ্টা দেখিয়া একটু কৌতুক-বোধ করিতে হয়।) পিতা তাঁহাকে কুরুকুল চাপিয়া পড়িতে বলিলেন,—

শুনি তাহা ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ কৈল কলেবর॥
কুরুবল চাপি পড়ে সেই মহাসুর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চুর॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক পড়ে যত নাহি তার অন্ত॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুজন॥

(চরিত্রগত সামান্য দোষ যে হাস্যরসের অন্যতম কারণ তাহা লইয়া পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতের অন্তত দুইটি চরিত্রের কথা প্রথমেই মনে পড়ে যাহাদের দোষ ও দুর্বলতা আমাদের অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুক উদ্রেক করে। তাহারা দুর্দান্ত কিংবা ভয়াবহ নহে, তাহারা শুধু কেবল

হাস্যাস্পদ। তাহারা হইল শকুনি ও কীচক) তাহাদের অপরাধ ক্ষত্রিয়োচিত নহে, তাহাতে কোন গম্ভীর গুরুত্ব নাই, তাহাতে রহিয়াছে লঘু নীচতা। শকুনির কথাই প্রথমে ধরা যাক। শকুনি দুর্যোধনের মামা, সম্বন্ধটি চিরকালই রসাল। আধুনিক রাজনীতিতে রণনীতি অপেক্ষা যেমন কূটনীতিরই প্রাধান্য, শকুনির রাজনীতিতেও আমরা তেমনি এই কূটনীতিরই নিরঙ্কুশ মহিমা দেখিয়াছি। দুর্যোধনের পক্ষে আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ছিলেন রণনীতিবিশারদ, রণক্ষেত্রেই তাঁহারা দুর্যোধনের সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু শকুনির স্থান ছিল প্রধানত নিরাপদ ও নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে, এবং দুর্যোধনও যে অনেক সময় তাঁহার মামার মন্ত্রণাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্য দিতেন তাহার প্রমাণ তো আমরা মহাভারতেই পাইয়াছি। অবশ্য পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণও সেরা কূটনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্মসংস্থাপক, লীলাবিলাস-ভগবানের অবতার; এজন্য তাঁহার কূটনীতি ভগবানেরই দুর্জ্ঞেয় ও অলঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু শকুনি ভীরু, কপট, ছলনাশ্রয়ী এক নীচ চরিত্র মাত্র। তাঁহাকে ভয় করিয়া মর্যাদা দেওয়া যায় না, হীন ভাবিয়া উপেক্ষা করিতে হয়, তাঁহার পটুতা শুধু পাশা খেলায়। পাশাখেলা ক্ষত্রিয়ের অবিধেয় না হইতে পারে কিন্তু শ্লাঘনীয় নহে। শকুনি যুদ্ধক্ষেত্রের বিপজ্জনক এলাকা সাধ্যমত এড়াইয়াই চলিতেন; অবশেষে অন্যান্য সব বীর যখন হতাহত হইলেন তখন, অগত্যা তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইল। বেচারার তখন কি শোচনীয় মানসিক অবস্থা! যুদ্ধ থামাইবার জন্য তাঁহার কি কাকুতি-মিনতি। দুর্যোধনকে বলিতেছেন—

দেখি ক্ষমা দেহ এবে ওহে কুরুরাজ।
শেষ রক্ষা করি থাক যুদ্ধে নাহি কাজ॥
কর্ণ আদি করি দর্প কি করিল তব।
আগ পাছ না গণিয়া নষ্ট কৈল সব॥

দুর্যোধন এই সব উপদেশ শুনিয়া সম্ভবত একটু হাসিলেন, বলিলেন—

মাতুল বচন শুনি কহে কুরুরায়।
বুঝিনু মাতুল তুমি পাইয়াছ ভয়॥
এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার।
তবে বুঝি কদাচিৎ মৃত্যু নাহি আর॥

*   *   *   *

ভাবিয়া দেখহ মনে কিসের শোচন।
সংগ্রামে দেখাও তুমি নিজ পরাক্রম॥

হায়রে, শকুনির ভাগ্য এবার সত্যই বিরূপ! পাশা ছাড়িয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে কশা ধরিতেই হইল। মৃত্যুর পূর্বে শকুনি আত্মরক্ষার এক শেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহদেবের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধে প্রাণপণ লড়িয়াও যখন সে হতাশ ও ভগ্নরথ হইয়া পড়িল তখন সে এবার পলায়নের চেষ্টা করিয়া দেখিল। কিন্তু তখন চারিদিক হইতে যে সব বিদ্রূপ বাণ নিক্ষিপ্ত হইল সেগুলি লৌহবাণ অপেক্ষা অধিক শাণিত। মহাভারতের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল—

বিরথী হইয়া বীর রহিল দাঁড়ায়ে।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়ে॥
রথ হতে লাফ দিয়ে পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পৃষ্ঠ দিয়া চলে॥
চঞ্চল চরণ গতি নাহি বুদ্ধিবল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল॥
ধিক ধিক ক্ষত্র হ'য়ে পলাইস কেনে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রাম মরণে॥
অবলার প্রায় যাস ছাড়ি বীরপণা।
মরণ এড়াবি হেন না কর ভাবনা।

আমরা কল্পনা করিতে পারি, এই বিদ্রূপে শুধু কেবল পাণ্ডব সৈন্যগণ যোগ দেয় নাই। স্বয়ং মহাভারতকার এবং তাঁহার শ্রোতাগণও বুঝি যোগ দিয়াছেন। শকুনিকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফিরিতেই হইল, কিন্তু এবার শেষ শাস্তির জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। এই শাস্তি এত নিষ্ঠুর যে এই নীচাশয় লোকটির প্রতিও একটু অনুকম্পা বোধ না করিয়া পারা যায় না।

মহাভারতের আর একটি হাস্যাস্পদ চরিত্র হইল কীচক। কীচক শ্যালক ও সেনাপতি। তাহার যেমন আদর তেমনি মর্যাদা। কিন্তু কুক্ষণে কীচক দ্রৌপদীকে দেখিয়াছিল। দ্রৌপদীকে অপমান করিয়া দুর্যোধন, দুঃশাসন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল আর কীচক তো কিঞ্চিৎ মাত্র। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিকার চিরকাল ভীমসেনই করিয়াছিলেন, এবারও তিনি করিলেন। দ্রৌপদীর সহিত পরামর্শের পর ঠিক হইল, নৃত্যশালায় কীচককে ভুলাইয়া আনিয়া হত্যা করিতে হইবে। এখানে মহাভারত রচয়িতা নিছক ঘটনাবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে

একটু কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বহ্নিমতী যাজ্ঞসেনীকে এখানে দেখিলাম এক রঙ্গবিলাসিনী রমণী রূপে। কামার্ত কীচকের কাছে যাইয়া তিনি বলিলেন,—

কৃষ্ণা বলে তব বশ হইলাম আমি।
আছয়ে গন্ধর্ব কিন্তু মোর পঞ্চস্বামী॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার॥

লালসায় অন্ধ হইলে প্রতারণা করিবার সহজ বুদ্ধি লুপ্ত হয়, কীচকের বুদ্ধিও এখানে লুপ্ত হইল। দ্রৌপদীর সহিত মিলনের যে রোমাঞ্চিত প্রস্তুতি ও প্রত্যাশার বর্ণনা কীচকচরিত্রের মধ্যে কাশীরাম দাস দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতুকময় হইয়াছে—

নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্যরত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥

এদিকে নৃত্যশালায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃকোদর সৈরিন্ধ্রীর বেশ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। (স্বয়ং ভীম ধরিয়াছেন নারীর বেশ! দৃশ্যটি কল্পনা করিতে গেলেই বোধ হয় কৌতুকের আঘাত মনের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে।) কিন্তু তবুও কামাহত কীচকের চোখে এই ছদ্মরূপের বিসদৃশ বিপর্যয় ধরা পড়িল না। মহাভারতকার একটু কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন—

লোহা হইতে সুকঠিন বৃকোদর কায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায়॥

ইহার পর ভীমের সহিত কীচকের কিছু আলাপও হইল, তথাপি কীচকের মনে কোন সন্দেহ আসিল না। ইহা প্রায় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সৈরিন্ধ্রীরূপী ভীম একটু অভিমান-ভরা অনুযোগ দিয়া বলিলেন, কীচক তাহাকে রাজসভামধ্যে পদাঘাত করিয়াছিলেন, এই দুঃখ কখনও

ভুলিবার নহে। কীচক তখন বিহ্বল অবস্থায় সুখস্বর্গে বিচরণ করিতেছে, এক লাথির পরিবর্তে দশ লাথি খাইতে প্রস্তুত। 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' বলিয়া মাথা পাতিয়া দিল। কিন্তু এবার শিরসি নহে ঘাড়োপরি, এবং পদপল্লব নহে পদবজ্র নামিয়া আসিল। একবার নহে তিন তিনবার। কিন্তু তবুও কীচক অটল, প্রেমের কি নিদারুণ নিষ্ঠা! তবে ভীম আর প্রচ্ছন্ন রহিলেন না, প্রকাশ্য হইলেন। তারপর কীচকের যে অবস্থা হইল তাহা দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

'more sinned against than sinning'.

এত বলি সেই মুখে মারে বজ্রমুষ্টি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুইপাটি॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রীরে করিলি দর্শন।
এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন॥
*　　*　　*　　*
হস্তপদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পূরাইল॥

কীচকের এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের প্রসন্ন হাসি বিষন্ন আঘাত পায়। তবে মহাকাব্যে শাস্তিদানের রীতিই এইরূপ, সেখানে কোন অনুকম্পা নাই, কোন মধ্যবর্তী অবস্থা নাই, সেখানে সবই চূড়ান্ত, সবই প্রচণ্ড। ইউলিসিস তাঁহার স্ত্রী পেনেলোপের প্রণয়ীদিগকে কিভাবে শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে।

মহাভারতে কৌরবদের নানা লাঞ্ছনা ও অবস্থা-বিপর্যয় দেখাইয়া অনেক-স্থলেই কৌতুকরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা দেখিয়া শুধু এক জায়গায় কেবল আমরা কৌতুকবোধ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। অবশ্য সেখানেও আমরা সহানুভূতিশীল থাকি বটে, কিন্তু আমাদের সহানুভূতির মাত্রা এত অধিক হয় না যাহাতে আমাদের কৌতুকবোধ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া যখন হারিয়া গেলেন তখন পাণ্ডবদের অবস্থা দেখিয়া আমরা বেদনাবোধ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকবোধ না করিয়াও পারি না। আর পাণ্ডবদের অবস্থার জন্য তাঁহারা নিজেরাও তো কিছুটা দায়ী। সেজন্য তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা-শীল থাকিয়াও তাঁহাদের দ্যূতাসক্তির জন্য আমাদের মনে একটু প্রচ্ছন্ন

অসমর্থনের ভাব বিরাজ করে এবং সেজন্যই তাঁহাদের দুর্গতিতে কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। (দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবদের কি কি কাজে নিয়োজিত করা হইবে তাহা যখন পরিহাসপ্রিয় কর্ণ সভায় ব্যক্ত করিলেন তখন শুধু সভায় নহে, পাঠকের চিত্তের মধ্যেও সরস কৌতুকের সঞ্চার হয়।) ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অঙ্গ কোমল সেজন্য তিনি শুধু তাম্বূলবাহকের কাজ করিবেন। বৃকোদর ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সেজন্য চতুর্দোল বহন করিতে তিনি অনায়াসেই সক্ষম হইবেন। অর্জুন বস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়া দুর্যোধনের পুরোভাগে চলিবেন, আর নকুল ও সহদেব শুধু দুইপাশে চামর ব্যজন করিবেন। এত অপমানসূচক উক্তি সত্ত্বেও পাণ্ডবেরা ধূলি-আসনে বসিয়া সবই সহ্য করিলেন। (পাণ্ডবেরা আজ পণবদ্ধ, মহাবল হইয়াও বলহীন—অবস্থাটি নিঃসন্দেহে কৌতুকময়।) অসহিষ্ণু ভীমের অবশ্য একটু দন্ত-কড়মড়ি দেখিয়াছি, কিন্তু অবশেষে যুধিষ্ঠিরের সম্মতি না পাইয়া তাঁহাকেও শান্ত হইতে হইল। ইহার পর কৌরবগণ যে হাস্যপরিহাসের অভিনয় চালাইলেন, তাহা কিন্তু আর আমাদের মনে কোন কৌতুক উদ্রেক করে না, তাহা এক লোমহর্ষণ উদ্বেগ ও ক্রুদ্ধ ঘৃণায় আমাদের মন পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া দুর্যোধন ও কর্ণ যে রসিকতা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অশ্লীল ও বিগর্হিত। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণের চেষ্টার মধ্যে হয়তো এরূপ রসিকতার ইচ্ছাই কৌরবদের মধ্যে ছিল, কিন্তু তাহা এক কামলোলুপ নীচ নিষ্ঠুরতাই হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি পড়িলে মনে হয়, ইহার লেখক যে অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন শুধু তাহাই নহে, হাস্যকৌতুকের ঘাতপ্রতিঘাতে যে জীবনরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহাও তিনি অসামান্য দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের যে প্রেম চিত্রিত হইয়াছে তাহা বিরহী কল্পনা ও তৃষিত ভাবাবেগে তন্ময় ও উতরোল নহে, তাহা প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও দেহচারী। (এই প্রেমে আর্তি ও আবেগ আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি রঙ্গরসোজ্জ্বল দিকও আছে।) বড়ু চণ্ডীদাস রাধাবিরহ-খণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত এই দিকটি অবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠা ও অনবদ্য শিল্পকুশলতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে নানা রাগরাগিণী সম্বলিত পদ আছে, কিন্তু পদগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, ইহারা অব্যাহত-গতিশীল একটি সরস কাহিনীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। (এই সরস, ঘটনাজটিল ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মধ্যে হাস্যকৌতুকের প্রীতিকর স্পর্শ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।) আর একটি কথা বলা দরকার। কৃষ্ণকীর্তন কাব্য বলিয়া বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইলেও আসলে ইহা সম্পূর্ণভাবে নাটকীয় রীতিতেই লেখা হইয়াছে। পাত্রপাত্রীদের নাম উল্লিখিত না হইলেও নাটকীয় উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শুধু কেবল সংলাপ নহে, ঘটনার জটিল আবর্তময়তা, উদ্বেগব্যাকুল পরিস্থিতি, বিচিত্র ভাবাবেগের সংঘাত ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া কবি তাঁহার কাব্যে নাট্যরীতিরই প্রয়োগ করিয়াছেন বেশি। (রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রের উক্তি ও প্রত্যুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক, তীব্র শ্লেষ ও শাণিত বিদ্রূপের ভিতর বড়ু চণ্ডীদাসের বিদগ্ধ ও হাস্যরসপ্রিয় অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।) (হাস্যরস ফুটাইয়া তুলিতে হইলে জীবন সম্বন্ধে যে গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ভাষাজ্ঞান ও পরিবেশরচনার যে কৌশল জানা দরকার সেগুলি কবির বিশেষভাবে আয়ত্ত ছিল। কৌতুক ও কারুণ্যের মিলনেই জীবন ও শিল্পের পরিপূর্ণতা। সেই পরিপূর্ণতা আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখিয়াছি। সেখানে কৌতুকের রৌদ্রালোকিত আকাশ শেষ পর্যন্ত নববর্ষার শ্যামল মেঘে মেদুর হইয়া উঠিয়াছে।)

কংসের রাজসভায় আসিয়া যখন নারদ দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ জন্মের কথা বলিলেন তখন নারদের অদ্ভুত চেহারা ও উদ্দাম উল্লাসের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কবির কৌতুকাসক্তির পরিচয় একেবারে গ্রন্থের গোড়াতেই পাওয়া যায়, যথা—

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥
খনে খনে হাসে বিণি কারণে।
ক্ষণে হ্ এ খোড় খোণেকেঁ কানে॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিতে রহে চিতরে॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।

॥ জন্মখণ্ড ॥

কৃষ্ণকীর্তন বইখানি যে মুষ্টিমেয় পণ্ডিত পাঠকের জন্য লিখিত হয় নাই, সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই লিখিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নারদের এই কৌতুকচরিত্রের অবতারণায়। যাত্রা প্রভৃতিতে কৌতুক-রস পরিবেষণ করিবার জন্যই সাধারণত নারদ চরিত্রের আমদানী করা হইত। আর একটি কৌতুকচরিত্র হইল বড়াই। কৃষ্ণকীর্তনেও গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত বড়াই রঙ্গরস জমাইয়া চলিয়াছে। পরবর্তীকালে ইহারই অনুরূপ পাইলাম ভারতচন্দ্রের অবিস্মরণীয় হীরা মালিনীচরিত্রে। বড়াই শুধু কেবল রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক সাক্ষাতের সুযোগ ও মনের মিল ঘটায় নাই, উভয়ের সহিত নানা ছলনা ও কপট অভিনয় করিয়া উহাদের প্রেমকে ঘোরালো ও রহস্যমধুর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার চেহারা, কথা ও আচরণ সবকিছুই অবিমিশ্র কৌতুকে সর্বদা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

চেহারার বর্ণনা শুনুন—

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল তুঈ পাশে॥
ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল তুঈ আঁখি॥
মাহা পুটনাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঁঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে তুঈ কুচ লুলে॥

॥ জন্মখণ্ড ॥

কৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইবার জন্য যে ঘটনাগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে সেগুলি বিশেষভাবে কৌতূহল ও কৌতুক উদ্রেক করে। (রাধার প্রেম পাইবার জন্য কৃষ্ণের দানী হইয়া বসা, মাঝনদীতে রাধাকে ভয় দেখাইয়া জলের মধ্যে মিলিত হওয়া, রাধার অনুগ্রহ পাইবার জন্য তাহার ভার বহন ও মাথায় ছত্রধারণ, রাধাকর্তৃক কৃষ্ণের বাঁশী অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা খুবই সরস ও আকর্ষণীয়।) প্রেম যেখানে বাহিরের বাধা ও আপাতবিরাগে ব্যবচ্ছিন্ন সেখানেই তো তাহার মিলন তীব্র রোমাঞ্চময়। বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্বেলিত, আত্মনিবেদনময় প্রেম কৃষ্ণকীর্তনে নাই; এখানে অটল অনিচ্ছা ও তীক্ষ্ণ তিরস্কারে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কঠিন ও আয়াসসাধ্য। দানখণ্ডে দেখিতে পাই রাধার মন পাইবার জন্য কৃষ্ণ বহুক্ষণ সাধ্য সাধনা করিয়া শেষে কঠোর ভাষায় গালাগালি করিলেন—

পামরী ছেনারি নারী হঁআঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে
দান লৈবোঁ ধরিআঁ আঞ্চলে॥

রাধাও কম যান না, সমুচিত শাস্তির ভয় দেখাইলেন—

রাজা বড় তুরুবার আইহন খুরের ধার
কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে।

ঘরত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ
পাছে দোষ না দিহ আহ্মারে ॥

(এখানে হাস্যরস ঠিক পরিস্থিতি বা ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে নিহিত নয়, দেবমর্যাদাপ্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক আচরণের বিসদৃশতায়। দেবদেবী যদি সাধারণ নরনারীর মত কোন্দল করে, তবে কোন্দলের ভাষা হাস্যজনক না হইলেও ইহা হাস্যরসের উদ্রেক করে।)

নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে আচ্ছা জব্দ করিলেন। রাধাকে একা পার করিবার সময় মাঝনদীতে বেশ মজা করিলেন। যমুনায় কি প্রচণ্ড ঝড়তুফান, ঢেউগুলি পর্বতের মত হইয়া নৌকার উপর আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ভয়ে রাধা কাতর হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের নৌকা নাকি মাঝ দরিয়ায় একেবারে অচল—

আকাশ পরসি যবেঁ ঢেউ আইসে।
রাধার বদন চাহাঁ কাহ্নাঞি হাসে।
কি বুধি করিবেঁ রাধা কোন পরকার।
মাঝ যমুনাতে নাঅ না চলে আহ্মার ॥

রাধা আর কি করেন, দাঁতে তৃণ লইয়া শপথ করিলেন কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন, এই সঙ্কট হইতে কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করুন—

না জানো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।
তিরী বধ দিবোঁ কাহ্নাঞি তোহ্মার উপরে ॥
দশনেত তৃণ করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥

রাধা জব্দ হইলেন, কিন্তু তিনি যে পরে কৃষ্ণকে জব্দ করেন নাই তাহা নহে। কৃষ্ণ অনুরাগে অন্ধ এবং অনুরাগে পড়িলে মানুষ যে অনুচরের কাজ করিতেও রাজি তাহা তো সকলেরই জানা আছে। কৃষ্ণের কাঙালপনা দেখিয়া রাধা বেশ মজা করিলেন। আগে কৃষ্ণ রাধার দধিদুগ্ধের ভার বহন করুন তবে তো তাঁহার আর্জি সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। কৃষ্ণ একটু ইতস্তত করিলেন, কিন্তু রাধার সেই এক কথা। অবশেষে লজ্জার মাথা খাইয়া

ছি ছি!—কৃষ্ণ রাধার ভার কাঁধে করিলেন। কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া সকল দেবতা হাসিতে লাগিলেন—

লড়িলা জনার্দন কান্ধে লঅাঁ ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে ল
ভাবে মজিলা দেবরাজে॥

কিন্তু হায়, কৃষ্ণ এত করিয়াও রাধার মন পাইলেন না, অনভ্যাসের ফলে দধিদুগ্ধ কিছু টলিয়া পড়িয়া গেল আর রাধার কাছে পাইলেন নির্দয় আঘাত (মানসিক নহে, শারীরিক)—

ভার লঅাঁ জায়িতেঁ পসার টলিঅাঁ গেল
ছাড়ায়িল কিছু দুধদহী।
সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী॥

অবশ্য রাধার কঙ্কণকণিত হাতের আঘাত কৃষ্ণ সলজ্জভাবেই হজম করিলেন।

কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া রাধার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, ইহা রাধাকৃষ্ণপ্রেমের চিরন্তন মাধুর্যময় একটি অংশ। কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশী রাধার জীবনে আর একটি ব্যাপার ঘটাইত এবং তাহা হইল সেই প্রেমের একটি কৌতুককর অংশ। রাধা শুধু কেবল ভাবাবিষ্টা প্রেমোন্মাদিনী নারী নহেন, তিনি গৃহস্থ বধূ—সংসারের কাজকর্ম, রাঁধাবাড়া ইত্যাদিও করিতে হয়। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর তাঁহার এই বাস্তব সংসারজীবনের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটাইত তাহার একটি রসাল বর্ণনা বংশীখণ্ডে রহিয়াছে। রাধা রন্ধন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, আর অমনি সব কিছুই ওলটপালট হইয়া গেল। তাহার পর রাধা রাঁধিলেন বটে, কিন্তু আহা! কি অপরূপ রান্নাই না সেদিন হইল!

বড়াইকে রাধা সেই রান্নার কাহিনী বলিতেছেন—

আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।
সাকে দিলোঁ কানাসোঅাঁ পাণী॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি।
সুণিঅাঁ বাঁশীর নাদে॥

নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন র এ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ॥
সেই ত বাঁশীর নাদ সুণিয়াঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোল খেপিলোঁ।
বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল॥

এই অপরূপ ভাত ও ব্যঞ্জন খাইয়া আইহন কি বলিয়াছিলেন তাহা অবশ্য কৃষ্ণকীর্তনে লেখা নাই।

যত নষ্টের গোড়া এই বাঁশী। রাধা মরিয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত এই বাঁশীই চুরি করিলেন। এই বাঁশীচুরি অনেক দূর পর্যন্ত গড়াইল। কৃষ্ণ রাধাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন বাঁশীটি ফিরাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু রাধা কিভাবে ফিরাইয়া দিবেন, তিনি কি বাঁশী নিয়াছেন? রাগিয়া কৃষ্ণ 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী' বলিয়া রাধাকে গালাগালি দিলেন। বিনা অপরাধে এই গালাগালি! কি অশুভক্ষণেই না রাধা আজ ঘর হইতে পা বাড়াইয়াছিলেন! অথচ সত্য সত্যই যে বাঁশী চুরি করিয়াছে কৃষ্ণ তাহাকে কিছুই বলিতেছেন না। রাধা কৃষ্ণকে গোপন কথাটি বলিয়া দিলেন, আসলে বাঁশী চুরি করিয়াছে বড়াই। রাধা দোষ দেন বড়াইয়ের, আবার বড়াই দোষ দেয় রাধার, কৃষ্ণ মহা ফাঁপরে পড়িলেন—

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল।
দুহাঁর কপটহাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল॥

অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাধার এই ছলনার সমাপ্তি ঘটিল, তিনি বাঁশী ফিরাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণকীর্তনের অনেক স্থানে গার্হস্থ্যজীবনে ব্যবহৃত নানা প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক বাক্য ও বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'বেল পাকলে

কাকের কি?' এই প্রবাদবাক্যটি রাধার মুখে এইভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে—

দেখিল পাকি বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥

'চোরকে বলে চুরি করতে আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে' এই বাক্যটিও রাধার মুখে ব্যক্ত হইয়াছে—

বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী।

এই ধরণের প্রবাদবাক্য ব্যবহারের ফলে কৃষ্ণকীর্তনের ঘটনা-পরিবেশের মধ্যে যেমন বাস্তবতা আসিয়াছে তেমনি চরিত্রগুলির উক্তির মধ্যে কৌতুকোজ্জ্বল সরসতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব-পদসাহিত্য

চিত্র-সৌন্দর্য, সঙ্গীত-লালিত্য ও ভাবকল্পনার সুগভীর ব্যঞ্জনায় বৈষ্ণব পদাবলী প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু পদাবলীতে সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় নাই, ইহাদের মধ্যে সমাজ-অতিক্রান্ত মানুষের ভাববিহ্বল হৃদয়-রহস্যের পরিচয়ই পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি-রসাশ্রিত লেখনীর দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ধ্যানলব্ধ জগতের অলৌকিক লীলাই বৈষ্ণব-কবিতায় রূপায়িত হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে রাধা ও কৃষ্ণের মানবী প্রণয়-লীলাই পদকর্তাগণ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই প্রণয়লীলা এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত যে উহা ঘটনার বৈচিত্র্য ও বাস্তব স্থূলত্ব সাধারণত বর্জন করিয়া গিয়াছে। পদসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি, অর্থাৎ পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, মাথুর, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি ভাবের সৌকুমার্য ও শিল্পের সূক্ষ্ম কুশলতার দিক দিয়া অনবদ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ঘটনার কোন চমকপ্রদ জটিলতা ও বিভিন্ন চরিত্রের স্থূল বাস্তবরূপ অদৃশ্য বলিয়া হাস্যকৌতুকের অনুকূল পরিবেশ নাই। কিন্তু যেখানে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র নিয়ম-নির্দিষ্ট, বাধা-বিচ্ছিন্ন সংসার-সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে প্রথা ও সংস্কারের সংঘাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম জটিল, গোপনচারী ও ছলনাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই কেবল হাস্যকৌতুকের উৎফুল্ল দন্তরুচিকৌমুদী বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। একাকী মানুষ আর সব কিছু পারে কিন্তু হাসিতে ও হাসাইতে পারে না, সেজন্য বড়াই ও সখীগণ যেখানে রাধা কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়াছে সেখানেই কৌতুকরস জমিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধের মধ্যে অনেক উপেক্ষিতা রমণীদের কথা উল্লেখ করিলেন কিন্তু রাধার সখীদের কথা উল্লেখ করিলেন না, অথচ ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা প্রভৃতি সখীদের বাদ দিলে বৈষ্ণব-সাহিত্যই অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। কৃষ্ণের সহিত শ্লেষ-কুটিল উক্তি-প্রত্যুক্তি ও রাধাকৃষ্ণের মিলনের জন্য নানা চমকপ্রদ ছলনার অবতারণা করিয়া সখীগণ যেমন

রাধাকৃষ্ণের প্রেম সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি পদাবলীর অন্তর্মুখী ভাবপ্রবাহের সহিত এক বহির্মুখী ফেনোচ্ছল কৌতুকধারার মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন। দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি অংশে ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক সরসতা রহিয়াছে, সেজন্য এ-সব জায়গায় হাস্যকৌতুকের স্পর্শ আছে। স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে কৃষ্ণ কি ভাবে নানা ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া রাধার সংসারে যাইয়া রসালাপ করিয়াছেন তাহার বর্ণনাও বিশেষ সরস হইয়াছে। রাধার মান ও মানভঞ্জন করিবার যে বিচিত্র উপায় কৃষ্ণ অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বর্ণনাও অনেক স্থলে খুবই রসাল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের বাল্যলীলায় যশোদা ও বালগোপালের স্নেহ-সম্বন্ধও নানা কৌতুকপূর্ণ ঘটনায় প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে ঘৃণামিশ্রিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্রী হইয়াছে শুধু কেবল দুইটি সার্থকনামা চরিত্র—জটিলা ও কুটিলা।

ননীচোরা কৃষ্ণের ননীচুরির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকময়। যশোদা ও রোহিণী যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যান তখনই তো ননীচুরির সুযোগ। কিন্তু চুরিবিদ্যায় তিনি বিশেষ পটু হন নাই, মায়ের কাছে ধরা পড়িয়া যান। এই ননীচুরির একটি পদ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্যঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদুখল দিয়া।
তবু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
নড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ॥
হেনই সময় দেখে জননী সম্মুখ;
মায়ের শব্দ শুনি যাদুধন নাচে।
ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাঁদমুখ মোছে॥

॥ ঘনরাম দাস ॥

গোষ্ঠলীলায় স্থানে স্থানে কৌতুকজনক ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। খেলিতে খেলিতে রাখালবালকদের এক খেয়াল হয়, কানাইকে তাহারা রাজা করিয়া বসে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজার সেবা করে, কেহ চারিদিকে থানা বসায়, কেহ বা দূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার কেহ হয়তো বেদধ্বনি

করিতে থাকে। কখনও আবার তাহাদের বনভোজনের সখ হয়। কানাইকে মাঝখানে বসাইয়া সবাই খাইতে বসে—

সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈয়া
সভে দেই কানু মুখে॥

॥ বিশ্বম্ভর দাস ॥

রাধার বয়ঃসন্ধির যে সব চিত্র বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন সেগুলি যেমন সরস তেমনি সৌন্দর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবন সমাগমে রাধার দেহ ও মনে কি বিচিত্র পরিবর্তনই না ঘটিয়াছে! তিনি গুরুজনের মাঝে লজ্জায় বেশিক্ষণ থাকিতে পারেন না, যখন সখীদের মধ্যে থাকেন তখন তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া নানা হাস্য-পরিহাস করেন। কেলিরহস্যের কথা যেখানে হয় সেখান হইতে অন্যদিকে তাকাইয়া থাকেন কিন্তু কান রাখেন শুধু সেইদিকেই, আবার কেহ যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আসে তবে তিনি আবার তাহাকে গালি দেন—

কেলি রভস যব শুনে।
আনত হোর ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি॥
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥

(এই ধরণের রহস্যময়ী, কৌতুকচপলা নারী শুধু কেবল রসিকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতিই সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।)

দেবতা যখন মানুষের উপর ভর করেন তখন সে অবশ্য উদাস ও উন্মনা হইয়া পড়ে, আবার অপদেবতা যখন মানুষের উপর ভর করে তখনও তাহার ঐরূপ অবস্থা হয়। দেববশীভূতা রাধার বিরহ ও উন্মাদনা লইয়া বহু কবি বহুতর পদ রচনা করিয়াছে কিন্তু তিনি যে অপদেবতার বশীভূতা হইয়াছেন তাহা ভাবিয়া সকলে কি ব্যবস্থা করিল তাহা বর্ণনা করিয়া শুধু দুই একটি পদ রচিত হইয়াছে। একটি পদের কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

কেহ কহে যাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পাইঞাছে ভূতা।

কাঁপি ঝাঁপি উঠে কহিলে না টুটে।
সে যে বৃষভানু সুতা॥
রক্ষা মন্ত্র পড়ে নিজ চুল ছাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
আমি দিব তোহে নিচয়ে কহিয়ে
কালার গলার ফুলে॥

॥ চণ্ডীদাস॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের আর্তি ও আয়াস উভয়ত, সেজন্য রাধার ন্যায় কৃষ্ণও তীব্র প্রেমের তাড়নায় বিকল ও সতত তাঁহার প্রণয়িনীকে পাইবার জন্য এতখানি লালায়িত যে, কোন প্রকার দুর্বল, অপমানকর ও হীনতাসূচক কাজেই তাঁহার আপত্তি নাই। রাধার অঙ্গস্পৃষ্ট বাতাস লইতে তিনি ব্যগ্র, রাধার সহিত একই পুকুরের জলে থাকিতে তাঁহার আনন্দ এমন কি 'বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়।' রাধা সখীর কাছে লজ্জায় ও আনন্দে কৃষ্ণের এই কাঙালপনার কথা ব্যক্ত করিতেছেন—

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্নতলে লুটয়ে তাই।

॥ গোবিন্দদাস॥

(শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্যের পদগুলিতে কৌতুকরসের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐসব পদে নিত্যনৈমিত্তিক সাংসারিক পরিবেশে রাধাকৃষ্ণের ছলনা-চপল অনুরাগ ও অন্তরের আদানপ্রদানের বর্ণনা রহিয়াছে। অখিল-রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতিকূল গুরুজনদের ঠকাইবার জন্য যে সব নিম্নশ্রেণীর বৃত্তিজীবীর ছদ্মরূপ ধারণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ খুবই সরস

ও চমকপ্রদ হইয়াছে। একদিন তিনি নাপিতানীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন—

ধরি নাপিতানী বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দেই দরপণী খোলে নখরঞ্জনী
বোলে বৈসে দেই কামাই ॥

॥ চণ্ডীদাস ॥

কোনদিন তিনি মালিনীর বেশ ধরিয়া আসেন, কোনদিন বা পসারীর বেশ। একদিন আসিয়াছেন দেয়াসিনীর বেশ ধারণ করিয়া॥ জটিলা দেয়াসিনীর কাছে আসিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গল বিধান কবিয়া দিতে অনুরোধ কারলেন। গম্ভীরভাবে দেয়াসিনী তাঁহার পুত্রবধূকে লইয়া আসিতে বলিলেন, দেয়াসিনী আসলে কে—

সঙ্কেত বুঝিয়া নয়ান ফিরাইয়া
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন চিহ্নিল তখন
শ্যাম নাগর ঢীটে ॥

॥ চণ্ডীদাস ॥

তারপর বণিকিনী, বেদে, বাজিকর ইত্যাদি ছদ্মরূপে আসিয়াও তিনি রাধার সহিত অনেক চতুরালী করিয়াছেন। একদিন আসিয়াছেন চিকিৎসকের বেশে। একজন সখী তাঁহাকে দেখিয়া রাধার নিকট লইয়া আসিল। রাধাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক বলিলেন, রোগিণীকে পিরীতি বিষে জর্জরিত করিয়াছে, অবস্থা সঙ্কটজনক—

বাম হাতে ধরি অঙ্গুলি মুড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয়।
পিরিতি বিষে জার্য্যাছে ইহারে
পরাণ রহেনা রয় ॥

ভাল কথা, কিন্তু ব্যাধির প্রতিকার হয় কিরূপে—

হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মুড়ি
ভাল যে কহিলা বটে।

বল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥

ঔষধ খাওয়াইতে অবশ্য চিকিৎসকের খুবই আগ্রহ, এখন খাওয়াইলে জ্বরও ভাল হইয়া যাইত—

ঔষধ হয় মনে করি ভয়
এখনি খাওয়াইয়া যাই গাম।
ভাল সে হইত জ্বর যে যাইত
যদি সে সময় পাইতাম ॥

নাগরী বুঝিলেন ঔষধ খাওয়াইবার এমন আগ্রহ যাঁহার সেই চিকিৎসক কে—

তখন নাগরী বুঝিয়া চাতুরী
ঢীট নাগর রাজ।
বাশুলি নিকটে চণ্ডীদাসে রটে
এমন কাহার কাজ ॥

(দানলীলায় কৃষ্ণ ও রাধার সখীগণের মধ্যে যে কপট রোষভরা উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখা যায় তাহা শ্লেষচাতুর্যে উজ্জ্বল ও রঙ্গরসে পরিপ্লুত।) সখীদের সহিত রাধাকে যাইতে দেখিয়া কপট দানী কৃষ্ণ বলিতেছেন—

বিনোদিনী না কর চতুরপণা।
ভাঁড়িয়া আমারে হিয়ার মাঝারে
লইয়া যাইছ সোনা ॥
নিবেদন করি শুন লো সুন্দরী
সহজে তোমরা ধনী।
দধি ঘৃত দেখি যাহ বিলাইয়া
তবে সে মহিমা জানি ॥

রাধা দানীর ধৃষ্টতার সমুচিত উত্তর দিলেন—

গোয়ালা ধরম রাখিতে গোধন
ফিরহ গহন বনে।
পথে লাগি প্যায়া পরনারী লয়্যা
সাধ করিয়াছ মনে ॥

নাগর নাগরী রসের চাতুরী
শুনি সখীগণ হাসে।
অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে
কহয়ে গোবিন্দদাসে॥

রাধা ও সখীগণ কৃষ্ণকে অনেক শক্ত কথা শুনাইলেন। রাখাল হইয়া তিনি নাকি বৃষভানুসুতার গাত্রস্পর্শ করিতে চাহেন। কংসকে বলিয়া দিলেই তাঁহার ঢীটপনা দূর হইয়া যাইবে। কে তাঁহাকে দানী করিল, পাটা কোথায়? কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই নিরস্ত নহেন, তাঁহার দুঃসাহসও অত্যধিক—

এত বলি গোপীনাথ দিতে চাহে গায়ে হাত
চুম্বন করিতে বারে বার।
উচিত কহিল তোরে দান দিয়া যাও মোরে
নহে ত উতার অলঙ্কার॥

আচ্ছা জঞ্জাল বটে, ললিতা বলিলেন—

শুনিয়া ললিতা বলে বন মাঝে নহে ভালে
রাজপথে এত কি জঞ্জাল,
আপন নগর ঘরে যদি লাগি পাই তোরে
তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল॥

দানী উত্তর দিলেন—

দানী কহে দোহাই আছে লৈয়া যাব রাজার কাছে
তবে সে জানিবা ভালে তুমি

এই বিরোধের মীমাংসা করিবে কে? একমাত্র পদকর্তা বংশীবদন—

বংশীবদন কয় মোরে না করিহ ভয়
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি॥

(দানলীলার ন্যায় নৌকাবিলাসের পালাও নানা রঙ্গরসে পরিপূর্ণ।) সখীদের সহিত রাধা যমুনা পার হইতে আসিয়াছেন। যমুনার কাণ্ডারী হইয়া বসিয়াছেন কৃষ্ণ। তাঁহারা কাণ্ডারীকে ডাক দিলেন—

ডাক দিয়া বলে নায়্যা না আন ঘাটে।
আমরা হইব পার বেলা সব টুটে॥

কাণ্ডারী নৌকা লইয়া আসিলেন—

দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরী লৈয়া।
বসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া ॥
কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন।
একে একে পার করিব যত জ৹ ॥

রাধা বলিলেন, কাণ্ডারী যাহা চান তাহাই তাঁহারা দিবে। কিন্তু কাণ্ডারীর স্পর্ধা অনেকখানি, তিনি একেবারে হৃদয়ের রত্নটিই লইবেন। সকলে তো নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু তখন কি ভীষণ ঝড় আর তরঙ্গের মাতামাতি—

তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে ॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই ॥

॥ উদ্ধবদাস ॥

কৃষ্ণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, ইহারই জন্য এত আয়োজন, এত চতুর ছলনা। ছলনা ও কৌতুকের মধ্য দিয়াই ত প্রেমের রসের আরও উপভোগ্যতা।

(রাস, ঝুলন ও হোলিখেলার পদগুলি উদ্বারিত আনন্দোচ্ছ্বাসে সরস-মধুর হইয়া উঠিয়াছে।) কিন্তু ঐ পদগুলিতে আনন্দের উদ্দামতা যতখানি কৌতুকের আকস্মিকতা ততখানি নাই। হোলিখেলার পদগুলির কথাই ধরা যাক। বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ হোরিখেলার মদির আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। আবির ও পিচকারীর রঙে চারিদিক রঙীন—

দুহুঁ করে আবির দুহুঁ অঙ্গে ডারত
পিচকা রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা পুলিন কুঞ্জবন
অরুণিত যুবতী জাল ॥

রঙের লড়াই বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। একদিকে কৃষ্ণ ও সুবল প্রভৃতি সখা, অন্যদিকে রাধা ও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখী। এই লড়াইয়ে কোন হার-জিত নাই, ইহাতে ব্যবহার হইয়াছে কৌতুকের গোলাগুলি আর ফিনকি

ধারায় ছুটিয়াছে শুধু রঙের ফোয়ারা। তাহাতে দেহ ভাসিয়াছে আর মন ডুবিয়াছে। উদ্ধবদাসের একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

দেখ শ্যাম গোরি সখি মেলি।
আবিরে অরুণ পিচকারি ঘন
হোয়ল তুমুল খেলি॥
সখা সুবল করিয়া সঙ্গ।
জয় জয় বলি দেই করতালি
হাসি হাসি রস রঙ্গ॥
সখী ললিতা বিশাখা সাথে।
হাসি খল খল জিতলুঁ জিতলুঁ
বলে পিচকারি হাতে॥
রস শেখর রসিকা নারি।
শ্রমজল দুহুঁ বয়ন ভরল
ঐ উদ্ধব বলিহারি॥

(বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি রসাল পালা হইল রাধার মানভঞ্জন। কৃষ্ণের অন্যনারীতে আসক্তি, প্রতীক্ষা করিয়া রাধার ব্যর্থতা, প্রভাতে কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার কোপ, কৃষ্ণের সাধাসাধি কিন্তু রাধার তীব্র কটূক্তি, নিরাশচিত্তে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন, রাধার অনুতাপ ও কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সখীদের কাছে মিনতি, সখীদের সহিত কৃষ্ণের রহস্যকৌতুকময় আলাপ, রাধার মান ভাঙিবার জন্য কৃষ্ণের বিবিধপ্রকার ছলনা ও চতুরালী—এসব বিষয় পদকর্তা ও কীর্তনিয়াগণ চিরকাল বিশেষ রসালভাবে কৌতূহলী শ্রোতাদের কাছে পরিবেষণ করিয়াছেন) মানের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম দ্বিধা ও সন্দেহে সংশয়িত এবং রোষে ও বিরাগে খণ্ডিত এবং সেজন্যই তাহা এত নিত্যনূতন ও বৈচিত্র্যমধুর। কৃষ্ণের জন্য সারা রাত জাগিয়া রাধা বিফলকাম হইয়াছেন। এতদিনে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—'নিঠুর পুরুষ জাতি'। সকাল বেলায় কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—

রজনী বঞ্চিয়া আইলা জ্বালাইতে আগুণ।
বিহানে আইলা পোড় ঘায়ে দিতে নুন॥
যাঁহা বসি আছ তাঁহা তুলি ফেলি মাটি।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়াঝাঁটি॥

যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ।
তাহার লাবণ্য জলে ধোও গিয়া মুখ ॥

॥ গোবিন্দদাস ॥

কৃষ্ণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু রাধার মান কিছুতেই ভাঙিল না। অগত্যা কৃষ্ণ শাস্তি নিতে রাজি হইলেন। চমৎকার শাস্তি এবং এই শাস্তির কথা বলিয়া দিয়াছেন রসিক চূড়ামণি বিদ্যাপতি—

হমরি বচনে যদি নহে পরতীত।
বুঝি করহ শাতি যে হোয় উচিত ॥
ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয় দেহ ভারি।
উর কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥

কৃষ্ণ নানা ছলে রাধিকার মান ভাঙাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তিনি কিভাবে রাধার মান ভঞ্জন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস পদ রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের পদটি পুরাপুরি উদ্ধৃত হইল—

গোরখ জাগাই, শিঙাধ্বনি শুনইতে,
জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর, মাথ হিলায়ত,
বুঝল ভিখ নাহি নেল ॥
জটিলা কহত তব, কাহা তুহুঁ মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূহাত, ভিখ হাম লেয়ব
তুরিতহি দেহ পাঠাই ॥
পতিবরতা বিনু, ভিখ লেউ যব,
যোগী বরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহে বধূ পাশ ॥
দ্বারে যোগিবর, পরম মনোহর,
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।

বহুত যতন করি, রতন থালী ভরি।
ভিখ দেহ তছু ঠামে॥
শুনি ধনী রাই, আই করি উঠল,
যোগী নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত, যোগী নহ আনমত
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধূম চূর্ণ, পূর্ণ থালীপর,
কণক কটোর ভরি ঘিউ।
করযোড়ে রাই, লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থরহরি জীউ॥
যোগী কহত হাম, ভিখ নাহি লেয়ব,
তুয়া মুখ বচন এক চাই।
নন্দ নন্দন পর, যো অভিমান সো,
মাফ করহ ঘর যাই॥
শুনি ধনী রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ, নটবর শেখর।
সাধি চলত মন কাজ॥

চৈতন্য চরিত-সাহিত্য

চৈতন্যদেবের দেবদুর্লভ মানবচরিত্র লইয়া যে বিরাট চরিত-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমরা লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানের একত্রিত সমাবেশ দেখিয়াছি। চৈতন্যদেব নিজে কখনও অবতাররূপে উল্লিখিত ও পূজিত হইতে চাহিতেন না, বরং কাহারও মুখে ঐরূপ উক্তি শুনিলে তিনি বিরক্তই হইতেন। তাঁহার সমকালীন ও নিকটকালীন জীবনীগ্রন্থ, যথা 'গোবিন্দদাসের কড়চা' (যদি বইখানি অকৃত্রিম হয়) ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' তাঁহার মানবীয় দিকের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে 'চৈতন্য-ভাগবত' ও 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিকতার দিকেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই রকমই হয়। বুদ্ধদেবও এইভাবে পরবর্তীকালে দেবতা ও ভগবানের অবতাররূপেই ভক্তমনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হাসি এই পার্থিব জীবনেরই সামগ্রী, পার্থিব জীবন যেখানে অপার্থিব স্তরে উন্নীত হয় সেখানে হাসির কোন প্রবেশ-অধিকার নাই; বস্তুজীবনের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি যখন অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হয় তখন জীবনের মূল্য বাড়ে বটে, কিন্তু রস কমিয়া যায়। সেজন্য চৈতন্যদেবের লীলা যেখানে মৃত্তিকাশ্রয়ী মানবিকতা লাভ করিয়াছে সেখানে মাঝে মাঝে হাস্যকৌতুকের উপাদান আমরা সন্ধান করিয়া পাই, কিন্তু যেখানে তাহা ভাবাশ্রয়ী অবতার-লীলায় পরিণত হইয়াছে সেখানে ভক্তিবিভোর চিত্ত হাস্যকৌতুকের অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করিতে থাকে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলায় হাসির কোন সুযোগ নাই, কারণ অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভু দেহধারী পুরুষ নহেন, বিদেহী বিগ্রহ। (কিন্তু আদিলীলায় নিমাই সাধারণ মানুষ এবং সেজন্যই সেখানে মাঝে মাঝে রঙ্গরসের তরল অবকাশ পাওয়া যায়, চৈতন্য-ভাগবতে এ কারণেই হাস্যরসাত্মক বর্ণনা স্থান পাইয়াছে কিছু বেশি পরিমাণে।. 'গোবিন্দদাসের কড়চা' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' হয়তো মহাপ্রভুর স্থূল মানবিকতার খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কাছে প্রিয় ও প্রামাণ্য হইতে পারে নাই, কিন্তু হাসির উপাদান এই দুই গ্রন্থেই বেশি পাওয়া যাইবে।

(নিমাইয়ের বাল্যচপলতার যে বর্ণনা চরিত-সাহিত্যে রহিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত-রচয়িতাগণ নিমাইয়ের বাল্যলীলা বর্ণনা করিবার সময় বৃন্দাবনের বালগোপালের কথাই মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন, সেজন্য নিমাইয়ের চপলতা ও দুরন্তপনা তাঁহাদের প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিশেষ সরস ও কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। স্নানার্থী ব্রাহ্মণগণ নিমাইয়ের দুরন্তপনায় অস্থির হইয়া তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের কাছে আসিয়া যে নালিশ করিতেন তাহা পড়িয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিতে হয়—

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্দে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবায় লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ।
নিত্য এই মত করে কহিল তোমাত॥

এখানে অবশ্য প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্ট কৌশল হইতে হাস্যরস সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু বালকের দুরন্তপনার কৌতুকময় বিবৃতি রহিয়াছে।) শুধু ব্রাহ্মণগণ নহে, নিমাইয়ের অত্যাচার হইতে বালিকাদেরও অব্যাহতি ছিল না। অবশ্য বালিকাদের সহিত এই কৌতুকলীলা দেখিয়া বৃন্দাবনের সেই নবকিশোর ও গোপীদের মধুর লীলার কথাই মনে হয়। পরবর্তী কালে যিনি নারী সংস্রব একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাকেই নারীদের সহিত এরূপ প্রীতিপ্রদ

রসিকতা করিতে দেখিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিতে হয়। শচীমাতার কাছে বালিকারা যে অভিযোগ করিত তাহাতে প্রকাশ্য বিরাগের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অনুরাগই বোধ হয় বিরাজ করিত—

শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করম॥
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জন সহ করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥

॥ চৈতন্যভাগবত। আদিকাণ্ড। পঞ্চমঅধ্যায়॥

দেবমূর্তি ও পূজার দ্রব্যাদি লইয়াই যেন নিমাইয়ের চপলতা উদ্দাম হইয়া উঠিত, যিনি স্বয়ং ভক্তির অবতার, বালক বয়সে সেই ভক্তি লইয়াই তাঁহার কি নিদারুণ পরিহাস! জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

কারো দেবমন্দিরে বসিঞা সিংহাসনে।
দেবতাপ্রতিমা নিঞা পেলাএ প্রাঙ্গণে॥
কাহার মন্দির চূড়ে বসিয়া সত্বরে।
গড়াগড়ি দিঞা ভূঙে পড়ে বিশ্বম্ভরে॥

* * * *

কাহার মন্দিরে দেবতার দ্রব্য খাএ।
দ্বারে কপাট দিঞা হাসিগড়ি জাএ॥
কুহুকুহুধ্বনি করে মন্দির ভিতরে।
পারাবত ধ্বনি যেন হংসরব করে॥

কাহার মন্দিরে চলে ময়ূর পেখনে।
কাহার মন্দিরে জাএ নানা বিভূষণে॥
কাহার মন্দিরে সন্ধ্যাকালে প্রবেশিঞা।
প্রদীপ নির্বাণ করে হাসিঞা হাসিঞা॥

॥ চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ। নদীয়া খণ্ড॥

নাগরিকদের সহিত বালক নিমাই যে ঠাট্টা রসিকতা করতেন তাহাতে অনেক সময় শিষ্টতা ও শ্লীলতা কিছুই থাকিত না, যথা—

গোপবণিকেরে প্রভু করে উপহাস।
রভসে বঞ্চিয়া তার কাটিল এ বাস॥
মামার সম্বন্ধে কেহো বাপে দেয় গালি।
তা দেখি হাসিঞা গৌর কারে বলে শালী॥

॥ ঐ॥

নিমাই বড় হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব গম্ভীর হইল না। রঙ্গ ও ব্যঙ্গের সুযোগ পাইলে তিনি বালকের মতই চপল ও তরল হইয়া উঠিতেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া তিনি পূর্ববঙ্গবাসীদের কথা অনুকরণ করিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিলেন—

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥

॥ চৈতন্যভাগবত। আদিখণ্ড। দ্বাদশ অধ্যায়॥

অবশ্য দীনবন্ধুর নাটকে ভাষণ-নৈপুণ্যের ফলে হাসি যে সাহিত্যরস-পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে তাহা এখানে নাই। ইহা অনেকটা fun অথবা animal spirits জাতীয়। হায়রে স্বয়ং মহাপ্রভু পর্যন্ত বাঙ্গালদের প্রতি এত বিরূপ ছিলেন, আর অন্যের কথায় প্রয়োজন কি! তবে তিনি স্বয়ং বাঙাল হইয়াও বাঙালদের লইয়া ঠাট্টা করিতেন, ইহাই আরও মজার বিষয়। তাঁহার পূর্বপুরুষদের বাসস্থান শ্রীহট্টে থাকা সত্ত্বেও এই শ্রীহট্টবাসীদের কথা লইয়া তিনি কতই না বিদ্রূপ করিলেন—

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥

পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানা মত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহা ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জিয়া গর্জিয়া॥

॥ ঐ। ১৩শ অধ্যায়॥

এই অংশ পড়িতে পড়িতে মনে হয় শ্রীহট্টবাসীদের রাগাইয়া স্বয়ং মহাপ্রভু মজা পান নাই, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গীয় জীবনীকার বৃন্দাবন দাসও বেশ মজা পাইয়াছেন।)

কিন্তু এই তরলস্বভাব, সদাহাস্যময় নিমাইয়ের চরিত্রে অকস্মাৎ কি পরিবর্তনই না আসিল! গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মুহুর্মুহুঃ অষ্টসাত্বিক ভাবে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি এতকাল অন্যান্য লোকেদের লইয়া হাসিতেন। এবার তাঁহাকে লইয়া অন্য লোকের হাসিবার পালা আসিল। অবশ্য হাসি বিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়, আবার অজ্ঞতা হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। বলাবাহুল্য এখানে সাধারণ লোকের হাসি ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংবদ্ধ ক্রিয়া ও আচরণ দেখিয়া সকলে সাব্যস্ত করিল যে, তিনি নিশ্চয়ই বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন—

নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু জ্ঞান করি লোক বলে বান্ধিবার॥
শচীমুখে শুনি যে যে দেখিবারে যায়।
বায়ু জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥

॥ চৈতন্য ভাগবত। মধ্যখণ্ড। ২য় অধ্যায়॥

কত ঔষধ, কত ব্যবস্থাই না তখন হইতে লাগিল। কেহ হাত পা বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ দিল, কেহ বা শীতল ডাবের জল পান করিবার নির্দেশ দিল, কত তৈল ও ঘৃতের বিধানই না হইল!

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গৌরাঙ্গের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন চরিত-গ্রন্থে আছে কিনা জানি না।) মঙ্গলকাব্যগুলিতে নায়ক-নায়িকার বিবাহের সময় নারীগণের যে খেদ ও পতিনিন্দা দেখা যায়, জয়ানন্দের গ্রন্থেও তাহার আভাস মেলে। বরবেশী গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া বিবাহিতা রমণীগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুযোগ এবং নিজেদের কুল ও সংসারের প্রতি তীব্র বিরাগ প্রকাশ করিতেছে—

ভাবের ভাবিনী রমণী তরুণী

মোর কুলে পড়ু বাজ

আল কি রমণী আর না রহিল ঘরে।

আর রমণী বলে প্রাণ কেমন কেমন করে॥

আলো কি আলো কি আলো কি।

এমন রূপ কন্যাবর কোথাহ না দেখি॥

এক রমণী বলে আমি অন্দরে জাব।

আর রমণী বলে গঙ্গাসাগরে মরিব॥

আর রমণী বলে মোর কাঁপে সব গা।

আর রমণী বলে মুখে নাহি স্বরে রা॥

এক রমণী বলে মোর ননদিনী মরু।

আর রমণী বলে স্বামী জে করে সে করু॥

॥ চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ। নদীয়া খণ্ড॥

ভাবমাতোয়ারা নিমাই পারিষদগণের সহিত যখন কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতেন তখন ভক্তি অনুরাগ ও সঙ্গীতে মিলিয়া এক উচ্ছ্বসিত মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইত। কিন্তু স্বর্গে যাইয়াও মানুষের স্বভাবধর্ম বোধ হয় একেবারে পরিবর্তিত হয় না। অলৌকিক লীলারসে বিভোর থাকিয়াও গৌরাঙ্গ ও তাঁহার শিষ্যগণ মাঝে মাঝে লৌকিক জগতের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার মধ্যে নামিয়া আসিতে ভালোবাসিতেন। আর ভক্ত মণ্ডলীও এই সব অসামান্য মানুষগুলির মধ্যে কোন সাধারণ মনোধর্ম ও স্থূল আচরণ দেখিতে পাইলে সুখীই হইতেন। (সেজন্য কখনও মহাপ্রভুর ভোজনের সবিস্তার বর্ণনা দিয়া আবার কখনও বা মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী কলহের বিবরণ দিয়া চরিত-রচয়িতাগণ ভক্তি-গম্ভীর পরিবেশকে মাঝে মাঝে

হাস্যমধুর করিয়া তুলিয়াছেন।) সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছে কিন্তু অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বিবাদ। এই দুইজন মহাপ্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য, বৈষ্ণবদের মহামান্য অবতার; সুতরাং ইঁহাদের বিবাদ যে সর্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে। অদ্বৈতপ্রভু সরল ভালোমানুষ, কোন ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারেন না, নিত্যানন্দের সহিত তিনি আঁটিয়া উঠিবেন কি ভাবে? সেজন্যই তিনি ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়েন। অপর দিকে নিত্যানন্দপ্রভু নিমাইয়ের অগ্রজস্বরূপ তো; সেজন্য লোকের পিছনে লাগিতে, নিত্য নূতন ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা লোককে নাস্তানাবুদ করিতে তাঁহার কোন জুড়ি ছিল না। আচার্য যত রাগিতেন নিত্যানন্দ তত মজা পাইতেন, আচার্য যত গালাগালি দিতেন নিত্যানন্দের রসিকতা তত বাড়িয়া যাইত। এত ঝগড়া তাঁহাদের মধ্যে, অথচ এত ভাবও আর কোথায় নাই। চূড়ান্ত ঝগড়ার পরেই দেখা যায় চরম প্রীতিতে উভয়ে পরস্পরের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ। তাঁহাদের এই কলহ ও অনুরাগলীলা ভক্তগণ চিরকাল প্রীতিপ্রসন্ন দৃষ্টিতে উপভোগ করিয়াছে। ‘চৈতন্য-ভাগবতে’ তিনস্থানে এবং ‘চৈতন্য-চরিতামৃতে’ একস্থানে তাঁহাদের কলহের রসাল বর্ণনা রহিয়াছে।

মহাপ্রভু শিষ্যদের সহিত জলকেলি করিতে আসিয়াছেন। অন্যান্য সকলে পরস্পরের মধ্যে জলকেলি আরম্ভ করিলেন কিন্তু অদ্বৈতের সহিত জলকেলি শুরু করিলেন শুধু মাত্র নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ তো প্রথমেই অদ্বৈতের চোখ লক্ষ্য করিয়া জল ছুঁড়িলেন—

অদ্বৈত নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিল জল দিল মহাবলী॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মিলিতে নাহি পারে।
মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হইতে মদ্যপের হইল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি॥

কিন্তু এত গালাগালি খাইয়াও নিত্যানন্দের রসিকতা যায় না—

নিত্যানন্দ বলে মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে আর কন্দলে কি কাজ॥

গৌরাঙ্গপ্রভু মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, তিনবার না হইলে হারজিতের মীমাংসা হইবে না। সুতরাং আবার জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল, আবার নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চোখে বেশ খানিকটা জল দিয়া দিলেন। অদ্বৈত ক্রোধে একেবারে রুদ্র মূর্তি ধারণ করিলেন—

সংহারিমু সকল মোহার দোষ নাই।
এত বলি ক্রোধে জ্বলে আচার্য গোসাঞি॥

॥ চৈতন্য ভাগবত। মধ্য খণ্ড। ১৩শ অধ্যায়॥

এই জলযুদ্ধে অবশ্য নিত্যানন্দেরই জিত হইল, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব হারজিত প্রসন্ন প্রীতির ধারায় ভাসিয়া গেল। আর একদিন ভক্তগণ হরিনামে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, সকলেই অলৌকিক ভক্তিসুধাপানে মাতোয়ারা। কিন্তু ইহারই মধ্যে বিভ্রাট বাধিয়া বসিল—অর্থাৎ, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দে ঝগড়া লাগিয়া গেল। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিলেন—

হেন জাতি না খাইলা যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোন জনে বলে তোরে॥
বৈষ্ণব সভায় কেনে মহা মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল।

নিত্যানন্দ তাঁহাকে আরও রাগাইবার জন্য দু'একটি কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন—

নিত্যানন্দ বলে আরে নাড়া বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়ো আগে দেখাই প্রতাপ॥
আরে বুড়া বামন তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত মত্ত ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে পরম সংসারী।
পরম হংসের পথে আমি অধিকারী॥

একে তো মা মনসা তাতে আবার ধুনার গন্ধ! অদ্বৈত প্রভু একেবারে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। অসহ্য ক্রোধের বশে তিনি যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন তাহা—ছি! ছি! বড়ই লজ্জাকর—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে॥

মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগবাসী॥
॥ চৈতন্য ভাগবত। মধ্য খণ্ড। ২৪॥

শুনিয়াছি গ্রাম্য বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা ঝগড়ায় মত্ত হইয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য এরকম কাণ্ড বাধাইয়া বসে। যাক অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের এই কলহ যে যথার্থ কলহ নহে, মহাপুরুষদের লীলামাত্র তাহা বৃন্দাবন দাস বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা না করিলেও এই কলহের বাহ্য ও আন্তর রূপের প্রভেদ আমরা বুঝিতে পারি এবং সেজন্যই কৌতুক বোধ করি।

শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। আচার্যপ্রভু দুইজনকে পরম সমাদরে পিঁড়িতে বসাইয়া বিবিধপ্রকার অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিয়াছেন। দুই প্রভু খাইতে বসিয়াছেন, কিন্তু ভোজন সম্বন্ধে দুইজনের কি বিপরীত প্রবৃত্তি! সংযমী ও কৃচ্ছ্রব্রতী মহাপ্রভু ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া সে-সব ভোজনে তাঁহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিতেছেন আর আচার্যপ্রভু তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ এত সুপ্রচুর আয়োজনেও তুষ্ট নহেন। ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতেছেন, এই সামান্য ভোজ্যদ্রব্যে তো তাঁহার পেটই ভরিবে না—

নিত্যানন্দ কহে কৈলুঁ তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥
আজি উপবাস হইল আচার্য নিমন্ত্রণে।
অর্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাস অন্নে॥

অদ্বৈতও রহস্য করিয়া বলিলেন—

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও ছাড় লোভ মন॥

নিত্যানন্দ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—

নিত্যানন্দ বলে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন॥

অদ্বৈত মনে মনে খুশি হইয়া ভূরিভোজী নিত্যানন্দকে খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন—

ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মণের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াইও ঝুট॥

॥ চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যলীলা। ৩য় পরিচ্ছেদ॥

পরের কল্যাণ সাধন করিতে যাইয়া মহাপুরুষদের জীবন যে কতখানি বিব্রত ও বিপন্ন হয় তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস জুড়িয়া আছে। যখন তাঁহাদের বিভ্রাট ও বিপদ সামান্য পরিমাণে থাকে তখন তাঁহাদের জীবন আমাদের সহানুভূতিশীল কৌতুক উদ্রেক করে, যেমন ডন কুইক্সোট ও পিকউইক। আবার যখন সেই বিভ্রাট ও বিপদ পরিমাণে বেশি হইয়া পড়ে তখন তাঁহাদের জীবন আমাদের সমবেদনাময় কারুণ্যের উদ্রেক করে, যেমন সক্রেটিস ও যীশুখৃষ্টের জীবন। বৈষ্ণব মহাপুরুষগণও মাঝে মাঝে পাপী ও অভাজনদের উদ্ধার করিতে যাইয়া নানা দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার মধ্যে পতিত হইতেন। (এক স্থানে এই দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপের পাষণ্ডদ্বয় জগাই ও মাধাইকে সকল সাধু ও সজ্জন ব্যক্তিরা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসের মনে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল। হরিদাস তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু নিত্যানন্দের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাকেও এই সদ্‌চেষ্টার সঙ্গী হইতে হইল। সকলে শঙ্কিত চিত্তে তাঁহাদিগকে বারংবার নিষেধ জানাইলেন, কিন্তু দুই প্রভু সে সব অগ্রাহ্য করিয়া জগাই ও মাধাইয়ের নিকটে যাইয়া অতি মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম শুনাইলেন—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥

কিন্তু হায়, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! দুই পাষণ্ড দুই ক্রুদ্ধ ষণ্ডের মতই ছুটিয়া আসিল। বেগতিক দেখিয়া দুই প্রভু পলাইতে শুরু করিলেন। রাজপথে সে একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্য! স্থূলতনু মহামান্য বৈষ্ণব প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে

ছুটিয়া চলিয়াছেন আর পিছনে দুই মদ্যপায়ী পাষণ্ড তাঁহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে—

দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিমু ধরিমু বলি লাগালি না পায়॥
নিত্যানন্দ বলে ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে তবে পাই সব॥
হরিদাস বলে ঠাকুর আর কেন বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥

॥ চৈতন্য ভাগবত। ২য়। ১৩॥

দুইজনেরই মোটা শরীর, ছুটিতে পারিবেন কেন? দুইজনেই হাঁপাইয়া পড়িলেন। হরিদাস তো কেবলই নিত্যানন্দকে দোষ দিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দের দুর্বুদ্ধিতেই তো আজ এই বিপদ। কিন্তু যাক, শেষ পর্যন্ত তাঁহারা রক্ষা পাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে পা হড়কাইয়া দুই দস্যু একেবারে পপাত ধরণীতলে, এবং এই সুযোগে দুই প্রভু বিপদ কাটাইলেন। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দুইজনের কি কোলাকুলি!

মহাপ্রভুর অবির্ভাবকালে নবদ্বীপের হিন্দুগণ নানাভাবে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হইত। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' এই অত্যাচারের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অত্যাচারিত হিন্দুগণ প্রতিকারের আশা অন্তরে পোষণ করিয়া অসহায়ভাবে দিন কাটাইতেছিল। নবদ্বীপের কাজিকে দমন করিবার জন্য নিমাই যে মহাকীর্তনযাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অত্যাচার-পীড়িত হিন্দুগণ এক প্রতিশোধমূলক অভিযানই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেজন্যই চরিত-লেখকদের দ্বারা এই অভিযান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছিল। কাজি ও তাহার অনুচরদের লাঞ্ছনা বর্ণনার মধ্যে লেখকদের দীর্ঘলালিত প্রতিহিংসাই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। নিমাইয়ের কীর্তনিয়াগণের হুঙ্কারে—

শুনিয়া কম্পিত কাজি-গণ সবে ধায়।
সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

কাজির লোকেদের কি দুর্দশা—

মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে॥

যার দাড়ি আছে সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে হালে বুক॥

॥ চৈতন্য ভাগবত। মধ্য। ২৩॥

ভীত কাজি নিমাইয়ের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য কি ব্যাকুল আগ্রহই না প্রকাশ করিল—

কাজী কহে তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করিবারে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হইলে আসি মিশিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ হয় সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥

দুর্দান্ত কাজির এইরূপ নাজেহাল অবস্থা দেখিয়া বিদ্রূপপ্রিয় লেখকের সহিত একত্রে চিরকাল অত্যাচার-পীড়িত পাঠকগণ আনন্দ-কৌতুক বোধ করিয়াছে।

নাথ-সাহিত্য

গোপীচন্দ্রের গান

ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রকে লইয়া যে-সব গান ও গাথা প্রচলিত আছে সেগুলি কোন্ সময় রচিত হইয়াছিল জানি না, কিন্তু সেগুলির বিষয়বস্তু এবং নীতি ও আদর্শের সহিত প্রাচীন সাহিত্যের অন্য কোন প্রকার বিভাগের কোন যোগ নাই। হিন্দুসমাজের বহির্জীবনে ও পারিবারিক জীবনে যে চিরপ্রচলিত ধারা প্রবহমান, পারস্পরিক সম্বন্ধের যে সুস্পষ্ট রূপ ও সুনির্দিষ্ট সংস্কার বিদ্যমান সেসব গান ও গাথাগুলির মধ্যে একেবারেই অদৃশ্য।[১] (ইহাদের মধ্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলি ও তাহাদের ভাব ও আচরণ আমাদের নিকট এতই উদ্ভট ও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, তাহাদের বর্ণনা পড়িবার সময় আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারে আচমকা আঘাত লাগে এবং তাহার ফলে আমরা কৌতুক বোধ করি।) বস্তুত গোপীচন্দ্রের গানে কবিগণ হয়তো অনেক করুণ রস উদ্রেক করিতে চাহিতেন এবং শ্রোতাগণও হয়তো একটি ভক্তিকেন্দ্রিক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়া ইহাতে ভক্তি-মিশ্রিত কারুণ্য সন্ধান করিয়া পাইতেন, কিন্তু আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্ত কাব্যটিই অদ্ভুত ও হাস্যরসাত্মক বলিয়া মনে হইবে। অতিরঞ্জন প্রাচীন সাহিত্য মাত্রেরই একটি অনিবার্য লক্ষণ বটে, কিন্তু এই কাব্যে যেরূপ অতিরঞ্জন আছে সেরূপ আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

প্রকৃত পক্ষে ইহাতে যে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতে কোন ভেদাভেদ নাই, সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে নাই কোন সীমারেখা। হয়তো ময়নামতী ও হাড়িপার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্যই নানা উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐগুলি পড়িবার সময় অলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আসে না, বরং একটা অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুকই মনের মধ্যে জাগ্রত হয়।

১। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত উল্লেখযোগ্য—'এই ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান রচকগণের অনেকেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে জন্মিলেও তাহারা সেই প্রাচীন যুগের ভাব ও ভাষার আর্দশটি ধরিয়া বসিয়া আছে, সংস্কৃতের প্রভাব তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে—পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মকে তাহারা গ্রহণ করে নাই; অথবা হিন্দুধর্মের নবউত্থান তাহাদের দোর পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।'
—গোপীচন্দ্রের গানের ভূমিকা।

যম এবং যমদূতকে আমরা ভয়ঙ্কর বলিয়াই জানি কিন্তু আলোচ্য কাব্যে তাহাদের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা আর কহতব্য নহে। মাণিকচন্দ্রের প্রাণ লইবার জন্য যখন গোদা যম আসিল তখন ময়নামতী তাহাকে যে মারটাই না দিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে না পলাইলে সে বাঁচিত কিনা সন্দেহ, যথা—

মহামন্ত্র গিয়ান নইল হৃদএ জাপিয়া।
চণ্ডি কালি রূপ হৈল কায়া বদলিয়া॥
তৈল পাটের খাড়া নিল হস্তে করিয়া।
মার মার করি জমক নিগায় পিটিয়া॥

॥ জন্মখণ্ড ॥

(তারপর গোদাযম মাণিকচন্দ্র রাজার প্রাণ লইয়া যাইবার সময় যে কাণ্ডটি ঘটিল তাহা যেমন উদ্ভট তেমনি হাস্যকর।) যমদূতের হাতে মানুষের শাস্তি হয় জানিতাম, কিন্তু এযে মানুষের হাতে যমদূতের শাস্তি! গোদাযম পলাইতেছে, পিছনে পিছনে ময়নামতী তাড়া করিতেছে—মাটিতে আকাশে স্বর্গে মর্ত্যে সর্বত্র। কখনও যমের নাগাল পাইয়া ময়না আচ্ছা এক মার দেয় আবার কোনক্রমে সে ছাড়া পাইয়া প্রাণভয়ে ছুটিতে থাকে। ছুটিতে ছুটিতে যমরাণীর কাছে আসিয়া সে তাহার প্রাণরক্ষা করিতে বলে—

হাত ধরি জমরানি পাও ধরি তোর।
তোমার ধম্মের দোহাই নাগে আমার প্রাণ রক্ষা কর॥

যমরাণী কিন্তু যমের কান্না দেখিয়া এখন বেশ দুই এক কথা শুনাইয়া দিল—

এক কলকি তামু জদি আমি নাই দেই সাজেয়া।
তার জন্যে মারছিস আমাক নোহার মুদ্গর দিয়া॥
তার সাজা দেউক এখন ডাহিনি মএনা আসিয়া॥

যাক বিছানার খড় দিয়া তো যমরাণী যমকে ঢাকিয়া রাখিল, ময়নামতী জানিতে পারিয়া বোড়া সাপ হইয়া তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। গোদাযম তখন ইঁদুর হইয়া পলাইয়া গেল, ময়না বিড়াল হইয়া তাহাকে গিলিল, আবার যম বাম গালের ভিতর দিয়া ফসকাইয়া পড়িল, গোদা তখন পায়রা হইয়া আকাশে উড়িল, পিছনে পিছনে ময়না বাজ পাখী হইয়া ধাওয়া করিল। এইভাবে যম ও ময়নার যে কত রূপ হইতে রূপান্তর ঘটিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

যমদের বর্ণনা অন্যত্রও আছে, সেখানেও দেখা যায় হাড়িপার হুকুমে

তাহারা অম্লান বদনে মুটে মজুরের কাজ করিয়া দিতেছে। হাড়িপার হুকুমে আগত যমদের বর্ণনা বিশেষ কৌতুকজনক—

চ্যাংরা চ্যাংরা জম সাজিল মাথাএ সোনার টুপি।
জু আন জু আন জম সাজিল গালাএ রসের কাটি॥
বুড়া বুড়া জম সাজিল হাতে সোনার নাটি॥
সৌক জম সাজিয়া গ্যাল আবাল জমের বাড়ি।
আবাল জম খাড়া হইল মাটিতে পৈল্ল দাড়ি॥

॥ গোপীচন্দ্রের গান। সন্ন্যাস খণ্ড ॥

যমেরা হাজির হইলে হাড়িপা তাহাদিগকে, 'রে বেটা জম, তোমাকে আমি এই জন্য ডাকছি'—এইভাবে সম্বোধন করিয়া একটি পথ তৈরী করিয়া দিতে বলিল। কোদাল হাতে লইয়া তাহারা তখনই সে কাজে লাগিয়া গেল।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস লইয়া ময়নামতীর সহিত অদুনা পদুনা প্রভৃতির যে তীব্র বিরোধিতা ও পারস্পরিক শত্রুতা দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে আমরা বাঙালীঘরের চিরকালীন শাশুড়ী ও পুত্রবধূর বৈরীভাবই দেখিতে পাই। গোপীচন্দ্রকে লইয়া একদিকে তাহার মাতা ও অন্যদিকে তাহার স্ত্রীগণ যেরূপ টানাহ্যাঁচড়া করিয়াছে তাহাতে বেচারার জীবন সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ময়নামতী পুত্রকে সন্ন্যাসী হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিয়া পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে তাহার মনকে নানাভাবে বিরূপ করিতে চাহিল। গোপীচাঁদ বধূদের কথায় সন্ন্যাস লইতে চাহিতেছে না, কিন্তু বধূরা কেমন তাহা সে জানে কি? ময়নার কথায়—

সরু সরু কথা বধূ তোর কানের কাছে কয়।
হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয়॥

মা-বোনই তাহার একমাত্র আপনার, সত্যকার দুঃখ হইবে তাহাদেরই, ঘরের স্ত্রী তো শুধু নিজের প্রয়োজন যতক্ষণ ততক্ষণ কাঁদিবে—

মাএর কান্দন ওলো ঝোলা বইনে মোছে ঘাম।
ঘরের ভারজা কান্দে জাবত ব্যারায় কাম॥

॥ বুঝান খণ্ড। গোপীচন্দ্রের গান ॥

ময়নামতী বৌদের নিন্দা করিয়াছেন বটে কিন্তু বৌরা তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা অনেক বেশি সাংঘাতিক। গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে

বর্ণিত আছে যে, তাহারা বুড়ী ময়নামতীকে পাঁচতোলা বিষ খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছে—

চারি বধূ টানি চাহে লাড়িতে না পারে।
চারি লাথি মাইল বুড়ার কাঁকাইল উপরে॥

* * * * *

ওর্চ নেচ টানিয়া বুড়াকে নিয়া জাএ।
চারি বধূএ মিলি বুড়াকে চেচা এ॥
টানি টানি নেএ খেনে ধাক্কা ধুক্কা মারে।
বুড়া বেটীর হাড়ে মাংসে কড় মড় করে॥

তারপর সকলে মিলিয়া বুড়ীকে যেই কুণ্ডের ভিতর ফেলিবার আয়োজন করিল অমনি মড়া বুড়ী আবার বাঁচিয়া উঠিল, বৌরা তো তাজ্জব বনিয়া অমনি চম্পট—

এত শুনি মৈনামতি ভাবিতে লাগিল।
গাও মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিল॥
কাছি এড়ি চারি বধূ উঠি দিল লড়।
পিছে পিছে মৈনামতি বোলে ধর ধর॥

॥ গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ॥

ময়নামতীর অগ্নিপরীক্ষায় বিপদের পরিবেশে কৌতুকরসই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই অগ্নিপরীক্ষাও অদ্ভুত। মাতার অগ্নিপরীক্ষার জন্য পুত্রের আয়োজন। কিন্তু অগ্নিতে মহামন্ত্রসিদ্ধ ময়নামতীর কি ক্ষতি করিবে? প্রচণ্ড উল্লাসে ময়না অগ্নির মধ্যে নাচিতে লাগিল। সেই নাচের কত ঢঙ্ আর কতই না বাহার—

আগুনের ছুইত মএনা ব্যাড়ায় নাচিয়া।
গর খ্যামটা নাচে মএনা হাতে তালি দিয়া॥
আড় খ্যামটা নাচে মএনা মাথায় ঘোঙ্গর দিয়া।
ডোমনা কাওড়া নোটন নাচে মএনা বুড়ি ছাপরিয়া ছাপরিয়া॥

॥ বুঝান খণ্ড। গোপীচন্দ্রের গান॥

(গোপীচন্দ্রের গানের কবি কয়েকটি চরিত্র নিছক হাস্যরসের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মাণিকচন্দ্রের রাজদরবারে উপস্থিত বাঙালের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। এই বাঙালের জন্য প্রজাদের অশেষ

দুঃখ-কষ্ট হইয়াছিল, সেজন্য ইহার বর্ণনাতে কবির ব্যঙ্গের ঝাঁঝটাই যেন বেশী ফুটিয়াছে—

দক্‌খিন হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত্ কৈলু কড়ি॥

কবির প্রসন্ন কৌতুকরস ফুটিয়া উঠিয়াছে পণ্ডিত খণ্ডের জ্যোতিষী পণ্ডিত ও নাপিত খণ্ডে নাপিতের চরিত্র-চিত্রণে। রাণীর প্রেরিত' বাঁদী যখন রাজ-দরবারে মিথ্যা গণনার অনুরোধ জানাইয়া পাঁচশ টাকা ঘুষ দিতে চাহিল তখন সরল সত্যব্রত ব্রাহ্মণ ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক সেয়ানা, স্বামীর নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে বেশ খানিকটা গালাগালি দিল—

পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান।
আকাশে পাতালে বেটি ধইরাছে ধিয়ান॥
কোন স্থাশে থাক ঠাকুর কোন স্থাশে তোর ঘর।
কোন দরিয়ার জল খাএয়া সর্ব্বাঙ্গে পাতল॥
দিনান্তরে ব্যাড়াও ঠাকুর পাঞ্জি পুস্তক নিয়া।
চাউল মুষ্টি কাচা কলা না পাও খুঁজিয়া॥
আপনে আসিল পাশ্‌শ টাকা তোমার দরজা এ সাজিয়া।
এইগুলি টাকা জোলা ঠাকুর দেইস আরো ফিরিয়া॥

পণ্ডিতানী পণ্ডিতকে বলিলেন, গণনা করা কি আর শক্ত ব্যাপার! তাঁহারা পণ্ডিতের জাত, 'দশটা সত্যের সহিত দশটা মিথ্যা বলিতে পারেন—'দশটা হাচা দশটা মিছা এয়াক কবার পারি।' অবশ্য এই পাঁচশ টাকা পণ্ডিতানী নিঃস্বার্থভাবে শুধু যে সংসারের জন্য চাহিয়াছিলেন তাহা নহে—

আমার বুদ্দিতে ঠাকুর গনিয়া নিলু টাকা।
আগে আমাক কিনিয়া দে দশ টাকার শাখা॥

পণ্ডিত দরবারে যাইয়া প্রথম ভুল গণনা করিয়া প্রায় প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। যাহা হউক চণ্ডীর কৃপায় সন্ন্যাসের দিন গণনা করিয়া দিয়া তিনি প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু পুরস্কার পাইয়া তিনি চণ্ডীর কথা ভুলিয়া গেলেন দেখিয়া চণ্ডীও তাঁহাকে জব্দ করিতে চাহিলেন। ছদ্মবেশে পণ্ডিতকে বলিয়া দিলেন, রাজার ছোটরাণী তো তাঁহার জন্যই ঠিক হইয়া

আছে, তাহাকে পাইবার দাবী তিনি জানান না কেন? নির্বোধ ব্রাহ্মণের মনেও দুরাশা জাগিল। রাজার দরবারে যাইয়া বলিলেন—

শিশুআ রানিকে পণ্ডিতক দান কর।
রান্দুনি করি রাখিব এ বার বৎসর॥

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া রাজা হুকুম দিলেন—

গালে চওড় দিয়া টাকা কাড়ি ন্যাও।
নাথি মারি বেটার ভূমি ছিনি ন্যাও॥

রাজার ভাই খেতুর রাগ আরও বেশি, কারণ ঐ রাণীর দিকে যে তাহারই লক্ষ্য—

জে রানির জন্য আমার দৌড়াদৌড়ি।
সেই রানির জন্য আসিয়াছ পণ্ডিত অধিকারি॥

পণ্ডিতকে তো ঘাড় ধরিয়া দরবার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অতঃপর দরবারে পণ্ডিতানীর আবির্ভাব। পণ্ডিতানী তো প্রথমে স্বামীর অপমানের তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। কিন্তু তারপর যখন জানিলেন পণ্ডিতের লোভ ছিল ছোট রাণীর উপর তখন যত রাগ গিয়া পড়িল তাঁহার উপর। কেন, ছোটরাণীর রূপ কি তাহার রূপের অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল?—

ছোট রানির পৈরণা জদিছ মুই ব্রাহ্মনি পাওঁ।
উহার থাকি উজ্জ্বল আমাকে দেখিতে পাও॥

আচ্ছা, তিনিই ভালো করিয়া রাণীকে আনিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মণী ক্ষোভে ক্রোধে একেবারে direct action স্বরু করিলেন—

ওদিগে জারে খেতু ছোড়া ওদিগে জারে তুই।
ক্যামন রাণি চাহিবার আইসাছে রানি হ্যাওহোঁ মুই।
দুই হস্ত ধরিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া।
দুই গালে দুই চওড় মারিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া॥

পণ্ডিতের ততক্ষণে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সকাতরে মিনতি জানাইলেন—

পাও ধরোঁ পণ্ডিতানি হস্ত ধরোঁ তোর।
অধিক করি না মারিস আমার গালের উপর॥

॥ পণ্ডিত খণ্ড। গোপীচন্দ্রের গান॥

গোপীচন্দ্রের গানে যে নারীরই একচ্ছত্র মাহাত্ম্য তাহা পুনর্বার প্রমাণিত হইয়া গেল।

এই নারী-মাহাত্ম্যের আবার পরিচয় পাওয়া গেল নাপিত খণ্ডে। নাপিত যাহাতে রাজাকে কামাইতে না আসে সেজন্য রাণীর বাঁদী তাহাকে পাঁচশ টাকা ঘুষ দিতে আসিল। নাপিতও পণ্ডিতের মত রাজার ভয়ে ঘুষ লইতে চাহিল না। তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া নাপিতানী তাঁহার প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিল—

কোন থ্যাশে থাকহে কোন থ্যাশে তোর ঘর।
কোন দরিয়ার জল খাএয়া সর্ব্বাঙ্গে পাতল।
দিনান্তরে ব্যাড়াইস নাপিত কণি কাটিয়া।
চাউল মুস্‌ট কাচা কলা না পাইস খুঁজিয়া॥
পাশশ টাকা আসিল তোর দরজায় সাজিয়া।
এগিলা টাকা নাপিত ক্যান দেইস আরো ফিরাইয়া॥
থ্যাও থ্যাও নাপিত টাকা থ্যাও গনিয়া।
এয়াতে জদি ধম্মি রাজা মন্দ বলবে তাত।
না থাকিম উঙার থ্যাশে অন্য থ্যাশে জাব॥
ঐ গিয়া টাকা দিয়া গরস্তি করি খাব॥

॥ নাপিত খণ্ড। ঐ॥

কথায় বলে, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! নাপিত স্ত্রীর বুদ্ধি শুনিল এবং নিজের সর্বনাশও ডাকিয়া আনিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অন্য স্থানে যেমন এখানেও তেমনি—নাপিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইল।

গোর্খ-বিজয়

মীননাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথকে লইয়া গোর্খ-বিজয় বা গোরক্ষ-বিজয় রচিত। গোর্খ-বিজয়ের গল্পাংশ সামান্য এবং তাহাও খুব গাঢ় নহে। কদলীর দেশে যাইয়া মীননাথের কদলী রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া পড়া এবং তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের দ্বারা তাঁহার উদ্ধার হওয়া—ইহাই গোর্খ-বিজয়ের কাহিনী। কাহিনীর এই ঘটনাবিরলতা ও চরিত্র-স্বল্পতার জন্য কাব্যটির মধ্যে হাস্যকৌতুকের উপাদান খুব কমই আছে। মাঝে মাঝে দুই একটি জায়গায় সামান্য একটু-আধটু আভাস আছে মাত্র।

গোরক্ষনাথ তাঁহার দুই অনুচর লঙ্গ ও মহালঙ্গকে লইয়া কদলীর দেশের দিকে যাত্রা আরও করিলেন তখন কবির বর্ণনা একটু কৌতুকময় হইয়া উঠিয়াছে—

বাটা ভরি সৈজ্জ লৈয়া আইল মহালঙ্গ,
দেখিয়া স্বর্ণ সৈজ্জ হইল বড় রঙ্গ।
গলে তিন গুণ দিল কপালের ফোটা,
মাথাতে আলগা ছাতি সঙ্গে লইল লোটা।
আগে পাছে দুই শিষ্য লঙ্গ মহালঙ্গ,
হাতে তুলি লইল নাথের স্বর্ণের ভাণ্ড।

কদলীর দেশে ভ্রষ্টমতি, অধঃপতিত মীননাথের আজ্ঞায় নানা প্রকার দুর্দশা ঘটিতে লাগিল। যোগীদের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বর্ণনা একেবারে কৌতুকস্পর্শহীন নহে—

বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল,
গাভুর যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল।
আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি কাটে,
পোলা বস্যা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে।

কদলীর রাজসভায় পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, সেজন্য গোরক্ষনাথ নর্তকীর বেশে সেখানে গিয়াছেন। রাজসভায় তাঁহার নৃত্য স্বরু হইল, মাদলের বোলে মীননাথের চৈতন্য উদ্রেক করিবার জন্য অনেক তত্ত্বকথা বাজিতে লাগিল—

নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর,
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর।
নাচন্তে যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।
হাতের চমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
আপনে ডুবাইলা ভরা গুরু মোহন্দরে।

মীননাথ তাঁহার গুরু ভোলানাথের মত নারী দেখিলেই মজিয়া যান। নর্তকীর রূপযৌবন ও নৃত্যরঙ্গে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে পাটেশ্বরী রাণী করিতে চাহিলেন। নর্তকী রহস্য করিয়া মীননাথকে বুড়া বলিয়া যথেষ্ট খোঁটা দিল—

তোমার সমান পুরুষ নাই কোন দেশ,
পাকিছে মাথার কেশ আয়ু হইছে শেষ।

কদলীর রাজা তুমি মীন অধিপতি,
উঠিয়া বসিতে নাই তোমার শকতি।
বুড়া হইয়া ঘুচা হইছ মুখে নাই লাজ,
আর কেন কথা কহ কামিনী সমাজ।

বুড়া বলিলে কোন্ বুড়াই বা সহ্য করিতে পারে? মীননাথও প্রবলভাবে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, তিনি কোন তরুণের অপেক্ষাও কম নহেন, এমন কি হাতেনাতে তিনি উদ্ধত তরুণের মত একটা কাণ্ড করিতে চাহিলেন—

বুড়া নএ আমি তরুণা কিসে লাগে,
শতেক তরুণা আনি দেয় মোর আগে।
দেখিবা বুড়ার বল ধরি যদি বলে,
মীনের পুরীতে আসি যাইতে চায় ছলে।
কাঞ্চলি ফাড়িমু তোর খসামু কবরী,
আমার ঘরেতে আসি যাইতে চায় ফিরি।

নর্তকী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ছল-ভরা কণ্ঠে বলিলেন যে, তিনি গোরক্ষনাথের বধূ, তাঁহার উদ্দেশেই তিনি দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছেন—

গোর্খনাথে বলে তবে বুকে মারি ঘায়,
না বল না বল গুরু মীন বাপ মায়।
তোমার শিষ্য গোর্খনাথে বিবাহ কৈল মোরে,
বিবাহ করিয়া গেল বিজয়া নগরে।
বিবাহ করিয়া গেল না রইল ঘরে,
তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশান্তরে।
শুনিলাম তার গুরু তুমি মোছন্দর,
তেকারণে চাতে আইলাম পুরীর ভিতর।
তোমার শিষ্যপুত্র বধূ আহ্মিত নিশ্চিত,
না বোল না বোল বাপু এসব কুৎসিত।

॥ গোর্খ-বিজয়—পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ॥

নর্তকীরূপ গোরক্ষনাথ কৌতুকছলে গোরক্ষনাথের নাম উল্লেখ করিয়া গুরুর মনে চৈতন্য উদ্রেক করিতেই চেষ্টা করিলেন এবং সেই চেষ্টাও সফল হইল, মীননাথ আস্তে আস্তে চৈতন্যের পথে ফিরিয়া আসিলেন।

কথা-সাহিত্য

কথা অর্থাৎ গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন ও সর্বজনীন। কাব্য হউক নাটক হউক, উপন্যাস হউক, এই কথার আকর্ষণেই মানুষ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও বহুতর কথার ধারা লোকের মধ্যে ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 'কথাসরিৎসাগর', 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র কথাগুলি শুধু কেবল সংস্কৃতভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। দেশীয় ভাষাতেও বহুল ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গল্প-রসপিপাসু বাঙালী Aesop's fables এবং 'আরব্য উপন্যাস', 'পারস্য উপন্যাস' প্রভৃতি বিদেশী গল্পসাহিত্যের অনুবাদ হইতেও বহুদিন ধরিয়া গল্পরস আস্বাদন করিয়াছে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব গল্পের ধারাও বহুবিচিত্র এবং দীর্ঘ-বিস্তৃত। তাহার ধর্মসংক্রান্ত গল্পধারার রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্যে, কৃষ্ণকথায় ও শিবের কাহিনীতে, কিন্তু তাহার লৌকিক গল্পের পরিচয় পাওয়া যায় পল্লী-গীতিকা ও রূপকথা উপকথার মধ্যে।

কথাসাহিত্যের অদ্বিতীয় রূপকার শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার কথাসাহিত্যকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা, রূপকথা (শিশুসাহিত্য), ব্রতকথা (মেয়েলি সাহিত্য), রসকথা (সভা-সাহিত্য), গীতকথা (পল্লীসাহিত্য) এই চার শ্রেণীর কথা সাহিত্যের মধ্যে ব্রতকথাকে আমরা ছড়ার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি, গীতিকথাও পল্লীগীতিকার আলোচনা প্রসঙ্গে বিচার্য। দক্ষিণারঞ্জন রূপকথা ও রসকথাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেও প্রকৃতপক্ষে রসকথাকেও রূপকথার অন্তর্ভুক্ত করা চলে, কারণ আসলে রসকথা হাস্যরসাত্মক রূপকথা ছাড়া তো আর কিছু নহে। দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথা 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র সহিত তাঁহার রসকথা 'দাদামহাশয়ের থলে'র বিষয়বস্তু ও পরিবেশের দিক দিয়া কোন প্রভেদ আছে বলিয়া তো মনে হয় না।

কথা-সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে আবার দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটিতে প্রধানত মানব-মানবীর চরিত্রকেই কাহিনী আশ্রয় করে। অবশ্য মাঝে মাঝে সেই সব মানব-মানবীয় চরিত্রের

সহিত ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদি অমানবীয় অথবা অতিমানবীয় চরিত্রও যুক্ত হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীর কথা-সাহিত্যে সচরাচরদৃষ্ট পশু-পক্ষীদের কাহিনীই দেখা যায়। শিয়াল, বিড়াল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, কাক চড়ুই, টুনটুনি ইত্যাদি পশুপক্ষী লইয়া অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও অসংখ্য কাহিনী রচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শ্রেণীর কথা-সাহিত্যকে উপকথা এই নামে অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন।[১] কিন্তু শুধু কেবল এই শ্রেণীর সাহিত্যকেই উপকথা বলা চলে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে; কারণ উপকথা ও রূপকথা নাম দুইটি সমর্থক, মানবাশ্রিত কথাকেও উপকথা বলা হইয়া থাকে। ইংরাজি Animal tale-এর বাংলা প্রতিশব্দ উপকথা হইতে পারে কিনা তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে রূপকথা মানে প্রচলিত কথাগুলিকেও দুইটি শ্রেণীতে বোধ হয় বিভক্ত করা চলে। প্রথমত রাজা-রাজড়ার কাহিনী অথবা বণিক-সওদাগরের কাহিনী লইয়া রচিত রূপকথা এবং দ্বিতীয়ত সাধারণ মানবের সংসার-জীবন লইয়া বাস্তব পরিবেশে রচিত রূপকথা। প্রথম শ্রেণীর রূপকথার মধ্যেই রূপকথার যথার্থ জগৎ উদ্‌ঘাটিত। সেখানে রাজপুত্র-রাজকন্যা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি-রূপার কাঠি, শুকপঙ্খী ও ময়ূরপঙ্খীর মধ্য দিয়া যে বিচিত্র রহস্য ও সৌন্দর্যের জাল বিস্তৃত হয় তাহাই চিরকাল রূপকথাকে এক অনিন্দ্য রসলোকের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথার যে রহস্যঘন মাধুর্য ও ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রধানত এই শ্রেণীর রূপকথার মধ্যেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপকথায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, বেনে, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, কুমার, মালী ইত্যাদি সাধারণ মানুষের সাংসারিক সুখদুঃখের নানা বিচিত্র কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র চ্যাংব্যাং বিভাগের গল্পগুলি এবং 'দাদামশায়ের থলে'র নূতন জামাই, বাইশ জোয়ান ও তেইশ জোয়ান, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ ও বেণে ভাইপো ইত্যাদি গল্প এই শ্রেণীর রূপকথার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

(দক্ষিণারঞ্জন হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি 'দাদামশায়ের থলে'র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র চ্যাংব্যাং বিভাগের প্রত্যেকটি গল্পও হাস্য

১। বাংলার লোক-সাহিত্য—৩২২ পৃঃ।

কৌতুকপূর্ণ!) রূপকথায় কাহিনী যেখানে সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত রস ও রহস্যময় জগতে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে হাস্যকৌতুকের অবকাশ নাই। সেখানে আকাশের নির্জন নীলিমায় ইন্দ্রধনুর বিচিত্র আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু মাটির জনপূর্ণ আঙিনা হাসির সংঘাতে মুখরিত হয় না। তবে মাঝে মাঝে রূপকথার কল্পলোকোজ্জ্বল, সুবিস্তৃত জগৎকে মাটির সংসারের সন্নিকটে লইয়া আসা হয় এবং তখন কল্পনাশ্রিত রহস্য-পরিবেশ ও প্রত্যক্ষগোচর বস্তুপরিবেশের অতর্কিত সহঅবস্থিতির ফলে আমাদের অন্তরে এক আচমকা আঘাতের জন্য হাস্যপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র মধুমালা, পুষ্পমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা ও শঙ্খমালা গল্পগুলি সৌন্দর্যকল্পনায় অতুলনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সুমধুর প্রেম ও সুগভীর দুঃখ-বেদনায় হৃদয় যতখানি অভিভূত হয়, তুচ্ছ ঘটনার তরল আঘাতে অন্তর ততখানি আমোদিত হয় না। ক্বচিৎ দুই একটি সংকীর্ণস্থানে মাত্র হাস্যকৌতুকের চকিত স্ফুরণ হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে একটি চরিত্রই মাত্র সজ্ঞান হাস্যরসসৃষ্টির পরিচয় বহন করে, অবশ্য সেই হাস্যরসে রঙ্গ অপেক্ষা ব্যঙ্গের ভাগই বেশি। চরিত্রটি হইল শঙ্খমালার কুৎসিত ননদী কুঁজী। এই কুঁজী চরিত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির নিষ্ঠুর বীভৎসতা শ্লেষ ও বিদ্রূপের প্রলেপে সরস করিয়া গল্পকার শ্রোতাদের কাছে পরিবেষণ করিয়াছেন। অনিষ্টান্বেষী কুঁজী যখন ভ্রাতৃবধূ শক্তির ঘরের দিকে উঁকি মারিতেছে তখন লেখক তাহার চিত্র কিরূপ সরস করিয়া আঁকিয়াছেন তাহা দেখুন—

'আনাচে কানাচে সাত হাঁটু পানি, রায় বাঘিনী ননদী—বকঠেঙ্গী পায়ে, কুঁজসুন্দরী গায়ে, শক্তির ঘরের পাশে উঁকি দিল।' মা যখন শক্তিকে সায়েস্তা করিতে বলিলেন তখন কুঁজীর আনন্দ দেখে কে। লেখকের বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ—

'সায়েস্তা করি—একে চায়, আরো পায়,—রায়বাঘিনী ননদী কুঁজ ঘুরাইয়া নথ বেসর উড়াইয়া, তিন ঝাঁকর ঝ্যাকনা তিন থ্যাকর থ্যাকনা চৌদ্দ হাতে ভাজের গায়ের যত গহনা খুলিয়া নিল। আগুন পাটের শাড়ী কাঁচুলী ছিঁড়িয়া দিল।' প্রাচীন কথা ও কাহিনীতে এই ধরণের চরিত্র যেরূপ নীতি-অনুমোদিত শাস্তি পায় কুঁজী তাহাই পাইয়াছিল। অর্থাৎ, পরিশেষে তাহাকে মরিতে হইল, যে সে ভাবে নহে, একেবারে কুমীরের পেটে। বলা বাহুল্য শাস্তির ভয়াবহতায় হাসির হাল্কা প্রসন্ন ভাব এসব স্থানে একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র মণিমালা গল্পটির পেঁচোও একটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র। অবশ্য চরিত্রটিতে ব্যঙ্গের রূঢ় স্পর্শ অপেক্ষা নিছক কৌতুকের আমোদজনক স্পর্শই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চেহারার বিকৃতি যেমন, বুদ্ধির বিকৃতিও তেমন। মায়ের কাছে মণি পাইয়া সে যখন নিজের নূপের (রূপের) গর্বে আত্মহারা হইয়া পড়ে তখন প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাস পাঠকের চিত্ত হইতে উদ্‌গত হয়—

'মণি পাইয়া পেঁচো তো তিন লাফে ঘর। মা, মা, আমি তো ভাল হইয়াছি—এই দেখ আমার কেমন নূপ—নূপের গাঙ্গে নূপ ভেস্যে যায়।'

'ঠাকুরমার ঝুলি'র চ্যাংব্যাং বিভাগে এবং 'দাদামশায়ের থলে'র মধ্যে যে গল্পগুলি আছে হাস্যকৌতুকের অনর্গল অজস্রতার দিক দিয়া তাহাদের তুলনা কথা-সাহিত্যে নাই। গল্পগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে অফুরন্ত রসের ধারা সিঞ্চন করিয়াছে। মানুষের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা চিরকাল হাস্যকৌতুক উদ্রেক করে, কিন্তু 'দাদামশায়ের থলে'র রসগোল্লা-বিভাগের গল্পগুলির মধ্যে অচিন্তনীয় বুদ্ধিবিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের স্বাভাবিক জীবনবোধ যেরূপ অতিশয়িত কৌতুকের আঘাত লাভ করে তাহার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী, সওদাগরের সাত ছেলে ও নূতন জামাই এই তিনটি গল্পের মধ্যে এমন কয়েকটি নিরেট ও আকাট বোকার সন্ধান আমরা পাই যাহাদের কথা ও আচরণ দুর্দমনীয় কৌতুকের উচ্ছ্বাসে আমাদের চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তোলে। প্রথম গল্পটির কথাই ধরা যাক। হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর কাহিনী চিরকাল ধরিয়াই উৎকট বোকামির এক অনন্য উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে। হবু শূকর দেখিয়া গবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি যায়?' গবু দেখিয়া বলেন, 'মহারাজ, সর্বনাশ! রাজবাড়ীর মাহুত চোর, হাতীকে খাইতে দেন না। তাই ওটা শুকাইয়া শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে।' আর একদিন ঐ শূকরটাকেই দেখিয়া হবু বলেন, 'হাতীটা তো বড় হইল না।' গবু বলেন, 'মহারাজ ওটা নিশ্চয়ই ইন্দুর, রাজভাণ্ডার লুটিয়া খাইয়া খাইয়া ইন্দুরটা মোটা হইয়া গিয়াছে।' মাহুতের গর্দান গেল, সিপাহীর গর্দান গেল। কিন্তু রাজা ও মন্ত্রী নিশ্চিন্ত হইলেন, রাজভাণ্ডার তো রক্ষা পাইল। রাজার পুকুরের পাড়ে কতকগুলি লোক রান্না করিবার জন্য পুকুর খুঁড়িতেছে দেখিয়া রাজা ব্যস্ত হইয়া পড়েন, 'মন্ত্রি! অত লোক কেন দেখ তো।' মন্ত্রী বেশ করিয়া দেখিয়া বলেন,

'মহারাজ, ভয়ানক সর্বনাশ!—রাজ্য গেল। কোথা থেকে কতকগুলি লোক আসিয়া পুকুর তো চুরি করিয়া নিল—ঐ দেখুন সিঁদ কাটিতেছে।' অমনি সিপাই ছুটিল ঢাল তরোয়াল নিয়া। লোকগুলিকে শূলে দিয়া তবে হবু ও গবু নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সমস্যা বাধিল সেদিন, যেদিন একটি চোর চুরি করিতে আসিয়া দেওয়াল চাপা পড়িয়া মারা গেল। অমন সুবিচারের রাজ্য, চোর মারা গিয়াছে, রাজ্যে হৈ হৈ পড়িল। চোর মারা যায় কেন, কোতোয়ালের দোষ, নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছিল। না, দোষ হইল গৃহস্থের, তাহার ঘরের দেওয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা যায় কেন? গৃহস্থ বুঝাইল, দোষ আসলে মালীর, সেই দেওয়াল গাঁথিয়াছিল। বটেই তো! মালী আসিল। তারপর যে মাটি ছানিয়াছিল সে আসিল। কুমার আসিল, কাঠকুড়ানী বুড়ী আসিল। শেষকালে আসিল এক ঢেঙ্গা কাঠুরে। যত নষ্টের গোড়া সে, কারণ সেই কাঠ কাটিয়াছিল। রাজা হুকুম দিলেন, 'দাও বেটাকে শূলে।' শূলে দেওয়া হইল, কিন্তু শূল ঢোকে না, শরীরে তো একটুও মাংস নাই। সর্বনাশ, এখন উপায়! রাজার হুকুম তো নড়চড় হইতে পারে না। শূলে দিতেই হইবে, যাহাকেই হউক না কেন। ঢেঙ্গা, শুকনো কাঠুরেকে শূলে দেওয়া গেল না, মোটা-সোটা শূলনীয় লোকের সন্ধানে জল্লাদ আর কোতোয়াল ছুটিল। যে পেটুক লোকটি এক পয়সায় পাঁচ সের মুড়ি ও পাঁচ সের রসগোল্লা খাইয়া মনের আনন্দে ভুঁড়ি বানাইয়াছিল শূলে যাইবার যোগ্য লোক বলিয়া সে বিবেচিত হইল। কিন্তু শেষ সময় তাহাকে উদ্ধার করিলেন তাহার গুরু সন্ন্যাসী। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ শূলে আমাকে দিন, ধ্যান করিতে করিতে সশরীরে স্বর্গ যাইব।' সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ! গবু মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজ, আমি শূলে যাইব।' হবু রাজা ভাবিলেন, তিনি থাকিতে মন্ত্রীবেটা সশরীরে স্বর্গে যাইবে? কখনই হইতে পারে না। তিনি রাজা, স্বর্গে যাইবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই। চতুর্দিকে বিরাট হৈ চৈ, উৎসব ও সমারোহ সুরু হইয়া গেল, রাজা শূলে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। রাজা শূলে উঠিলেন, তাঁহার আত্মা নিশ্চয়ই প্রবল প্রতাপে স্বর্গে আরোহণ করিল কিন্তু শরীরটা বড়ই বিকট হইয়া পড়িল। ভয়ে সকলে পলাইতে লাগিল। মন্ত্রী পলাইতে গিয়া পড়িলেন একটি কূপের ভিতরে। পড়িবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, 'বাঃ! নিশ্চয়ই পাতালে চলিয়াছি। হা! হা! রাজা আমাকে স্বর্গে যাইতে দিলেন না বটে, তা আমি কি যে সে লোক? এক জায়গায় না এক

জায়গায় আমি না যাইয়া পারি? রাজাহীন রাজ্যে কে থাকে?—পাতালে গিয়াই অমনি আমি সেখানে মন্ত্রী হইব। স্বর্গে গিয়া রাজা এখন একা একা বুঝবেন মজাটা।' গল্পের পরিণতিতে হবু ও গবুর বিয়োগান্তক পরিণতি দেখাইয়া গল্পকার আমাদের নীতিবোধ পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। কারণ তাঁহারা শুধু নির্বোধ নহে, নিষ্ঠুরও বটে, অ৹ককে তাঁহারা শূলে দিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিকৃত বুদ্ধির ফাঁদেই তাঁহাদিগকে পড়িতে হইল।

সওদাগরের সাত ছেলে নামক গল্পে সাত ভাইয়ের নির্বুদ্ধিতাও কম হাস্যোদ্দীপক হয় নাই। ব্যবসা করিবার সংকল্প লইয়া তাহারা কিভাবে ঘোড়ার ডিমের সন্ধান করিতে লাগিল, চালকুমড়াকে ঘোড়ার ডিম এবং শিয়াল দেখিয়া ঘোড়ার বাচ্চা ভাবিয়া তাহারা যে কতখানি খুশি হইল, সেসব কাহিনী পড়িতে পড়িতে হাসির প্রবল বেগে বেসামাল হইয়া পড়িতে হয়। সাত ভাইয়ের প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়া গুনিয়া দেখিতেছে যে তাহারা মোট ছয় জন। তখন তাহাদের কি যে কান্না, একজন ভাই কোথায় হারাইয়া গেল। তেলের ব্যবসা করিতে যাইয়া তাহারা দেখিল প্রত্যেক দিনেই তেল কমিয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই কোন চোর তাহাদের তেল চুরি করিতেছে। অবশেষে একদিন তাহারা চোর ধরিয়া ফেলিল, একেবারে সাত সাতটি চোর ভাঁড়ের মধ্যে! চোর আর কেহই নহে, তাহাদের নিজেদের ছায়াগুলি। কিন্তু সাতভাই চোরকে শাস্তি দিবার জন্য ভাঁড়ের উপর এমন লাঠিই চালাইল যে চোর সায়েস্তা হইল বটে, কিন্তু ভাঁড়ের দফা একেবারে রফা। বেচারারা অনেক নাজেহাল, অনেক নাস্তানাবুদ হইল, কলুর ব্যবসা করিতে যাইয়া কলুর বলদ হইল, কাজ করিয়া উপহারের বদলে প্রহার ভাগ্যে জুটিল। যাক শেষ পর্যন্ত তাহাদের একটা সুরাহা হইয়া গেল বটে! ঘেসেড়ার ঘাসকাটার কাজ লইয়া তাহারা ভাবিল, একাজটা মন্দ নহে। সাতভাই খুব খুশী হইয়া ঘাস কাটিতে লাগিল। লেখাপড়া না শিখিলে শেষ পর্যন্ত যে এভাবে ঘাস কাটাই অদৃষ্টে জোটে এই নীতিশিক্ষা গল্পটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বটে, কিন্তু সেই নীতিশিক্ষাকে একেবারে আড়ালে রাখিয়া হাস্যকৌতুকের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই গল্পটিকে এত সরস ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

অবিমিশ্র কৌতুকের ফোয়ারা অনর্গল করা হইতেছে নূতন জামাই নামক গল্পটিতে। গল্পের জামাই খুবই মাতৃভক্ত। মাতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, কিন্তু তাহার অভাব শুধু সাধারণ বুদ্ধির। মাতার

উপদেশগুলি একটু বুদ্ধির সহিত পালন করিতে পারিলে সে একেবারে আদর্শ জামাই হইতে পারিত। কিন্তু সেই বুদ্ধিটুকুর অভাবেই সে পদে পদে যে মহাবিভ্রাট বাধাইয়াছে তাহা আর কহিবার নহে। মা বলিয়াছেন, শ্বশুর বাড়িতে কিছুমিছু লইয়া যাইতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিছুমিছু পাইয়া সে ভারী খুশি হইল, সেই কিছুমিছু হইল এক প্রকাণ্ড মানকুচু। মা বলিয়াছেন উঁচু আসন দেখিয়া বসিতে, তাই সে বসিল একেবারে উইয়ের উঁচু ঢিপির উপরে। মায়ের উপদেশ, কোকিলের স্বরে কথা কহিতে হইবে, সে একেবারে কুহু কুহু ডাকিতে লাগিল। খাবার দিলে না বলিতে হইবে, সে বিষয়েও সে মাতৃ আদেশ পালন করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু নিজেকে সামলাইতে পারিল না। রান্নাঘরে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া সে যে দুর্দশা ডাকিয়া আনিল, আহা—তাহা যেন কোন জামাইয়ের অদৃষ্টে কোনদিন না ঘটে! হাঁড়ির কানাটা গলায় করিয়া মাতৃভক্ত ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আমরা বলি কি, গোটা হাঁড়িটা থাকিলেই ভালো হইত, জলে ডুবিয়া মরার সুবিধা হইত।

মাতার উপদেশ পালন করিতে যাইয়া জামাইটি যেমন বিভ্রাট বাধাইয়াছিল, পিতার উপদেশ পালন করিতে যাইয়া এক রাজপুত্র তেমনি নিজের সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল। পিতা বলিয়াছিলেন—

প্রতিদিন প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও।
টাকা ধার দিয়া টাকা লইও না।
প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিও।

আর,

তিন ঠেঙ্গে তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিও।

একটু সাধারণ বুদ্ধির অভাবেই রাজপুত্র পিতার সব উপদেশ নিখুঁতভাবে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াও শুধু কেবল নিজের ক্ষতিসাধনই করিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা মজা তিনঠেঙ্গের কাছে বুদ্ধি নিবার সময়। রাজার লোকজনেরা তেমাথার সন্ধান পাইল না বটে কিন্তু চারটি তিনঠেঙ্গে আনিয়া হাজির করিল। সেগুলি হইল চারটি খোঁড়া শিয়াল, বিড়াল, ঘোড়া ও গাধা। রাজা ও রাণী জোড়হাতে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আপনারা তিনঠেঙ্গে, আপনাদের মহিমা তো আমরা কিছুই জানি না, দেখুন, আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, তাই আপনাদের শরণাগত হইয়াছি, আপনারা আমাদিগকে রক্ষা

করুন, আমাদিগকে সুবুদ্ধি দিন।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব বুদ্ধিমান তিন-ঠেঙ্গেরা রাজাকে কোনই সুবুদ্ধি দিল না, বরং লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

বোকা লোকের বিপর্যয়-কাহিনী অনেক আমরা জানিয়াছি। কিন্তু বোকা হইয়াও যে চালাকের ভাত মারিতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী নামক গল্পে। ব্রাহ্মণ লেখাপড়া জানেন না, বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু নাই। ব্রাহ্মণীর গঞ্জনায় বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে যে লেখাপড়া তিনি শিখিলেন তাহা সত্যই অনবদ্য—

এ বেলা পড়েন—ক—চ—প—অ—অ—অ
ও বেলা পড়েন—খ—চ—ফ—অ—অ—অ
দিনে পড়েন—হগড়ং ডগরং বগ বগ বগড়ম্
রাতে পড়েন—চং ছং খঁচরঁ অম্—ঘড়—ঙ্—ঘড়্ম

এত বিদ্যা শিখিয়া একেবারে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া তিনি ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু দৈব নেহাতই তাঁহার অনুকূল ছিল, সেজন্য সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়া তিনি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিপুল প্রতিষ্ঠা লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বুদ্ধিহীনকে দেখিয়া আমরা অনেক স্থানে হাসিয়াছি, কিন্তু বুদ্ধিমানকে দেখিয়া আমরা হাসিয়াছি শুধু কেবল একটি গল্পে। সরকারের ছেলে নামক একটি গল্পে। সরকারের ছেলে নামক গল্পের রামধন সরকার বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও অনেকের উপহাস লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজের সুচতুর বুদ্ধি, আর সুগভীর সততার দ্বারা সে সকলের উপহাসই সুদে আসলে ফিরাইয়া দিল। রাজা ও মন্ত্রী তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নানা রকম কাজের ভারই দিয়াছিলেন, কিন্তু সব কাজই সমান আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া শুধু যে রাজা ও মন্ত্রীকেই সে বেয়াকুব বানাইয়া দিল তাহা নহে, নিজের জন্যও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া ফেলিল। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা রামধনকে রাজ্যের সব বাড়ি মাপিতে বলিলেন, তারপর নদীর ঢেউ গণিতে বলিলেন। রামধনের কোন কাজেই বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। ঢেউয়ের কি নিখুঁত হিসাব! মোট ঢেউয়ের সংখ্যা নিরানব্বুই নিখর্ব নিরানব্বুই বৃন্দ নিরানব্বুই কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিরানব্বুই হাজার নয় শত নিরানব্বুই। রাজা বলিলেন, 'হিসাবে তো ভুল হইতেও পারে।' রামধন জোড়হাত করিয়া বলিল, 'মহারাজ, যে

কাহাকেও দিয়া আবার গণাইয়া দেখুন, যদি একটিও ভুল হইয়া থাকে, আমি অবশ্যই শাস্তি পাইব।' রাজা ও মন্ত্রী একেবারে চুপ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মজা হইল ইঁদুর মারিবার বেলায়। রাজা হুকুম দিয়াছেন, রাজ্যের সব ইঁদুর মারিয়া ফেলিতে হইবে। রামধন তাহার বিরাট ইঁদুরনিধনবাহিনী লইয়া ইঁদুরের বংশ ধ্বংস করিতে লাগিল। ইঁদুর ধ্বংস করিতে যাইয়া রাজ্যের সব ঘর-বাড়িও সে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিল। মন্ত্রীর প্রাসাদ এমন কি রাজার প্রাসাদও যায় যায় আর কি। যাক, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব রক্ষা পাইল আর রামধনের গর্দান দিতে হইল না, কিন্তু গদি জুটিল।

আকৃতির বিপর্যয় যে কতখানি হাস্যোদ্দীপক হইতে পারে তাহার চিরকালের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি সুইফটের Gulliver's Travels-এ। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র দেড় আঙ্গুলে গল্পে এবং 'দাদামশায়ের থলে'র বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান নামক গল্পে মানুষী আকৃতির আত্যন্তিক ক্ষুদ্রতা ও বিশালতা দেখিয়া আমরা কৌতুকের প্রবলতম আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়াছি। দেড় আঙ্গুলে ছেলের আড়াই আঙ্গুল টিকি। পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্যে সে তাহার টিকি নিয়া যে সব অ্যাডভেঞ্চার করিয়াছে সেগুলির বর্ণনা অবিমিশ্র কৌতুকরসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে কেহও আঁটিয়া উঠিতে পারে না—'পিপঁড়া আসে, গুবরে আসে, ফড়ীং যায়—দেড় আঙ্গুলের সঙ্গে কেউ পারে না। দেড় আঙ্গুলে হটিং হটিং করিয়া হাঁটে, ফটিং ফটিং করিয়া নাচে।' বাইশ জোয়ান ও তেইশ জোয়ানের গল্পটিতে কৌতুকের প্রকাশ বোধ হয় আরও প্রবলতর। সেখানে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতা ও বিশালতা দেখিয়া মনে হয় Gulliver's Travels-এর লিলিপুট ও ব্রবডিংন্যাগের কাহিনী বুঝি একত্রিত হইয়াছে। যে জোয়ান পুকুরের জল এক চুমুকে সব খাইয়া ফেলে, এক চাপড়ে একটি হাতিকে কাত করিয়া রাখে, সেই আবার অন্য জোয়ানকে দাঁতন করিবার জন্য একটি বিরাট বটগাছ লইয়া যাইতে দেখিয়া শঙ্কিত হইল। আবার এ হেন দুই জোয়ানের লড়াই দেখিয়া এক বুড়ী বলিল, 'হাঁরে বাছারা, পথের মাঝে খেলা করিতেছিস, লোকজন যাইতেছে, কার পায়ের চাপনে মারা যাইবি। পথ ছাড়িয়া সরিয়া খেলা কর।' তারপর তো তাহারা বুড়ীর কাঁধে উঠিয়া লড়াই চালাইতে লাগিল, কিন্তু এক চিল ছোঁ মারিয়া সকলকে লইয়া আকাশে উড়িল, আর সেই সব গিয়া পড়িল এক রাজকন্যার চোখের ভিতরে—আকাশ হইতে কি যেন

ধূলাবালির কণা চোখে ঢুকিল। ধূলাবালি তো নয়, কি যেন নড়ে চড়ে। এদিকে রাজকন্যার চোখের জলে দুই জোয়ান, বুড়ী ও তাহার গোরু মহিষগুলি তো একেবারে হাবুডুবু। গল্পটির মধ্যে এরূপ অভাবনীয় উদ্ভটত্ব এত রহিয়াছে যে পড়িবার সময় হাসির নির্দয় আঘাতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

রূপকথার মধ্যে দেবতার আবির্ভাব বেশি হয় নাই, কিন্তু অপদেবতার অধিকার অনেক স্থানেই দেখা দিয়াছে। ভূত-প্রেত, রাক্ষক-খোক্কস প্রভৃতি মানবেতর জীব প্রায়ই মানবের জীবনযাত্রার মধ্যে নানা সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে; অবশ্য শুধু কেবল সঙ্কট সৃষ্টি নহে, মাঝে মাঝে সঙ্কটত্রাণেও তাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে তাহাদের বিকট আকার ও উৎকট আচরণ অনেক স্থানেই আমাদের এক আতঙ্কিত কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃদকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে।' ভূত-প্রেত অথবা রাক্ষক-খোক্কসের কাহিনী শুনিয়া আমরা এই আনন্দই অনুভব করিয়া থাকি। ভূত কৌতুকজনক এই কারণে যে, ভূতের ক্রিয়া আমরা বোধ করিতে পারি, কিন্তু সে শরীরী ও দৃশ্য নহে। সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য সত্তা দ্বারা একটি ব্যাপার ঘটিতেছে। অথচ তাহাকে আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না—এই বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্বের ফলেই আমাদের কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। ভূতের আবার নানা জাত ও নানা প্রকৃতি আছে, পরশুরাম অবশ্য তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তবে ভূত আমোদ-জনক আরও এই কারণে যে সে রাক্ষসজাতের মত হিংস্র নহে, চড় চাপড়, কিল ঘুসি মারিলেও প্রাণে একেবারে মারিয়া ফেলিতে বোধ হয় তাহার মায়া হয়। 'দাদামশায়ের থলে'র সরল ও সদাশয় ব্রাহ্মণটিকে ঠকাইতে যাইয়া ভূতের অবিরাম কিলগুঁতা খাইয়া লোভী বেণের কি দুর্দশাই না ঘটিয়াছিল! কিন্তু তাহারও শাস্তি হইল বটে, তবে প্রাণ খোয়া গেল না। ভূত ও রাক্ষসদের ভাষার দিক দিয়া বোধ হয় একটা মিল আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা ইহা লইয়া আলোচনা করিতে পারেন। উভয়ের ভাষাতেই আনুনাসিকের ভীষণ প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই আনুনাসিক পাওয়া যায় পেত্নীর কান্নায় আর রক্ষসী বুড়ীর কথায়।

হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মাঁনষেঁর গঁন্ধ পাঁউ
ধঁরে ধঁরে খাঁউ॥

রাক্ষসদের এই চিরপ্রচলিত নরমাংসলোলুপ উক্তি আনুনাসিক বর্ণের অস্তিত্বের জন্যই চিরকাল কৌতুকরসপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রাক্ষস অপেক্ষা খোক্কস বোধ হয় আরও কৌতুকাবহ, অন্তত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র নীলকমল ও লালকমলের গল্পে খোক্কসদের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তো ভয় অপেক্ষা কৌতুকের উদ্রেকই হয় বেশি। খোক্কসদের শেষ পরিণতিতেও এই কৌতুকের স্পর্শ ফুটিয়া উঠে যখন দেখিতে পাই সব খোক্কস কচুকাটা হইয়া একেবারে যেন গিরগিটির ছা'র মতই হইয়া গিয়াছে।

পশুপক্ষীর কথা

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পগুলির মধ্যে বিভিন্ন পশুপক্ষীর সরস কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ নীতিশিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। Aesop's Fables-এর প্রসিদ্ধ গল্পগুলির মধ্যেও কোন না কোন লৌকিক নীতিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রচলিত গল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন নীতি অথবা তত্ত্ব প্রাধান্য পায় নাই, হয়তো আর্যেতর সমাজ হইতে অনেকগুলি গল্প আসিয়াছিল বলিয়া আর্য সমাজের সহজাত নীতি ও ন্যায়বোধ তাহাদের মধ্যে বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে ইহাও সত্য, গল্পগুলির মধ্যে নীতিকথা বড় না হইয়া উঠিলেও আমাদের মনের সহজ প্রবণতা ও অনুকূলতা কোন বিরূপ নীতির রূঢ় আঘাতে বিপর্যস্ত হয় নাই। ন্যায়বোধ মাঝে মাঝে আহত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যায় যদি করা হইয়া থাকে তবে করা হইয়াছে সাধারণত হিংস্র ও দুর্দান্ত প্রাণীদের বেলাতেই। কুমীর, বাঘ প্রভৃতির প্রতি অনেক স্থলে ন্যায় বিচার প্রদর্শিত হয় নাই, তাহার কারণ, ঐ প্রাণীগুলি হিংস্র ও অপকারী। যাহাকে আমরা ভয় ও ঘৃণা করি তাহাকে জব্দ হইতে দেখিলে আমরা মজা পাই। বাঘকে আমরা সর্বাপেক্ষা ভয় ও ঘৃণা করি, সেজন্য কথাগুলির মধ্যে বাঘের জব্দ হইবার নানা ঘটনা সৃষ্টি করিয়া আমাদের এত মজা যোগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুত কথাগুলিতে দোর্দণ্ড প্রতাপ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আত্যন্তিক দুর্গতি দেখিয়া তো আমাদের অনুকম্পাই জাগ্রত হয়।[১] আর

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি উল্লেখযোগ্য—অপরিমিত দৈহিক শক্তি ও নরমাংস-লোলুপতা থাকা সত্ত্বেও, বাংলার উপকথায় ব্যাঘ্র এক ফোঁটাও নররক্তপান করিতে পারে নাই, মানুষের বুদ্ধির নিকট বার বার পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অপমান ভোগ করিয়াছে মাত্র।

লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৫৩

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পশুপক্ষী লইয়াই নানা গল্প রচিত হইলেও সেই সব পশুপক্ষীর সহিত মানুষের কাহিনী জড়িত থাকে, এবং সব কাহিনীতে মানুষেরই অন্তিম জয় ও সুখভোগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে মানুষ লেখকের পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। পশুপক্ষীজগতের কেহ লেখক অথবা কথক হইলে কাহিনীর বস্তু ও রসপরিণতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইত ইহা অনুমান করা শক্ত নহে। পশুপক্ষীদের কাহিনী মানুষের কাছে এত প্রিয় এই কারণে যে, তাহারা স্বভাব ও আচরণে মানবীয় ভাববিশিষ্ট, তাহাদিগকে মানুষের মতই কথা বলিতে ও আচরণ করিতে দেখিয়া আমরা বিশেষ কৌতুক বোধ করি। অনুকরণ কৌতুকের একটি প্রধান উপাদান। পশুপক্ষী মানুষের জীবন ও স্বভাবের অনুকরণ করিয়াই কৌতুকাবহ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশে পশুপক্ষীর অনেক গল্প বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' বোধ হয় এধরণের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ, অবশ্য পরবর্তীকালে যোগীন সরকারের বইগুলিও বাংলার ঘরে ঘরে গল্প-রসপিপাসু শিশুদের মনে অনাবিল আনন্দরস বিতরণ করিয়াছে।

পশুপক্ষীদের মধ্যে শিয়ালই বোধ হয় সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।[১] সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে, মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখীদের মধ্যে কাক আর পশুদের মধ্যে শিয়াল। বস্তুত শিয়ালের ধূর্ততা লইয়া যে কত গল্প প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে গল্পগুলির মধ্যে শিয়াল শুধু খল ও স্বার্থান্বেষী নহে, সে বন্ধুবৎসল ও পরোপকারীও বটে। শিয়াল ও কুমীরের কথাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র শিয়াল পণ্ডিত ('ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 'টুনটুনির বই'য়ের মধ্যেও রহিয়াছে) কুমীর অন্যান্য অনেকের উপরেই জিতিয়াছিল বটে, কিন্তু তালগাছে মনের আনন্দে নাচিতে যাইয়া কিন্তু তাহার শোচনীয় পরিণতি ঘটিল। কুমীরকে জব্দ হইতে দেখিয়া আমরা হাসিয়াছি আবার শিয়ালকে জব্দ হইতে দেখিয়াও হাসিলাম, গল্পকার কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নাই। আর একটি গল্পেও শিয়াল কুমীরকে আচ্ছা জব্দ করিয়াছিল। দুইজনে তো একসঙ্গে চাষ আরম্ভ করিল। প্রথম আলুর চাষ, কুমীর গাছের আগার

১। আর্য ও অনার্য উপাদান লইয়া আর্যভাষিগণই সমগ্র পশুজগতের একটি নূতন পরিকল্পনা করেন—তাহাতে সিংহ রাজা ও কোলমুণ্ডা জাতি পরিকল্পিত পশুসমাজের সর্বপ্রধান চরিত্র শৃগাল মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়। শৃগালের এই মন্ত্রিত্বের পদ হইতেই তাহাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া কল্পনা করা হয়। ॥ লোকসাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৪৯ ॥

দিক নিয়া ঠকিল। তারপর হইল ধানের চাষ। কুমীর এবার সেয়ানা হইয়াছে, সে গোড়ার দিক নিল, হায়রে তবুও সে ঠকিল। তারপর আবার আখের চাষ। আবার আগার দিক নিয়া সে ঠকিল! চাষে লাভ করার আশা ছাড়িয়া দিয়া সে বলিল, 'না ভাই তোমার সঙ্গে আর চাষ করতে যাব না. তুমি বড্ড ঠকাও।' শিয়াল কুমীরকে যেমন ঠকাইয়াছিল তেমনি ঠকাইয়াছিল বাঘকে। বাঘ তাহার পূজনীয় মামা হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে পদে পদে জব্দ করিতে তাহার বাধে নহে। বাঘকে সে কখনও তাহার বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া কূয়ার উপর মাদুর পাতিয়া তাহাতে বসিতে দিতেছে, কখনও শ্বশুর বাড়িতে যাইবার পাল্কী বলিয়া খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকাইতেছে, কখনও বা বাঘ শিয়ালের পরামর্শে রাখালদের কুড়ুল, খন্তা ও বল্লভের ঘা শালাশালীর ঠাট্টা মনে করিয়া হা—হা, হো—হো, হি—হি করিয়া হাসিতেছে, আবার কখনও বা শিয়ালের ব্যবস্থামত নিজের হাত পা চিবাইয়া অসুখ সারাইবার চেষ্টা করিতেছে। তবে শিয়াল যে অনেকের বহু উপকার করিয়াছিল তাহাও সত্য। বন্ধু বোকা জোলার সহিত কি ভাবে সে রাজকন্যার বিবাহ দিয়াছিল তাহার কাহিনী যথেষ্ট কৌতুকময়। দুষ্ট বাঘ ব্রাহ্মণের দয়ায় খাঁচা হইতে ছাড়া পাইয়া তাহাকেই যখন খাইতে উদ্যত হইল তখন শিয়াল যেভাবে বাঘকে পুনরায় খাঁচার মধ্যে বন্দী করিল তাহাতেও তাহার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর একজন সওদাগরের ঘোড়া চুরি গেলে সেই ঘোড়াও শিয়ালের বুদ্ধি বলেই পুনরায় উদ্ধার হইয়াছিল। শিয়াল অনেককে জব্দ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে যে নিজে একেবারে জব্দ হয় নাই তাহাও নহে। নরহরি দাস নামক ছাগল ছানা ও কুঁজো বুড়ী তাহাকে বিশেষ বেয়াকুব বানাইয়াছিল বটে এবং একবার আখের ফল খাইতে যাইয়াও সে আচ্ছা নাকাল হইয়াছিল। বাঘের কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বেচারা বাঘকে মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া শিয়াল, ছাগল এমন কি চড়াইপাখী পর্যন্ত আচ্ছা নাস্তানাবুদ করিয়াছে। ছাগলকে আমরা বোকা বলি, অথচ সেই ছাগল-কুলোত্তম শ্রীমান নরহরি দাস যখন গর্তের ভিতর হইতে সদর্পে হাঁক দিল—

লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন নাড়ি;
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস।
পঞ্চাশ বাঘে আমার এক এক গ্রাস।

তখন বাঘের সে কি বিষম দৌড়! মানুষ বাঘকে ভয় করে কিন্তু বাঘ ভয় করে টাগকে। জোলা যখন তাহার ঘোড়া ভাবিয়া বাঘের পিঠের উপর চড়িয়া বসিল তখন বাঘ তো ভাবিল, হায় হায়! এবার টাগের হাতে বুঝি প্রাণটা যায়! মরিয়া হইয়া প্রাণভয়ে সে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল, 'দোহাই টাগ দাদা। আমার ঘাড় থেকে নাম, আমি তোমার পূজা করব।' বাঘ বোকা হইতে পারে বটে কিন্তু বিবাহে তাহার বড়ই সখ। এই বিবাহ করিতে যাইয়া তাহাকে বার বার নাজেহাল হইতে হইয়াছে। বাঘিনী কন্যা হইলে চলিবে না। তাহার যে একেবারে রাজকন্যা চাই! একবার সে তো সত্যি সত্যি এক সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিয়াই আনিয়াছিল, রাজকন্যা না হউক, গৃহস্থ কন্যা তো বটে! বিমাতার অত্যাচারের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি, এখানে এই ব্যাঘ্রবধূ তাহার সপত্নীপুত্রদের প্রতি যে আচরণ করিয়াছে তাহাও অবশ্য কম নৃশংস নহে। কিন্তু হায়রে, ব্যাঘ্রায়ন লিখিবেন এখন লেখক কোথায়! বাঘের কথা বলিবার সময় বাঘের মাসীর কথাও একটু বলিতে হয়। 'টুনটুনির বই'তে একজন মাসীর কথা আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছি। সে হইল মজন্তালী সরকার। মজন্তালীর বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু দৈবও ছিল তাহার অনুকূল। সেজন্য বার বার দৈববলে জয়ী হইয়া সে তাহার প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে মরিতেই হইল। কিন্তু মরিবার সময় পর্যন্ত সে তাহার প্রেষ্টিজ বজায় রাখিয়া গেল। হাতীর পায়ের চাপে তাহার পেট ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঘিনী ও বাঘের বাচ্চাদের কাছে তো সে আর ছোট হইতে পারে না। বলিল, 'তোরা যে সব ছোট ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিলি, দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটই ফেটে গিয়েছে।'

'টুনটুনির বই'য়ের নামকরণ হইয়াছে যে টুনটুনিকে অবলম্বন করিয়া তাহার সম্বন্ধে কিন্তু মোটে তিনটি গল্পই আছে। টুনটুনি অতি ক্ষুদ্র পাখী কিন্তু বুদ্ধি বলে সে বিড়াল, নাপিত, রাজা সকলকেই জব্দ করিয়া দিয়াছে। অমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, টুনটুনির সহিত বিবাদ করিতে যাইয়া তাহাকেও নাককাটা হইয়া থাকিতে হইল। আমাদের আফসোস, রাজার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাকে অন্য দেশে উড়িয়া যাইতে হইল, তাহা না হইলে এই রঙ্গপ্রিয় ক্ষুদ্র পাখীটির আরও অনেক রঙ্গরহস্য হয়তো জানিতে পারিতাম।

গোপাল ভাঁড়

গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি আলোচনা না করিলে বাংলার হাস্যরসাত্মক গল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। গোপাল রসিক-চূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের-রাজসভায় ভাঁড় ছিল। প্রাচীনকালে গোপালের মত ভাঁড় হয়তো অনেক রাজার সভাতেই ছিল, কিন্তু তাঁহাদের কেহই গোপালের মত কালাতিশায়ী জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব দুইশত বৎসরের অন্ধকার কালের গর্ভে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যেমন একদিকে সৌন্দর্য ও ভক্তির সুধারসে বিদগ্ধ, ও ভক্তমণ্ডলীকে চিরদিন পরিতৃপ্ত করিতেছেন তেমনি অন্যদিকে তাঁহার সর্বজনপ্রিয় বিদূষকটি আজও পর্যন্ত বাঙালীর দুঃখ-মলিন জীবনে হাসির প্রসন্ন প্রলেপ আনিয়া দিতেছেন। যে বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী রাজাটি এরূপ অসামান্য গুণী লোকেদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাকে কৃতজ্ঞ জাতীয় চিত্তের শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের যে পরিচয় পাই তাহাতে তাঁহাকে উদারতা, রসজ্ঞতা ও বদান্যতার দিক দিয়া আদর্শ রাজা রূপেই মনে হয়। বর্তমানে আমাদের মর্যাদাবোধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়াছে, সামান্য কারণেই আমরা অপরাধ লইয়া থাকি, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এরূপ ছিল না, সেজন্য গোপালের দ্বারা নানাভাবে জব্দ ও অপমানিত হইয়াও তিনি তাঁহার আশ্রিত ভাঁড়টিকে প্রসন্ন হইয়া শুধু কেবল পুরস্কৃতই করিয়াছেন. বেরসিক গোঁয়ারের মত তাহাকে শাস্তি দিবার কথা ভাবেন নাই।

প্রাচীনকালে প্রায় সব দেশের রাজসভাতেই রাজা ও সভাসদবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য ভাঁড় জাতীয় একটি চরিত্র থাকিত। সমাজের পরিণত ও জটিল অবস্থাতেই হাস্যকৌতুক সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন ও সর্বব্যাপী হইয়াছে, কিন্তু পূর্বতন রাজতান্ত্রিক সমাজে হাস্যকৌতুক বিশেষ বিশেষ স্থান ও চরিত্র হইতে উৎসারিত হইত। আর একটি কথা। হাসি কর্মব্যস্ততাহীন অবকাশের মধ্যেই প্রবল জীবনীশক্তি লাভ করে। হাসির জন্য একটু ঢিলেঢালা, বিলম্বিত লয়ের জীবনই প্রয়োজন। প্রাচীনকালে জীবনের এই অবকাশ ও শিথিলতা ছিল বলিয়াই তখন হাস্যকৌতুক পরিবেষণের জন্য বিশেষ বিশেষ লোক নিয়োজিত থাকিত। হিন্দুরাজাদের রাজসভায় যেমন বিদূষক ছিল, পাশ্চাত্য রাজাদের সভাতেও তেমনি Buffoon, Fool অথবা Court Jester

থাকিত। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যেমন বিদূষকের একটি অপরিহার্য স্থান ছিল, এলিজাবেথীয় কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যেও তেমনি Fool অথবা Jester-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যাইত। বিভিন্ন দেশের বিদূষক জাতীয় চরিত্রের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। বিদূষক অথবা Fool-এর বোকামি দেখিয়া আমরা হাসি বটে, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বোকামি তাহার একটি ভান মাত্র, ইহা তাহার একটি বাহ্য ছদ্মরূপ, সেই ছদ্মরূপের অন্তরালে কৌতুকসৃষ্টি করিবার একটি সূক্ষ্ম ও সচেতন সত্তা বিরাজমান। সার্কাসের ক্লাউন অথবা ভাঁড়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেও বুঝা যাইবে, সে মুখে যত চুন-কালিই মাখুক এবং যত বোকার মত আচরণ করুক, আসলে সে বোকা নহে, বোকা সাজিয়া সে লোকেদের হাসায় মাত্র।

গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামির মধ্যেও তাহার সচেতন কৌতুকসৃষ্টির সুচতুর প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার চেহারা হাস্যাস্পদ ছিল বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি অপর সকলকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত। গোপাল স্বভাবত গম্ভীর-প্রকৃতির লোক ছিল এবং সেজন্যই তাহার রসিকতা এত হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তারী হইত। প্রকৃত হাস্যরসিকের হাস্য তরল ও বহির্মুখী নহে, তাহা গাম্ভীর্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এবং অপরের প্রতি অব্যর্থ শরসন্ধানী। শেক্স্পীয়রের As You Like It নাটকের টাচস্টোনের মতই গোপালকে উপহাস করিবার উপায় নাই, তাহার উপহাসে যোগ দিয়াই কৌতুক বোধ করিতে হয়।[১] সে যখন কোন আপাতনির্বোধ অথবা অর্থহীন উক্তি করে তখন মনে করিতে হইবে তাহার মধ্য দিয়া কোন সূক্ষ্ম রঙ্গ অথবা ব্যঙ্গের ইঙ্গিতই তাহার অভিলষিত। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে ঘটনার উদ্ভটত্ব সৃষ্টি করিয়া কৌতুকরস পরিবেষণ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু গল্পগুলির হাস্যজনকতার মূলে রহিয়াছে প্রধানত গোপালের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাহার তীব্র শ্লেষাত্মক উক্তি ও ব্যঙ্গকষায়িত গূঢ়ার্থক ইঙ্গিত। মনে রাখিতে হইবে, গোপালের রসিকতা বিদগ্ধ রাজা ও তাঁহার রসিক পারিষদবর্গের মধ্যেই

১। টাচস্টোন সম্বন্ধে, J. B. Priestly তাঁহার The English Comic Characters নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'Certainly for us he is no more butt, for we laugh with him and not at him. Even when he is gabbling nonsense, and that is not often, he is, of course, angling for a laugh and usually preparing to launch some shrewd hometruth-P. 22.

পরিবেষিত হইত। সেজন্যই ঘটনাশ্রয়ী অপেক্ষা সূক্ষ্ম বাক্যবিলাসী হওয়াই তাহার প্রয়োজন ছিল। তবে গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা বর্তমানকালে অনেক স্থানেই অশ্লীল ও গ্রাম্য মনে হইতে পারে এবং তাহা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মানুষের সমাজ-পরিবেশ, পারস্পরিক সম্বন্ধবোধ, কথা বলিবার বিষয় ও রীতি এবং ভদ্রতার আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রসবোধেরও পরিবর্তন হয়। পূর্বকালের রসিকতা এখন অশ্লীল ও রুচি বিগর্হিত মনে হইতে পারে, কিন্তু সেই রসিকতা বুঝিতে হইলে বর্তমানকালের সভ্যতাভিমানী রুচিবাই ত্যাগ করিয়া মনকে একটু উদার ও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

গোপালের স্বভাব অকারণ অনিষ্টান্বেষী ও অপচিকীর্ষু ছিল না। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে অপমান করিত তবে সে সেই অপমান সুদে-আসলে ফিরাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হইত না। প্রতিপক্ষের কথা মানিয়া লইয়া চট করিয়া একটি যথাযোগ্য উত্তর দিবার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তি তাহার ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রাগিয়া গোপালকে বলিলেন, 'তোমাতে আর গাধাতে তফাত কি?' গোপাল মহারাজের সহিত তাহার ব্যবধানের স্থানটুকু মাপিয়া বলিল, 'আজ্ঞে! এই দেড় হাত মাত্র তফাত।' উত্তরটি গোপালের মুখে যেন যোগানোই ছিল। আর একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাগ করিয়া গোপালকে 'শূয়ার কী বাচ্চা' বলিলে গোপাল করজোড়ে বলিল, 'হুজুর মা বাপ সব বলতে পারেন।' আবার এক দিন রাজা গোপালের পুত্রকে দেখিয়া বলিলেন, 'তাই ত বলি, ঠিক আমার মত দেখছি কেন?' গোপাল উত্তর করিল, 'মহারাজ হবে না কেন, নরাণাং মাতুলক্রমঃ।' এইভাবে গোপাল কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত ঠাট্টা মানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই ঠাট্টা ফিরাইয়া দিয়াছে। মহারাজ গোপালের প্রতি যতই রাগ করুন না কেন, গোপালের রসিকতায় শেষ পর্যন্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিতে না। আর হাসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত রাগ বিগলিত হইয়া যাইত। একদিন প্রত্যুষে গোপালের মুখ দেখিয়া উঠিবার পর রাজার নখ কাটিবার সময় একটু আঙ্গুল বাধিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি গোপালের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। গোপাল তখন বলিল, 'মহারাজ আমার মুখ দেখিয়া আপনার একটু কষ্ট হইয়াছে আর আপনার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ যাইতেছে। বিচার করিয়া বলুন দেখি, অনামুখো কে?' রাজা হাসিয়া তাকে ক্ষমা করিলেন। আর একদিন রাজা তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'গোপালের মুখদর্শন আর করিব না।' গোপাল পরদিন

তাহার পশ্চাদ্দেশ দেখাইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সভাস্থ সকলে বলিল, 'মহারাজ গোপালের মুখ দেখিবেন না বলিয়া সে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ দেখাইতেছে।' রাজা হাসিয়া গোপালকে সভায় আসিবার অনুমতি দিলেন। গোপাল পরিহাসচ্ছলে সংসার-জীবনের অনেক গূঢ় সত্যই প্রকাশ করিত। মহারাজ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোপাল! টাকা কেমন জিনিস?' গোপাল উত্তর করিল, 'মহারাজ! টাকার সবই গোল, টাকা দিতে গোল, টাকা পেতে গোল, টাকার হিসাবে গণ্ডগোল, টাকা চাইলে মহাগোল, টাকার সবই গোল ও টাকার সংশ্রবে থাকলেও কত গোল।' আর একদিন মহারাজ কে কে অকৃতজ্ঞলোক তাহা গোপালের কাছে জানিতে চাহিলেন। গোপাল তাহার জামাতা, ভাগিনেয় ও এক ঘরামিকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মহারাজ! এই তিন জনই অকৃতজ্ঞ লোক।' কতকগুলি গল্পে গোপাল উদ্ভট পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া প্রবল কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে। তালগাছের উপর হাঁড়ি রাখিয়া তলায় মাটিতে জ্বাল দিয়া তাহার অদ্ভুত রন্ধন, তাহার দ্বিতল বৈঠকখানা নির্মাণ, খট্টাঙ্গপুরাণ আলোচনা প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। গোপালভাঁড়ের অনেকগুলি গল্পই মলমূত্রত্যাগ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রচিত। এগুলি আজকাল গ্রাম্য ও কুরুচিপূর্ণ বলিয়া বিরক্তিকর মনে হইবে, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রাচীনকালের স্থূল রসিকতায় এগুলি দুর্দমনীয় হাস্যরসই উদ্রেক করিত।

(গোপালভাঁড়ের গল্পগুলির সহিত অনেকগুলি রঙ্গরসপূর্ণ গল্প বাংলাদেশে মুখে মুখে প্রচলিত আছে।) গল্পগুলি বহুরূপী, ভূঁইফোড় রহস্য, মজলিসি রঙ্গিলা ও হরবোলা ভাঁড় প্রভৃতি বিভিন্ন নামীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি গল্প অবশ্য সাহেব আদালত ইত্যাদি লইয়া রচিত কিন্তু অনেকগুলি গল্পই ইংরাজ-পূর্ব সমাজ-পরিবেশ হইতেই প্রচলিত হইয়াছে মনে হয়। কতকগুলি গল্পের নাম তো প্রবাদ বাক্যের মতই জনগণের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, যেমন,—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ; ছি মা কালী ঠাট্টা বোঝ না, পি-পু ফি-শু, কুলের কথা, কাদের সাপ, আলুদোষ, তবু ভাল জল নয় মুত, মাতালস্য নানা ভঙ্গি, কাশী না হয় ফাঁসী—মৃত্যু, কমলী তো ছোড়তা নেই, বদন তুলে গুড়ুক খাও ইত্যাদি গল্পের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকগুলি গল্পেই পণ্ডিত নৈয়ায়িক, বৈষ্ণব ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণবিদ্রূপ

ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই বিদ্রূপের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নাই, কোন স্বার্থপর মত ঢুকাইবার চেষ্টা নাই। মাতাল, গুলিখোর প্রভৃতিকে লইয়াও কয়েকটি রসাল গল্প রচিত হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে কোন নীতিকথা কিংবা পাপপুণ্যের জয়-পরাজয় প্রচারিত হয় নাই বলিয়া সেগুলি সমানভাবে সকলের উপভোগ্য হইয়াছে। সেজন্য সেগুলির মধ্যে হাসির শর্করারসই শুধু সৃষ্টি করা হইয়াছে, হাসির রস ও নীতির কষে পাচন তৈরী করা হয় নাই।

পল্লীগীতিকা

পল্লীগীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ইহাদের মধ্যে বাংলার যে আসল রূপটি তাহার সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। একদিকে নদনদী, বিল-হাওর, বন ও পুষ্করিণীশোভিত পল্লীপ্রকৃতির চিত্র; অন্যদিকে চাষী-রাইয়ত, জেলে-মাঝি, বণিক-সদাগর প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীসংবদ্ধ বাংলার সমাজচিত্র অতি বাস্তবভাবে গাথাগুলির মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যেও বাংলার সমাজরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল বটে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দৈব-লীলার অত্যধিক প্রাধান্যে নরনারীর স্বাধীন জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু এই পল্লীগাথাগুলির মধ্যে সংঘাত ও সমস্যাজড়িত মানব-জীবনের বেদনা ও মর্যাদা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। গাথাগুলির বক্তা ও শ্রোতা শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনদৃষ্টি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই এবং সমাজশাসিত জীবনের দুর্জয় ও বেপরোয়া গতিলীলা তাঁহারা অন্তরের অকপট সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

কিন্তু পল্লীকবিদের কাব্যে মানবজীবনের নিরঙ্কুশ মহিমা ঘোষিত হইলেও নদীমাতৃক দেশের জলবায়ু ও মাটির প্রভাবে মানবপ্রকৃতির যে সহজাত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহাই তাঁহাদের কাব্যেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে সহজ কমনীয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ত বেদনা ও কারুণ্যের ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ গাথার পরিণতিই দুঃখময় এবং তাহাদের মধ্যে একটি বিলাপচারী ও রোদনভরা সুরই অবিরাম ধ্বনিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি পালার মিলনান্তক পরিণত ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও খেদ ও আক্ষেপের কারুণ্যই প্রাধান্য পাইয়াছে। কংস, যমুনা ও ফুলেশ্বরীর বুকে চিরকাল ধরিয়া মহুয়া, মলুয়া, লীলা ও চন্দ্রাবতীর শোকই তো তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁদিয়া চলিয়াছে। জীবনের যে দূরাবস্থিত, বুদ্ধিকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে হাস্যকৌতুকের উপাদান ধরা পড়ে, ঘটনা ও চরিত্রের যে বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখাইয়া হাস্যরসিক হাস্যরস সৃষ্টি করেন সেই দৃষ্টি অথবা

সেই রসিকসত্তা আমরা পল্লীকবিদের মধ্যে বেশি দেখিতে পাই নাই। কিন্তু বেশি না দেখিলেও একেবারেই যে দেখি নাই তাহা নহে। জীবনের ধারা করুণ হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারা মাঝে মাঝে হাস্যকৌতুকের আবর্তে ক্রীড়াশীল হইয়াও উঠে। অবশ্য যে পালাগুলি গভীর অনুভূতিময়, দুঃখক্ষত হৃদয়ের ক্রন্দনে করুণ, যথা—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, ধোপার পাট, দেওয়ান ভাবনা প্রভৃতি—সেগুলিতে হাস্যকৌতুকের উপাদান তেমন নাই। কিন্তু যেগুলি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে জটিল, বিচিত্র চরিত্রে কৌতূহলোদ্দীপক, যথা—কমলা, ভেলুয়া, মাণিকতারা, মইষাল বন্ধু, চৌধুরীর লড়াই ইত্যাদি, সেগুলির মধ্যে ইতস্তত হাস্যকৌতুকের উপাদান সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। তবে গাথাগুলির কবি ও শ্রোতা উভয়েই ছিলেন সাধারণত নিরক্ষর অথবা অল্পশিক্ষিত, সেজন্য কোন সূক্ষ্ম ও শাণিত উপায়ে তাঁহারা হাস্যকৌতুকের সন্ধান করিতে চাহেন নাই। শব্দচাতুর্য ও বাক্যবিন্যাস-কৌশলের মধ্য দিয়া যে Wit অথবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সৃষ্টি হয় তাহার নিদর্শন গাথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। যে জীবনসচেতন, সহানুভূতিশীল ও অন্তর্গূঢ় দৃষ্টিতে Humour অথবা করুণ হাস্যরসের প্রবাহ ধরা পড়ে তাহাও তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। নিছক কৌতুক অথবা বিদ্বেষকষায়িত ব্যঙ্গ এই দুই প্রকার হাস্যরসের পরিচয়ই সাধারণত পল্লীগাথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। কৌতুকের উদ্দেশ্য ছিল আমোদ আর ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল আঘাত।

আমাদের পারিবারিক জীবনে হাস্যপরিহাসের সীমানা সুবিস্তৃত নহে, বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যেই তাহা আবদ্ধ। ভ্রাতৃবধূর সহিত দেবর ও ননদিনীর অথবা ঠাকুরদার সহিত নাতিনাতনীর সম্বন্ধ চিরকাল রঙ্গরসে স্নিগ্ধ মধুর হইয়া রহিয়াছে। এই রঙ্গরসের ধারা ও প্রকৃতি বাঙালী সমাজবহির্ভূত কোন লোকের বোধগম্য নহে। পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় মাঝে মাঝে ক্রন্দন-বিলাপের ফাঁকে ফাঁকে হাস্যপরিহাসের মৃদু গুঞ্জন শুনা গিয়াছে। জলের ঘাটে চাঁদবিনোদের সহিত মলুয়ার নব পরিচয় হইবার পর সে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার পাঁচ বৌদির চোখে কিন্তু তাহার ভাবান্তর আর লুকানো রহিল না। তাহারা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল—

আউলা ঝাউলা অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুলা।
আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিলা একলা॥

আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি॥
কি হইয়াছে জলের ঘাটে সত্য করি বল।
না ভাড়াইও ননদিনী না করিও ছল॥
আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল।
সঙ্গে কইরা কলসী লও ভইরা আনতে জল॥

মলুয়া মহা ফাঁপরে পড়িল, বৌদিদিদের সহিত সে কিভাবে যাইবে? বাধ্য হইয়া তাহাকে অসুখের ভান করিতে হইল—

কালিকার রাত্রি আমার গেছে দারুন জ্বরে।
বেদনা হইছে বধূ আমার পেটের কামরে॥
তোমরা সবে জলে যাও না যাইব আমি।
পাঁচ ভাইয়ের বধূ তবে করে কানাকানি॥

চাঁদবিনোদের সহিত মলুয়ার বিবাহের পর শুভরাত্রিতে বিনোদ মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া একটু বেয়াড়াপনা আরম্ভ করিল, তখন তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া মলুয়া যে কথা বলিল তাহাতে অন্তঃপুরিকা রমণীদের রঙ্গরসের আর একটি দিক পরিস্ফুট হইল—

পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে।
বেড়ার ফাঁক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে॥
ভূষণের রুনুঝুনু শব্দ শুনি কানে।
পরিহাস করবে তারা কালিকা বিহানে॥
পরদিম নিবাইয়া বন্ধু আজি কাট নিশি।
চিত্তে ক্ষেমা দিও বন্ধু না বানাইও দোষী॥

বাঙালী ঘরের খাদ্যদ্রব্যের রসাল বর্ণনা কোন কোন গাথার মধ্যে পাওয়া যায়। মাণিকতারা গাথাটির কথাই ধরা যাক। নায়ক বাসু ভাবী শ্বশুর-বাড়িতে গিয়াছে। প্রথম প্রাতরাশটির আয়োজন বেশ ভালোই হইয়াছিল। হুরুম, নাইরকল, গুর বাতাসা, চিরার মোয়া, পাক্কা ডউয়া, তিলের নাড়ু ইত্যাদি মনের মত খাওয়া পাইয়া বাসু বেশ খুশীই হইয়াছিল। তারপর দ্বিপ্রহরের যে খাদ্য তালিকা বর্ণিত হইয়াছে তাহা যে কোন মঙ্গলকাব্যের বর্ণনাকে হারাইয়া দেয়। কিন্তু গোলমাল বাধিল ভাজাপোড়া লইয়া। বাসুর পাতে ভাজাপোড়া দেখিয়া ভাবী শ্বশুর তো রাগিয়াই খুন। জামাইয়ের পাতে

কি ভাজা দিতে আছে, ভাজা দিলে শ্বশুরবাড়িতে তাহার মেয়েকে যে সকলে ভাজিবে—

জামাই ভাজে হউড়ী ভাজে, ভাজে নোন্দগণ।
দেওরে কেউরে ভাজে ভাজে ঐষ্টক্ষণ॥

তাড়াতাড়ি বাস্থর পাত হইতে ভাজা তুলিয়া লওয়া হইল, তাহা দেখিয়া বাস্থ হায় হায় করিয়া উঠিল। এত পাইয়াও ভাজার শোক সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না—

বাস্থ ভাবে হায় কি অইল এইনা কম্মে ছিল।
মস্ত মস্ত কইভাজা আর বাগুন পোড়া গেল॥
আলু ভাজা বাগুন ভাজা ভাজা তিলের বড়া॥
বেসম দেওয়া উস্কি ভাজা চাপটি কড় কড়া॥
মোনের মত জিনিষ পাইয়া খাবার না পাইলাম।
বিয়া হব ভাব দেইখা মোনে খুসী হইলাম॥

॥ মাণিকতারা। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য়॥

(বাঙালীর কথাবার্তায় হাস্যকৌতুকের যে ধারা উদ্বেল হইয়া উঠে তাহা বিশেষ বিশেষ মানসভঙ্গি, প্রয়োগকৌশল, স্বরবৈচিত্র্য ও অলঙ্কারচাতুর্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়।) রসের উচ্ছ্বাস যেখানে যত প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ, বক্র ও গুহাহিত সেখানে তাহা ততই আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য। মাঝে মাঝে আপাতবিরাগের ছদ্মাবরণ দ্বারা অন্তঃশায়ী অনুরাগের তীব্রতা ও গভীরতাই ফুটাইয়া তোলা হয়। মহুয়া ও নদেরচাঁদের নিম্নলিখিত কথোপকথন দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—

মহুয়া। কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া॥
নদের চাঁদ। কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া॥
মহুয়া। লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দ্যা জলে ডুব্যা মর॥
নদের চাঁদ। কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥

॥ মহুয়া। মৈমনসিংহ গীতিকা॥

কমলা নামক গাথাটির চিকণ গোয়ালিনী ও কারকুনের রসালাপের কথা ধরা যাক। দুইজনেই রসে টইটম্বুর, সেজন্য উভয়ের কথাতেই রসের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। উহাদের রসালাপের কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

'কিসের লাগ্যা আইছুইন দুয়ারে আইছুন খারা।
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তি: কেন পাড়া॥'
গোয়ামরি হাসি তবে কহিছে কারকুন।
'খালি পান খাইয়া আইছি ভাণ্ডে নাই চুন॥
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ি॥
সঙ্গে কিন্তু নাই মোর এক কানা কড়ি॥'
গোয়ালিনী কয় 'আমি নাহি বেচি পান।
বিনা মূল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ॥
রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি।'
গোয়ালিনীর কথা শুনি কারকুন কয় হাসি॥

এই ধরণের ঠাট্টারসিকতা আজকাল আর নাই, এখন রসের বস্তু বদলাইয়াছে, ভঙ্গিও বদলাইয়াছে, কিন্তু এককালে পল্লীগ্রামের মাটিতে এই রসের বন্যা বহিত। চিকণ গোয়ালিনীর সহিত কমলার রসাল উক্তি প্রত্যুক্তির কথা আলোচনা করা যাক। গোয়ালিনী তাহার গোপন উদ্দেশ্য লইয়া কমলার কাছে আসিল এবং তাহার অসাধারণ রূপের বহু প্রশংসা করিয়া তাহার বিবাহের কথা তুলিল। কমলা রসিকতা করিয়া বলিল মানুষের সহিত তো তাহার বিবাহ হইবে না, তাহার বিবাহ হইবে একমাত্র মদনদেবের সঙ্গে—

সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইয়াছি দঢ়।
বিয়া না করিব আমি রৈব আইবুড়॥
এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব।
মদনের ঘাটে আসি খেওয়া দিয়া খাইব॥

গোয়ালিনী তো হাসিয়া একেবারে ফুটিফাটা, কমলার কথার উত্তর দিয়া বলিল—

একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপুরে।
পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে॥
তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া।
আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া॥

কমলা গোয়ালিনীকে অনেকখানি প্রশ্রয় দিল, কৌতূহল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন।
দেখি নাই কোন দিন সে চাঁদ বদন॥

গোয়ালিনী যে মদন ঠাকুরের সবিস্তার বর্ণনা করিল, সে আর কেহই নহে, কমলার বাপের অধীনস্থ কারকুন। কমলা মুখে খুশির ভাব দেখাইয়া গোয়ালিনীকে গলার হার পুরস্কার দিতে চাহিল। গোয়ালিনী তো আনন্দে আত্মহারা, কিন্তু তারপর কমলা তাহাকে কি চমৎকার পুরস্কারই না দিল—

চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল।
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল॥
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে।
ভূমিতলে পড়ে দাত কন্যার ঠোকরে॥
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল ঢিল।
পৃষ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত কিল॥
লাথি ভেদা দিয়া তারে মাটিতে ফালায়।
গোসায় ফুলিয়া কেবল উল্টা মারে গায়॥
চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক।
লাথি মাইরা গোয়ালিনীর ভাঙ্গিলেক নাক॥

কমলা চরিত্রের মধ্যে রসিকতা ও তেজস্বিতায় এক অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে আমরা কোমলা ও তেজস্বিনী উভয় প্রকার নারীই দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ রঙ্গরসিকা নারী বেশি দেখি নাই

পল্লীগাথাগুলির কয়েক স্থানে অদ্ভুত ও উদ্ভট জায়গার বর্ণনা দ্বারা কৌতুক রস সৃষ্টি করা হইয়াছে। নছর মালুম নামক গাথার মধ্যে অঙ্গী নামে এরূপ একটু আশ্চর্য সহরের বর্ণনা করা হইয়াছে—

আচানক দেশ সেই শুন কহি যাই।
বেপরদা মাইয়া মাইনসর লাজ সরম নাই॥
মরদেরা রাঁধে ভাত নারী হাটে যায়।
ভালা মাছ ছাড়ি তারা নাপফি পোঁচা খায়॥

মইষাল বন্ধু পালায় যে উত্তর মহলের বর্ণনা আছে তাও কতকটা এরূপই—

পুরুষ বসিয়া থাকে মাইয়ালে কামায়।
হাটবাজার যত নারী লোকের দায়॥
দরিয়ার পানিতে যত আছে হীরা মণি।
জালেতে ঠেকাইয়া রাখে না বাছি না গুণি॥
আসনে বদল করে সোনা মনে মন।
শুড়ি মাছ বদলে দেয় কাঠা মাপ্যা ধন॥
॥ মইষাল বন্ধু। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য়॥

পল্লীকবিগণ কোন কোন চরিত্রের দৈহিক বিকৃতি অথবা স্বভাবের উদ্ভটত্ব দেখাইয়াও কৌতুকরস পরিবেষণ করিয়াছেন। এসবস্থানে একটু মজা ও তামাসা ছাড়া কবিদের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মাণকতারা পালার তিনকড়ি কবিরাজের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়ক বাসুর মাকে দেখিতে কবিরাজ যাইতেছে। তখন তাহার বর্ণনা করা হইতেছে—

কিষ্টবর্ণ শরীলখানি ত্যাল ত্যালা তার গাও।
খাটা খুটা নাফা নোফা ফাটা ফাটা পাও॥
কুতকুতিয়া চায় কবিরাজ গুরগুরাইয়া যায়।
পাছে পাছে বাসু নাই উপ্তা হোচট খায়॥
বাসুর বাড়ী যাইয়া বলে বৈদ্য তিনকড়ি।
তোমার মাও যে ভাল হব খাইলে তিন বড়ী॥
॥ মাণিকতারা। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য়॥

আর একটি কৌতুকরসাত্মক চরিত্র চৌধুরীর লড়াইয়ের রামগতি। রামগতি কুব্জ ও কুরূপ, কিন্তু বিবাহ করিবার সখ তাহার প্রচণ্ড। তাহার চেহারার বর্ণনা একটু শুনুন—

একে তো রে রামগতি দাউদে খাইচে অঙ্গ।
দেখিলে তার রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ॥
ওঁচ নেচ ভাঙ্গিয়া বুক হইছে মোচা।
মুখের দিকে চেইনতে লাগে চৈত মাইয়া পেঁচা॥
॥ চৌধুরীর লড়াই। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৩য়॥

রঙ্গমালার সহিত তো এই রামগতির বিবাহ হইয়া গেল। অতুলনীয় রূপ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া রঙ্গমালার মত নারী খুব কমই দেখা যায়। এই কুরূপ, কুৎসিত লোকটির সহিত বিবাহ হওয়াতে তাহার অন্তর তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিবাহ বাসরে রামগতি স্ত্রীকে একটু আদর করিবার জন্য যেই তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইল অমনি—

লাত্থি মারি রামগতিরে ফালাইয়া দিল।
কেবাড় ভাঙ্গে রামগতি উড্‌গা লড় দিল॥
যেদিন লাগাত রঙ্গমালা চিনল আপন পর।
একদিনও না কইরল্য রামগৈত্যা গুঁজার ঘর॥
ধায় আর রামগতি পিছের দিগে চায়।
আর কিরে রঙ্গমালায় আমার লাউগ পায়॥

স্বামীকে লাথি মারিয়া স্ত্রী ফেলিয়া দিল এবং সে দুয়ার ভাঙ্গিয়া চম্পট দিল এই বিষয়ের বর্ণনা করিতে যাইয়া পল্লীকবি সুনীতি দুর্নীতির দিক ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহার কৌতুকময় দিকটিই দেখিয়াছেন, টাকা দিয়া রামগতি রঙ্গমালার বাপ ও ভাইকে বশ করিয়াছিল, কিন্তু রঙ্গমালাকে বশ করিতে পারে নাই—টাকা দ্বারা এরূপ বিবাহের বিসদৃশতা দূর করা যায় না, পল্লীকবি কৌতুকের আঘাত দিয়া তাহাই পরিস্ফুট করিয়াছেন।

পল্লীগীতিকার মধ্যে গ্রাম্য সমাজের যেমন স্নেহপ্রীতি, কোমলতা ও সততার দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তেমনি আবার ঈর্ষা-দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও নীচাশয়তার দিকও সমানভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দুর্বৃত্ত জমিদার, দুর্মনা সদাগর, অত্যাচারী দেওয়ান, কামাতুর কাজি ইত্যাদি চরিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাদের প্রতি কবিগণ শ্রোতাদের ঘৃণা ও আতঙ্ক উদ্রেক করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের মধ্যে আর এক শ্রেণীর অপকারী লোক আছে যাহারা প্রবল ও পরাক্রান্ত নহে কিন্তু যাহারা নীচ ও কুটিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ঈর্ষাপরায়ণ আত্মীয়, কেহ অর্থলুব্ধ কুসীদজীবী, কেহ স্বার্থসন্ধ স্তাবক আর কেহ বা গুপ্তপ্রেমের সুড়ঙ্গপথে যাত্রী কুটনী। তাহাদের চরিত্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আঘাতে হাস্যজনকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের পরাজয় ও বিপর্যয়ের চিত্র আঁকিয়া কবিগণ হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। কিন্তু এই হাস্যরসে কবি ও শ্রোতাদের চিরলালিত ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহারই পরিপূর্তি হইয়াছে।

বাঙালী পরিবারের ননদিনী চরিত্র চিরকাল ঈর্ষা ও কুটিল অভিসন্ধির জন্য কুখ্যাত হইয়া আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের কুটিলা চরিত্রের কথা প্রথমেই সকলের মনে পড়িবে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডে ভেলুয়া পালার মধ্যে এরূপ একটি ননদিনী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহার নাম বিভলা। বিভলা তাহার ভাই আমির সাধু ও ভাই বৌয়ের সুখে হিংসা ও বিদ্বেষে জর্জরিত। তাহার চরিত্র এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

আমির সাধুর রঙ ভৈন বিভলা তার নাম।
মাংস নাই সারা অঙ্গে অস্থি বেড়াই চাম॥
পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাই তায়।
কুড়ি বচ্ছর বয়স হৈয়ে বৈলতে লজ্জা পাই।
যৌবন জোয়ার তবু গাঙে আসে নাই॥
ডালিম্বের গাছে হায়রে ধরে নাই ফল।
ডাঙ্গর ডাঙ্গর চৌখ করে ঝল মল॥
নারীর ছুরত নাই বিভলার অঙ্গে।
এই দুনিয়াতে বর্ক নাহি কারো সঙ্গে॥
আষাঢ়ে মেউলার মত লাগে মুখখানি।
সে মুখের বাণী যেন চিরতার পানি॥

কৃপণ ও সুদখোর লোক লইয়া আমাদের দেশে ও বিদেশের সাহিত্যে অনেক গল্প-নাটক রচিত হইয়াছে। এরূপ একটি চরিত্র হইল আষাঢ়িয়া মণ্ডল। চরিত্রটির বর্ণনা রহিয়াছে মইষাল বন্ধু নামক পালার মধ্যে। বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইল—

বিলাই বান্ধ্যা ভাত খায় আষাঢ়্যা মণ্ডল।
মাউগের পিন্ধনে নাই কাপড় ভাইয়ে মারে চড় চাপড়॥
পুতে ডাকে লাউড়ের পাগল।
লেংঠী পিন্ধ্যা থাকে শালা পাটি নাই ঘরে॥
দিনরাত শুইয়া বইয়া সুদের চিন্তা করে॥
ট্যাকার কুমইর ব্যাটা লোকে করজ দিলে।
হিসাব কইরা সুদ লয় কড়া ক্রান্তি তিলে॥
এক টাকার সুদ হয় যত বুড়ি কড়ি।
তিলে তুল্যে গণ্যা লয় হিসাব ঠাহরি॥

এক সন্ধ্যা খাইলে আর এক সন্ধ্যা নাহি খায়।
পাতার মশাল জ্বাল্যা রজনী গুয়ায় ॥

গরীব চাষী কবি ও তাহার শ্রোতাগণ এই চরিত্রের এরূপ বিকৃত স্বভাব ও আচরণের বর্ণনার সময় যে কত আমোদ পাইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

পূর্বে অর্থশালী লোকেদের অধীনে অনেক নীচ, স্বার্থলোভী তাঁবেদার লোক থাকিত। তাহারা প্রভুদের অনেক অপকর্মে সহযোগিতা করিত এবং দরিদ্র অসহায় লোকদের উপর অত্যাচার করিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিত। এইরূপ একটি চরিত্র হইল চৌধুরীর লড়াই গাথার রামভাঁড়ালী। সে দুর্দান্ত অত্যাচাবী জমিদার রাজচন্দ্র চৌধুরীর সর্বপ্রকার অন্যায় কর্মের মন্ত্রণাদাতা ছিল। তাহার যত বিক্রম দেখা যাইত গরীব ও দুঃস্থ লোকের বেলায়, তাহাদের উপর হামলা করিয়া টাকাকড়ি ছিনাইয়া নিতে সে বড়ই পটু ছিল, কিন্তু তাহার নানা শ্লেষগর্ভ উক্তি ও রসাত্মক মন্তব্য খুবই উপভোগ্য হইত। যেদিন প্রথম রাজচন্দ্র রঙ্গমালার সহিত রাত কাটাইয়াছিলেন সেদিন রামভাঁড়ালী বাহিরে একাকী অপেক্ষা করিতে করিতে বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজচন্দ্র প্রভাতে দরজা খুলিবার কথা বলিলে সে একটু উষ্মার সহিতই বলিল—

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
আমনে করেন রঙ্গ তামাসা আমি খোয়া যাই ॥
যায়গা না দিতে পাইল্যে এমন খেচরের
বাড়ী আইল কিসের লাই ॥

॥ চৌধুরীর লড়াই। পূর্ববঙ্গগীতিকা। ৩য় ॥

পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে কুটনী জাতীয় ব্যঙ্গবিদ্ধ চরিত্র প্রায়ই দেখা যায়। ইহার সাধারণত কুরূপা ও বিগতযৌবনা, যৌবনে দেহমনের বেসাতি করিয়া দেউলিয়া হওয়া সত্ত্বেও বেসাতির কারবার ভুলিতে পারে নাই, সরল ও অসহায় গ্রাম্যবালিকাদের ভুলাইয়া এই কারবারে নামাইতে চায়। মলুয়ার নেতাই কুটনী, কমলার চিকণ গোয়ালিনী ও চৌধুরীর লড়াইয়ের শ্যামপ্রিয়া এই ধরণের চরিত্র।

চিকণ গোয়ালিনীর কথা পূর্বেই একবার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার চরিত্র-চিত্রণে কবির বাস্তবতা ও চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতার বিশেষ

পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার চেহারা ও স্বভাবের বর্ণনা কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

গেরামে আছয়ে এক চিকণ গোয়ালিনী।
যৌবনে আছিল যেমন শবরি কলা চিনি ॥
বড় রসিক আছিল এই চিকণ গোয়ালিনী।
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী।
দই দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥
যখন আছিল তার নবীন বয়স।
নাগর ধরিয়া কত করত রঙ্গরস ॥
রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী।
দেশের লোকেতে ডাকে চিকণ গোয়ালিনী ॥
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ।
বয়সের দোষে মাথায় পাকিয়াছে কেশ।

এই সব নষ্টচরিত্রা, অনিষ্টকারিণী নারীর যথোচিত শাস্তির বিধান করিয়া পল্লীকবি ও তার শ্রোতাগণ পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। চিকণ গোয়ালিনীর শাস্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্যামপ্রিয়ার শাস্তির কথা একটু আলোচনা করা যাক। রসের কথা বলিতে যাইয়া শ্যামপ্রিয়া রঙ্গমালার দাসীদের হাতে যে লাঞ্ছনা পাইল তাহা সত্যই তাহার মত রসিকা রমণীর উপযুক্ত নহে—

লাপ দি পড়ি দাসীগণ চুল চাবি ধরিল।
গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল ॥
আশ কিল পাশ কিল কিল অজাগর।
চৌদ্দ বুড়ি মাইরছে কিল ঘেঁড়ির উপর ॥
এমন কিল কিলাইল তাইরে আরে কমু কি।
গুইল পিডনি পিডন দিল বাঁশের জিঙ্গল দি ॥

॥ চৌধুরীর লড়াই। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৩য় ॥

ছড়া

বিশ্বজগতের মধ্যে এক পরিপূর্ণ ছন্দের লীলা বিরজিত। একে অপরের সহিত মিলিয়াই সুন্দর ও সার্থক, তখনই জীবনে ছন্দের প্রতিষ্ঠা। মাঝে মাঝে এই ছন্দ ভাঙ্গিয়া যায়, ছন্দপতনের বেদনা বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেজন্য আমাদের বুদ্ধি ও অনুভূতি নিয়ত ছন্দ মিলাইবার জন্য প্রয়াসী—বাহিরের সহিত অন্তরের, ভাবের সহিত ভাবের, রূপের সহিত রূপের, কথার সহিত কথার মিল ঘটাইতে চায়। এই ইচ্ছা সহজাত ও মনের স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা পরিপোষিত। সাহিত্যের আদি ও অপরিণত অবস্থায় তাহার মধ্যে কোন জটিল পরিবেশ অথবা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসৃষ্টি থাকে না, তাহার মধ্যে থাকে শুধু একটা সুরের মিল, একটা আবেগের দোলা। ছড়া সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ এই কারণে যে, ইহার মধ্যে ঐ মিল ও আবেগ ছাড়া কোন সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ অথবা সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশ নাই। এই ছড়ার সুললিত ঝঙ্কারে শিশুর চিত্তে সর্বপ্রথম একটা ছন্দবোধ ও আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয়, এজন্যই ছড়া তাহার কাছে এত প্রিয়। কিন্তু ছড়ার মধ্যে যে মিল ফুটিয়া উঠে তাহা সুরের মিল, ভাবের মিল নহে। ছড়ার জগতে শিশু ছন্দের পক্ষীরাজের উপর চড়িয়া তাহার এলো-মেলো খেয়াল ও খুশীর জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেখানকার রাস্তাঘাটগুলি অচেনা ও অনির্দিষ্ট, কিন্তু পক্ষীরাজের চলা থামে না, টগটব করিয়া সে ক্রমাগত ছুটিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে!' সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে ছড়ার অনেক শ্রেণীবিভাগই করা চলে, কিন্তু ইহাকে প্রধানত দুইটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়—ছেলেভুলানো ছড়া ও মেয়েলী ছড়া—যাহা ব্রতকথার নিজস্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ অনেক ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তবে বাংলা ছড়ার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন পাওয়া যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' নামক গ্রন্থে।

দুরন্ত শিশুকে শান্ত করিয়া তাহার মনে খুশির আমেজ ও মুখে হাসির ঝলকটুকু ফুটাইবার জন্যই তো ছড়ার সৃষ্টি। শিশুর উদ্দাম দুরন্তপনা ততক্ষণই চলিতে থাকে যতক্ষণ তাহার ভিতরের মনটি থাকে ঘুমন্ত, কিন্তু যখন তাহার মন জাগিয়া উঠে তখন তাহার চপল হাতপাগুলি নিস্তেজ হইয়া আসে এবং তাহার কল্পনা ছুটিয়া চলে তেপান্তর মাঠ পার হইয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। তখন অদ্ভুতজগতের আজব বস্তু ও প্রাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে। সে অবাক হয়, ভয় পায় কিন্তু তবুও এক অবিরাম আনন্দের ঐকতান তাহার অন্তরে বাজিয়া চলে। কিন্তু শিশুর আন্তরিক আনন্দই মায়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তিনি যে তাহার কচি কচি গালভরা খিলখিল হাসি ভালবাসেন। সেজন্য তিনি কৌতুকের আচমকা আঘাত দিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলেন— ফুটন্ত লাল গোলাপের মাঝে দুই-একটি কুন্দকলি উঁকি মারে, মায়ের বুক সুবাসে ভরিয়া যায়। সেই কৌতুকের জন্য কখনও তাঁহাকে কোন আজব কাহিনী বলিতে হয়, কখনও কোন ভয়ঙ্কর জীবের লোমহর্ষণ বর্ণনা দিতে হয়, আবার কখনও বা শিশুর রোমাঞ্চকর বিবাহের রমণীয় বিবরণ শুনাইতে হয়। শিশু ভাত খাইবে না, বায়না ছাড়িবে না, ঘুমাইবে না, কেবল কাঁদিবে; মা তাহাকে আদর দেন, ধমক দেন, বিরক্ত হইয়া ঠাস করিয়া একটি চড় মারেন; শিশুর কান্না বাড়িয়া যায়। মা তখন বলেন, চুপ করলি নে, কানকাটার মাকে তবে ডেকে দেব? ঐ যে—

> কানকাটার মা বুড়ী
> বেড়ায় গুড়ি গুড়ি;
> এক হাতে নুনের ভাঁড়,
> আর এক হাতে ছুরি।
> যে ছেলেটা কাঁদে, তার
> নাকটি কেটে, কানটি কেটে,
> দেয় গড়াগড়ি!

কানকাটার মার কথা শুনিয়া শিশু ভয়ে চুপ করে, কল্পনার রাস্তা ধরিয়া তাহার মন চকিতে কোথায় যেন ছুটিয়া যায়। মা তখন আবার অন্য সুর ধরেন—

> দোল্ দোল্ দোল্ দোল্
> কিসের এত গোল?

খোকা আসছে বিয়ে ক'রে
সঙ্গে ছ'শ-ঢোল।
থামলো ঢোলের রব,
খোকামণি ঘুমিয়ে পল,
শান্ত-হ'ল সব।

খোকার চোখের পাতা বুজিয়া আসে, তাহার মনে বিবাহের ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বাজিয়া চলিয়াছে আর মুখে হাসির রেখা,—ঐ আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়া জ্যোৎস্নার একটুকু মিঠেল পরশ।

শিশুকে নানা আজগুবি ও ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা বলিয়া ভয় দেখানো হয় বটে, কিন্তু ভয় হইতেই শিশু কৌতুক ও আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। সেজন্য ভয়ের ছড়া শুনিতে সে ভালবাসে। যাহা প্রাকৃত জগৎ ও জীবনের ব্যতিক্রম ও বিপর্যয় বলিয়া বয়স্ক লোকের নিকট প্রতীয়মান হইবে তাহাই শিশুচিত্তের নিকট বিশেষ কৌতুকময় ও প্রীতিপ্রদ মনে হইবে। ভয়ঙ্কর চরিত্রগুলিকে শিশু পরিহাস করিতে চাহে না, তাহাদের সঙ্গী হইয়া সে তাহাদিগকে ভয় করে আবার ভালও বাসে। কানকাটার মার কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি, শিশুর ছড়ার মধ্যে এরূপ আরও কয়েকটি ভীতিজনক অতিমানবীয় চরিত্রের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। একানোড়ের কথাই ধরা যাক। কি বীভৎসই না তাহার চেহারা—

এক যে আছে একানোড়ে,
সে থাকে তাল গাছে চড়ে'।
দাঁত দুটো তার মুলোর মত,
পিঠখানা তার কুলোর মত,
কান দুটো তার নোটা নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলীর দড়ি,
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী।
যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলীর ভিতর বাঁধে,
গাছের উপর চড়ে,
আর, তুলে আছাড় মারে।

এই একানোড়ের কথা শুনিয়া আর কোন ছেলে কাঁদিতে সাহস পাইবে কি? একানোড়ে ছাড়া আরও ভয়ঙ্কর জীব আছে, যথা, কটকটে—

কটকটেটা বলে, আমি
এই গাছে আছি,
যে ছেলেটা কাঁদে, তার
জুলপী ধরে নাচি।

অথবা, জুজুমানা—

সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা,
জুজুমানা বসে আছে সঙ্গে ছ'পণ মশা।
আসিস না রে জুজুমানা, গোপাল ঘুমিয়েছে,
হুম হুম হুম—গুম্ গুম্ গুম্—ডালে বসেছে।
হাতে ছোরা ছুরি আছে গোপালের আমার,
আসিস যদি কেটে যাবি, দোষ দিবি কাহার?

রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষের মত এখানেও এক বীরপুরুষ খোকার সন্ধান পাইতেছি, মায়ের নিরাপদ কোলে সুরক্ষিত থাকিয়া খোকা জুজুমানার কাছে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছে বটে! জুজুমানার মতো আরও অনেক ভীষণ জীবের সহিত খোকার পরিচয় ঘটে, যথা বাঁশতলার বুড়ী, চারি চোকোর মা, হুম্বুর মুম্বুর ইত্যাদি।

ভয়ঙ্কর চরিত্রগুলি ছাড়াও ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে কতকগুলি কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর কথা শুনা যায়, সেগুলি কবে কোথায় ছিল জানি না কিন্তু সেগুলি বহুকাল ধরিয়া শিশুর চিত্তে কৌতুকবোধ জাগ্রত করে। এমনি এক আজব প্রাণী হইল হট্টিমা টিমটিম—

হট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হট্টিমা টিম টিম।

ইহারা ডিম পাড়ে আবার ইহাদের মাথায় শিংও আছে, অদ্ভুত প্রাণী বটে, প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণা করিতে পারেন! হট্টিমা টিম টিম অদ্ভুত পাখী, কিন্তু অদ্ভুত মানুষ হইল ফটিং টিং—

ওপারে যেও না ভাই,

ফটিং টিং এর ভয় ;
তিন মিনষে মাথাকাটা,
পায়ে কথা কয়।

ইহারা বোধ হয় সেই মজার দেশের অধিবাসী, যেখানে 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো।' আর একটি মজার দেশের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহা হইল হট্টমালার দেশ—

খোকামণির বিয়ে দেবো
হট্টমালার দেশে,
তারা গাই-বলদে চষে ;
তারা হিরেয় দাঁত ঘসে,

কিন্তু এই দেশে বিবাহ দিলে খোকার মা তাহাকে আবার ফিরিয়া পাইবেন তো ?

সাংসারিক নরনারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা খুশির মুহূর্ত কোন্‌টি—যখন সানাইয়ের সুর ঢ্যাম কুড় কুড় তালের সহিত মিলিত হয়, যখন লজ্জায় আকাশ রাঙা হইয়া আসে আর মাটির বুক পুলকে দুলিয়া উঠে। পরিণত লোকের কাছে বিবাহ দিল্লীকা লাড্ডু হইতে পারে, কিন্তু বিবাহের মধ্যে যে লজ্জা ও আনন্দের সুর রহিয়াছে তাহা অনুক্ষণ অবিবাহিত নরনারীর চিত্তকে রাঙাইয়া রাখে। শিশুর জীবনে রমণীয় মুহূর্তটি আসিবার অনেক বিলম্ব থাকিলেও সেই বিবাহ মুহূর্তের খুশিভরা লজ্জার সুর তাহার চিত্তকে স্পর্শ করে। বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার চিত্তে সেই খুশি ও লজ্জার স্পর্শ আনিয়া মা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন। শিশুর বয়সের সহিত তাহার বিবাহের এমন একটি সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে যে তাহার বিবাহ-প্রসঙ্গ বয়স্ক লোকের কাছে এক পরম কৌতুকাবহ ব্যাপার হইয়া উঠে। শিশুও সেই কৌতুকে যোগ দেয়। কিন্তু তবুও সেই অসম্ভব সম্ভাবনা তাহার অন্তরে এক অনাস্বাদিত পুলকের শিহরণ আনিয়া দেয়। খোকা কাঁদিলে মা তাহাকে সান্ত্বনা দেন—

কেঁদ না আর যাদুমণি,
আনবো তোমার বৌ ;
সোনা হেন রংটি তাহার,
ঠোঁটে আলতাগোলার ঢেউ।

এ-হেন বউয়ের আশ্বাস পাইলে যাদুমণির কান্না আর কতক্ষণ থাকে! অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও যে হয় না তাহা নহে—

খোকনমণির বৌটি ভালো,
সব ভালো তার রংটি কালো!

শুধু বৌ হইলে চলিবে না, বড় মানুষ শ্বশুর হওয়াও দরকার, সেই আশ্বাসও পাওয়া যায় মায়ের মুখে—

টুম টুমা টুম বাদ্দি বাজে,
লোকে বলে কি
খোকনমণি বিয়ে করে,
বড়মানসের ঝি।

লৌকিক কথার মত লৌকিক ছড়ার মধ্যেও মানুষের জীবনের সহিত পশুপক্ষীর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়। খোকাখুকুর সমস্ত শুভ ও আনন্দের ব্যাপারেই পশুপক্ষীদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিবাহ ব্যাপারেই এই সহযোগিতার ভাব বেশি দেখা যায়। খোকার বিবাহে তাহারা যে শুধু বরযাত্রী হইয়াছে তাহা নহে, বিভিন্ন প্রকার বাজনার ভারও তাহারা লইয়াছে। বরযাত্রীর বর্ণনা শুনুন—

আগে যায় গাড়ী ঘোড়া, পিছে যায় হাতী,
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাঙ্, কাঁধে ধ'রে ছাতি!

একটু বাজনার বর্ণনাও শুনুন—

কুকুরে বাজায় টুমটুমি,
বানরে বাজায় ঢোল;
টুনটুনিয়ে টুনটুনালো,
ইন্দুরে বাজায় খোল।

খোকার বিয়েতে নাচগানের আসরও বা কি চমৎকার—

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে
হাতী নাচবে, ঘোড়া নাচবে,
সোনামণির বে!

কতকগুলি ছড়াতে শিশুদের অন্য এক জগৎ দেখা যায়। শিশুরাও যে বয়স্ক লোকের মতই ঈর্ষা বিদ্বেষের বশীভূত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের

নিত্যকার জীবনে এবং সেই জীবনের প্রতিবিম্ব এই ছড়াগুলির মধ্যে। প্রতিপক্ষ খেলার সাথীদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কত অদ্ভুত বিশেষণেই না বিশেষিত করে। বয়স্ক লোকেরাও শিশুদের প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাদিগকে নানা উদ্ভট নাম ও আচরণের মধ্য দিয়া হাস্যাস্পদ করিয়া তোলে। রাগিলে অপর পক্ষকে কুৎসিত বলিয়াই জব্দ করিবার নিয়ম।

খোকা খুকুকে ভেংচি কাটিয়া বলে—

আহা! কি বা মেয়ের ছ্যারি,
যেন বাঁশবাগানের প্যারি!

খুকুও কম যায় না, মুখ বাঁকাইয়া সে টিপ্পনী কাটিয়া বলে—

আহা! কি বা ছেলের ছিরি ছাঁদ,
যেন গোবর-গাদার কালাচাঁদ।

যে সব ছেলেমেয়ে অনবরত কাঁদিয়া থাকে, তাহাদের কান্না থামাইবার জন্য বলা হয়—

ছিঁচকাঁদুনে নাকে ঘা,
রক্ত পড়ে চেটে খা।

কোন কোন স্থানে কাহারও কোন দৈহিক পীড়া অথবা অপটুতা দেখিলে শিশুদের কৌতুকবৃত্তি চঞ্চল হইয়া উঠে। কাহারও গাল ফোলা দেখিলে তাহারা বলিতে থাকে—

গালফুলো গোবিন্দর মা,
চালতা তলায় যেও না,
চালতা তলায় গরুর ঠ্যাং,
কলকে নাচে ড্যাডাং ড্যাং।

কাহাকেও খোঁড়াইতে দেখিলে ছেলেদের মজার আর সীমা থাকে না, পিছনে পিছনে দল বাঁধিয়া সমস্বরে বলিতে বলিতে চলে—

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং
কার বাড়ীতে গেছলি খোঁড়া,
কে ভেঙেছে ঠ্যাং
খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং।

যে সব ছেলে শীর্ণ ও দুর্বল তাহারাও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের পাত্র হইয়া থাকে। বেজায় মন্দ নামক ছড়াটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

মন্দ বড় বাছের বাছ,
হেলান দিয়েছে
আমরুল গাছ!
দূর্বার কোঁৎকা হাতে,
চলেছে রাজপথে,
পথে দেখেছে পাকাটি
লেগেছে দাঁতকপাটি।

খেলা ও কৌতুকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, খেলার মধ্যে যেমন অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন, কৌতুকের মধ্যেও তেমনি কখনও অঙ্গসঞ্চালন, কখনও বুদ্ধিসঞ্চালন, আবার কখনও বা কথাসঞ্চালন দেখা যায়। যে কোন প্রকার সঞ্চালনই হউক, তাহাতে আমরা মনের একটি সক্রিয় উত্তেজনা বোধ করি এবং সেই উত্তেজনাই আনন্দানুভূতি উদ্রেক করে। গৃহের বহির্গত খেলার মধ্যে যেমন শারীরিক উত্তেজনার বেশি পরিচয় পাওয়া যায়, গৃহের অন্তর্গত খেলায় তেমনি মানসিক বুদ্ধি কৌশল ও কৌতুকের ভাগই অধিক দেখা যায়। অনেক সময়েই গৃহে অথবা গৃহের প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েরা সম্মিলিতভাবে কিঞ্চিৎ দেহ চালনা করিয়া নানা কৌতুকময় ছড়ার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মজার খেলায় যোগ দেয়। মেয়েদের বাহিরে যাইবার সুযোগ সুবিধা কম, সুতরাং এসব খেলাতেই তাহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রথমেই আগডুম বাগডুম খেলার কথা মনে পড়ে। একসঙ্গে বসিয়া সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া খেলা করিতে থাকে—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ডান মিরগেল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে চললো ঢুলী,
ঢুলী গেল সেই কমলাপুলি,
কমলা পুলি টে টা, সুয্যিমামার বেটা। ইত্যাদি

আর একটি খেলা ইকড়ি মিকড়ি। মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে আবৃত্তি করে—

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি,

চাম কাটে মজুমদার,
ধেয়ে এল দামোদর,
দামোদর ছুতোরের পো,
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।

ছড়াটি অর্থহীন এবং ভাবসঙ্গতিহীন, কিন্তু ইহার ছন্দের দোলায় দোলায় খেলা জমিয়া উঠে, নাচের তাল দ্রুত হইতে থাকে। আনন্দের উত্তেজনায় ঘন ঘন সম্মিলিত স্বর ধ্বনিত হইতে থাকে—ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি ইত্যাদি। আর একটি কৌতুকময় খেলা হইল চাক্কু লাটা। খেলাটিতে যে ছড়া আবৃত্ত হইয়া থাকে তাহার কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

চাক্কু লাটা—পানের বাটা,
চাক্কু দুই—তুলে থুই,
চাক্কু তিন—ঘোড়ার ডিম,
চাক্কু চার—পগার পার।
চাক্কু পাঁচ—ধিনতা নাচ,
চাক্কু ছয়—খুকুর জয় ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত মিল রাখিবার জন্যই বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সব শব্দের কোন অর্থসঙ্গতি নাই, কিন্তু উহাদের প্রয়োগে যে ধ্বনিগত মিল ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই শিশুদের কৌতুকপ্রিয় মনকে মাতাইয়া রাখে। কয়েকটি ছড়ায় শ্রুতিমধুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা দ্রুত বেগ ও সরস আবেগ সৃষ্টি করা হয়। এই ছড়াগুলি সাধারণত খোকার নাচের সময় আবৃত্তি করা হয়। খোকার পা দুইটি টলমল করে, তাহার শরীরটি হেলিয়া দুলিয়া পড়ে, কিন্তু তবুও তাহাকে নাচাইতে হইবে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার তাল চলিতে থাকে, খোকার শরীরের উত্তেজনার সঙ্গে মিলিত হয় উৎফুল্লতা। খোকার নাকটি খাঁদা, পায়ে জড়ানো নূপুর। সেই খাঁদা নাক ঘুরাইয়া নূপুর বাজাইয়া নাচিতে থাকে—

ধিন্ ধিন্ ধিন্—খাঁদা নাচে,
না—তিন্ তিন্—নূপুর বাজে।
নাচে খাঁদা তুড়্—তুড়্—তুড়্,
দামা বাজে গুড়্—গুড়্—গুড়্।

সেই নাচ শেষ হইলে আবার অন্য তালে নাচ সুরু হয়—

তাকুড়্—তাকুড়্ তাক্
তাক্ কুড়াকুড়্ তাক্।
খোকার নাচন দেখ্।
খোকার কেমন নাচন দেখ্।

খোকা নাচিয়া চলে, তাহার কাজলপরা চোখ দুইটি কৌতুকে উজ্জ্বল, মুখে হাসির দুই একটি মুক্তাকণা, মাও তাহার নাচ দেখিয়া হাসি দেখিয়া আনন্দে দুলিতে থাকেন। এইভাবে নিরালা গৃহকোণের একপ্রান্তে স্নেহমুগ্ধ, মা ও খোকার নাচ চলিতে থাকে। খোকার নূপুর না—তিন—তিন বাজে আর মায়ের চুড়ি রিন—ঝিন—ঝিন বোল দেয়—সঙ্গে মিলিত হয় খোকার অস্ফুট হাম-হুম আর মায়ের দ্রুত আবৃত্তি—তাকুড় তাকুড় তাক! তাক কুড়াকুড় তাক্!

মেয়েলী ছড়াগুলি প্রধানত পাওয়া যায় ব্রতকথার মধ্যে। এই ব্রতকথার দুইটি অঙ্গ ছড়া ও আলপনা। কুমারী মেয়েরা আলপনা আঁকিয়া নানা মূর্তি গড়িয়া, ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে ব্রতানুষ্ঠান পালন করে। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠানদিদির থলে' ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রতকথা'র মধ্যে ব্রতকথার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতকথার মধ্যে ব্রতীর মানসিক আকাঙ্ক্ষা ও পূজা গম্ভীরভাবে থাকে বলিয়া হাস্যকৌতুকের অংশ ইহাদের মধ্যে কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে যেসব স্থানে ব্রতীদের দেবতার মধ্যে বাস্তব মানুষের ভাব ও স্বভাব আরোপ করা হয় তখনই কেবল কৌতুকের স্পর্শ পাওয়া যায়। মাঘমণ্ডল ব্রতে কিভাবে সূর্যকে একেবারে গৃহস্থালী সংসারের মধ্যে নিয়া আসা হইয়াছে তাহা দেখুন—

আসবেন সূর্য বসবেন খাটে, নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
চুল মেলবেন সোনার খাটে, পা ফেলবেন রূপার খাটে,
ভাত খাইবেন সোনার থালে, বেন্নন খাইবেন রূপার বাটিতে;
আঁচাইবেন ডাবর ভরা, পান খাইবেন বিড়া বিড়া,
সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া, খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা;
চুণ খাইবেন খুটরী ভরা, পেচকী ফেলাইবেন লাদা লাদা;

ঐ ব্রতে লাউল ঠাকুরের বিবাহের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাও বিশেষ কৌতুকজনক—

এ পারে লাউল ও পারে লাউল, কিসের বাদ্য বাজে
রাজার বেটা সওদাগর বিয়ে করতে সাজে ॥
সাজে সাজন্তি লাউল মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজার কন্যা, তুইলা দিব বিয়া ॥
সাজে সাজন্তি লাউল পায়ে নেপুর দিয়া।
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইলা দিব বিয়া ॥

ব্রতগুলির মধ্যে বাঙালীঘরের লক্ষ্মীবতী মেয়েদের কল্যাণ-কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহের সকলের কল্যাণ, আশ্রিত ও অভ্যাগত সকলের কল্যাণই ব্রতচারিণী মেয়েরা কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের সুখ ও সৌভাগ্যের কামনা করিয়াও একজনের প্রতি তাহারা কিন্তু বড়ই অশুভ অভিশাপ বর্ষণ করে। সে হইল সতীন। সতীনের প্রতি নানা বিরূপ উক্তির মধ্য দিয়া কল্যাণবতী বাঙালী ললনাদের যে অত্যধিক উদ্বেষ ও আত্যন্তিক ক্রোধের ভাব ফুটিয়া উঠে তাহাই বিশেষ কৌতুকময় মনে হয়। সেঁজুতী ব্রত হইতে সপত্নী সম্পর্কিত ছড়াটি উদ্ধৃত হইল—

আয়না, আয়না, আয়না।
সতীন যেন হয় না ॥
উদ্‌বিড়ালী ক্ষুদ খায়।
স্বামী রেখে সতীন খায় ॥
খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা।
সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ড্যাংরা ॥
বেড়ী, বেড়ী, বেড়ী।
সতীন আবাগী চেড়ী ॥
খোরা খোরা খোরা।
সতীনের মাকে ধরে নিয়ে যায় যেন
তিন মিনসে গোরা।
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা ॥

থুৎকুড়ি থুৎকুড়ি থুৎকুড়ি।
সতীন যেন হয় আঁটকুড়ী ॥
পাখী পাখী পাখী।
নীচেয় মলো সতীন, আমি উপর থেকে দেখি ॥

ছড়াটির মধ্যে সতীনের নানাপ্রকার দুর্গতিই কামনা করা হইয়াছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্গতি কোনটি? আমি বলিব, সেই যে যেখানে বলা হইয়াছে—সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ড্যাংরা। ইহা অপেক্ষা বড় অভিশাপ মেয়েদের আর কিছু আছে কি?

প্রবাদ

পাহাড়ী ঝরনার উৎপত্তি-স্থান কোথায় কে জানে, কিন্তু তাহার কলহাস্য ও চটুল নৃত্যছন্দে পাহাড়ের বুক সরস আনন্দে ভরিয়া উঠে। তেমনি ভাষার প্রচলিত প্রবাদগুলিও যে কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাদের রঙ্গব্যঙ্গের উজ্জ্বল স্পর্শে ভাষা রসোচ্ছল হইয়া উঠে। প্রবাদের গুহাহিত উৎপত্তি-স্থান অনুসন্ধান করিতে গেলে অতীতের সমাজ ও সংস্কৃতির কত অভাবিত-পূর্ব বিবর্তন ও বৈচিত্র্যের পরিচয় যে পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা অথবা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সারগর্ভ উক্তি ক্রমে ক্রমে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। লোক-প্রচলিত কোন ছড়া ও কাহিনীর বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় অংশও কিছুকাল পরে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইতে পারে। লৌকিক রূপকথা ও রসকথা হইতে অসংখ্য প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এবিষয় লইয়া অন্যত্রও আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি', 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী', 'ঘোড়ার ঘাস কাটা', 'পুকুর চুরি', 'সড়া অন্ধা', 'ছি মা কালী ঠাট্টা বোঝ না', 'Yes, no, very well', 'কমলী তো ছোড়তা নেই', 'বদন তুলে গুড়ুক খাও', 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' ইত্যাদি অসংখ্য প্রবাদবাক্য রূপকথা ও রসগল্প হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য হইতেও বহুপ্রবাদের জন্ম হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে দীনবন্ধুর নাটক প্রহসনে[১] মধুসূদনের প্রহসনে, রামনারায়ণের নাটক-প্রহসনে, স্বর্ণলতা উপন্যাসে[২] এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লোক-প্রচলিত অনেক প্রবাদের উৎপত্তি সন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্য হইতে উৎপন্ন প্রবাদ-সমূহের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ তালিকা পাওয়া যাইবে ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অতুলনীয় গ্রন্থে।

প্রবাদের উৎপত্তি যেভাবেই হউক না কেন, তাহার পুষ্টি ও প্রসার কিন্তু সাধারণ জনসমাজে। কোন প্রবাদ কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেহ জানে না, জানিতে চাহে না, আপনমনের আনন্দ বেদনার সহিত মিশ্রিত করিয়া

১। 'নবীনতপস্বিনী'র হোঁদল কুঁতকুঁত, 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্যের প্রসিদ্ধ উক্তি-'মাইরাগো পেল্লনাউনে সি সিজ সিম হইব না কেন' ইত্যাদি।

২। গদাধরচন্দ্রের সেই প্রসিদ্ধ বাক্য স্মরণ করুন—'ডুড়ও খাই, টামাকও খাই'।

ইহাকে সাধারণ লোক বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। এইভাবে বিশেষ স্থান অথবা বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন বাক্য জাতির এক চিরন্তন, নির্বিশেষ বাক্যে পরিণত হইয়া যায়।[১] কিন্তু প্রবাদের উৎপত্তি ও প্রসারের জন্য অনুকূল সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। যখন বংশ পরম্পরায় মানুষ একটি বিশেষ স্থানে জীবনযাপনে আবদ্ধ, প্রতিবেশীদের সহিত যখন আত্মীয়তাসম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, আড্ডা ও খোসগল্পের জন্য যখন প্রচুর সময় ও সুযোগ বর্তমান, তখনই প্রবাদের উৎপত্তি ও প্রচলন দেখা যায়। প্রাচীন পল্লীকেন্দ্রিক সমাজে এই অবস্থাগুলি ছিল বলিয়া তখন প্রবাদবাক্যগুলি জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তখন বহির্বিশ্বের সহিত পল্লীবাসীদের কোন যোগ ছিল না, রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি লইয়া মাথা ঘামাইতে তাহারা জানিত না; সেজন্য প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা লইয়াই তাহাদের সব আলাপ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিত। বারোয়ারীতলায়, চণ্ডীমণ্ডপে, বৈঠকখানায়, রন্ধনশালায় ও পুকুরঘাটে তখন কেবল জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও প্রতিবেশীর ব্যক্তিজীবন ও সংসারজীবন লইয়াই আলোচনা হইত। বলা বাহুল্য এই আলোচনায় বিদ্রূপ-কুটিল ওষ্ঠের বাক্য এবং কুৎসাকুঞ্চিত চোখের দৃষ্টি মিলিত হইত। সেই সময় প্রবাদ বাক্যের ধ্বনি-লালিত্য ও রসব্যঞ্জনা সর্বপ্রকার আলোচনার আসরই যে সরগরম করিয়া তুলিত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুধু বাদে নয় বিসংবাদে, পরিবাদে নয় প্রতিবাদেও প্রবাদগুলির চাহিদা ছিল যথেষ্ট। প্রাচীনকালে কর্মব্যস্ততা কম ছিল বলিয়া ঝগড়ার অবকাশ ছিল প্রচুর। প্রতিবেশীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও তখনকার শাশুড়ী, ননদী, জা, সতীন ইত্যাদি দ্বারা পরিবৃত সংসারে ঝগড়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারই ছিল। সেই ঝগড়ার মধ্যে কত যে ঝগড়াটে প্রবাদ-বাক্যাংশ ব্যবহৃত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিকে'র মধ্যে সেই প্রবাদ-পুষ্ট ঝগড়ার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'আটকুড়ীর ছেলে', 'ভাইখাগীর ভাই', 'মড়িপোড়ানীর জামাই', 'কুলীনকুমারী গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিখারী', 'মড়িঘাটায় তোর বাপ কাঠ যোগায়,' 'শ্যালকাঁটা ফুলের কলি,' 'ডাবনারিকেলের ন্যাওয়াপাতি' ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু গলার তারস্বরে এবং তীব্র গালাগালিতে

১। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মত উল্লেখযোগ্য—'কোন কালে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কথিত হইলেও ইহা সাধারণের নির্বিশেষ সম্পত্তি; সেইজন্য রচয়িতার নাম বা সাল তারিখ মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার বা উহার, একালের বা সেকালের নয়, ইহা সর্বকালের ও সর্বজনের।' বাংলা প্রবাদ—ভূমিকা, পৃঃ ৩

প্রতিপক্ষকে জব্দ করা চলে না, ঝগড়ার ভাষাকে যত প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ, বিদ্রূপ-শাণিত ও শ্লেষকণ্টকিত করা যায় প্রতিপক্ষকে ততই ঘায়েল করার সুবিধা হয় এবং সেজন্যই ঝগড়ার ভাষায় প্রবাদের এতখানি উপযোগিতা। প্রাচীন বঙ্গকুলাঙ্গনাদের সেই ঝগড়ার গরম পরিস্থিতি কল্পনা করুন। অন্তঃপুর আঙ্গিনা অথবা পুকুরঘাটে কলহকলিত কণ্ঠের গগনবিদারী হুঙ্কার ও আর্তনাদ শুনা যাইতেছে। কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও নাচা, আবার কখনও মূর্ছা—কলহপটীয়সীদের কি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক অভিনয়ই না চলিয়াছে! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চোখ ঘুরাইয়া, নখ বাঁকাইয়া ফুলঝুরির মত তীক্ষ্ণোজ্জ্বল প্রবাদ-বাক্যগুলি ছুঁড়িয়া মারিতেছে! এরকম না হইলে ঝগড়া জমে! শুধু কেবল ঝগড়ায় নহে, সাধারণ কথাবার্তাতেও পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েরাই বেশি প্রবাদ-বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে। যাতায়াত, খেলাধূলা, বৈষয়িক তত্ত্বাবধান ইত্যাদি ব্যাপারে পুরুষদের অনেকখানি ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু মেয়েদের চলা-ফেরার জায়গা এবং বহুমুখী প্রবণতার সুযোগের একান্তই অভাব এবং সেজন্যই অধিকাংশ সময় তাহাদের কথায় ও কাহিনীতে কাটাইতে হয়। এই অতি-ভাষিতার জন্য স্বভাবতই তাহাদের কথাবার্তায় প্রবাদের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। প্রবাদগুলি বিশদভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে প্রাগাধুনিক বাঙালী সমাজের পরিচয় ও নরনারীদের বিচিত্র অন্তঃপ্রকৃতির নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যাইবে। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের উক্তি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'জাতির আভ্যন্তরীণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা, তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিত্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্ম-কর্ম, বিদ্যাশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস, জলহাওয়া, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-সংস্কৃতি, শাসন-শিক্ষা, সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যের যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহা কল্পনার রঙে রঙিন বা ভাবমাধুর্যে অতীন্দ্রিয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও বাস্তব বুদ্ধির ঈক্ষণে সরস ও সজীব।'[১]

বর্তমানে প্রবাদগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, ইহার কারণ লইয়া আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। মানুষের জীবনধারণ-প্রণালী, পারস্পরিক সম্বন্ধবোধ এবং রসচেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাষারূপও পরিবর্তন লাভ করে। শব্দ-নির্বাচন, বাক্য-প্রয়োগ-রীতি এবং অলঙ্কার-ব্যবহারের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক শব্দ ও

১। বাংলা প্রবাদ (দ্বিতীয় সং). ভূমিকা, পৃঃ ৮৬।

বাক্যাংশ এককালে প্রচলিত থাকিলেও ক্রমে ক্রমে সেগুলি গ্রাম্য ও অশ্লীল বলিয়া বর্জিত হয়। পিরীত, নাগর, ভাতার, মিনসে, মাগী দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণত দেখা যায় তদ্ভব শব্দগুলি সম্বন্ধেই আমাদের রুচি ও রসবোধের পরিবর্তন হয়। প্রবাদগুলির অধিকাংশই তদ্ভব শব্দাশ্রিত। সেজন্যই সেগুলি বর্তমানের শিষ্ট ও মার্জিত ভাষা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে নূতন ভাষাশিল্পবোধ ও রসচেতনা শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে দেখা গেল, তখন হইতেই লেখ্য ও কথ্য ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে এবং আলালী ও হুতোমী ভাষায় আমরা তদ্ভব শব্দবহুল গদ্যরীতির পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য হইতেই শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্যালঙ্কারে তৎসম প্রভাব দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গেল। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই নাগরিক সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের একত্রে মেলামেশার ফলে তাহাদের ব্যবহার্য একটি মার্জিত সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষারূপ দেখা গেল, তাহা হইতে পল্লীমৃত্তিকালগ্ন শব্দ ও প্রবাদ বাক্যগুলি অপসারিত হইল। ভূমিজীবী সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূমির সহিত আমাদের যে ভাষারূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন চাকরীজীবী লোকেরা চাকরী ও জটিল শিল্পবৃত্তি উপলক্ষে নানা দেশী ও বিদেশী লোকের সহিত মিলিতেছে এবং সেজন্যই তাহাদের ভাষা নিজস্ব ঐতিহ্য-ধারা হইতে সরিয়া আসিয়া নানা বিদেশী ও বিষম শব্দ ও বাক্যরীতি গ্রহণ করিতেছে। এই বিচিত্র পরিবেশ-পুষ্ট, বিভিন্ন প্রভাব-তাড়িত অনিশ্চিত ভাষার মধ্যে বাঙালীর চিরন্তন মানস ঐতিহ্যবাহিত, সরস মৃত্তিকা-লালিত প্রবাদগুলি কিভাবে স্থান পাইবে? আজিকার সূক্ষ্মরুচিবিলাসী এবং নকল ভদ্রতাভিমানী মনের বালুচরে প্রবাদ-বাক্যের রস আর আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু একদিন বাঙালীহৃদয়ের পলিমৃত্তিকায় সেই রস দুইকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইত।[১]

১। 'সেকালের রঙ্গ তামাসা, শ্লেষ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরসাত্মক উক্তির মধ্যেও একটি স্বাভাবিক সবল ও খাঁটি বাংলা সুর ছিল, যাহা আধুনিক ভাবগদ্‌গদ বিলাতী বাংলা গৎএর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেইটুকুই ছিল বাঙালীর প্রাণের জিনিস। বর্তমানকালে এই সুস্থ প্রাণধর্মের সহজ রসজ্ঞানের পরিবর্তে আমরা মার্জিত রুচির শুচিবাইগ্রস্ত হইয়াছি।

বাংলা প্রবাদ ডক্টর সুশীলকুমার দে। ভূমিকা, পৃঃ ২৩।

সাধারণ অর্থজ্ঞাপক উক্তিকে সরস ও জোরালো করিবার জন্যই প্রবাদের ব্যবহার হয়। প্রবাদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাবসত্য ও রসসত্য নিহিত থাকে। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যদি সুকৌশলে কোন প্রবাদবাক্য প্রয়োগ করা যায় তবে সেই কথাবার্তার মধ্যে যেমন একটা অকাট্য যৌক্তিকতার দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠে, তেমনি তাহাতে একটি সর্বজনভোগ্য সরসতার স্পর্শও আসিয়া যায়। প্রবাদ-বাক্য অথবা বাক্যাংশটি মূল উক্তির সহিত যুক্ত থাকে না। সুতরাং তাহার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার মন হঠাৎ একটি দূরবর্তী জগতে যাইয়া সাধারণ উক্তিটির সহিত প্রবাদ-বাক্যটির একটি প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য আবিষ্কার করে এবং এই আবিষ্কারের ফলে সে কৌতুকের একটা প্রীতিপ্রদ স্পর্শ অনুভব করে। এই কৌতুকময়তা প্রবাদের স্বাভাবিক ধর্ম। অবশ্য প্রবাদ সব অবস্থাতেই ও সব সময়েই যে কৌতুকরসাত্মক তাহা নহে। যে প্রবাদগুলির মধ্যে একাধিক বাক্যাংশ থাকে এবং একটি বাক্যাংশের সহিত অপর বাক্যাংশের একটা অন্ত্য মিল দেখা যায় সেগুলিই সাধারণত কৌতুক রস সৃষ্টি করে, যেমন, 'শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।' আবার কোন কোন স্থলে প্রবাদ দ্বিপদী মিত্রাক্ষর কবিতার রূপ ধারণ করিয়া ছড়ার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত হইয়া পড়ে। এই সব ছড়াধর্মী প্রবাদের মধ্যে কৌতুকরস প্রবলতর হইয়া উঠে, যথা--

শুনতে বটে শ্বশুরবাড়ী বড় সুখের ঠাঁই।
কিন্তু সেথা ঝাঁটা ছাড়া আর কিছু নাই ॥

যেখানে প্রবাদ একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ অথবা বাগ্‌রীতিতে পরিণত হয় সেখানে ইহা সর্বজনসম্মত কোন সত্যভাষণ হইলেও সর্বজনসম্ভোগ্য কোন রসবাক্য আর হয় না। 'অকাল কুষ্মাণ্ড', 'বামন হয়ে চাঁদে হাত', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে', এইসব প্রবাদ বাক্যের মধ্যে ঈষৎ সরসতা আনিতে পারে বটে, কিন্তু কৌতুকের আচমকা আঘাত আনিতে পারে না। আবার কয়েকটি প্রবাদ আছে যেগুলি নিছক তত্ত্বগর্ভ ও উপদেশমূলক, ইহাদের মধ্যে কৌতুকের বিন্দুমাত্র যোগ নাই। ইহারা গুরুগিরি পাইয়া বিদূষণ-বৃত্তি ভুলিয়াছে, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে যাইয়া আনন্দরস হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ডাক ও খনার বচনগুলি এই শ্রেণীর প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। খনার বচনগুলির মধ্যে যেমন কৃষিসম্বন্ধীয় নানা নির্দেশ পাওয়া যায়, ডাকের বচনগুলিতেও গার্হস্থ্যজীবনে

পালনীয় বিশেষত নারীদের স্বভাব ও আচরণসম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্বকথা পাওয়া যায়, যেমন—

কাঁখে কলসী পাণিকে যায়, হেঁটমুণ্ড কাকেও না চায়।
যেন যায় তেন আইসে, ডাকে বলে গৃহিণী সে ॥

প্রবাদগুলির অধিকাংশই সাধারণত বিদ্রূপাত্মক ও সংস্কারমূলক, খোঁচা ও আঘাত দিয়া মানুষের দোষত্রুটি ও দুর্বলতার ক্ষতস্থানগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এমন কতকগুলি প্রবাদও আছে যেগুলি অবিমিশ্র রঙ্গরস উদ্রেক করিয়া শ্রোতার মনে সন্তোষ বিধান করিতেই চায়। বাঙালী ঘরে দেবর-ভ্রাতৃবধূ, ঠাকুরজামাই-শালা-বৌ, শালা-শালী ও ভগ্নীপতি, ঠাকুরদা ও নাতি-নাতনীর মধ্যে কথাবার্তায় অথবা সখী ও অন্তরঙ্গজনের সঙ্গে রসালাপে এইসব প্রবাদ ব্যবহার হয়। বুড়ার হাসি লইয়া রসাল উক্তি—'অদন্তের হাসি আমি বড়ই ভালবাসি', রাঙা বৌকে নিয়া যে ঠাট্টা দীনবন্ধু করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ উপভোগ্য—

দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বৌ সেই ঘরেতে চুরি ॥

শ্বশুরবাড়ির প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক জামাইয়ের মনেই বিরাজমান। সেই শ্বশুরবাড়ির প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি লইয়া একটি প্রবাদে কিরূপ ঠাট্টা করা হইয়াছে, দেখুন—

নৌকা ডিঙি চাইনা আমি আজ্ঞা যদি পাই।
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাই ॥

প্রথম বারের বৌকে বর তেমন আমল দেয় না। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বারের বৌ কিভাবে বরের নিকট ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর আদর ও প্রশ্রয় পায় তাহার বর্ণনা রহিয়াছে একটি রসাল প্রবাদের মধ্যে—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়িমাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায়!

যেসব প্রবাদের মধ্যে সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি ও আদিখ্যেতা প্রভৃতির প্রতি নিন্দাসূচক মনোভাব ব্যক্ত হয় সেগুলির মধ্যে শ্লেষ ও বিদ্রূপের মাত্রা এত অধিক হয় না যাহাতে প্রবাদগুলির

উপভোগ্যতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। প্রবাদগুলি আমাদের দুর্বল ও দুষ্ট স্থানে একটা লজ্জা ও গ্লানির ঈষৎ প্রদাহ আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা দমন করিয়া নির্দোষ ও নিরপেক্ষ লোকের হাসিতেও আবার যোগ না দিয়া পারি না। লেখাপড়ার প্রতি যাহারা অবহেলা করে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—'লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে, মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।' যে সব অন্তঃসারশূন্য লোক• কোন লেখাপড়া না শিখিয়া বড় বড় কাজের ভান করে তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলা হয়—

বিদ্যে সিদ্যে সব হল, দেশ করলে জয়,
এখন একটা লেজ বেরুলেই হয় ॥

নিজেদের দোষের অন্ত নাই, অথচ পরের ছিদ্র সন্ধান করিয়া যাহারা বেড়ায় তাহাদিগকে আঘাত করিয়া অনেক প্রবাদই প্রয়োগ করা হয়, যথা, 'চালুনি বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা', অথবা, 'রসুন বলে পেঁয়াজ ভাই, তোর গায়ের গন্ধে ম'রে যাই', 'পেঁচা বলে পিঁপড়েকে সর্ লো থেবড়ামুখী', 'আনারস বলে কাঁটাল ভাই, তোর গা বড় খসখসে' ইত্যাদি। অনেকের আবার এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে নিজেদের প্রিয়জনের কেবলই প্রশংসা করে, অথচ অপরের বেলায় নিন্দা ও উপহাস ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, তাহাদের চরিত্র হাস্যাস্পদ করিয়া তোলা হইয়াছে কয়েকটি প্রবাদের মধ্যে, যথা—

আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি
বেড়ায় যেন গোপালটি।
ওদের ছেলে ছেলেটা খায় দেখ এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা ॥

অথবা, 'নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুশমন।' কুৎসিত লোকের চেহারা নিয়াও অনেক প্রবাদে ঠাট্টা করা হইয়াছে, যেমন—

বাছার আমার কিবা রূপ।
ঘুঁটে ছাইয়ের নৈবিদ্যি, খেঙরা কাঠির ধূপ ॥

অথবা, 'নাক নেই বেটীর নথের সখ, ফেলনা বেটীর কত ঠমক'। অথবা, 'অবাক সৃষ্টি করলেন চুপে, নাক নেই তার আতর গোঁপে'। আবার যাহারা রূপের গর্ব করে তাহারাও রেহাই পায় নাই, যথা—'অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই', 'অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায়

বর।' আতিশয্য আরও অনেক ক্ষেত্রে নিন্দিত হইয়াছে, যথা—'অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে', 'অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি', 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ', 'অতিলোভে তাঁতী নষ্ট' ইত্যাদি। ঘরে চাল নাই, অথচ বাহিরে চাল দেন এমন লোকের কপটতা লইয়াও অনেক শ্লেষাত্মক প্রবাদ রচিত হইয়াছে, যথা—'ঘরে নেই অষ্টরম্ভা', 'বাহিরেতে কোঁচা লম্বা', 'ঘরে ছুঁচোর কীর্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন', 'উননে চড়ে না হাঁড়ি কথায় রাজা-বাদশা মারি' ইত্যাদি। সমাজের অনেক হৃদয়হীন প্রথাও কোন কোন প্রবাদের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। পণভারগ্রস্ত পিতার দুঃখ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে—

কণের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ বসে আছে পাঁচশ টাকার আশে॥

ঘরজামাইয়ের দুঃখ-দুর্গতির কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের অম্লরসে মিশ্রিত করিয়া কয়েকটি প্রবাদের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যথা—'ঘরজামাইয়ের পোড়া মুখ মরা বাঁচা সমান সুখ'। অথবা—

ঘর জামাই আধা চাকর সর্বলোকে চলে।
বাপ-দাদার নাম নাই ফলনীর জামাই বলে॥

যেসব প্রগতি-গর্বী পুত্র পিতামাতার প্রতি অসম্মান ও অনাদর দেখায় তাহাদের হাস্যকর অপরাধও ধরা পড়িয়াছে প্রবাদের মধ্যে যথা—'কলিকালের পোলাপান, বাপেরে কয় তামুক আন্', অথবা—

মায়ের পেটে ভাত নেই বউয়ের চন্দ্রহার।
মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার॥

একান্নবর্তী বাঙালী পরিবারে কয়েকটি জায়গায় চিরকাল অপ্রীতি ও অশান্তি দেখা গিয়াছে। পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও এই সব জায়গায় আত্মীয়স্বজনেরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিরক্তি ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া পারস্পরিক সম্বন্ধকে তিক্ত ও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। কখনও নিন্দায় এবং কখনও বা ঝগড়ায় এই সব সম্বন্ধের অন্তরস্থ ঈর্ষা-বিদ্বেষ অতি কদর্যভাবে প্রকটিত হইযাছে। বাঙালী ঘরের এই লজ্জাকর ও অপ্রীতিজনক দিকটি বহু প্রবাদের মধ্যেই আভাসিত হইয়াছে। আত্যন্তিক ঈর্ষা-বিদ্বেষের দিক দিয়া শাশুড়ী ও বৌয়ের সম্বন্ধই বোধ হয় সর্বপ্রথম আলোচনা করিতে হয়। শাশুড়ীর চোখে বউ কোন কাজই পারে না—'অকাজে বউড়ী দড়, লাউ

কুটতে খরতর'। বউয়ের চলন ফেরন গলার স্বর কিছুই শাশুড়ীর চোখে ভাল ঠেকে না, যেমন—

বউয়ের চলন ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন ॥

শাশুড়ীর রাগ যখন সপ্তমে ওঠে তখন তিনি বলেন,

বউ না রে বউ না, গরল ডাকিনী।
দিন হ'লে মানুষের ছা রাত হ'লে বাঘিনী ॥

এদিকে বউও কম যান না। আহা! শাশুড়ীর যেন আর কোন দোষ নাই—

বৌ ভাঙলে শরা গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা ॥

তবে বউয়ের হিংসা একেবারে চরম দেখা যায় যখন শাশুড়ীকে মরিতে দেখিয়াও সে একটু লোক দেখানো কান্নাও কাঁদিতে চাহে না—

শাশুড়ী মল সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে।

আসলে শাশুড়ীর মৃত্যু কবে ঘটিবে সেই কামনাই তো বৌ মনে মনে করে, কারণ শাশুড়ীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যে স্বতন্ত্র হইবার উপায় নাই—

জা জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।

আসলে ব্যাপারটা হইল শাশুড়ী ও বৌ দুইজনেই সমান, প্রবাদেই আছে –

শাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে খোয় দুধ।
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ ॥

শাশুড়ীর সঙ্গে যেমন ননদিনীর সঙ্গেও বউয়ের তেমনি সম্বন্ধ। কোন ননদিনীই ভাইবৌয়ের নিন্দা না করিয়া পারে না—'ননদিনী রায় বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়'। আবার কোন বউই ননদিনীর অশুভ কামনা না করিয়া থাকে না—'ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়।' অবশ্য বাঙালী সংসারেও ভাল শাশুড়ী, ভাল বৌ, ভাল ননদিনী আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত হয় নাই, এবং তাহাদের নিয়া আমাদের আলোচনাও নহে।

প্রবাদের মধ্যে যখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং তিরস্কারের উদ্দেশ্য প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহার হাস্যজনকতা কমিয়া যায়। তখন প্রবাদ রসসৃষ্টি করিবার জন্য প্রযুক্ত হয় না, তাহা গালাগালিতে পরিণত হয়। হাস্যরস তখনই সৃষ্টি হইতে পারে, যখন বক্তার একটি নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক ও রসোচ্ছল দৃষ্টি বজায় থাকে। যখনই বক্তার ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা ও নীতি-প্রচারের উদ্দেশ্য প্রবল হইয়া উঠিবে তখন শ্রোতাগণ আর প্রসন্নচিত্তে তাহার সহিত হাস্যকৌতুক বোধ করিতে পারিবে না। ডাকের বচনগুলির মধ্যে মেয়েদের চরিত্রের প্রতি একতরফা খবরদারী ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বলিয়া তাহাদের মধ্যে তেমন কৌতুকময়তার সন্ধান পাওয়া যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

পিঙ্গল আঁখি, চপল মতি, ওষ্ঠ ডাগর, অলক্ষণ অতি
পেট পিঠ উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড়হ বাট।
দেওর বধে স্বামী মারে, ডাক বলে—কাজ কিবা তারে॥

উপরের বাক্যগুলির মধ্যে বিশেষ জাতীয় নারী সম্বন্ধে সতর্কতা আছে, শিক্ষা আছে, কিন্তু কৌতুকের প্রসন্ন স্পর্শ নাই। মেয়েলি ঝগড়ার মধ্যেও প্রথম দিকে শ্লেষাত্মক ও কৌতুকাবহ প্রবাদ ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু ঝগড়ার মাত্রা যত বাড়িতে থাকে ততই প্রবাদবাক্য প্রখর ও ঝাঁঝালো হইতে থাকে এবং ঝগড়ার Climax-এর সময় তাহা অশ্লীল ও তীব্র আক্রমণাত্মক হইয়া পড়ে। 'জামাই বারিকে'র সেই দুই সতীন বগী ও বিন্দীর ঝগড়ার কথাই ধরা যাক। দুই সতীন পরস্পরের প্রতি অনেক গালাগালি করিয়া শেষে একেবারে মোক্ষম প্রবাদের তীক্ষ্ণ শূল দিয়া পরস্পরকে বিঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে। বড় সতীন বগী ছোট সতীন বিন্দীকে বলিয়াছে—

আমি ফঁচকে ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি মড়িপোড়ানির ঝি।
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি॥

বিন্দী পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে—

ভিক্ষা দাওগো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন।
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইছি বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনে বগী যায় নাই, গিয়াছিল বগী ও বিন্দীর বেচারা স্বামী। এখনকার শিক্ষিতা মেয়েরা যতই বাণীর সাধনা করুক না কেন আগেকার মেয়েরা কিন্তু বাণীর কোন সাধনা না করিয়াই সেই দেবতাকে কায়েম করিয়া বসাইয়াছিল তাহাদের জিহ্বাগ্রে এবং সেই বাণীর বাহন ধবল মরাল নহে, ধারাল প্রবাদ।

হেঁয়ালী

প্রবাদের মত ধাঁধা বা হেঁয়ালীও প্রাগাধুনিক বাংলা সমাজে একটি লোকপ্রিয় বাগ্‌বিলাস রূপে প্রচলিত ছিল। প্রবাদের সহিত হেঁয়ালীর তফাত এইখানে যে, প্রবাদের ব্যবহার বিস্তৃতক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল, কিন্তু শুধু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির খেলা ও কৌতুকসৃষ্টির জন্যই হেঁয়ালীর ব্যবহার হইত। প্রাচীন বাংলা সমাজে বাহুযুদ্ধ যত হউক বা না হউক বাগ্‌যুদ্ধটি হইত প্রায় সব ক্ষেত্রে এবং সব অবস্থার মানুষের মধ্যে। যখন এই বাগ্‌যুদ্ধের সহিত ক্রোধ ও বিদ্বেষ মিশ্রিত হইত তখন ইহা কলহ ও কোন্দলের রূপ ধারণ করিত। কিন্তু যখন ইহার সহিত কৌতুক মিশ্রিত হইত তখন ইহা প্রকাশ পাইত বৈঠকখানা ও বিবাহবাসরে, কবি ও তর্জাগানের আসরে। কথার মারপ্যাঁচ এবং বুদ্ধির কসরতের দ্বারা প্রতিপক্ষকে হারাইতে পারিলেই বিশেষ কৌতুকসৃষ্টি হইত। এই কৌতুকে শুধু যে বিজয়ী ও বিজিত পক্ষ যোগ দিত তাহা নহে, বহু রসগ্রাহী শ্রোতাও অতীব আগ্রহের সহিত যোগ দিত।

ধাঁধা বা হেঁয়ালী শুধু যে বাংলা সমাজেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে, পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই ইহাদের প্রচলন ছিল। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম পঞ্চপাণ্ডবকে যে ধাঁধাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই সুবিদিত। গ্রীক কাহিনীতে যে স্ফিংকসের কথা জানিতে পারা যায় সেও কিভাবে পথিককে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত তাহাও সকলের জানা আছে। রূপকথায় ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও নানারকম হেঁয়ালীর উল্লেখ আছে। প্রধানত বিবাহ উপলক্ষেই বহু পরিমাণে হেঁয়ালী ব্যবহৃত হইত। আমোদ ও রঙ-তামাসার প্রধান উপলক্ষ্যই তো বিবাহ। সেখানে কখনও রঙ্, কখনও ঢঙ, কখনও আদর কখনও চাপড়, সেখানে ঠারে ঠোরে, ইসারা ইঙ্গিতে রসের উজান বহিয়া যায়, সেখানেই তো হেঁয়ালীর অনুকূল পরিবেশ। বাহিরের আসরে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ পরস্পরকে কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া হারাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং ভিতরের বাসরে সপ্তরথী (রথী নহে রথিনী) বেষ্টিত বর বেচারা হেঁয়ালীর জবাব দিতে গলদঘর্ম হইয়া উঠিতেছে। অভিমন্যুকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, কিন্তু বাসরঘরের বরকে মান খোয়াইতে হয়; কারণ হারিলে রাঙাহাতের চড়চাপড়, কানমলা নাকমলাগুলি প্রাণের হানি না করিলেও মানের হানি যে ঘটায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হায়! আজ

একেলে বর-কনেদের কাছে বাসরঘরের রঙ-তামাসা সেকেলে হইয়া গিয়াছে, আধুনিকী বিনোদিনীদের মার্জিতমুখের ঈষৎ-স্ফুরিত হাসিতে আর হেঁয়ালীর রস স্থান পায় না।

ধাঁধা বা হেঁয়ালীর মধ্যে একটি ঘটনা বা বস্তুর বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যটি উন্মোচন করিতে বলা হয়। সেজন্য বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে দুইটি অর্থ থাকে, একটি আপাতবোধ্য শব্দগত অর্থ আর একটি অন্তরালস্থিত প্রচ্ছন্ন অর্থ। ঐ প্রচ্ছন্ন অর্থ বুঝিতে পারিলেই হেঁয়ালীর উত্তর সন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যাজস্তুতির মধ্যে যেরূপ দ্ব্যর্থক ভাবের চমৎকারিত্ব দেখা যায় সেইরূপ চমৎকারিত্বই হেঁয়ালীর মধ্যে বিদ্যমান। হেঁয়ালীর প্রশ্ন শুনিয়া শ্রোতা বর্ণিত সূত্র ধরিয়া সম্ভাব্য উত্তর সন্ধান করিতে থাকে, কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারে যে আসল উত্তরটি বর্ণিত সূত্রের জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত অথচ উভয়ের মধ্যে একটি গূঢ় সামঞ্জস্যও রহিয়াছে তখন সে অপ্রতিভ হয়, অথচ একটি মজাও পায়। সে ভাবিয়া দেখে, ঐ সংক্ষিপ্ত উত্তরটি তাহার অতি সুপরিচিত জগতেরই কোন বস্তু, অথচ সে তাহা অনুমানও করিতে পারে নাই। যদি উত্তরদাতা উত্তরটি দিতে পারে তবে প্রশ্নকর্তা অপ্রতিভ হয় বটে, কিন্তু এখানে কৌতুক প্রবল নহে। তারপর হয়তো প্রশ্নকর্তা আবার একটি প্রশ্ন করে, অথবা উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করে। এইভাবে যতক্ষণ কেহ কাহাকেও ঠকাইতে না পারে ততক্ষণ বার বার প্রশ্নের পাল্টাপাল্টি চলিতে থাকে। প্রশ্ন ও উত্তর যদি সহজভাবেই চলে তবে মজা নাই, ঠকাইতে হইবে, বোকা বনিতে অথবা বানাইতে পারিলেই কৌতুকরস উপভোগ করা যায়। এই কৌতুকরসই হেঁয়ালীর আসল উদ্দেশ্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলন সেই কৌতুকরসের উপায় মাত্র। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য—'ধাঁধার ভিতর দিয়া যে কেবল পরিণত শিল্পমন ও রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা নহে—ইহার ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বুদ্ধির অনুশীলন কিংবা জ্ঞানের চর্চা ইহার চরম লক্ষ্য নহে, ইহার চরম লক্ষ্য নির্মল হাস্যরসসৃষ্টি, তবে বুদ্ধির অনুশীলন বা লৌকিক জ্ঞানের চর্চা ইহার উপলক্ষ মাত্র হইতে পারে।'[১] প্রবাদের মত ধাঁধা বা হেঁয়ালীও Wit বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য শ্রেণীর হাস্যরসের অন্তর্ভুক্ত। এখানে কথার আধারেই হাস্যরস

১। বাংলা লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪০

নিহিত, কথার জটিল ও ঘোরালো গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বুদ্ধিশীলিত হাসির কণাগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে।

বিবাহবাসরে যে হেঁয়ালীগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলির মধ্যে একটু আদিরসের আধিক্য দেখা যায়, অথচ সেই আপাতদৃশ্যমান হাস্যরসাত্মক বর্ণনার অন্তরালে তাহার যে আসল অর্থটি নিহিত রহিয়াছে তাহা হয়তো আদিরসহীন নিতান্তই একটি সাধারণ বস্তু। শ্রোতার মনে আদিরসাত্মক বর্ণনার প্রভাবে যে ভাবানুভূতিময় প্রত্যাশার সৃষ্টি হয় তাহা উত্তর শুনিয়া রূঢ় আঘাত পায় এবং তাহারই ফলে কৌতুক উৎপন্ন হয়। বাসরঘরে দিদিমা যখন নূতন বরকে একটি হেঁয়ালী শুনাইতে বলিল, তখন সে একটি হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিল—

যুবতী এয়োতি যেন ডেকে ঢেকে চলে,
কত জনে দিবানিশি, শুধু আঁখি ছলে।
মনোহর বেশভূষা, চাঁদপারা মুখ,
থেকে থেকে বারে বারে খোলে শুধু বুক।
কোলে কভু কোলাকুলি, হাতে হাত মেশা,
কভু থাকে বুকে বুকে, ঢেলে ভালবাসা।

এই হেঁয়ালীর মধ্যে যে দেওয়াল ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, হাতঘড়ি ও ট্যাঁকঘড়ির কথাই বলা হইয়াছে তাহা হেঁয়ালীটি শুনিয়া অনুমান করা যায় কি? এই হেঁয়ালীটি শুনিলে বরকে অসভ্য বলিতে হয়, কিন্তু অসভ্য বলিবারও উপায় নাই, কারণ বর সত্যই কোন অশ্লীলবস্তুর ইঙ্গিত করে নাই। তবে এ ধরণের কয়েকটি হেঁয়ালী বলিলে বর যে শালী ও শালাবৌয়ের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে তাহা একেবারে নিশ্চিত। এরূপ আর একটি হেঁয়ালী শুনুন—

সাজ সজ্জায় সাজে ভাল করতে জানে ছল,
মুখেতে চুম্বন খেলে, হাসে খল্ খল্।

এই চুম্বনে অবশ্য রসের বদলে ধোঁয়াই পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান শ্রোতা উত্তরটি হয়তো বলিতে পারিবেন, তাহা হইল 'হুঁকা'। সদ্যপরিণীত রামচন্দ্রকে রঙ্গরসিক বালকগণ যে ব্যাজস্তুতিমূলক হেঁয়ালীটি বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে—

শুনহে কুমার! তোমার আজ কুলের উচিত হইল কাজ।
তব হে জনম অতি বিপুলে ভুবন বিদিত অজের কুলে।
জনক-দুহিতা বিবাহ করি তাহাতে ভাসালে যশের তরী।

এখানে কয়েকটি শব্দের দুইটি অর্থ ধরিতে হইবে, নিন্দাপক্ষে অজ—ছাগ, জনকদুহিতা—ভগিনী ; স্তুতিপক্ষে—অজ—রামচন্দ্রের পিতামহ, জনকদুহিতা—জনক রাজার কন্যা সীতা। যমক অলঙ্কারমূলক একটি প্রসিদ্ধ হেঁয়ালীর কথাও সকলের জানা আছে—

হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।

এখানে হরি শব্দটির বিভিন্ন অর্থ না জানিলে হেঁয়ালীটি ধরা যাইবে না, যথা—জল, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি।

সাংসারিক জগতের নিত্যকার পরিচিত অথবা ব্যবহার্য বস্তু লইয়াই সাধারণত হেঁয়ালীগুলি রচিত হয়, অথচ কথার মারপ্যাঁচে শ্রোতা সাধারণত **সেই বস্তুটিই** খুঁজিয়া পায় না এবং তখন সকলে কৌতুকবোধ করিয়া থাকে। এরূপ কয়েকটি হেঁয়ালী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ঘরের মধ্যে ঘর তারি মধ্যে বসে আছে পরমেশ্বর

উত্তর—মশারি

অলি অলি পাখীগুলো গলি গলি যায়।
ময়রার দোকানে গিয়ে ডিগবাজি খায়॥

উত্তর—টাকা

একটুখানি ঘরে, চুনকাম করে।

উত্তর—ডিম

পদ নাই, কিন্তু বহুদূরে চলে যায়,
সুপণ্ডিত নয়, কিন্তু বিদ্যা ভরা তায়।
মুখ নাই, কিন্তু বলে অনেক বচন,
কিবা তাহা বুঝে সুপণ্ডিতগণ।

উত্তর—পত্র

আমার বাবা, বাবার বাবা, কি সম্পর্ক ভাই,
দাদার বাবা, মামার বাবা, লাজে মরি যাই।

উত্তর—জগৎপিতা

একটু খানি গাছে,
লাল পেয়াদা নাচে॥

অথবা,

একটু খানি গাছে,
রাঙা বৌটি নাচে ॥

উত্তর—লঙ্কা

তিন অক্ষরে নাম যার সর্বঘরে আছে,
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে ॥
আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সর্বলোকে খায়।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রামগুণাগুণ গায় ॥

উত্তর—বিছানা

তিন অক্ষরে নাম তার বনেতে বসতি,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মস্তকেতে স্থিতি।
দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে, সর্বলোকে খায়।
তৃতীয় অক্ষর বাদ দিলে ঠাট্টা করা যায় ॥

উত্তর—শালিক

বাগান থেকে বেরুলো হুমো।
হুমোর গায়ে ডুমো ডুমো ॥

উত্তর—কাঁঠাল

বাগান থেকে বেরুলো টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ॥

উত্তর—আনারস

আজ নূতন দিনের হাসিঠাট্টার মজলিসে হেঁয়ালীর কোন স্থান নাই, সত্য, কিন্তু যখন মেয়েরাও এ-ধরণের হেঁয়ালীর মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য হাস্যরস উপভোগ করিত তখনকার রসবোধ যে একেবারে স্থূল ও নিম্নস্তরের ছিল একথা মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যাত্রা

যাত্রার ইতিহাস সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীনতম যুগের দুর্নিরীক্ষ্য প্রদেশে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাংলা দেশে মহাপ্রভুর পূর্বে যাত্রাগানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাহা কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান ইত্যাদি নানা ধারা-বিবর্তনের মধ্য দিয়া সম্ভবত যাত্রাগানে রূপান্তরিত হইয়াছিল।[১] মহাপ্রভুর পরে যাত্রা, বিশেষত কৃষ্ণযাত্রা দেশের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই যাত্রা কালীয়দমন নামেও অভিহিত হইত। শিশুরাম, পরমানন্দ, বদন, লোচন, গোবিন্দ, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি অধিকারীগণ এই কালীয়দমন যাত্রা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব যাত্রাওয়ালাদের রচনা এখন একেবারেই দুর্লভ, সুতরাং ইহাদের রূপ ও রীতি জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নূতন আর এক প্রকার যাত্রার উদ্ভব হইল, তাহার নাম ছিল সখের দল। এই সখের দলে বিদ্যাসুন্দর পালাই প্রধানত অভিনীত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের উদ্ভবের পর নূতন আর এক শ্রেণীর যাত্রা দেখা গেল। ইহা অপেরা বা গীতাভিনয় নামে পরিচিত হইল। নাটকের ভাববস্তু ও আঙ্গিক অনেকাংশে অনুকরণ করিয়া সাধারণ যাত্রার ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রবর্তিত হইল। অধুনাতন কাল পর্যন্ত খাঁটি নাটকের পাশাপাশি দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের রসপিপাসা পূর্ণ করিবার জন্যই এই গীতাভিনয়ের ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তবে আমাদের বর্তমান যাত্রার আলোচনায় গীতাভিনয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

বৈষ্ণবপদাবলীর ভাব ও বিষয় লইয়াই কৃষ্ণযাত্রাগুলি রচিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ প্রেমলীলা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও প্রায় ঠিক সেভাবেই বর্ণিত হইত এবং যে ভক্তিময় ভাবোচ্ছ্বাসের ধারা পদাবলীর অন্তরে প্রবাহিত তাহা কৃষ্ণযাত্রার মর্মস্থলকেও প্লাবিত করিয়া রাখিত। বৈষ্ণব কীর্তনের সুধারসে যে বাঙালী জনসাধারণের চিত্ত নিমগ্ন ছিল তাহাদের কাছে কৃষ্ণযাত্রা কোন নূতন রসের সন্ধান দিতে

১। যাত্রার উৎপত্তি ও বিকাশের কাহিনী 'বাংলা নাটকের ইতিহাসে' (২য় সং) বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পারে নাই। সেজন্য যাত্রাওয়ালাগণ যাত্রার মধ্যে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য আনিবার জন্য কোন কোন অভিনব চরিত্র ও তাহাদের অদ্ভুত ভাবভঙ্গির আমদানী করিতেন। এই সব চরিত্র আনিয়া সরস পরিস্থিতি ও সংলাপের সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা কৌতুকরস উদ্রেক করিতে চাহিতেন। চরিত্রগুলির কথাবার্তা, স্বভাব ও আচরণ নিতান্তই বাস্তব সংসারের সচরাচর-দৃষ্ট সাধারণ মানুষের মতই ছিল। যাত্রার সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ইহারা অকস্মাৎ আমাদের দৃষ্টিকে পরিচিত বাস্তব সংসারের মধ্যেই নামাইয়া আনিত। ইহাতে আমাদের সাংসারিক মন স্বস্তি লাভ করিয়া কৌতুকহাস্যে মাতিয়া উঠিত। সাধারণ শ্রোতাদের মন ভক্তিরসের সহিত কৌতুকরসও বিশেষভাবে উপভোগ করিতে চাহিত। তাহাদের এই চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্যই যাত্রার মধ্যে কৌতুকরসের প্রাচুর্য দেখা যাইত।

বৈষ্ণব-পদাবলীর হাস্যরস লইয়া আলোচনা করিবার সময় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সেগুলি আরও অধিক হাস্যরসাত্মক রূপে কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে অবতারিত হইয়াছে। সেজন্য ননীচুরি, দানলীলা, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন ইত্যাদি হাস্যরসাত্মক ঘটনা আশ্রয় করিয়া শ্রোতাদের কাছে বিশেষ প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি অক্রূরসংবাদ, নিমাইসন্ন্যাস ইত্যাদি পালায় করুণ রসের অবিচ্ছিন্ন আধিক্য সত্ত্বেও যাত্রাওয়ালাগণ উহাদের মধ্যেও অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ও চরিত্র আনিয়া কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে চাহিতেন।

কোন গভীর ও গম্ভীর ভাব-পরিবেশের মধ্যে অকস্মাৎ লঘুরসাত্মক বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলেই তাহা কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠে। গোবিন্দ অধিকারীর 'চাঁদধরা' পালাটির মধ্যে কণ্বমুনি যশোদার গৃহে আসিলে তাঁহার সহিত দাসীর কথোপকথনের মধ্যে এই ধরণের কৌতুকরস উদ্রিক্ত হইয়াছে। দাসী যখন কণ্বমুনির পাদপ্রক্ষালণ করিতে আসিল তখন তাহার সহিত মুনির এরূপ কথাবার্তা হইল—

কণ্ব। ওগো দাসি। যদি নিতান্তই পা ধোয়াবে গো, তবে একটু সাবধান হয়ে ধুইও গো, গায়ে ব্যথা আছে।

দাসী। তা বটে ঠাকুর, তোমার পা দু'খানি যে রকম ফুটিফাটা হয়েছে, তাতে ব্যথা হ'তে পারে বটে গো। তা ভয় নেই বাপু, আনাড়ী দাসী নই গো, (পদ ধৌত করিয়া) মুনি ঠাকুর গো! (প্রণাম)

যশোদা। ওগো দাসি! আমাদিগে বিপ্র-পাদোদক দেও গো।

দাসী। ওগো রাণীমা। কত পাদোদক নেবে নেও গো, আমি এক গামলা পাদোদক তৈরী করেছি গো।

॥ কৃষ্ণযাত্রা। গোবিন্দ অধিকারী। ৩য় খণ্ড ॥

গোপালের উপদ্রবে বৃন্দাবনবাসিগণ কিরূপ অস্থির হইয়া উঠিত তাহার অনেক সরস বর্ণনা পদাবলীর ন্যায় কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও লিপিবদ্ধ আছে। কখনও ননীচুরী করিয়া, কখনও বাঁদর দিয়া গৃহস্থের ফলমূল খাওয়াইয়া গোপাল বেশ মজা পাইতেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোকেদের সাংসারিক জীবন বড়ই দুর্বিষহ হইয়া উঠিত। এই সব উপদ্রব সাধারণ বালকের দ্বারা ঘটিলে কৌতুকাবহ হইত না। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার উপদ্রবগুলিও লীলামাত্র এই সংস্কার শ্রোতাদের চিত্তে বদ্ধমূল ছিল বলিয়া তাহারা প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে এগুলিকে দেখিত এবং বিব্রত ও বিপন্ন লোকেদের দুর্গতি দেখিয়া কৌতুক বোধ করিত। উপদ্রুত প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ যখন যশোদার কাছে নালিশ করিত অথবা গোপালকে উদ্দেশ করিয়া গালাগালি করিত তখন শ্রোতাদের কাছে সেগুলি পরম কৌতুকাবহ বলিয়াই মনে হইত। আবার কোন কোন স্থলে নালিশ ও গালাগালির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যাজস্তুতিরও আভাস পাওয়া যাইত। গোপাল একদিন হড়াই, চড়াই ও কুড়াইবুড়ীদের বাড়িতে নানা প্রকার অনিষ্ট ও উপদ্রব ঘটাইয়াছিল, উহারা যশোদার কাছে আসিয়া যে খেদ ও উষ্মা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে গোবিন্দ অধিকারী যথেষ্ট কৌতুকরস সঞ্চার করিয়াছেন। হড়াই বুড়ী ও যশোদার উক্তি-প্রত্যুক্তি কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

হড়াই। (প্রবেশ পথ হইতে) ওগো যশোদে! ওগো রাজমণি! ওগো বড় লোকের বেটি। আমার সর্বনাশ করলি কেন গো এমন অকালে—হাউড়ে ছেলে তোমার ঘরে জন্মেছে, মা! হায় হায়, গরীব দুঃখীর সর্বনাশ করতে অমন করে ছেলে ছেড়ে দিতে নাই গো, ঘরে কুলুপ দিয়ে আটকে রাখতে হয়! ধরতে পারলে আজ তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে ছেড়ে দিতেম! এত লোকসানী কি বরদাস্ত হয় গো! এমন ছেলে থাকার চেয়ে নির্বংশ হওয়া ভাল গো! ওরে আমার পেঁপে রে। (রোদন)

যশোদা। ওগো দিদি! থাম—থাম, আর গাল দিয়ো না গো। আমার সবে ধন ঐ একটি ছেলে। অমন ক'রে তাকে শেপো না গো! তোমার কি নষ্ট লোকসান করেছে বল, আমি তোমার সে ক্ষতি পুষিয়ে দিব গো! তুমি

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার তুধের গোপালকে অমন ক'রে গাল দিয়ো না গো!

হড়াই। না গো, সাউখোরের বেটি! গাল দিব কেন গো, তোমার ছেলের মুখে কদমা ধরে দিব গো। আমার কি করেছে। একবার দেখবে চল গো! হায় হায়, ওরে আমার পেঁপে রে! ওরে আমার ডালনার তরকারী রে! ওরে আমার কোষ্ঠ সাঁফের জোলাপ রে! ওরে বিদবার রাতের জলপান রে! ওরে আমার বড় সাধের পেঁপে রে! (রোদন)

॥ ননীচুরি। গোবিন্দ অধিকারী ॥

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। শরীরে কত ব্যাধি তো নিত্য আসিয়া জুটে। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপীদের মধ্যে এক নূতন ব্যাধি দেখা দিল—প্রেমজ্বর। সাংঘাতিক ব্যাধি, তবে এখানে ব্যাধি অপেক্ষা আধিই বড় বটে। এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য কত কবিরাজ, কত দাতব্য চিকিৎসালয় ও কত ঔষধেরই না উল্লেখ করা হইল!

সখীদের সহিত রাধার কথোপকথন—

রাধা। ওগো বৃন্দে। যে এ জরে জ্বরে সেই পিরীতে পড়ে নয় গো?

বৃন্দা। হ্যাঁগো শ্রীমতি। তাই গো।

রাধা। ওগো দূতি! এ জ্বরের কি ঔষধ নাই গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এর ঔষধ—কবিরাজ সব আছে গো!

রাধা। ওগো সহচরি! এ রোগের কবিরাজ কে গো?

বৃন্দা। শ্রীমতি গো! এ রোগের কবিরাজ স্বয়ং বৈদ্যরাজ বৈদ্যনাথ।

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে না হয় বৈদ্যনাথে গিয়ে ধন্না দোবগো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমাকে বৈদ্যনাথে গিয়ে ধন্না দিতে হবে কেন গো, স্বয়ং বৈদ্যনাথই যে তোমার পায়ে ধন্না দেন গো। সেই বৈদ্যনাথ শ্যামচাঁদ যে তোমার ঘরের লোক গো। তাঁর কাছে গিয়ে একটু মিলন-পাচন খেলেই এ জ্বর সেরে যাবে গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আর দেরি না ক'রে আমাদিকে সেই বৈদ্যনাথের কাছেই নিয়ে চল গে।

ললিতা। বৃন্দে! সেখানে গেলে ওষুধের দাম লাগবে না ত গো?

বৃন্দা। না গো ললিতে! সে বৈদ্যনাথের দাতব্য চিকিৎসাশালা, সেথা বিনিমূলে ওষুধ পাওয়া যায় গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে। তবে সেইখানে আমাদিকে নিয়ে চল গো।

॥ কৃষ্ণযাত্রা। গোবিন্দ অধিকারী। ৫ম ॥

রাধার মান ভাঙ্গিবার জন্য কৃষ্ণকে কত ছলাকলা, কত শপথ আর প্রতিশ্রুতিরই না আশ্রয় লইতে হইয়াছে। একদিন তিনি মালিনী রাধার কাছে অকপটে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেছেন। শুধু মৌখিক স্বীকৃতি নহে, কত লিখিয়া তিনি যে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। সেই খতের মধ্যে কর্জ, সুদ ও খালাস হইবার দিন সবই লিখিত আছে, সাক্ষীদের যথারীতি স্বাক্ষরও তাহাতে রহিয়াছে।

খতের বিবরণ একটু শুনুন—

ইষাদিকিঞ্চ গুণ সমুদ্র শত সাধু শ্রীরাধা।
সতুদারস্য চরিত তস্য পুরাও মম সাধা॥
তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ পত্রমিদং লিখিলাম সুকুমারি॥
ইহার লভ্য, পাইবে ভব্য বাঞ্ছা তিন করিয়ে।
সুদ সহিত শোধ করিব সব কলিযুগ ভরিয়ে।
এই করারে, রাই, তোমারে, খত দিয়েছি লিখি।
চন্দ্রাদি মঞ্জরী সখী সকলি রয়েছে সাক্ষী॥
প্রেমে বাঁধা আছি রাই, তব প্রেমঋণে।
যে দিন কাল অঙ্গ গৌর হবে, খালাস সেই দিনে॥

॥ স্বপ্নবিলাস। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ॥

আর একদিন রাধার মানভঞ্জন করিবার জন্য কৃষ্ণ আর একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কুন্দলতার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি রাধার সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে কলাবতী নাম্নী এক রমণীরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার ছদ্মরূপ রাধার কাছে অবশ্য ধরা পড়িয়া গেল এবং তিনি সখীদের দ্বারা উপহসিত হইলেন কিন্তু তবুও আশা ছাড়িলেন না। রাধার শাশুড়ী জটিলার কাছে কলাবতী দুঃখ করিয়া বলিলেন যে রাধা তাঁহার মাসতুতো বোন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এ প্রাণ তিনি আর রাখিবেন না। জটিলা বৌয়ের এই ব্যবহারের কথা শুনিয়া ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—

শুন গো ললিতে! মোর বৌয়ের স্বভাব,
দেখি নাই শুনি নাই, ছি ছি! একি ভাব।

এই কলাবতী, তার সম্বন্ধে ভগিনী,
গোপনে আহ্লাদে এল, দেখিতে আপনি,
বহুদিন পরে দেখা, বাড়িবে আহ্লাদ,
তা না, একি, সাধে সাধে ঘটালে বিষাদ।

রাধিকাকে ডাকিয়া জটিলা বলিল—

জটিলা। যা হবার, তা হয়েছে, এখন,

রাধিকার হস্ত ধারণ পূর্বক—

আমার শপথ, বাছা! উঠগো সত্বর,
কলাবতী সঙ্গে বাছা আলিঙ্গন কর।
নির্জনে দুজনে কর সুখ আলাপন।
একত্র ভোজন আর একত্র শয়ন॥

॥ বিচিত্র বিলাস। কৃষ্ণকমল গোস্বামী॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, রাধার সহিত প্রেমের পথে যে একটি প্রবল প্রতিবন্ধক সেই জটিলাই রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া দিল, কৌতুক তো এইখানেই।

কৃষ্ণের সহিত কখনও সখীগণ এবং কখনও বা গোপীগণ নানা খেলাধুলায় মাতিয়া যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিয়াছে। খেলার মধ্যে এমনিতেই একটি স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকময়তা রহিয়াছে, তাহাতে আবার খেলার প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি মধুররসাত্মক আধ্যাত্মিক পরিবেশ হইতে তুচ্ছ ধূলামাটির পরিবেশে স্থানান্তরিত হয় এবং তাহাতে কৌতুকের আঘাতে আমাদের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে।

সখাদের সহিত কৃষ্ণের কপাটি খেলার বর্ণনা উদ্ধৃত হইল—

কপাটি—কপাটি—কপাটি
ইটিটি নিকুটি—চু কাটী চু কাটী
হা ডু ডু ডু ডু ডু ডু
সুবল মেরেছিস চু,
চু কিটী কিটী, মার চটপটি
ঝাপটি মেরে ঘাপটী গেড়ে,
করে দে উলটি—পালটি॥

॥ কালিয় দমন। গোবিন্দ॥

এখানে লক্ষ্য করা যায়, কপাটি খেলায় ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির প্রয়োগের ফলে এই অংশটি যাত্রায় গীত হইবার সময় বিশেষ কৌতুক উদ্রেক

করিত। এবার রাধার সহিত কৃষ্ণের একটি খেলার কথা উল্লেখ করা যাক। তবে বলা বাহুল্য, ইহা বহির্গত (Outdoor) খেলা নহে, গৃহগত (Indoor) খেলা। দুইজনে বাজি ধরিয়া পাশা খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, সখীগণ চারিদিক হইতে খেলা দেখিতেছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'বিচিত্র বিলাস' হইতে সেই পাশা খেলার একটু বিবরণ দেওয়া যাক—

কৃষ্ণ। (পাশা ধারণ পূর্বক) ছক্কা—ছক্কা—এই ছক্কা পাশা ক্ষেপণ

রাধিকা। (সহাস্যে) দেখ, নাথ। ঐ দেখ তোমার ছক্কা পড়েনি ; এখন আমার আর ভয় কি যদি পাঞ্জা নাই পড়ে, না হয় শোধ যাবে। (পাশা ক্ষেপণ)

সখীগণ। (করতালিকা প্রদান পূর্বক) এই ত। আমাদের যূথেশ্বরীর পাঞ্জা পড়েছে। কৃষ্ণের প্রতি—

ওমা! ছি ছি! নাগর হারলে!
—(ছি ছি লাজে যে মলেম)—
(মলেম মলেম, ছি ছি লাজে মলেম)
তুমি পুরুষ হয়ে, নারীর সনে, খেলাতে না পারলে।
তোমার সর্বস্বধন, মুরলীরতন, তাও ত রাখতে নারলে ॥

পাশা খেলায় রাধা হারিলে তেমন মজা হইত না। যিনি সকলের প্রাণ ও মন হরণ করিতে পারেন তিনি হারিলেই তো মজার কথা।

(কৃষ্ণযাত্রার অনেক স্থলেই কৃষ্ণের সহিত গোপীদের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে।) এই সব উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, কপট বিরাগ, কৃত্রিম অভিমান এবং অন্তঃশায়ী পরিহাস-প্রিয়তা দেখা যায়। যাহাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অথবা স্থায়ী ব্যবধান নাই তাহারাই যখন সাময়িক বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠে তখন তাহা রসিক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বিশেষ প্রীতিকর হয়। ('দানলীলা', 'নৌকাবিলাস', 'মানভঞ্জন' ইত্যাদি পালার মধ্যেই এরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়।)

কৃষ্ণের সহিত বাদপ্রতিবাদ করিতে রাধার সখীদের মধ্যে বৃন্দার মত কেহই তৎপর নহে। বৃন্দা এক অসামান্যা রমণী, কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে রাধা অপেক্ষাও বোধ হয় বৃন্দার প্রাধান্য বেশি। কূট বুদ্ধি, চতুর বাকপটুতা এবং সূক্ষ্ম রঙ্গরসিকতায় বৃন্দার চরিত্র অতিশয় আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে কৃষ্ণকে প্রায়ই পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। বহুবল্লভ

কৃষ্ণ যখন রাধার প্রতি কোন অবহেলা দেখাইয়াছেন তখনই বৃন্দা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার নিষ্ঠা জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কৃষ্ণ কুব্জার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া একস্থানে বৃন্দা তীব্র ভাষায় তাঁহাকে অনুযোগ দিয়াছে, যথা—

যা যা ত্বরায় যা, সে মথুরায় যা,
দেখা দিয়ে বাঁচা গিয়ে কুবুজা,
নৈলে বসলে নৃপাসনে, কে বসিবে সনে,
রাজমহিষী হ'য়ে কে বা লবে পূজা,
ওঝা হয়ে যায় সেরে কুব্জের বোঝা।
টানা টানি করে করেছিলি সোজা,
সে কুবুজির মতন, রমণী রতন,
হেথা কোথা পাবি, করিলে যতন
উচিত এখন তার মন রাখা,
হয় না যেন আবার বাঁকা,
সে বাঁকা হ'লে, সে বাঁকা হ'লে,
বাঁকার বাঁকা মন কে ভুলাবে, পাছে॥
সেথায় সে বা কি, হেথায় এ বা কি,
বাঁকীর মত জানে তত সেবা কি,
বাঁকায় পেয়ে বাঁকী, না করেছে বা কি,
বাঁকী প্রেমের বাঁকী, রেখেছে বা কি।

এই তীব্র তিরস্কারের উত্তরে কৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না, আর বলিবার কিই বা আছে, বঁধুর মন রাখিতে গেলে মান একটু খোয়া যায় বৈ কি। তবে শুধু কটু কথা শুনিলে তার কতটুকু মান খোয়া যায়? রাধার মান ভঞ্জন করিতে যাইয়া কৃষ্ণ যে কাজ করিলেন তাহাতে তাঁহার নিজের মান তো একেবারে ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। রাধার প্রতি প্রেম নিবেদন করিতে করিতে তিনি একবার একটু চন্দ্রার নাম বলিয়া ফেলিয়াছেন, আর অমনি রাধা তাঁহার যে দুর্গতি ঘটাইলেন তাহা লীলাময় কৃষ্ণ বলিয়াই সহ্য করিলেন—

রাধিকা। ললিতে! বিশাখে! তোরা যে বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে রলি? শঠের কপট বিনয়বাক্য, আমার কাণে যেন বাণের মত বিঁধছে, ত্বরায় করে লম্পটকে বের ক'রে দে।

ললিতা। ওগো যূথেশ্বরি। আমরা তোদের ভাব কিছুই বুঝতে পারছি নে, আমরা তোর নিতান্ত অনুগত সহচরী, কাজেই যা বললি তাই করি, (কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক) ওহে রাধারমণ! বুঝলে তো রাধার মন? এখন এস্থান হতে প্রস্থান কর।

কৃষ্ণ। ললিতে। বিশাখে। তোমরাও কি কঠিনা হ'লে?

শুন চতুরা ললিতে তবে উচিত বলিতে,
আমার হ'য়ে রাইকে দু'টি কথা,
না বুঝিবে প্রাণেশ্বরী, অকারণ মান করি,
সাধে মোর দেন মনে ব্যথা।

ললিতা। ওহে নটবর। তোমার হ'য়ে দু'ট কেন, দশটা বলছি, তুমি শ্রীরাধার চরণ ধ'রে বসে থাক, আমি একবার সেধে দেখি, না হয়, তুমিই কেন একবার সেধে দেখ না?

কৃষ্ণ। ললিতে ভাল বলেছ, তবে তাই করি, (রাধিকার চরণ ধারণ পূর্বক) অয়ি রাধে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং, নিজ দাস বলে ক্ষমা দে রাই।

॥ বিচিত্র বিলাস। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ॥

(কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে সুকৌশলে নানা অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা যাত্রাওয়ালাগণ হাস্যরস সৃষ্টি করিতে চাহিতেন।) অলঙ্কার ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য বর্ধন করে। কিন্তু সেই অলঙ্কারে আতিশয্য অথবা অপপ্রয়োগ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের পরিবর্তে স্থূল হাস্যরসই সৃষ্টি করে। এই হাস্যরসসৃষ্টির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই যাত্রাওয়ালাগণ যাত্রার মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতেন। সেই অলঙ্কারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াই শ্রোতাগণ এক চমৎকারী আনন্দ অনুভব করিত। অবশ্য অলঙ্কারের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাদের বৈদগ্ধ্য ও রসজ্ঞতারও প্রয়োজন হইত সন্দেহ নাই। ধ্বন্যুক্তি, যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যাজস্তুতি, বিরোধ ইত্যাদি অলঙ্কারই প্রধানত হাস্যরস উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন স্থানে যমকের মত একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার না করিয়া একই অর্থে বার বার ব্যবহৃত হইত। বার বার ব্যবহারের ফলে বিশেষ প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ কৌতুকাবহ হইয়া উঠিত যথা—

নিকড়িয়া মুখে তোমার নিকড়িয়া হাসি।
নিকড়িয়া হাতে তোমার নিকড়িয়া বাঁশী ॥

নিকড়িয়া ফুলে তোমার নিকড়িয়া মালা।
নিকড়িয়া বঁধু তোমার নিকড়িয়া গলা॥
নিকড়িয়া কটী তোমার নিকড়িয়া ধটী।
নিকড়িয়া বৃন্দাবন, নিকড়িয়া বাটী॥
নিকড়িয়া দাস গোবিন্দ পদ নিকড়িয়া।
যেবা গায় যেবা শুনে সেহ নিকড়িয়া॥

॥ দান লীলা। গোবিন্দ অধিকারী॥

লোক কথাটি লইয়া একস্থানে কিরূপ যমক অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখুন—

বিশাখা। এ দানী বালকে, দেখি এ লোকে।
মনে হয় এ লোক কে, এলোকে—এলোকে।
দেখে পাই কোন লোকে, এ বালকে এ তিনলোকে,
বলে লোকে এ বালকে দেখি নাই ইলোকে।
কেউ বলে কপট বালক এ,
কেউ বলে এ রয় গোলকে,
কেউ বলে বিশ্বপালক এ
থাকে পরলোকে—

॥ ঐ॥

যমক ও সভঙ্গ শ্লেষের আর একটি চমৎকার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল যমুনা পার হইবার জন্য বৃন্দা কৃষ্ণের সহিত দরাদরি করিতেছে—

বৃন্দা। এক আনায় হব পার, একা নায় হব পার,
ভাল আট আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,
আট আনা আট আনা—আ টানা রেখো না,
কৃপা করে টেনে নাও॥
কৃষ্ণ। আট আনা আট আনা—তাতে আঁটে না
মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আধুলি ছুঁই না
এক গোপীর চরণ ধূলি বিনা
বৃন্দা। নয় আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,
আমরা হরিণনয়না—নয় আনা নয় আনা
এ পারে আমরা নয়ানা নয়ানা,

তরীখানি নয়া না, ঝলকে ঝলকে জল ওঠে
কেবল মাঝিটি পুরাণা, তাও আবার পুরা না,
তিন জায়গা ভাঙা তার, তাও আবার পুরাণা ॥

॥ ঐ ॥

ভক্তের রসদৃষ্টিতে বৃন্দাবনের সকলেই ভালে।, মন্দ শুধু দুইজন—জটিলা ও কুটিলা। জটিলা ও কুটিলার নামের মধ্যেই তাহাদের স্বভাবের পরিচয় রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বিরক্তির পরিবর্তে বোধ হয় অনুকম্পাই জাগ্রত হয়। তাহারা যাত্রার পালার মধ্যেও কোথাও কোন স্থায়ী ও গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। কৃষ্ণ ও গোপীদের দ্বারা তাহারা বার বার প্রতারিত হইয়াছে, অথচ যাত্রার রচয়িতা ও ভোক্তা সকলের কাছেই শুধু কেবল একটানা ছি-ছি-ই তাহাদের অদৃষ্টে জুটিয়াছে। জটিলা ও কুটিলার মধ্যে আবার জটিলাকে তো নিতান্তই একজন সরলা, বৌ-দরদী শাশুড়ী বলিয়াই মনে হয়। রাধা কৃষ্ণ ও সখীদের ছলাকলায় বার বার বেচারী প্রতারিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনই ঘটাইয়া দিয়াছে। তবে কুটিলা তাহার নামের মর্যাদা রাখিয়াছে বটে। কুটিলা তো বিশেষ একটি ননদিনী চরিত্র নহে, সে যে বাঙালী সংসারের চিরন্তন প্রতীক চরিত্র। কুটিলা সম্বন্ধে রাধা ও তাঁহার সখীদের কিরূপ ধারণা তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথনে বুঝা যাইবে—

রাধা। ওগো ললিতে, ঘরে যাই চল গো।

ললিতা। হ্যাঁ শ্রীমতি, তাই চল গো, লোকে কত কথা বলবে গো।

রাধা। ওগো ললিতে! আর কেউ কিছু না বললেও আমার বাঘিনী ননদিনী কত টিটকারী দেবে গো!

ললিতা। ওগো ঠাকুরানি, কুটিলের সে কু কথায় কান না দিলেই হবে গো!

রাধা। ওগো ললিতে! ননদিনীর কথা যেন শীত কালের সেঁচা জল গো!

ললিতা। ওগো শ্রীমতি! তাই যদি হয় গো, তবে না হয় একটু ছ্যাং ক'রে লাগবে গো, আর তুমিও একটু নয় শিউরে উঠবে গো! তার কোন কথার উত্তর না দিলেই গোল মিটে যাবে গো!

॥ অক্রূর সংবাদ। গোবিন্দ অধিকারী ॥

উপরিউক্ত অংশে হাস্যরস প্রধানত দুইটি উপমার চমৎকারিত্বের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

কুটিলার জিহ্বা যে কতখানি শাণিত তাহার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দাদার প্রতি অভিমান এবং বৌয়ের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইয়াছে এখানে—

ঢং ঢং ঢং! ওগো, ও সব ঢংয়ের মূর্চ্ছা আমরা বেশ বুঝি গো—বেশ বুঝি—কেবল নিজেদের কুচ্ছর ভয়ে কিছু বলি না গো। নৈলে যদি ঝাঁটা ধরে ঝাড়ন—মন্তর ঝাড়ি, তা হলে মুচ্ছ টুচ্ছ সব সারিয়ে দিতে পারি; কিন্তু পারি নে কেবল দাদার ভয়ে গো! আমরা দাদাকে যত রাধার দোষ দেখাই, দাদা ততই তার গুণ ব্যাখ্যা করে গো! দাদা আমার সুন্দরী বৌয়ের পিরীতে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাই বৌ হাজার মন্দ করলেও কিছুই বলবার নাম গন্ধও নেই গো! হায়রে, আমরা যদি বৌয়ের মত সুন্দরী হতেম, তবে দাদার মন পেতেম গো।

॥ গোষ্ঠবিহার। গোবিন্দ অধিকারী ॥

এখানে হাসির মূল কথায় কিংবা পরিস্থিতিতে নাই, আছে পাঠক কর্তৃক রাইনিন্দার ব্যর্থতার অনুভবে।

যাত্রা ও কীর্তনের মিলিত রূপ ঢপসঙ্গীতের মধ্যেও স্থানে স্থানে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য ভাব-গম্ভীর ভক্তিরসাত্মক পরিবেশের মধ্যে কৌতুকরসের অবতারণা হইয়াছে। দূরাস্তৃত আধ্যাত্মিক রহস্য-মণ্ডিত ভাবকল্পনার জগতে আকস্মিকভাবে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের কোন ঘটনা কিংবা চরিত্র আমদানী করিলে যে বিপরীত ভাবাবর্তের সৃষ্টি হয় তাহা দর্শকচিত্তে কৌতুকরসেরই উদ্রেক করে। মধুসূদন কানের কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা[১] হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণ অসুখের ভান করিয়া শয্যাশায়ী আছেন, তখন এক বৈদ্য আসিল তাঁহার চিকিৎসা করিতে। এই বৈদ্যও আর কেউ নহেন, স্বয়ং কৃষ্ণ। সেই বৈদ্য আসিয়া তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে যে লম্বা চওড়া আত্মপ্রশংসামূলক উক্তি করিয়াছে তাহা বর্ণনার বাস্তবতার জন্যই কৌতুকপ্রদ হইয়াছে, যথা—

পড়া আছে নাড়ীচক্র, জানা আছে ষটচক্র, ঘুচাতে পারি কুচক্র, এম্নি আমি চক্র জানি।

নিদানেতে বিদ্যা জানাই নিদানের কালে;—যে করে মম স্মরণ রক্ষা পায়

১। ঢপ সঙ্গীত—মধুসূদন কাঁন, মহিমচন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত

হেলে ; নিদানেতে বিধান বটী, সেই রাজা রামচাঁদের বটী, গোপালের নাশ দিলে কত গোপাল ভাল হয় তখনি।'

বৈদ্যরাজ গোপালকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অসুখ গুরুতর বটে। তিনি যশোদাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রসেতে হ'য়ে অপচার, বাত পৈত্তিকে দুয়ের বিকার, এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই।

হৃদয় দাহ মোহ হচ্ছে এমনি বোধ—বইতে নারে মনের কথা তাইতে বাক্য রোধ—বায়ুকে ঢেকেছে কফে, ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে, তার পরে পিপাসা হবে ; তখনি প্রমাদ ঘটিবে জানাই।'

কৃষ্ণ একবার রাধাকে একখানা দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গেলে রাধা সেই দাসখতের বলে কৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য বৃন্দাকে মথুরায় পাঠাইলেন। সেই দাসখতের ভাষা অবিকল বাস্তব খতের ভাষার অনুরূপ হওয়াতে তাহা এত কৌতুকময় হইয়া উঠিয়াছে, যথা—

মহামহিমমহিমাসাগরসুহৃন্মঞ্জরি শ্রীমতি রাধা প্রতাপেষু—

কস্য মানপত্রমিদং লিখিতঞ্চ ভদ্রে মানেতে মগ্না হৈ।, মম অপরাধে কৃপা করি প্রসন্ন হও। কর্জ অনুরোধে এহার মুনাফা প্রেম দিব দিনে ২। এ শরীরে, সুদ দিব মূল মুনাফা সনে॥...

কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি সৌর মাঘ মাসে। লিখিয়া দিলেম খত সহস্রাংশু শেষে॥
ইসাদী অষ্টম সখী মঞ্জরি সহিত। দস্তখত প্রেমদাস কৃষ্ণের স্ব-লিখিত॥

॥ মাথুর। ঢপ-সঙ্গীত—মধুসূদন কান॥

যাত্রার ন্যায় ঢপসঙ্গীতেও যমকের বহুল ব্যবহার দ্বারা কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষিত হয়। বৃন্দা মথুরায় গেলে তাহাকে দেখিয়া মথুরার নারীগণ বলাবলি করিতেছে—

দেখ না ও কে নারী, ঐ যে যমুনা কেনারি।
দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারি,
ও নারী চিন্তে নারি।

॥ মাথুর॥

কবিগান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে সকল কাব্য-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল কবিগান।[১] কবিগানের মধ্যে ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ ও বিরহের গান গুলিই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত ছিল। শাক্তপদাবলী অবলম্বনে ভবানী-বিষয়ক গানগুলি এবং বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে সখীসংবাদ ও বিরহের গানগুলি রচিত হইয়াছিল। কবিগানের মধ্যে, বিশেষত হরু ঠাকুর প্রভৃতি প্রাথমিক কবিয়ালদের গানের মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব ও ভাবের উৎকর্ষ বিদ্যমান ছিল; কিন্তু যে শ্রোতাদের জন্য এই গানগুলি রচিত হইয়াছিল তাহারা উচ্চাঙ্গের ভাবকলা অপেক্ষা সহজ আমোদেরই অধিক পক্ষপাতী ছিল, সেজন্য তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য কবিয়ালগণ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক শ্লেষাত্মক রচনা ও অশ্লীল গালাগালির অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রুচি প্রবর্তনের পর কবিগান ক্রমে ক্রমে নিম্নশ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার রসও অত্যন্ত অশ্লীল ও কদর্য হইয়া উঠিয়াছিল।[২] সেজন্য কবিগানের উচ্চভাবমূলক রাধাকৃষ্ণলীলা অপেক্ষা বাস্তব মানবরসাত্মক লহর ও খেউড়ই শ্রোতাদের অধিক মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইত। রাগরাগিণীপূর্ণ সঙ্গীত অপেক্ষা শ্লেষাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তি, উপস্থিত বুদ্ধির কুশলী কসরত, ব্যক্তিগত জীবনের বক্র ও কটু ইঙ্গিতই তাহারা অধিক পছন্দ করিত। সাহিত্যরসের দিক দিয়া বিচার করিলে এগুলি নিকৃষ্ট মনে হইতে পারে, কিন্তু তবুও ইহা সত্য যে ইহাদের মধ্যেই কবিওয়ালাদের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রীতির পরিচয় পরিস্ফুট হই

১। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল আর একাল' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সেকালের প্রধান আমোদ ছিল, তাহার মধ্যে কবি প্রধান।'

2. This debasement was complete in the next generation when with the spread of western education and consequent revolution in taste, these songs had been banished totally from respectable society and descended to the town classes who demanded a literature suited to their uneducated taste.

Bengali Lit. in the 19th century by Dr. S. K. De. P. 308

আগমনী, সখীসংবাদ ও বিরহের গানগুলিতে কাব্যোৎকর্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলি শাক্ত ও বৈষ্ণবপদাবলীর ভাব ও ভাষার প্রায় অবিকল অনুকরণ বলা যাইতে পারে। কবিগানের বিশিষ্ট ঢঙ, অর্থাৎ চিতান, পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া, খাদ ইত্যাদি বাদ দিলে কবিওয়ালাদের কোন বিশিষ্ট মৌলিকতাই আর চোখে পড়িবে না।[১]

কবিগানের যে সংকলন-গ্রন্থগুলি আজও পর্যন্ত দুই-একখানা আছে সেগুলিতে লহর ও খেউড় অংশ প্রায় নাই বলিলেই হয়। রুচির অনুরোধে সেগুলি রক্ষিত সাহিত্য হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নির্বাসিত হইয়াছে। বর্তমান পাঠক সমাজের সেগুলি জানিবার ও আলোচনা করিবার আর কোন উপায় নাই। হাস্যরসের আলোচনার সেগুলির অভাবই বিশেষ বোধ করিতেছি। ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ ও বিরহের গানগুলি ভক্তিরসাত্মক ভাব ও কল্পনায় পূর্ণ বলিয়া সেখানে স্থূল ও বাস্তব উপাদানের খুবই অভাব এবং সেজন্য হাস্য-কৌতুকের ধারাও সেখানে অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে উক্তি ও প্রত্যুক্তি করিবার ফলে যে বাক্য-সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি হইত তাহাই শ্রোতাদের আমোদ উদ্রেক করিত। কবিয়ালদের মধ্যে কেহ রাধা এবং কেহ কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্কের বাণ নিক্ষেপ করিতেন। বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আক্রমণের নবতর অস্ত্র তাঁহারা প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ রাধাকৃষ্ণের লীলাময় জগৎ হইতে বাস্তব মানবীয় ক্ষেত্রে নামিয়া আসিত বলিয়াই শ্রোতাগণ কৌতুকমগ্ন মন লইয়া এই রসের লড়াই উপভোগ করিত এবং অশেষ কৌতূহল লইয়া জয়পরাজয়ের অপেক্ষা করিত। সখীসংবাদ ও বিরহের অধিকাংশ পদেই কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধা অথবা তাঁহার কোন সখীর মুখ দিয়া কৃষ্ণের অনাদর ও অবিশ্বস্ততার জন্য তাঁহার প্রতি তীব্র শ্লেষ ও অনুযোগ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং কবিগানে প্রথম আক্রমণ সাধারণত রাধার পক্ষ হইতেই আসিত, কৃষ্ণকে প্রধানত আত্মরক্ষার দিকেই অধিক মনোনিবেশ করিতে হইত। তবে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া তিনি যে একটু-আধটু পাল্টা আক্রমণ করিতেন না তাহাও নহে। এই আক্রমণ

১। কবিগানের মৌলিকতার অভাব উল্লেখ করিয়া ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন,

'They are thoroughly preoccupied with the conventional themes of earlier poets, though their treatment may be a little popular, and they even express themselves in conventional diction and imagery.'

Bengali Literature in the 19th. century by Dr. S. K. De, P. 318

ও প্রতিআক্রমণের মধ্যে কিভাবে কৌতুকরসের সঞ্চার হইত তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

ধরতা

রামবসুর প্রণীত

ইহার নিজের দলে গীত

১ চিতান। সেই তুমি সেই আমি—
সেই প্রণয়—নূতন নয় পরিচয়।
১ পরচিতান। হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান,
তবে বিরস বদন কেন হয়
১ ফুকা। তোমায় লোকে কয়
রসময় মিথ্যা নয় সে রস পরের কাছে হয়,
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।
১ মেলতা। তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি
শিরে সংক্রান্তি
যেন শান্তি শতকেতে পাঠ এগুলো।
মহড়া। ভাব দেখে করি অনুভব,
ভাব বুঝি ফুরাল।
দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি,
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল।
খাদ। এই দুখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল।
২ ফুকা। ছিল নব রস,
ছিলে বশ, কত যশ,
করতে তুমি প্রাণধন,
দেখা হলে এখন তুলে চাও না ও বদন।
২ মেলতা। তখন হাসি হাসি
তুষিতে প্রেয়সী প্রাণ,
সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেল।

উত্তর

ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর প্রণীত

নীলমণি পাটুনীর দলে গীত

১ চিতান। বল সই কি কথা
ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।
১ পরচিতান। তবে কর্মান্তরে হলে স্বতন্তর,
তুষতে নারি প্রাণ তোমার।
২ ফুকা। তা বলে ভেব না প্রিয়ে আমায় পর।
আমি নহিত পরের প্রাণ,
তুষি না পরের প্রাণ,
তোমারি রাধা নিরন্তর।
১ মেলতা পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর,
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ করে না।
মহড়া। কও কে শিখালে হে তোমারে
এমন ঘরভাঙা মন্ত্রণা।
বিনা দোষেতে দুষো না,
সুখের প্রেমে দুখ দিও না,
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে না। [১]

মাথুর গানে রাধার দুঃখবেদনার বর্ণনা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি সখী বৃন্দার শাণিত শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ তিরস্কারই বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে। বৃন্দাবনের রাখাল মথুরায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিয়াছেন। নিম্ন অবস্থা হইতে হঠাৎ অতি উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হইয়া পূর্বেকার আপনজনের কথা ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যে যে চরিত্রতে অসঙ্গতি ও অপরাধ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লইয়াই প্রধানত বৃন্দার অভিমানক্ষুব্ধ তিরস্কার ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ লোক হইলে এরূপ তিরস্কারে কৌতুক উদ্রিক্ত হইত না কিন্তু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এভাবে তিরস্কৃত হইতেছেন, ইহা সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ কৌতুকপ্রদ মনে হয়। রাম বসুর এরূপ একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

১ চিতান। নিরখি মধুপুরে একি আজ অপরূপ।

১। রসগ্রন্থাবলী—(বসুমতী সাহিত্য মন্দির)

১ পরচিতান। মধুরাজ্যেশ্বর, হয়ে বসেছেন ব্রজের নটভূপ।

১ ফুকা। খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়, কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।

১ মেলতা। ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আ মরি, বিধির বিচারের পায়ে নমস্কার।

মহড়া। ছি। ছি। এই কি দশা এখন দেখতে হল মথুরায়। যে নাগর গোপীর বসন চোর, চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার।

খাদ। ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার।

২ ফুকা। ছিল কোটালি ব্রজে যার, ঘাটেলি ঘুচিয়ে দেখি রাজ্যলাভ হল তার।

২ মেলতা। যদি হলে হে ভূপতি। তুমি যদুপতি, গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর। [১]

রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে কবিয়ালগণ ঐ লীলা হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া সাংসারিক মানুষের স্বভাবধর্ম লইয়া যে সরস মন্তব্য প্রকাশ করিতেন সাধারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশেষ প্রীতিকর হইয়া উঠিত। নারীর ভালোবাসা পুরুষের অর্থের উপর নির্ভরশীল তাহা বর্ণনা করিয়া নারীর স্বভাবের কৃত্রিমতা ও কপটতা লইয়া একজন কবিয়াল যে রসিকতা করিয়াছেন তাহার একটু নিদর্শন দেওয়া হইতেছে—

চিতেন।

অতি নীচ হয়, নিত্য ধন দেয়,
যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিত বুজনা, নাহি বিবেচনা,
স্বকার্য করে সাধন॥

অন্তরা।

কেবল অর্থেতেই লোভ, মৌখিক সে সব,
কহে যে প্রেমকথন।
পীরিতিরসের রসিকনারী,
সহস্রে মেলে একজন॥

১ প্রাচীন কবি সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩

চিতেন।

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়,

হোলে হর স্বর্ণভূষণ।

তাদের সেই হয় প্রিয়তম, সেই মনোরম,

ধন দিয়ে তোষে যে জন॥

অন্তরা।

যার স্বামী অকৃতী, তাকে সে যুবতী,

নাহি করে মান্যমান

বলে ধিক থাক পিতা মাতারে,

এমন দরিদ্রে দিয়াছে দান॥

চিতেন॥

যদি কপালগুণে, পুনঃ সে জনে,

অর্থ করে উপার্জন।

তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এপতি,

করে হর আরাধন॥

অন্তরা।

দেখে অর্থ আছে যার, সদা নারী তার,

করয়ে মনোরঞ্জন।

বলে পাদপদে স্থান, দিও ওহে প্রাণ,

আমি করিব সহগমন॥ ১

যাত্রার মত কবিগানেও কোন বিশেষ কথা বার বার ব্যবহার করিয়া কৌতুকরস উদ্রেক করা হইত। বিশেষ ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রকার স্বর ও সুরের বৈচিত্র্য আনিয়া সেই কথাকে রসোদ্দীপক করিয়া তোলা হইত। রসিক-শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি যত চালিত হইত ততই তাহারা কৌতুক বোধ করিত। রাম বসুর একটি পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হইতেছে।

১ চিতান। পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ, বিরহীরাজ্যে রাজন।

১ পরচিতান। সহ সহচর, পঞ্চস্বর, তরাই রিপু হল পঞ্চজন।

১। গুপ্তরত্নোদ্ধার—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯১।

১ ফুকা। ভ্রমর কোকিলাদির পঞ্চস্বর, রাজা পঞ্চশর, অঙ্গে হানে পঞ্চশর।

১ মেলতা। তাহে উনপঞ্চাশত, মলয় মারুত, সই, আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে।

মহড়া। এ বসন্তে সখী পঞ্চ আমার, কাল হল জগতে।
করে পঞ্চদুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি
পাই পঞ্চবাণেতে। ইত্যাদি। ১

কবিয়ালগণ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া যে ব্যক্তিগত গালাগালি বর্ষণ করিতেন, তাহাই শ্রোতাদের কাছে অধিকতর মনোরঞ্জক হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইরূপ গালাগালিপূর্ণ পদ কবিসংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু রক্ষিত হয় নাই। মাত্র দুই-এক স্থল হইতে ঐ ধরণের গানের একটু-আধটু নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। এক জায়গায় রাম বসু ভোলা ময়রাকে তীব্র কটূক্তি করিয়া যে গান গাহিয়াছিলেন, ভোলা ময়রা তাহার উত্তর না দিতে পারিয়া পরাজয় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। গানটি উদ্ধৃত হইল—

১ চিতান। সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষণ্ড নচ্ছার।

১ পরচিতান। ভজিস ঢেঁকি, বলিস কিনা গৌর-অবতার।

১ ফুকা। কি সে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস না সূক্ষ্ম, ও মূর্খ, দিস কোন ঠাকুরের ঠেস?

মেলতা। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস পচা ভুর।

মহড়া। সেই হরি কি তোর হরুঠাকুর।
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর,
যাঁর অভয়চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর।
যে রজক ছেদন করে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর। ২

রাম বসুর আর একটি লহরে রামপ্রসাদ ঠাকুরের প্রতি তীব্র আক্রমণের নিদর্শন পাওয়া যায়। নীলু ঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ দলপতি ছিলেন, একদিন তিনি রাম বসুকে গালি দিলেন—

নাইক রামবোসের এখন সেকেল পৌরুষ।
এখন দল করে হয়েছেন রামবোস—রামকামারের⋯।

১। প্রাচীন কবি সংগ্রহ—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৬।

২। প্রাচীন কবি সংগ্রহ—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬০।

রাম বসু তীব্র ভাষায় উত্তর দিলেন—

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজে নাক একটি দিন॥
যেমন রাতভিখারীর ধামাবওয়া থাকে এক এক জন,
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—(ভাইরে)
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্ম্মা—
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ সিদ্ধিরস্তুবস্তুহীন॥
নীলমণি মলে, নীলমণির দলে, ঢুকলো শিংভাঙা এড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব বলে নবাব হল উজীরালি আড়াই দিন।
যেমন···কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্ম্মেতে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে পুড়িয়ে করেন খাক,
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেটকো মুকুলচাঁদ,
ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ, তরেন রামপ্রসাদ,
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না, দোলে লবেদার আস্তীন॥ ১

১। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৭৩।

দাশরথি রায়

পাঁচালী কথাটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের কাব্য বুঝাইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। মঙ্গলকাব্য পাঁচালী নামে কথিত হইত, আবার মহাভারতও কোন কোন স্থানে পাঁচালী নামে আখ্যাত হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একপ্রকার লোকসঙ্গীত পাঁচালী নামে অভিহিত হইল। এই পাঁচালী কীর্তন হইতে উদ্ভূত হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্যও আছে। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, 'পাঁচালীর সহিত কীর্তন গানের তফাত হইতেছে যে, পাঁচালীতে গায়ন অঙ্গভঙ্গি করিত। কখনো কখনো পাত্র-পাত্রীর সাজও সাজিত এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিত। গানের ঢঙেও কীর্তনের বিশুদ্ধি ছিল না, ইহাতে খেমটা ও কবিগান পদ্ধতির প্রভাবও পড়িয়াছিল।'[১] অবশ্য ইহাদের আসল পার্থক্য ছিল সুরে। পাঁচালীতেও দুই দলের সহিত সংগ্রাম হইত। ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না, কিন্তু ছড়া ও গানের লড়াই হইত। যে দল বেশী ভাল ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত।

পাচালী-রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। দাশরথি প্রথমে কবির দলে গান গাহিতেন। (ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া প্রতিপক্ষদলের কবিওয়ালাদের অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালিই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, আত্মীয়-স্বজনের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বহুদিন তিনি কবির দল ত্যাগ করিতে পারেন নাই।) অবশেষে পিতার ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি কবিগান ছাড়িয়া পাঁচালী গান রচনা আরম্ভ করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে লৌকিক সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছিল সেগুলির বিষয়সমূহ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি বাস্তব সমাজের সমস্যা আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকভাবে ধর্মভাবমুক্ত ও মানবরসাশ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই মৃত্তিকাচারী মানবমুখীন দৃষ্টি ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মধ্যযুগে

১। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—পৃঃ ৯৫৯

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে দৈবলীলা ও অপ্রাকৃত বিধি-বিধানের প্রতি মানুষের যে অকপট ও অপরিসীম ভক্তিবিশ্বাস ছিল তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে শিথিল ও অগভীর হইয়া আসিতেছিল। দেবলীলা তখনও সাহিত্যে বর্ণিত হইতেছিল বটে, কারণ কবিগণ লোক-প্রচলিত পুরাণকাহিনীর বহির্ভূত কোন মৌলিক ও অভিনব মানবকাহিনী সাহিত্যে আনয়ন করিতে সাহস করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি-পরিবর্তনের ফলে দেবকাহিনী অবলম্বন করিয়া সমাজ-জীবনের নানা ঘটনা ও সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিতেছিল এবং পৌরাণিক ও দেবচরিত্রগুলিও তাঁহাদের দূরস্থিত মহিমান্বিত রূপ হারাইয়া ক্রমে ক্রমে লঘু হাস্যোদ্দীপক চরিত্র হইয়া পড়িতেছিল। ভারতচন্দ্র দেবচরিত্রগুলি লইয়া যেরূপ রঙ্গরসিকতা করিয়া-ছিলেন, সেরূপ রঙ্গরসিকতা পরবর্তী লৌকিক সঙ্গীতগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেবতা সম্বন্ধে ভক্তিবিশ্বাস তখনও ছিল বটে, কিন্তু পূর্বের মত দেবতার প্রতি একাগ্র, অবিমিশ্র ও সংসারবিরাগী কৌতূহল ও ভক্তি আর ছিল না। আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সামাজিক জীবনে যে অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার ভাব দেখা গিয়াছিল তাহাতে সে-সময়ে গুরু ও গম্ভীর বিষয়ের প্রতি কাহারও কোন অনুরাগ ছিল না। তখন রাজনৈতিক জীবনে অনিশ্চিত অরাজকতা, সামাজিক নীতি ও আদর্শ ধূলায় লুণ্ঠিত, কোন স্থায়ী বস্তু সম্বন্ধে লোকের মনে তখন আর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা নাই। সেই সংশয়সঙ্কুল, অনিশ্চয়তাবাদী সমাজে শাশ্বত ও মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব নহে। তখন তুচ্ছ ও লঘু বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ করার দিকেই সমাজমনের প্রবণতা লক্ষিত হইয়াছিল। সেজন্য তৎকালীন কবি, আখড়াই, পাচালী ইত্যাদি গানের মধ্যে সেই সমাজ মনের রুচিকর লঘুরসাত্মক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া আমোদ বিতরণের উদ্দেশ্যই কবিদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল।

দাশরথির পাচালী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কবি তৎকালীন শ্রোতাদের রুচি ও রসপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সেজন্য পৌরাণিক দেবলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি যেমন সামাজিক আচার-ব্যবহার ও বিচিত্র লোকচরিত্র অবতারণা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেও এক অবিচ্ছিন্ন কৌতুকরসের ধারা

প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। দাশরথি নিজে একজন মিষ্টালাপী, প্রীতিমান, ও পরিহাসপ্রিয় রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কৌতুক-প্রফুল্ল মুখ হইতে সর্বদা হাস্যকৌতুক নির্গত হইয়া নিকটবর্তী লোকেদের প্রাণে অশেষ আমোদ সঞ্চার করিত। তাঁহার অনিঃশেষ হাস্যভাণ্ডার হইতে যে কোন উপলক্ষে সদা-প্রস্তুত হাস্যজনক উক্তিগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাহির হইয়া আসিত। ১

হাস্যরসিকের পক্ষে সমাজ ও সমাজচরিত্র সম্বন্ধে যে ভূয়োদর্শন থাকা প্রয়োজন তাহা দাশরথির প্রচুর পরিমাণেই ছিল। ব্রাহ্মণের মূর্খতা ও ঔদরিকতা, বৈষ্ণবের শাক্তবিদ্বেষ, প্রতিবেশিনী নারীর ঈর্ষা ও কৌতূহল, বিবাহের স্ত্রী-আচার, ঘটকালী প্রথা, হাতুড়ে চিকিৎসা কোন বিষয়ই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। বিধবা বিবাহ এবং অন্যান্য সমসাময়িক আন্দোলনের প্রতিও তাঁহার সরস চিন্তাশীল মন জাগরূক ছিল। সমাজের বিচিত্রমুখী জীবন-প্রণালীর মধ্যে অসঙ্গতি ও অসরসতা দেখিয়া তিনি কোথাও রঙ্গরসে উচ্ছল এবং কোথাও বা একটু শ্লেষ ও বক্রোক্তিবিলাসী হইয়াছেন, কিন্তু কখনও তিনি নির্মম মানববিদ্বেষীরূপে প্রতিভাত হন নাই। তাঁহার উদার স্বভাব ও প্রীতিপ্রসন্ন অন্তরে কখনও কোন ক্ষুদ্র ঘৃণা ও নীচ ঈর্ষার স্থান ছিল না। ২ দাশরথি তাঁহার কাব্যে শুধু কেবল স্থূল ঘটনার মধ্যেই তাহার দৃষ্টি সীমায়িত রাখেন নাই। সূক্ষ্ম কল্পনা আশ্রয় করিয়া নির্মল সৌন্দর্যরসের প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই মধুর রসপ্লাবিত ক্ষেত্রে হাস্যকৌতুকের আবর্তগুলিও এক রমণীয় মাধুর্যে অভিষিক্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃত উদার হাস্যরসিক বোধহয় নিজেকে লইয়াই সর্বাপেক্ষা বেশি হাস্য পরিহাস করেন। দাশরথিও নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ ব্রাহ্মণদের লইয়া তিনি বহু জায়গায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন, নিজের গৃহে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন, অথচ এই বৈষ্ণবদের অনুদারতা ও ভণ্ডামি লইয়া তিনি কতই না উপহাস করিয়াছেন! স্বল্পবিত্ত ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া কিরূপ লোভার্ত হইয়া উঠিতেন তাহার সরস বর্ণনা যেমন কবি দিয়াছেন, তেমনি তাহাদের মূর্খতা, আচার-

---

১। দাশরথির রহস্যপ্রিয়তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে [পৃঃ ৩৪০ দ্রষ্টব্য]

২। দাশরথির রসিকতা কাব্যরসে সিক্ত, তাই উহা এত মধুর। দাশরথির গর্ব ছিল না, তিনি পরশ্রীকাতর ছিলেন না।

বঙ্গভাষার লেখক (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়) পৃঃ২৪০

ভ্রষ্টতা ও নীচতার উল্লেখ করিয়া কবি একটু কঠিন বিদ্রূপও বর্ষণ করিয়াছেন, দ্বারকায় কৃষ্ণের পুরীতে এক লোভী ব্রাহ্মণের খাওয়ার বর্ণনা শুনুন,—

স্বর্ণ থালে অন্নপোরা, নানা ব্যঞ্জন কটরা, পঞ্চামৃত দধি ঘৃত তায়। পরিবেশন পরিপাটী, পায়সান্ন বাটী বাটী, হরিপুরে হরিষে দ্বিজ খায়॥ নানা দ্রব্য থরে থরে, খেতে দ্বিজ ভেবে মরে, বলে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা খাব পাছে। খেয়ে তিন মালসা ক্ষীর সর, কহে হে গোকুলেশ্বর, ক্ষীণ শরীর জীর্ণ না হয় পাছে॥ সকল দ্রব্যই ঘৃতপক্ক, পেটে পাছে না হয় পক্ক, লোভে খেয়ে কি শেষে পড়িব পাকে। ওহে কৃষ্ণ মহাশয়, অগ্নিমান্দ্য অতিশয়, এত সয় অভ্যাস যদি থাকে॥ আপনি আদর করেন কি উদর মরা, তৈলপক্ক তিলের বড়া, গুরুপাক পায়স মাংস মীন। দিচ্ছেন আপনি খাচ্ছি কেঁপে, কালি মরিব উদর ফেঁপে, সাহস করিতে নারি নাড়ী ক্ষীণ॥.........একবার একবার খায়না ডরে, আবার লোভে মনে করে, খেলাম না হয় জন্মের মত খাই। খেলাম খেলাম খেয়ে মরি, মহাপ্রাণীকে শীতল করি, একবার বইতো দুইবার মরণ নাই॥

॥ রুক্মিণী হরণ॥

অপরিমিত ভোজন ও দান গ্রহণের পরও কোন কোন নীচমনা ব্রাহ্মণ কিরূপ নিন্দা করিয়া বেড়াইত তাহার দৃষ্টান্ত কবি এক জায়গায় দিয়াছেন। হিমালয় ও মেনকার গৃহে প্রচুর ভোজন করিয়া এবং প্রচুরতর দানসামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্তনের সময় এক ব্রাহ্মণ কিভাবে নিন্দা করিতে করিতে যাইতেছেন তাহার একটু নিদর্শন দেওয়া হইতেছে।

বাহিরে চটক খরচ হাল্কি, ভোজেও বেটার ভোজেও ভেল্কি, যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের। পাকী হন বড় মান্য, পাক করেছেন পরমান্ন, আধ পোয়া চাল দুগ্ধ ষোল সের॥ ফলার করেছেন পাকা, কলাগুলা তার আধ পাকা, একটা নাই মর্ত্তমান সবগুলো কুলবুত॥ তিন পোয়া বেড় করেছে, না করিলে ত্রিশ কুচি, আহার করিতে নাই যুত॥ সন্দেশগুলো সব মিছরি পাকে, তাতে কখন মিষ্ট থাকে, দলো না দিয়ে জলো হ'য়ে যায়। চিনিগুলো সব ফুট সাদা, খড়ি মিশান বুঝি আধা, এত ফরসা চিনি কোথায় পায়॥............দেখিলাম বেটার সকলি ফক্কি, বামুন বড় ষাটি লক্ষি, ইহার বাড়া হয় যদি কান কাটি। সকল বিষয়ে ন্যূনকল্প, কেবল পাহাড়ে গল্প, মেটে ঝাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি॥

॥ শিববিবাহ। দাশরথি পাঁচালী। নিউ মহামায়া প্রেস॥

বৈষ্ণবদের প্রতি কবির শ্লেষ যেন একটু অসহিষ্ণু তিক্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তৎকালীন বৈষ্ণবদের শক্তি-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন—

যত পেঁদির বেটা রামশন্না, শ্যামা মায়ের নাম সন্না, শাক্ত বামুনের ভাত খান্না, বলি দিয়েছে বলে ॥ এদিকে ডোম কোটালকে করে শিষ্য, তাদের প্রতি নাই উষ্ম, শূওর বলিতে নাই দূষ্য, আনন্দে ভোজন হ'য়ে বসে তাদের বাড়ী। শাক্ত বামুনকে দয়া হয় না, পাঁটা উহাদের পেটে সয় না, ঐ বিষয়টা মন্দাগ্নি ভারী ॥ কিবা ভক্তি কিবা তপস্বী, জপের মালা সেবাদাসী ভজন কুঠরী অহর কাঠের বেড়া। গোঁসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যাং শেতে কুলিন বড় নেড়া ॥

অন্যত্র আর এক ভণ্ড ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৈষ্ণবের চরিত্র এভাবে আঁকিয়াছেন—

ললাটেতে হরিমন্দিরের লোভে তিলকমাটি। করে করে করমালা কপ্নি আঁটা কটি ॥ সর্বাঙ্গে নামের ছাবা গলায় তুলসী। এক দৃষ্টে দেখে রূপ প্রেমমণি সেবাদাসী ॥ বলে প্রভু কিবা রূপ তুমি প্রেমদাতা। কৃপা কর রমণীরে চরণে দেই মাথা। তুমি শ্রীরূপ সনাতন তুমি মোর নিমাই। তুমি মোর অদ্বৈত প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥ তখন সেবাদাসীকে কৃপা করি গাঁজায় দিয়ে টান বাহিরে গিয়ে বাবাজী করে গৌর গুণগান ॥

॥ শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ॥

দাশরথি হাতুড়ে বৈদ্যের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার সরস বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যায়—

হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত, এক ঔষধে দীক্ষিত, হলাহল গোদন্তী আর পারা। ধর্মভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীবন হত্যে, কোর্তে সদা ফেরেন পাড়া পাড়া ॥ খুন করে পড়েন ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা, কি পথ দিয়েছেন জগৎপতি। কিবা অনুমানের লেখা, কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা, যার নাড়িতে বায়ু বৃদ্ধি অতি ॥ হাতুড়ে বলেন ধরি হাত, এতো ঘোর সান্নিপাত, দধির মাৎ শীঘ্র আন্তে হয়। আগে লয়ে দক্ষিণের কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি, দর্শন করায় যমালয় ॥ যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে, তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে তাই প্লীহাপাতে। ঔষধের দোষে ভুগি, অন্ন থাক্তে মরেন রোগী, অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে ॥

॥ রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন ॥

দাশরথি শুধু কেবল বিচিত্র পুরুষ চরিত্র লইয়াই আলোচনা করেন নাই, অন্তঃপুরিকা রমণীদের স্বভাব ও আচরণও তিনি তাঁহার কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় আমরা বাংলার কুলকামিনীদের আচার-অনুষ্ঠান, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, রঙ্গ-রসিকতা ও বস্ত্রালঙ্কার প্রিয়তার নানা কৌতুকরসাত্মক চিত্র পাইয়াছি। শিবের বিবাহ উপলক্ষে সমাগত নারীদের বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি তাঁহার সমকালীন নারীদেরই এক সরস বিবরণ দিয়াছেন, যথা—

সজ্জা করি মনোসাধে, যত রমণী জল সাধে, অঙ্গে দিয়ে বিবিধ ভূষণ॥ কারু বা পোষাক কাটা, নাগরী ঘাঘরী আঁটা, বুক কাটা কারু রাঙ্গা চেলি। পরেছেন কোন নারী, কুসুমী রঙ্গের সাড়ী, গোটা আঁটা তাহাতে সোনালী॥ পরেছেন কোন রসবতী, জামদানী বুটি ধুতি, কারু বা চিকন মলমল। পরশে বসন হন্দ, চরণে চরণপদ্ম, গোল বেঁকি গুজরি গোল মল॥······নারীর ধর্ম চমৎকার, বস্ত্র বিবিধ প্রকার, গা ভরে পান অলঙ্কার, শিরে শিথি পায় পঞ্চম-পাতা। তবেই পতিব্রতা হন, কর্তা বলে কথা কন, নৈলে পতির খেয়ে বসেন মাথা॥

॥ শিববিবাহ ॥

শেষের কথাগুলির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কোন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার আভাস আছে কিনা জানি না, তবে উহাদের মধ্য দিয়া সঙ্কটাপন্ন পতিদের চিরন্তন খেদ যে ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দাশরথির পাঁচালীতে সর্বাপেক্ষা বহুল দৃষ্ট চরিত্র বোধ হয় নারদ। নারদ স্বর্গ মর্ত্য, পুরুষের সভা ও মেয়েলী মহল, শিবের ঘটকালীতে আর কৃষ্ণের রোগমুক্তিতে, নিমন্ত্রণ জানাইতে এবং কোন্দল বাধাইতে সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। নারদের আকৃতি ও আচরণ কবি ও শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর। সেজন্য সকলের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বস্থানেই তাঁহাকে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে। অবশ্য ভাল কাজ ও পরের উপকার করিতে যাইয়া নারদকে কারণে অকারণে লোকের অনেক নিন্দামন্দও শুনিতে হইয়াছে। শিবের বিবাহের ব্যাপারই ধরা যাক। শিব বিবাহ করিতে যাইয়া একেবারে দিগম্বর হইয়া পড়াতে রমণীগণ যখন পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন নারদ নানা কথায় তাহাদিগকে বুঝাইতে ব্যস্ত—

নারীগণ যায় চলি, যেওনা যেওনা বলি নারদ রমণীগণে ডাকে। কেন কর

গোলমাল, অমনধারা অসামাল, বস্ত্র অনেকেরি হ'য়ে থাকে। মোটা উদরের দশা, না রয় বসন কসা, খসা রীত আছে গো অবলা, মিছে কেন বারে বারে, লজ্জা দেও বিয়ের বরে, তোমরা মেয়ে বড় ত উতলা।'

কিন্তু নারদের কথায় নারীগণ আশ্বস্ত হয় না, আর গিরিরাণীর যত রাগ যাইয়া পড়িল তো নারদের উপরেই—

নারীগণ না শুনে বাণী, পলায় লইয়া প্রাণী, গিরিরাণী ক্রোধে কয় নারদে। ওরে বুড়া অল্পেয়ে, তুইতো আমার মাথা খেয়ে, এত বাদ সাধিলি এত সাধে।

॥ শিববিবাহ ॥

শুধু এখানে নহে, কশ্যপ মুনিও একদিন খামোকা নারদকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি দিলেন। সেই গালাগালির একটু নমুনা দিই—

কশ্যপ বলেন লেটা, ঘটালে নারুদে বেটা, তখনি বুঝেছি সেটা, সমূলেতে কল্লে খোঁটা, ভাল কি করেছে এটা, নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা, পরের মন্দ হবে যেটা, সেই কর্ম বড়ে আটা, ঋষির মধ্যে বড় ঠেঁটা, কে কোথা দেখেছে কটা, পোঁদে লাউ উপরে সোঁটা, হাতে করে সদাই সেটা, বেড়ায় যেন হাবা বেটা, চালচুলো নাই নির্লজ্জেটা, কি সাউখুড়ি করেন একটা, মিথ্যা কথার ধুকড়ি ওটা, সত্য কয়না একটি ফোঁটা, গণ্ডগোলের একটি গোটা, বিষম দেখি বুকের পাটা, মাগু ছেলে নাই ন্যাংটা ওটা, কিছুতেই নাই যায় আঁটা, বেটা সব দুয়ারে ফেনচাটা॥

॥ বামনদেবের ভিক্ষা ॥

অথচ এত গালাগালি খাওয়া সত্ত্বেও নারদের কোন চেতনা নাই। তিনি অবিরাম কোন না কোন ফ্যাসাদ বাধাইয়া মজা দেখেন। রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে যাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া শিশুপাল প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। নারদ লজ্জিত ও ভগ্নমনা শিশুপালকে একটি চমৎকার যুক্তি দিলেন—

আমি একটি যুক্তি বলি ভাই, ভক্তি হয়তো কর তাই, যাউক প্রাণ মানকে হাতে রেখো! যাও ঘরে ডুলিতে চড়ে, বস্ত্র আচ্ছাদন করে, কিছুকাল অন্তঃপুরে থেকো।

এদিকে নারদ আবার শিশুপালের পুরীতে খবর দিয়াছেন। শিশুপাল বিবাহ করিয়া আসিতেছেন। রাজপুরীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বাজি ও বাজনা সুরু হইল প্রচণ্ডভাবে। নগরের যত মেয়ে-বৌ ভিড় করিয়া আসিল বর-

কনে দেখিবার জন্য। আশায় আনন্দে সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, শিশুপালের ভগ্নী যাইয়া ডুলির আচ্ছাদন উন্মোচন করিলেন, তখন—

নগরের যত নাগরী, বৌ দেখিতে ইচ্ছা করি, নগরের বাহিরে যায় হেঁটে। শিশুপালের ভগ্নী গিয়ে, ডুলির আচ্ছাদন তুলিয়ে, আইমা বলে দন্তে জিহ্বা কাটে। নারীগণ বলিছে হেসে, আয় লো মজার বৌ দেখসে, জন্মে যে দেখি নাই হেন বৌ। লাজের কথা কারে কব, ওমা, আমি, কোথায় যাব, বিয়ের কন্যা গোঁপ দেখেছ কেউ॥

॥ রুক্মিণী হরণ ॥

নারদ এক বিশ্বজনীন ঘটক, ঘটকালীতে তাঁহার তুলনা নাই, সে ঘটকালী শিবের বিবাহেই হউক, কিংবা কৃষ্ণের বিবাহেই হউক। ঘটকালী উপলক্ষে মেয়েদের মহলে তাঁহার অবারিত দ্বার। রঙ্গরসিকতা করিয়া মেয়েমহল তিনি বেশ জমাইয়াও রাখেন। কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহের ঘটক হইয়া রুক্মিণীর পিতৃপুরীতে যাইয়া মেয়েদের সহিত তিনি কিরূপ রঙ্গরসিকতা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন দেওয়া গেল—

হাসি রমণীগণ কয়, পাত্র তোমার কেটা হয়, নারদ বলে লেটা বাধালে বড়। মিথ্যা কাজ কি বলি খাঁটি, এখনকার বেহাই বটি, কোটে পেয়েছ যা হয় তা কর। রমণীগণ কয় হাসি হাসি, আমরা সবাই মেয়ের মাসী, ওহে বেহাই, কেমন বটেন গিন্নি। তোমার পক্ক দাড়ি পায়ে ঝোলে, ইহাই দেখে কি বেহানি ভুলে, যদি ভুলে তবে তাঁরে ধন্নি॥ নারদ বলে সে কে কয়, বয়েস ত আমার অধিক নয়, বাবা হয়েছেন তার পরে আমি হই। লেখাতে বয়েস অতি কমি মহাপ্রলয় দেখেছি আমি, কবার বা বার আশী নব্বুই॥

॥ রুক্মিণী হরণ ॥

দাশরথির মৌলিক হাস্যরসসৃষ্টির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। আবার অন্যস্থানে বহু প্রচলিত হাস্য ও কৌতুকরসের ধারাও তিনি তাঁহার কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য অথবা মঙ্গল কাব্য হইতে সেই সব ধারা উৎসারিত হইয়া লৌকিক গীতি ও গাথায় প্রবাহিত হইয়াছিল। জটিলা কুটিলা, বৃন্দা প্রভৃতি চরিত্র লইয়া দাশরথি হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার শিবের বিবাহ, শিব-পার্বতীর কোন্দল ইত্যাদি বিষয় লইয়াও তিনি কৌতুক করিতে ছাড়েন নাই। হাস্যরসে কবির স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি চির-আস্বাদ্য, অতি-পরিচিত হাস্য-কৌতুকের অংশগুলিকেও যেন অধিকতর

রমণীয় ও প্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন, হাস্যরস সৃষ্টি করিতে যাইয়া কবি শব্দ যোজনা ও বর্ণনা-শক্তির অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অতি সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টির সহিত অতি নিপুণ শিল্পবোধের সুমিত সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার হাস্যরস বিদগ্ধ মনের পক্ষে এত উপভোগ্য হইয়াছে। কুব্জার রূপ বর্ণনায় কবি হাস্যরসের মধ্যে কিরূপ সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা একটু লক্ষ্য করা যাক:—

হেথা চন্দন হাতে, রাজসভাতে, যায় কংসের দাসী, হদ্দ মজা, নাম কুব্জা, মুখে মধুর হাসি॥ আষ্টে পিষ্টে ঢিপি ঢাপা আটদিকে আট বেক। পেট্রি ডোঙ্গা, শতেক ভাঙ্গা, যেন গাঙ্গের টেক॥ ঠিক তালপারাটি, বড় ঠেঁটী, দেখিলে ভয় লাগে। ভীষণ ভাষা, বৃদ্ধদশা, নব অনুরাগে॥ তাতে কোটরে চক্ষু, সূক্ষ্ম অতি করছে মিটমিটী, হঠাৎ তারে দেখিলে পরে, লাগে দাঁতকপাটি॥ নাই নারীর চিহ্ন, স্তন বিভিন্ন, কি বিধাতার গতি। চাহে ভুরুর ভঙ্গে, নাকের সঙ্গে, ফারখতা ফারখতি॥ দেখিতে সুলুক, কদর্য মুখ, বুকময় খাল ডোবা। তাকে দৃষ্টি করি, বলেন হরি এটা কেরে বাবা॥

॥ অক্রূর সংবাদ ॥

দাশরথির হাস্যরসের আর একটি বিশিষ্ট রীতি হইল, কুশলী মালোপমা প্রয়োগ। উপমার পর উপমা আনিয়া তিনি একদিকে যেমন শ্রোতাদের মনে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি উপমাগুলির পারস্পরিক দূরাবস্থিতির ফলে তাহাদের কল্পনাশক্তি মুহুর্মুহুঃ যে আকস্মিক আঘাত লাভ করে তাহাতেই তাহাদের মনে কৌতুকরসের সঞ্চার হয়, কৃষ্ণের মথুরাগমনের সংবাদ শুনিয়া কুটিলার কিরূপ আহ্লাদ হইয়াছিল তাহাই বুঝাইবার জন্য কবি কিভাবে উপমার ফুলঝুরি রচনা করিয়াছেন তাহা দেখুন—

যেমন প্রবাসী পতি ঘরে আইলে যুবতীর আহ্লাদ ঘটে। বন্দুয়ানের আহ্লাদ যে দিন পায়ের বেড়ি কাটে॥ বন্ধ্যানারীর আহ্লাদ যেমন গর্ভ হঠাৎ হোলে। অগ্রদানীর আহ্লাদ হয় বুড়ো ধনি মোলে॥ তিন পুরুষে পিরিল যেমন জাতি পেয়ে আহ্লাদ মনে। জোরো রোগীর আহ্লাদ যেমন অন্ন পথ্যের দিনে। দারোগার আহ্লাদ কোথাও করিলে ডাকাইত গ্রেপ্তারি। খেলওয়াড়ের আহ্লাদ যেমন পাশাতে পড়িলে আড়ি॥ দরিদ্রের আহ্লাদ কোথাও হঠাৎ ধন পেলে। পেটুকের আহ্লাদ কোথাও ফলারের নিমন্ত্রণ হলে।

॥ অক্রূর সংবাদ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ভারতচন্দ্রের পর যাত্রা, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি লৌকিক গানের মধ্য দিয়া প্রাচীন যুগের বিদায়-রজনীর আসর জমিয়া উঠিয়াছিল। সেই আসরে লঘু আমোদ ও হাল্কা হাসির যে ঢেউ উঠিত তাহাতে আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক ভাব ও রহস্য ভাসিয়া যাইত। কিন্তু সেই রঙ্গব্যঙ্গের হাস্যমুখরিত আসরে মানুষী সংসারের অসঙ্গতি ও দুর্বলতা উদ্‌ঘাটিত হইলেও সেই সংসারের প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহলও জাগ্রত হইল। অথচ সেই সংসারের বাস্তব দিকটি সসম্ভ্রমে উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার মহৎ লক্ষ্য ও সার্থকতা দেখাইবার মত স্থির চিন্তাশীল ও আদর্শবাদী দৃষ্টি তখনও উন্মেষিত হয় নাই। এই আমোদকলুষিত রজনী অতিক্রান্ত হইবার পর নব প্রভাতে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত নবীন সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই রাতের অবসান ও দিনের প্রকাশমুহূর্তে একজন কবি আসিয়া একই সঙ্গে পুরাতন রাত্রির পূরবী এবং নূতন প্রভাতের ভৈরবী সঙ্গীত মিলিত করিয়া বাঙালী শ্রোতাকে শুনাইলেন। তবে তাঁহার কাব্যে ভোরের আনন্দকাকলী শুনা গেলেও, বিলীয়মান রজনীর জন্য আক্ষেপ-বেদনার সুরই সেখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। এই নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে বিরাজমান ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—দ্বয়ী যুগের অদ্বয় সাধক।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিয়ালদের বিশিষ্ট সঙ্গীতধারায় পরিপুষ্ট ছিলেন। তিনি নিজেও একজন কবিয়াল ছিলেন। সেজন্য কবিগানের বিভিন্ন রাগরাগিণীসম্বলিত সঙ্গীতধর্মিতা তাঁহার কাব্যেও দেখা যায়। সঙ্গীতের প্রভাব হইতে কাব্যের মুক্তি, ইহাই আধুনিক কবিতার লক্ষণ। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা স্থানে স্থানে সঙ্গীতময় হওয়া সত্ত্বেও, এই সঙ্গীতময়তা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও নিরবচ্ছিন্ন কবিতাসৃষ্টিতেও কবির লক্ষ্য ছিল। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র গানের আসরে শেষ গান গাহিয়া কাব্যসভায় আসিয়া প্রথম আসনটি গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু কেবল কবিগানের ঐতিহ্যধারক ছিলেন না, কবিগানেরও পূর্ববর্তী ভারতচন্দ্রের কাব্যের রীতি ও রসও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের অনুকরণে রসাত্মক

ও যুদ্ধবিষয়ক কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। যমক, অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলঙ্কারের বাহুল্য, ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাচুর্য, বর্ণনার অতিশয়িত বাস্তবতা ইত্যাদি রীতি তিনিও তাঁহার কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য ও কবিগানের ধারা অনুসরণ করিয়া তিনিও ভক্তিরহস্যমূলক অপ্রাকৃত দেবলীলা লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন এই অপ্রাকৃত দেবলীলা যে নবজাগ্রত সমাজমানসের পক্ষে কৃত্রিম ও আন্তরিকতাহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণ এই কবিতাগুলি। কবি কাব্য রচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার পাঠকসমাজের আগ্রহ ও অনুরাগই সেই কাব্যকে জীবন্ত ও রসবান করিয়া তোলে। সেই আগ্রহ ও অনুরাগের অভাবেই ঈশ্বরচন্দ্রের ভক্তিমূলক ও দেবলীলাবিষয়ক কবিতাগুলি উপেক্ষিত স্তরে নির্বাসিত হইয়া নিঃশেষে প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কবি নিজে সুগভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং অপ্রাকৃত রহস্যে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কবিতাগুলিকে বাঁচাইতে পারেন নাই। মনে হয়, তিনি বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা যাহা মানিতেন তাহার সহিত কোন শৈল্পিক একপ্রাণতা তাঁহার ছিল না। যাহা তাঁহার কাছে স্থূল, অসঙ্গত ও নিন্দনীয় তাহার বর্ণনাতেই তাঁহার শৈল্পিক শক্তির আনন্দলীলা প্রকাশ পাইয়াছে। কবির সচেতন ধর্মবোধ হইতে আমরা পারমার্থিক, নৈতিক ও রসাত্মক কবিতাগুলি ও 'সারদামঙ্গল কাব্য' পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার শিল্পমানস হইতে পাঁটা ও তপসে মাছ, বড়দিন ও পৌষপার্বণের বাস্তব রসাত্মক চিত্র আমরা লাভ করিয়াছি। কবির সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ইহাদের মধ্যেই তাঁহার সাবলীল কবিধর্মের আত্মপ্রকাশ হইয়াছে। ইহারা প্রমাণ করিয়া দিল যে, কাব্যক্ষেত্রে অপ্রাকৃত দেবলীলার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রাকৃত মানবজীবনের সুখ দুঃখ, সুকৃতি ও বিকৃতিই এখন কবি ও পাঠকদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে।

বাস্তব মানবজীবন কাব্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু সেই জীবন সম্বন্ধে এখনও পুরাপুরি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় নাই। কবি ও পাঁচালীর ধারা অনুসরণ করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র মানবজীবনের স্থূল অসঙ্গতি, ভ্রান্তি, ও ক্ষুদ্রতাই তাঁহার কাব্যে উদ্‌ঘাটন করিলেন। কবির বোধ হয় এই ধারণা ছিল যে, এই জীবন সত্য বটে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় নহে, ইহাতে ভাবিবার বা আশা করিবার কিছু নাই, ইহা রঙ্গের ফুৎকারে ও ব্যঙ্গের ধিক্কারে উড়াইয়া দিবার

বস্তু। মানবজীবন সম্বন্ধে কবির অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের মূলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনাও অনেকাংশে বিদ্যমান। মাতার অভাব, বিমাতার দুর্ব্যবহার, পত্নীর অযোগ্যতা, নানা অভাব ও কষ্টের আঘাত, ইহাদের দ্বারাই তাঁহার চরিত্র কঠিন ও প্রতিশোধপরায়ণ মানববিদ্বেষী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।[1] সেজন্য যেখানেই তিনি হাসি উদ্রেক করিয়াছেন সেখানে তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক কঠিন আঘাতপ্রিয়তার ফলে বিদ্রূপের শাণিত খোঁচায় কণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছে। (কবির হাস্যরসে এই ব্যঙ্গবিদ্রূপের আতিশয্যের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া শুধু কেবল তাঁহার স্বভাবধর্মের কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে না, সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করিতে হইবে। তখনকার হাস্যরসের রীতিই ছিল ব্যঙ্গমূলক।) (পরস্পরের প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়াই সেই হাস্যরসের উদ্রেক হইত।) কবিগণের লহর ও খেউড়ের ধারাই একটু মার্জিত হইয়া শিক্ষিত লোকদের কবিতাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত কিরূপ আঘাত-প্রতিঘাতমূলক কদর্য কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তখনকার শ্রোতাগণ স্থূল আঘাতমূলক, আতিশয্যপূর্ণ হাস্যরস না হইলে মজা পাইতেন না। সূক্ষ্ম, অন্তঃশায়ী ও ব্যঞ্জনাধর্মী হাস্যরসের যুগ তখনও আসে নাই। যে ভাবকোমল, সহানুভূতিসিক্ত ও অশ্রুগভীর হাস্যরসকে ইংরাজিতে Humour বলে তাহার নিদর্শন তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। (সেই Humour-এর প্রথম নিদর্শন পাইলাম আমরা ঈশ্বরচন্দ্র-শিষ্য দীনবন্ধুর মধ্যে। তাঁহার পূর্বে সব হাস্যরসিকের হাস্যরস অল্পবিস্তর ব্যঙ্গবিদ্রূপমিশ্রিত। ভবানীচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টাই ব্যঙ্গরসাত্মক রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গরস প্রধানত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে অবলম্বন করিয়াছে।) শব্দচাতুর্য ও কবির কুশলী বাক্যপ্রয়োগ ও শাণিত-প্রখর মন্তব্যের মধ্য দিয়াই এই ব্যঙ্গরস প্রবাহিত হইয়াছে। কবি বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান ও হঠাৎ-দৃষ্ট আংশিক মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার ব্যঙ্গরস উদ্ভট ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হইতে উৎসারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাহা উচ্ছল কিন্তু স্থায়ী নহে, তাহা অন্তরালবর্তী কবির অদৃশ্য সভা হইতে প্রবাহিত নহে, তাহা সম্মুখবর্তী কবির সুপরিজ্ঞাত ভাবধর্ম

[1] বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনচরিত ও কবিত্ব দ্রষ্টব্য।

হইতে সঞ্জাত। কিন্তু কবিসত্তা তাঁহার হাস্যরসে পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও তাহা এতখানি অহংবাদী হইয়া উঠে নাই, যাহাতে মেঘাচ্ছন্ন আলোকের মত তাঁহার হাস্যপরিহাসের দীপ্তি ম্লান হইয়া যাইতে পারে। কবির সজ্ঞান নীতি ও আদর্শ যাহাই হউক না কেন, তিনি তাঁহার মূল উদ্দেশ্য কখনও বিস্মৃত হন নাই। সেই উদ্দেশ্য হইল অবারিত ও অনর্গল হাস্যের দ্বারা পাঠকচিত্তকে ক্রমাগত উত্তেজিত রাখা।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের কবিপ্রতিভার অনবদ্য বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন, 'তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।' ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় এমন কি আছে যাহা অপর কাহারও কবিতায় নাই, তাহা উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয়, ভোজ্যবস্তুর মধ্যে তিনি যে রস সন্ধান করিয়া পাইয়াছেন, তাহা অন্য কেহ সন্ধান করিয়া পান নাই। এই রস সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে ঔদরিকরসনা-আস্বাদ্য বটে এবং [illegible] কিনা তাহা অবশ্য ভোজনরসিকেরা বিচার [illegible] দুঃখের বিষয়, রসব্যাখ্যাতাগণ এই রসকে কাব্যের অন্ত[illegible]তে সম্মত হন নাই, সেজন্য ইহা আমাদের মনে সৌন্দর্যসম্ভোগজনিত আনন্দ উদ্বোধন করে না, স্থূল অসঙ্গতিঘটিত হাস্যরস উদ্রেক করে মাত্র। খাদ্যবস্তুগুলি লইয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গই বেশি। যে সব বিষয় লইয়া কোন কবিই কাব্যের সৌন্দর্য-কল্পনাক্ষেত্রে আলোচনা করেন নাই, সেগুলি যখন আমাদের আলোচ্য কবিতায় দেখি তখনই তাহা আমাদের মনে বিস্ময়ের আঘাত দিয়া হাস্যবোধ জাগ্রত করে। দ্বিতীয়ত তুচ্ছ খাদ্যবস্তুকেই কবি এরূপ বিশদ বর্ণনার দ্বারা এবং নানা গুরুগম্ভীর গুণ আরোপ করিয়া এমন একটি সুউচ্চ ভাবলোকে লইয়া যান যে তাহা আমাদের প্রবল কৌতুক উদ্রেক করে। লঘু বিষয়ের লঘু বর্ণনাতে কৌতুক নাই, কিন্তু লঘু বিষয়ের গুরু বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে যে বৈপরীত্য রহিয়াছে তাহাই কৌতুক সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ কবির পাঁটা নামক কবিতা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত

১। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না, কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটাই আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি।

হইতেছে। কবি কিরূপ ভক্তিভরে পাঁটার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করুন—

প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী॥
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা।
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ ছালা॥

* * *

অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বালি গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥

পাঁটার মত তপসে মাছের প্রতিও কবির ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নাই,

যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেট ভরে খেতে যেন পাই এক দিন॥
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু॥
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার॥
খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে সহস্র প্রণাম॥

পৌষপার্বণ এবং হেমন্তে বিবিধ খাদ্য এই দুইটির কবিতার মধ্যে কবি যে বাঙালীর কত প্রকার খাদ্যের বর্ণনা দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙালীর

ভাঁড়ার ও রান্নাঘর সম্বন্ধে কবির এত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক দৃষ্টি দেখিয়া সত্যই অবাক হইয়া যাইতে হয়। লুচি সকলেরই প্রিয় খাদ্য কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণনাগুণে ইহা যেন আরও প্রিয় হইয়া উঠে, যথা—

দুধে গমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি।
ছেলে বুড়া সকলেরই ভোজনেতে রুচি॥
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে॥
যত খায় তত মন থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় ক্ষোভে॥
পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার॥

রঙ্গভরা বঙ্গদেশের যেখানে যত রঙ্গ আছে কবির দৃষ্টি সেগুলি সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে। রঙ্গের আসর দেশী হউক আর বিদেশীই হউক, সেখানে কবি নিজেকে নিঃশেষে মিলাইয়া দিয়াছেন। সেই রঙ্গের আসরে কবি শুধুই কেবল রংদার মাত্র। সেখানে তাঁহার নিজস্ব কোন অবচ্ছিন্ন সাত্ত্বনা নাই, নীতি ও তত্ত্বের কালো যবনিকা ফেলিয়া হাসির আলোকিত আসরটি তিনি নিরালোক ও নিস্তব্ধ করিয়া ফেলেন নাই। তাঁহার গমন সর্বত্র,—পিঠাপুলির হেঁসেল হইতে শেরি-শ্যাম্পেনের টেবিল পর্যন্ত। পৌষপার্বণে পিষ্টক-পরিতৃপ্ত লোকেদের চিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া কবি সকৌতুকে লিখিয়াছেন—

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সবলোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক॥
কর্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুইপার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে।
চিটেগুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে॥

তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের কৌতুক॥

পৌষপার্বণের আনন্দে মত্ত এই সুখী পল্লীবাসীদের ছাড়িয়া কবি যখন ইংরাজি নববর্ষের সাহেব-বিবিদের মাঝে যাইয়া বসিয়াছেন তখন—

গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বস গিয়া বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙা মুখ দেখে বাবা টেনে লও হাসি।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥

কথাগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই শ্লেষ ও বিদ্রূপ রহিয়াছে কিন্তু নিছক আমোদের আতিশয্যই এখানে প্রধান। সেই আমোদের হাস্যতরল দৃষ্টি দিয়াই কবিকে আমরা দেখি, যখন তিনি বলেন—

ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল।
দিশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণজয়।
সেরিদাতা মেরিস্যুত বেরি গুড বয়॥

*   *   *   *

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেল টোটেল নাশ সে বরং ভাল॥
পূরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ॥

বড়দিনের উৎসব দেখিয়াও কবির অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা যে মিথ্যা ইহা জানি বলিয়াই আমরা এত মজা পাই। কবির উক্তি কিছুটা উদ্ধৃত হইতেছে—

হায় রে সুখের দিন শোভা কব কায়।
ইংরাজ টোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়॥
প্রতি গেটে গাঁদা হার করি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু দেবদারু পাতে॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিন্দুয়ানী রাখিব না আর॥
জেতে আর কাজ নেই ঈশু গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই॥

ভারতচন্দ্রের শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র নিপুণ শব্দকুশলী কবি ছিলেন। তাঁহার হাস্যরস অনেক স্থলেই শব্দচাতুর্য অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের চতুর ও রসোদ্দীপক প্রয়োগের ফলেই তাঁহার কবিতা বিশেষ বিশেষ স্থানে হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। যমক ও শ্লেষের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

১। আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ॥

২। আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে

৩। তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত কুমার তোমার॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত গুপ্ত কিছু নয়॥
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়॥

৪। বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥

মাঝে মাঝে তাঁহার অনুপ্রাসযুক্ত দুই একটি বাক্য স্নিগ্ধ কৌতুকরসে ভরিয়া উঠিয়াছে, যেমন—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

অথবা,

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।

অথবা,

উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া॥

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়ার ব্যবহারে কবির কুশলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের শব্দ ও ক্রিয়ার পর্যাপ্ত প্রয়োগের ফলে বহু স্থানে তাঁহার হাস্যকৌতুক হঠাৎ-ফাটা বোমার মতই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে নির্গত হইয়া শ্রোতাদের বিস্ময় চকিত কান ও মনকে উত্তেজিত করিয়া রাখে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল—

১। সাহেব-বিবিদের খানার টেবিলে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা শুনুন—

কট কট কটাকট টক টক টক।
ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন ঢক ঢক ঢক।
চুপু চুপু চুপ চুপ চপ পে পে।
সুপু সুপু সুপ সুপ সপ সপ সপ॥
ঠকাস ঠকাস ঠক ফস ফস ফস।
কস কস টস টস ঘস ঘস ঘস॥

আবার খানার পর গানা ও নাচার বহর দেখুন—

সুখের সখের পর খানা হ'লে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান॥
গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

যুদ্ধের বিভিন্ন প্রকার বাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের আওয়াজ কবির সরস লেখনীতে কিরূপ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটু নিদর্শন দেওয়া যাক—

হুড় হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড় দুড়
গুড় গুড় গুড় গুড় গুম
কড় কড় চড় চড় ঘড় ঘড় ফড় ফড়,
হড় হড় দড় দড় দুম॥
গাড়া গাড়া গুম গুম, ডাগা ডাগা ডুম ডুম,
গুম গুম জয়ঢাক বাজে।
ভঁভঁ ভঁভ ভম ভম পঁপ পঁপ পম্ পম্
ভম ভম ভেরী রাগ ভাঁজে॥

ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়ার ব্যবহারের ফলে তাঁহার বর্ণনা কিরূপ কৌতুকময় হইয়া য়াছে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে—

ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনাস্তি,
মশামাছি ভনভনাস্তি,
শীতে শরীর কনকনাস্তি
একটু কাপড় নাইক পিটে।
দারা পুত্র হনহনাস্তি,
অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে॥

এবার আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের রঙ্গের আসর ছাড়িয়া তাঁহার ব্যঙ্গের আসরে প্রবেশ করিব। এই ব্যঙ্গের আসরে কবি শুধু মাত্র রসিক আমুদে লোকটি নহেন, তাঁহার ঈষৎ-বিকশিত হাসির অন্তরালে তাঁহার বিরক্ত, কঠিন ও অসহিষ্ণু মুখটি দেখা যায়। এখানে মনে হয় হাসি তাঁহার ছলনামাত্র, হাসির মধ্য দিয়া বিকৃত, কপট ও উন্মার্গগামী সমাজকে শাসন ও শোধন করাই বুঝি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরগুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর তাঁহার যথার্থ রাগ ছিল।' এই মেকির উপর তাঁহার রাগ ছিল বলিয়া তিনি প্রাচীন ও নবীন সবশ্রেণীর লোকেদের উপরেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মনে হইবে যে, নবীন সমাজের নব্য হাবভাবের প্রতিই তাঁহার রাগ বেশি ছিল। সামাজিক নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন বিপ্লবাত্মক সমাজ ও ধর্মের আন্দোলন তরঙ্গায়িত হইল তাহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতম অস্ত্র লইয়া তিনি দাঁড়াইতে চাহিলেন। আধুনিকতার সবকিছুই আর মেকি ও ফাঁকি ছিল না। সেজন্য আধুনিকতার প্রতি তাঁহার নির্মম ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্রূপ দেখিয়া সর্বত্র তাঁহার উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয় না, বরং তাঁহার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা সম্বন্ধেই বিশ্বাস জন্মায়। যেমন বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া কবি লিখিলেন—

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তার রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের কূলতরী,
অকূলেতে কূল পেলে না।

কূলের তরী থাকলে কূলে,
কূলের ভাবনা আর থাকে না।
সে যে অকূল সাগর, দারুণ ডাগর,
কালাপানি বড় লোণা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল,
তখনি গিয়েছে জানা।
এর দফরা খেয়ে নফরা যত,
ক'রে বসে কি একখানা॥

নবশিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত নারীদের সম্বন্ধে কবি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বোধ হয় আধুনিক নারীদের কেহই বরদাস্ত করিতে পারিবেন না। কবির মত আগে সকল মেয়েই খুব ভালো ছিল, এখন সকল মেয়েই কেবলি মন্দ, যথা—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এবি শিখে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচ ধোরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥

অবশ্য জায়গায় জায়গায় কবির কটু ও কঠোর মন্তব্য যে ভণ্ড বিকৃত ও অধঃপতিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন

সন্দেহ নাই। বিকৃত মনোভাবাপন্ন আধুনিক যুবকদের নিন্দা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

যত কালের যুবো যেন স্বুবো
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরুপুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
দুসী ধ'রে ওঠেন তবে।
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, জো বাঙালী, ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হ'য়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসে চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।

ঠোঁটকাটাব স্বভাব অঙ্কন করিতে যাইয়া কবি যে বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট উপভোগ হইয়াছে—

গোডিম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গোঁফ।
তখন করেছি আমি পিতৃ পিণ্ড লোপ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্যা তারে রেঁধে দিয়া পদসেবা করে॥
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাবা।
গো টু হেল ওল্ড ফক্স্‌ ড্যাম ড্যাম হাবা॥
আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পায় কম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা, কিসে আমি কম?

ভীরু, দুর্বল, ও কৃত্রিম জাতীয় আন্দোলনকারীদের ব্যঙ্গ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

করি শুভ অভিলাষ।
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস॥
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভূসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

(ঈশ্বরচন্দ্রের হাসিতে করুণ কোমল অংশ কম একথা সত্য, কিন্তু দুই এক স্থানে হাসি ও কৌতুক মাতামাতি করিতে করিতে কবির মন যেন মানুষের দুঃখবেদনার লুক্কায়িত স্তর স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে।) (পৌষপার্বণের আনন্দোৎসবের মধ্যেও কবি বাঙালী ঘরের নির্যাতিত বধূর বেদনা হাসি ও অশ্রুর মিলিত রসে অভিষিক্ত করিলেন।) বধূর রন্ধনে হয়তো সামান্য ত্রুটি হইয়াছে, অমনি শাশুড়ি ও ননদীর তীব্র ভাষায় অনুযোগ আরম্ভ হইল—

হ্যাঁলো বউ কি করলি দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস মায়ের নিকটে
সাতজন্ম ভাত বিনা যদি মরে দুখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল,
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥

(নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে যাইয়া কবির স্বভাবসিদ্ধ হাসির টুকরা এদিক ওদিক কিছু ছড়াইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু অসহায় প্রজাদের প্রতি সুগভীর সমবেদনা সেই হাসিকে ব্যথাভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে)—

হলো নীলকরদের অনররি
মেজেস্টরি ভার।

পড়েছে সব পাতরবক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইক আর।
নীলকরের হন্দ লীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্বনাশ।
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা,
চীলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না॥

(ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় কতরকম হাস্যরস আছে আমরা সেই আলোচনা করিলাম। কিন্তু সবশেষে এই কথা বলিয়াই উপসংহার করিতে হয়, কবির কাছে আমাদের পরিতৃপ্ত কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। তিনি হাসিয়াছেন ও হাসাইয়াছেন, হাসির সহিত জগতের আর কোন সম্পদের তুলনা হয় না—)

হাসির হিল্লোল উঠে অধর—পুষ্করে।
দশন—হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥
হায়রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই।
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই॥

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়েকজন বাঙালী মনীষী জাতীয় জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ভবানীচরণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও ব্যক্তিত্ব লইয়া বিরাজমান ছিলেন। তিনি তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, ধর্মসভা সংস্থাপক, বাংলা গদ্যের একজন আদিতম লেখক এবং বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক ছিলেন। এরূপ বিরাট ও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী হইয়া তিনি পরবর্তী কালে জন-স্মৃতি হইতে কিভাবে নির্বাসিত হইয়া গেলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা আমাদের সমাজজীবনে প্রবেশ করিবার ফলে প্রাচীন ও নবীন আদর্শে যে ঘোরতর সংঘাত বাধিয়াছিল তাহাতে তৎকালীন হিতৈষী সমাজনায়কদের মধ্যে কেহ কেহ নবীন আদর্শের জয়ধ্বজা ধারণ করিলেন আবার কেহ কেহ প্রাচীন আদর্শের সনাতন দণ্ডটি আঁকড়াইয়া রহিলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রথম দলে, কিন্তু রাধাকান্ত দেবের ন্যায় ভবানীচরণ ছিলেন দ্বিতীয় দলে। ভবানীচরণ তখনকার শৈথিল্য ও স্বৈরাচার-দুর্বল সমাজে বিজাতীয় ধর্ম ও বিগর্হিত নীতির প্রবল আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্ম ও শুচি-শুদ্ধ নীতির কল্যাণ রূপটি সযত্নে রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভা ও সম্পাদিত সমাচার-চন্দ্রিকার মধ্য দিয়া তিনি সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন, অন্যদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কণ্টকিত রচনার মধ্য দিয়া দুর্নীতিপরায়ণ কুক্রিয়াসক্ত সমাজকে শোধন ও নির্মল করিতে চাহিলেন। ভবানীচরণ সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী চিন্তাশীল ও কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তিনি আমোদপ্রিয় হাস্য-রসিক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। সেখানে তাঁহার নীতি ও আদর্শ ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সেই নীতি ও আদর্শ হাসির আনন্দদীপ্তির মাঝে প্রচ্ছন্ন, সেখানেও তাঁহার হাতে শাসনের বেত্রটি ধরা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বেত্রটি খুশির রঙে রাঙানো, তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে সুখ আছে।

ভবানীচরণ রুচিমান, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু সেই রুচি ও নীতির অনুরোধে তিনি সাহিত্য-সত্য বিসর্জন দিতে চাহেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাঙালী সমাজের কোন কোন লোক ইংরাজদের অধীনে নানা প্রকার বৃত্তি ও ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া এক নূতন ধনশালী শ্রেণী রূপে সমাজের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। পুরাতন বনেদী জমিদারশ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করিয়া তাহারাই অকস্মাৎ ভুঁইফোঁড় হঠাৎ-বড়লোক হইয়া সমাজের মধ্যে জাঁকিয়া বসিল, 'নববাবুবিলাসে' ইহাদের এরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—

'এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাঁড়ামি ও রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিংবা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।'

এই সব ধনাঢ্য লোকেদের শুধু কেবল ধন-ঐশ্বর্যই ছিল, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা, সুনীতি ও সদাদর্শের কোন বালাই ছিল না। সেজন্য এদের প্রভাবে তখন সমাজের গতি নিম্ন ও বিকৃত পথেই চালিত হইয়াছিল। ইহাদের পুত্র ও পোষ্যগণই বিনা ক্লেশে অপরিমিত ধনসম্পদ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রশ্রয় পাইয়া বিলাস ব্যসনকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য করিয়া সমাজের মধ্যে বাবু আখ্যা লাভ করিল। ইহাদের নিষ্কর্মা নীতিহীন জীবন একটা গ্লানিকর ব্যাধির মত সমাজদেহকে দূষিত ও দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সব বাবুদের খোসামুদে মোসাহেব, ইয়ার, দালাল ইত্যাদি লোক নানা নীচ পরামর্শ ও কলুষিত আচরণের দ্বারা সমাজের মধ্যে অন্যায় ও পাপের গতি অবারিত করিয়া দিয়াছিল। প্রাচীন সমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ তখন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন সমাজের উন্নত বলিষ্ঠ আদর্শ তখনও স্থাপিত হয় নাই। অসৎ ও অসঙ্গত উপায়ে ধন উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের নির্মল আলোক বুদ্ধির পরিশীলিত দীপ্তি ও চিন্তার ঋজু-প্রসন্ন মুক্তি তখনও আসে নাই। সেই সময়ে শুধু যে পুরুষদের মধ্যেই এই ব্যাপক দুর্নীতি ও দুরাচার সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে।

অন্তঃপুরের মেয়েরাও গোপনে তাহাদের অবদমিত ইচ্ছা ও লালসার অবাধ প্রশ্রয় দিয়া চলিত। তাহাদিগকে সম্ভোগের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া সর্বনাশের পথে লইয়া যাইবার জন্য দূতী ও কুটনীর অভাবও সমাজে ছিল না। ভিতর ও বাহিরের এই সর্বাঙ্গীন রুচিহীন নীতিভ্রষ্টতার সমাজচিত্রই ভবানীচরণ নির্বিকার বাস্তববোধ ও অকপট আন্তরিকতার সহিত অঙ্কন করিলেন। তিনি যে বাবুসমাজের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন তাহা লইয়াই পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। গল্পকাহিনীকে পদ্য হইতে গদ্যের মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া ভবানীচরণ যে নূতন সাহিত্যরীতি প্রবর্তন করিলেন তাহাই পরে সার্থক উপন্যাসের জন্মদান করিয়াছিল।[১] অবশ্য ভবানীচরণের সাহিত্যে পূর্বতন পদ্যরীতি যে একেবারেই বর্জিত হইয়াছিল তাহা নহে। 'দূতীবিলাস' তো সম্পূর্ণ পদ্যছন্দেই লিখিত, 'নববিবি-বিলাস' এমন কি 'নববাবু-বিলাসে'রও স্থানে স্থানে পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দ রহিয়াছে। শুধু কেবল ছন্দের দিক দিয়া নহে, অলঙ্কার ও বাক্যপ্রয়োগের দিক দিয়াও তাঁহার রচনায় পদ্যরীতির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভবানীচরণের 'নববাবু-বিলাস' দূতীবিলাস ও 'নববিবি-বিলাস' এই তিনখানি গ্রন্থেই পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুনির্দিষ্ট গল্পকাহিনী রহিয়াছে। 'কলিকাতা কমলালয়ে' 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ন্যায় বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। ভবানীচরণের কাহিনীমূলক গ্রন্থগুলিতে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলিয়া কাহিনীর সরস ভঙ্গী ও জটিল গ্রন্থনের দিকে লেখক দৃষ্টি দেন নাই। সমাজের এক একটি বাস্তব অংশ এবং কোন কোন টাইপ চরিত্র লেখকের ঝলকিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আলোকে আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভবানীচরণের সাহিত্যে যে রঙ্গরসের উপাদান রহিয়াছে তাহা বাক্য ও ঘটনার আধারে নিহিত নাই, তাহা চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় সর্বপ্রথম পৌরাণিক কাহিনী-বহির্ভূত বিচিত্র বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে রসসৃষ্টি করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইল। অবশ্য সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুজনচরিত্র তিনি বেশি অঙ্কন

১। প্রকৃত প্রস্তাবে নববাবুবিলাসই যে বাংলা ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।' নববাবুবিলাসের ভূমিকা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী)

করেন নাই। যাহা উদ্ভট, অসঙ্গত, বিদ্‌ঘুটে ও বিসদৃশ তাহাতেই তিনি একবার হুলের খোঁচা আর একবার মধুর প্রলেপ দিয়াছেন। সেজন্যই কুটনী নাপতিনী, মূর্খ ওস্তাদ, খোসামুদে ইয়ার, ভণ্ড দালাল, প্রাচীন লোচ্চা ও বৃদ্ধা বেশ্যা চরিত্র লইয়াই তাঁহার কারবার।

ভবানীচরণের হাস্যরস ব্যঙ্গমিশ্রিত একথা সত্য, কিন্তু সর্বত্রই যে তিনি ব্যঙ্গের কশাটি উদ্যত করিয়া রহিয়াছেন তাহা নহে। 'দূতীবিলাসে' ব্যঙ্গের খোঁচা একেবারে নাই বলিলেই হয়, লেখকের আমোদপ্রিয় ও রসসম্ভোগী মনই সেখানে পরিস্ফুট, রুচি ও নীতির সমস্তপ্রকার শাসনই সেখানে একেবারে শিথিল। ঐ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বরূপচন্দ্র মল্লিক নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুরোধে লেখক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে এক নব আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেন। সেই গ্রন্থে নব দূতীদের বিচিত্র লীলাই তিনি বর্ণনা করেন। এই দূতীগণ অনঙ্গমঞ্জরী নামক এক কুলকামিনীর সহিত শ্রীদেব নামক এক রসিক নাগরের কিভাবে মিলন ঘটাইয়া দিল তাহাই 'দূতীবিলাসে' বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীদেব কিরূপ বিভিন্ন উপায়ে বিচিত্র ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীর সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহাই অত্যন্ত রসাল ভাবে গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। দৈহিক কামবিলাসের বর্ণনায় এই গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দরকে'ও হার মানাইয়াছে। প্রত্যেকটি মিলনের বর্ণনায় লেখক এরূপ সুচতুর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং স্থূল বিষয়কে এরূপ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও সুরসাল অলঙ্কার জালে আবৃত করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার কৌতুকবিলাসী বিদগ্ধ মনের চমৎকার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। গুরুতর নীতিবিগর্হিত ঘটনার বর্ণনা দিতে যাইয়াও লেখকের যেন বিন্দুমাত্র নৈতিক দ্বিধা নাই। গ্রন্থের পরিণতিতেও পাপপুণ্যের জয়-পরাজয় দেখাইবার কোন বিশেষ আগ্রহ তাঁহার নাই। অবশ্য বিষয়-বিরক্ত ধর্মজীবনের দিকে শেষ পর্যন্ত নায়কের মন ঝুঁকিয়াছে সত্য, কিন্তু লেখকের মতের কোন গোঁড়ামি গ্রন্থমধ্যে ধরা পড়ে নাই। 'নববাবু-বিলাস,' 'নববিবি-বিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়ে' লেখকের বিদ্রূপধর্মিতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু এই বিদ্রূপ নির্মম ও ক্ষমাহীন নহে, ইহার দাহ হাসির বাষ্পকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলে নাই। সংস্কার ও শোধন লেখকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু একথা তিনি ভুলিয়া যান নাই যে, তিনি মাষ্টার নহেন, শাসানো থেকে রসানোর দিকেই অধিক নজর দেওয়া তাঁহার ধর্ম।

চরিত্র-চিত্রণে লেখক যে অভিনব মৌলিকতা এবং অদ্ভুত উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিতে হয়। মাঝে মাঝে আবার তুচ্ছ ও হেয় বিষয় পদ্যছন্দে বিবৃত করিয়া অথবা নানা গুরুগম্ভীর গুণ ও মহিমা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কৌতুকরসের প্রাবল্য আনিয়াছেন। নববাবুর লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিলেন,

'মনিয়া বুলবুল আখড়াইগান, খোষ পোষাকী, যশমী দান, আড়িঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' আবার নববিবির বিভিন্ন স্তর উল্লেখ করিতে যাইয়া বলিলেন—

অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী সর্বশেষে
সর্বনাশে সারং ভবতি টুক্‌কনী॥

'দূতীবিলাসে' আবার দূতীদের কিরূপ প্রশস্তি রচনা করা হইয়াছে তাহা একটু শুনুন।

'দূতীর শরণে শোক, ভুলে যায় পুত্র শোক, কোন দুঃখ নাহি লাগে তার॥ সবে বলে দূতী তুমি, আসিয়া এ কর্মভূমি, কতরূপ ধর বহুরূপা॥ শুনিয়াছি লোকমুখে, পঞ্চরূপে থাক সুখে, তবগুণে কুরূপা সুরূপা॥ কত শত ছল ধর, কামিনীর কুল হর, কে বুঝিতে পারে তব মায়া। ভবানীচরণ ভনে, তোমার সাধক জনে, নিজগুণে দেহপদছায়া॥'[১]

কবি যখন লুচ্চদের বৃত্তান্ত দিয়াছেন তখন তাহাতে তাঁহার নীতি ও উপদেশের উদ্দেশ্য মোটেই পরিস্ফুট নাই, তখন পরিহাসপ্রিয়, রঙ্গরসিক মনটিই তিনি মেলিয়া ধরিয়াছেন। সেই বৃত্তান্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

লোকে যারে বলে লুচ্চ সে কেবল জানিবা কুচ্ছ,
লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই।
মারে মণ্ড: আদা ছেনা, সদা থাকে বাবু আনা
সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই॥
মাতা পিতা দাদা ভাই, কাহার তোয়াক্কা নাই,
দুঃখী নাহি হয় কার দুখে
কেহ যদি কটু বলে, সে কথা না গায়ে তোলে,
সর্বদা সরল কথা মুখে॥

॥ নববাবুবিলাস। পৃঃ ২৫ ॥

১। ॥ দূতীবিলাস—কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে চতুর্থবার মুদ্রিত। ১২৫৩, ৪ চৈত্র॥

বৃদ্ধা বেশ্যাদের বর্ণনা দিতে যাইয়া লেখক এরূপ সম্মানবাচক ও সমাসবদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ হইয়া উঠিয়াছে। যথা—

তৎপরে পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসা গলিতযৌবনা ভগ্নদশনা রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড়নিতম্বিনী বারাঙ্গনাপ্রধানা বকনাপেয়ারি কোঁকড়া পেয়ারী দামড়াগোপী কানঝাড়া রাধামণি ছাড়ুখাগি মণি জয়াবিবি প্রভৃতি আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরি সঙ্গে লইয়া খলিপা সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন ॥

॥ নববাবুবিলাস। পৃঃ ৩৩ ॥

বিচিত্র ব্যক্তি ও বস্তুর বর্ণনা একই সঙ্গে যদি আতিশয্যপূর্ণ ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় তবে তাহা হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠে। এই আতিশয্যজনিত হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা লেখকের রচনার অনেক স্থলেই দেখা যায়। নিমন্ত্রিত বিবিদের আহার ও বিহারের বর্ণনা 'নববিবিবিলাস' হইতে কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

কেহ কহে কালিয়া কাবাব, কেহ বলে লালসরাব, কেহ বলে আচ্ছা বেরাণ্ডী, কেহ বলে ফাইন ব্রাণ্ডি, কেহ বলে এখনি পোলাও, কেহ বলে তবল বাজাও, কেহ বলে বহুত মজা, কেহ বলে খেমটা বাজা, কেহ বলে মোহন গাঁজা, কেহ বলে ফের লেগে যা, কেহ বলে সরস চরস, কেহ বলে আঙ্গুরকা রস ॥

॥ নববিবিবিলাস (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস)। পৃঃ ৬২ ॥

লোকচরিত্র সম্বন্ধে, লেখকের অভিজ্ঞতা যেমন ব্যাপক, উহাদের বর্ণনা-ক্ষমতা তেমনি নিখুঁত ও রঙ্গরসাত্মক। দূতীবিলাসের বিভিন্ন দূতীর বর্ণনায় অথবা 'নববিবিবিলাসে'র বিচিত্র ওস্তাদদের আকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রণে লেখকের সামাজিক চরিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কুশলতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় লেখকের কোন নৈতিক উদ্দেশ্য নাই, কোন ঘটনার পরিণতিদানেও যেন আগ্রহ নাই, কেবল রঙ্গরসের আসরে কয়েকজন উদ্ভট ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্র আনিয়া তাহাদের লইয়া হাসিঠাট্টা করাই যেন তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। নববিবির ওস্তাদদের বর্ণনা করিবার সময় লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে কাহিনীর গতি শিথিল হইয়া গিয়াছে। তিনি বেশ রহিয়া সহিয়া, মজাইয়া রসাইয়া একটির পর একটি অদ্ভুত ওস্তাদকে আনিয়া

অনর্গলিত কৌতুকের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম ওস্তাদের বর্ণনা একটু উদ্ধৃত হইতেছে। ওস্তাদটি বাঙাল এবং তাহার নাম রামমাণিক্য। জানিনা দীনবন্ধু মিত্র এই চরিত্রটি হইতেই তাহার রামমাণিক্য চরিত্রের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কিনা। ভবানীচরণের বর্ণনা শুনুন—

'ওস্তাদমধ্যে এক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার; প্রেতের ন্যায় সকল প্রকার উপরে গণ্ডগোল, মধ্যে জলবিকার, পায়ে গোদ, অতি চমৎকারী ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান। তাহাকে বিবির মাতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার নাম কি এবং তোমার বাড়ি কোথায়? ওস্তাদ কহিলেন, আজ্ঞা আমার নাম রামমাণিক্য, আমার গো বাড়ী ডাহার ইছলাপুর, আমার বাসা জোড়াবাগানে। বিবির মাতা ওস্তাদজীর বাক্যের মাধুর্য শুনিয়া অধৈর্য হইয়া কহিলেন, তুমি কি ২ প্রকার গাওনা জান। ওস্তাদ উত্তর করিলেন, আজ্ঞা হক্‌কুলরকম গাওনা হিকচি, রামায়ণ গাইবারে পারি, ঢফের গীত গাইবার পারি ও কবি গাইবার পারি ও নেড়ীর গানও গাইবার পারি এয়োগো হুনক্যান।'

॥ নববিবিবিলাস। পৃঃ ২৭ ॥

নির্বাচিত গায়কের স্বভাব বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা এবং রসাল বাক্যের ফুলঝুরি একটু নিদর্শন দেওয়া হইতেছে—

'হাপকাষ্ট গায়কবেটা, অতি ঠেঁটা, বাক্যে জেঠা, কর্মে খোঁটা, বুদ্ধি মোটা, টিকি কাটা, গোফ ছাঁটা, কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাতড়া চাটা, সর্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপেয়পানে মূর্তিমন্ত এক অধর্ম, নীচ কর্ম তাহার স্বধর্ম, চুরি জুয়াচুরি পরদারী ভাঁড়ামী ঠকামী বদনামী কোটনামীতে অদ্বিতীয়, কিন্তু আপন বিষয় ভোলে না, তত্ত্বকথা ছাড়ে না।'

এই বর্ণনার মধ্যে লেখকের অসহিষ্ণু উষ্মা হয়তো একটু রহিয়াছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে মনে হয়, লেখক যেন তাহার অনিঃশেষ তূণ হইতে অবিরাম কথার বাণ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন, সেই বাণসমূহের চমক ও ঝঙ্কার দিয়া আমাদের চোখ ও কানে তাক ও তালা লাগাইয়াই যেন তাঁহার তৃপ্তি।

অযোগ্যতা, ভণ্ডামি, প্রতারণা ইত্যাদির প্রতি ভবানীচরণ অতিশয় বিরক্ত ছিলেন, সেজন্য সুযোগ পাইলেই তিনি বিদ্রূপের খোঁচায় বিদ্ধ করিয়া ইহাদের স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করিয়া ধরিয়াছেন। কত বোট আপিসের মাঝি এলেমদার মন্ত্রী হইয়া বসে, কত মুরগীর ডিম সরবরাহকারী

ওস্তাদ সাজিয়া গান শিখাইতে আসে সে সব লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। 'কলিকাতা কমলালয়ে' কলিকাতার অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান ও লোকচরিত্রের মিথ্যাচার ও কপটতাই তাঁহার বক্রদৃষ্টির সূক্ষ্ম খোঁচায় বিদ্ধ হইয়াছে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে বই সাজানো থাকে, কেউ সেগুলি পড়ে না, নাড়ে না। পরম যত্নে সেগুলি তোলা থাকে। বইয়ের আদরের মধ্যে বিদ্যার এই অনাদর দেখিয়া লেখকের বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে—'বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম ২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদগর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ভাল আমি কারণ জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ করেন না।'

প্যারীচাঁদ মিত্র

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ করিবার ফলে যে উন্নতরুচি ও উদারদৃষ্টি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল প্যারীচাঁদ সেই সম্প্রদায়ভুক্ত একজন অশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তখনকার উচ্চশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলগণ যে অসংযম ও অনাচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল তিনি তাহা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সমাজের গতিপ্রকৃতি বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে সমাজের পরিবর্তন হইতেছিল, অশিক্ষিত বাবুসম্প্রদায়ের পর সুশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছিল, কিন্তু সমাজের প্রকৃত নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবের প্রসার হয় নাই। প্যারীচাঁদ তাহার শিক্ষিত মন এবং বিশুদ্ধ, আদর্শবাদী অন্তর লইয়া সমাজের নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি উন্মার্গগামী বাবু সম্প্রদায়ের বিকৃতি ও কুক্রিয়া দেখাইয়া উহাদের সংশোধনের পথ দেখাইয়াছিলেন। অন্যদিকে আবার অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির বীভৎস পরিণাম দেখাইয়া সমাজকে এই দুষ্ট ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, কপট ধর্মাচরণ ইত্যাদি যেমন নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, তেমনি আবার উন্নত তত্ত্বচিন্তা ও অকপট ভাগবত-সাধনার দিকে শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ কয়েকখানি বই লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রধানত 'আলালের ঘরের দুলালে'র জন্য। বইখানি লঘু কথ্য ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদাদান এবং বাস্তব কাহিনীমূলক উপন্যাসের রসধারা প্রবর্তন এই দুই দিক দিয়াই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। (অবশ্য ঠিক সত্যকথা বলিতে গেলে বিষয়বস্তু ও উপন্যাসরীতি এই দুই দিক দিয়াই প্যারীচাঁদ তাঁহার পূর্ববর্তী পথিকৃৎ ভবানীচরণের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।) 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' এই পুস্তিকাখানি মদ্যাসক্তি ও সামাজিক রক্ষণশীলতার দোষ ও অন্যায় দেখাইয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

প্যারীচাঁদের বইতে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ ও সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনা রহিয়াছে এবং কাহিনীর একটি জটিল ও কৌতূহলোদ্দীপক গতির দিকেও তাঁহার লক্ষ্য আছে, কিন্তু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি ও কাহিনীবর্ণন নহে, সমাজতত্ত্ব-উদ্ঘাটন ও নীতিশিক্ষাদানই তাঁহার লক্ষ্য। সেজন্য তাঁহার চরিত্র, বিশেষত আদর্শ ও উন্নত চরিত্র যেমন আড়ষ্ট হইয়াছে, তেমনি অহেতুক ও অত্যধিক নীতিকথার চাপে ঘটনার স্বাধীন ও সাবলীল গতিও অনেকস্থানে ব্যাহত হইয়াছে। ('আলালের ঘরের দুলাল' মূলতঃ হাল্কা হাস্যরসাত্মক পুস্তক, কিন্তু লেখকের তাত্ত্বিকতা ও উদ্দেশ্যময়তা অনেক স্থলেই কৃত্রিম গুরুত্ব ও ছদ্ম গাম্ভীর্যের দ্বারা মূল রসের শৈথিল্য ও হানি ঘটাইয়াছে। সমাজশোধন ও নীতিশিক্ষাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য, সেজন্য তাঁহার হাস্যরস অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। হাসির ছলে আঘাত এবং আনন্দরসের সহিত শিক্ষার কষ মিশাইয়া দেওয়াই ব্যঙ্গকার লেখকের উদ্দেশ্য।) লেখকের ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে প্রধানত চরিত্রের দোষ ও অসঙ্গতিবর্ণনায়। তিনি সরস মন্তব্য, শ্লেষাত্মক উক্তি, বক্র কটাক্ষ এবং রসাল চিত্রণ-কৌশলের দ্বারা হাস্য উদ্রেক করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নীতি-বিশুদ্ধ, তত্ত্ব-গম্ভীর সত্তা সেই হাস্যে যোগ দেয় নাই। তাঁহার লেখা পড়িয়া আমরা হাসি বটে, কিন্তু আমাদের হাসির মধ্যে লেখককে পাই না বলিয়া সেই হাসি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, গুরুমহাশয়ের গম্ভীর আনন দেখিয়া চঞ্চল শিশুর প্রগল্‌ভ হাসি ঠিক যেমনভাবে লুকাইয়া যায়। লেখকের রুচি ও নীতিবোধের প্রাবল্যের জন্য তিনি যাহাদের চরিত্র ব্যঙ্গের আঘাতে শাসন করিতে চাহিয়াছেন তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতার চিত্র সার্থকভাবে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। (পঙ্কের মলিনতা দেখাইতে গেলে পঙ্কের মধ্যে নামিতে হয়, ভবানীচরণ নিজে নীতিনিষ্ঠ ও শুদ্ধচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই পঙ্কের মধ্যে নামিতে দ্বিধা করেন নাই বলিয়া তাঁহার চিত্র এত বাস্তব ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্যারীচাঁদ পঙ্ক হইতে দূরে থাকিয়া অঙ্গুলী নির্দেশে সেই পঙ্কের মলিনতা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন; সেজন্য তাঁহার নীতি বচন শুনিয়া আমরা শিক্ষা পাইলাম, কিন্তু তাঁহার শিল্পরূপ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম না। তাঁহার ব্যঙ্গের পাত্র আংশিক, অপূর্ণ ও অগভীর এবং তাঁহার রসও ক্ষীণ, মিশ্রিত ও ক্ষণস্থায়ী।)

'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যে সমাজের বিভিন্ন ধরণের চরিত্র লেখকের কশা দ্বারা শাসিত হইয়াছে। কৃপণ, অনুদার, অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা ধনী

ব্যক্তি, উন্মার্গগামী, বিকৃতমতি, কুক্রিয়াসক্ত ধনী সন্তান, অর্থলোলুপ, স্বার্থপর মাস্টার, ধূর্ত, ফন্দিবাজ দালাল ইত্যাদি অনেক চরিত্রই 'আলালে' আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু প্যারীচাঁদের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র ঠকচাচা।[১] ঠকচাচার কথাবার্তা, চালচলন, ফন্দি ও মতলব এরূপ বিশদ ও বিশিষ্টভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে যে, চরিত্রটির প্রতি সতত আমাদের ঘৃণা ও ধিক্কার উৎসারিত হইলেও তাহার প্রতি আমাদের কৌতূহলী,রসমগ্ন চিত্ত সর্বদা আসক্ত হইয়া থাকে। তাহার অদ্ভুত উর্দু ও বাংলা মিশ্রিত ভাষা আমাদের কৌতুক উদ্রেক করে, তাহার গূঢ় স্বার্থপর নীচতার সহিত বাহ্যপরোপকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষী রূপের বৈপরীত্য দেখিয়া আমরা ঘৃণামিশ্রিত আমোদ অনুভব করি এবং তাহার পুনঃ পুনঃ নিগ্রহের মধ্যে তাহার আত্মম্ভরি বাক্যসমূহ কিভাবে বার বার অসার ও ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা মজা বোধ করি। ঠকচাচাকে প্রথম যেখানে দেখিলাম সেখান হইতে তাহার বর্ণনা কিছুটা উদ্ধৃত হইতেছে—

'তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন, আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে রমজান ইদ সোবেরাত আমার করা সার্থক—বোধ হয় পীরের কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদরৎ আরও বাড়িয়া যাইবে। এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া উজু করিতেছিলেন, বাবুরাম বাবুর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া নির্জনে সকল সংবাদ শুনিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন—ডর কি বাবু এমন কতশত মকদ্দমা মুই উড়াইয়া দিয়াছি—এবা কোন ছার।'

যেমন ঠকচাচা তেমনি ঠকচাচী। দুঃখের বিষয় লেখক ঠকচাচীর চরিত্র বিশদভাবে অঙ্কন করেন নাই। যদি করিতেন তবে আমরা ঠকচাচার মতই আর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র পাইতাম। এই চাচা ও চাচীর কথোপকথনের একটি কৌতুকময় দৃশ্য লেখক আঁকিয়াছেন, সেখান হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত হইল—

যেমন দেবা, তেমনি দেবী ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুইজনেই রাজযোটক। স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে, স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে।

১ ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠকচাচা, পুরানো সাহিত্যের ভাঁড়ুদত্তের পাশে তাহার স্থান সাহিত্যসৃষ্টির জনবিরল অমরাবতীতে।' বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—সুকুমার সেন, পৃঃ ১৪৩

—ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হররোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হরঘড়ী বল যে, হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়? মোর দেল বড় চায় যে, জরি জর পিনে দশজন ভাল ভাল রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখিনা। ......।' ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি যে কোশেশ করি, তা' কি বলব, মোর কেতনা ফিকির—কেতনা ফন্দি—কেতনা প্যাচ—কেতনা শেস্ত, তা' জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয়, আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জলদি এসবে।'

ঠকচাচা যতই মন্দ লোক হউক না কেন, সে সকলের কাছে শাস্তিও কম পায় নাই। তাহার অন্তিম শাস্তি তো প্রায় করুণরসের পর্যায়েই গিয়াছে, তাহা ছাড়াও অন্যত্র একাধিকবার সে অত্যন্ত নির্দয় শাস্তি পাইয়াছে। মতিলালের বিবাহে এবং মতিলালের পিতা বাবুরামের দ্বিতীয় বিবাহে অন্যান্য বরযাত্রীর সহিত যে লাঞ্ছনা সে সহ্য করিয়াছে তাহাতে তো তাহার প্রতি রীতিমত অনুকম্পাই জাগ্রত হয়। মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করা যাক। ঐ অংশটি আবার পদ্যছন্দে লিখিত। পদ্যছন্দে লিখিবার প্রলোভন প্যারীচাঁদ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন নাই—

ঠকচাচা মোর বাঁচা বলে তাড়াতাড়ি।
মুসলমান বেইমান আছে মুড়িঝুড়ি।
যায় সরে ধীরে ধীরে মুখে কাপড় মোড়া।
সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া।
রেওতাট করে সাট ধরে তাকে পড়ে।
চড় চড় চড় চড় দাড়ি টেনে ছেঁড়ে।
সেকের পো ওহো ওহো বলে তোবা তোবা।
জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা॥
খুব করি হাত ধরি মোকে দাও ছেড়ে।
ভালা বুরা নেহি জান্তা জেতে মুই নেড়ে।

গ্রন্থের নায়ক মতিলালের চরিত্র আদ্যন্ত সুপরিস্ফুট নহে। গোড়ার দিকে তাহার চপলতা ও দুরন্তপনার বিশদ ও বাস্তব বর্ণনা রহিয়াছে বটে, কিন্তু

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য যেসব কুক্রিয়ায় সে আসক্ত হইয়াছিল সেগুলির কোন পর্যাপ্ত পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও নিত্যনূতন দুরন্তপনার যে কয়েকটি চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন সেগুলি যথেষ্ট সরস ও কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। পাঠশালার গুরুমহাশয়, পূজারী ব্রাহ্মণ ও পারসীশিক্ষক মুন্সী তাহাকে পড়াইতে আসিয়া যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তাঁহারা কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। পূজারী ব্রাহ্মণকে মতিলাল বলিয়াছিল,—

'অরে বামুন, তুই যদি হ, য, ব, র, ল, শিখাইতে আমার নিকট আর আসবি, ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায় শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বলে ছাদের উপর হ'তে তোর মাথায় এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাড়িব যে, তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে।'

মুন্সী সাহেব ছাত্রের নিকট হইতে আরও গুরুতর দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। লেখকের বর্ণনাই উদ্ধৃত হইল—

'এক দিবস মুন্সী সাহেব হেঁট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন, ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিক দিয়া একখান জ্বলন্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল, তৎক্ষণাৎ দাউ দাউ করিয়া দাড়ি জ্বলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল, 'কেমন রে বেটা শোরখেকো নেড়ে, আর আমাকে পড়াবি।' মুন্সী সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে ঝাড়িতে ও তোবা তোবা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন এবং জ্বালার চোটে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এস মাফিক বেতমিজ আওর বদজাৎ লেড়কা কবি দেখা নাই এস কামসে মুল্কমে চাস কর্ণা আচ্ছি হ্যায়, এস জেগে আনা বি হারাম হ্যায়—তোবা—তোবা—তোবা!!!'

লেখক এইসব স্থানে হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া শুধু কেবল উচ্ছন্ন বালকের ক্রিয়াকলাপের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করিতে চাহেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে অনুপযুক্ত, কর্তব্যবিমুখ, অর্থলোভী শিক্ষকদের চরিত্রের দোষত্রুটির প্রতিও একটু প্রচ্ছন্ন নিন্দার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অপদার্থ ও নীচমতি শিক্ষকের চরিত্র লইয়া লেখক অন্যস্থানেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন। বক্রেশ্বর এরূপ একজন শিক্ষক। তাহার চরিত্রের পরিচয় দিয়া লেখক বলিয়াছেন—

'স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতেন কিনা সন্দেহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোর

অপমান মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ডিক্সনারি দেখ্। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকাটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাষ্টারীগিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম শব্দ কাটিয়া কার্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞেস করিলে বলিতেন, তোমরা বড বে-আদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও।'

প্যারীচাঁদের হাস্যরস শিক্ষামূলক এবং উদ্দেশ্যচালিত ইহা আমরা উপরে আলোচনা করিলাম, কিন্তু স্থানে স্থানে নিছক আমোদের জন্য অবিমিশ্র হাস্যকৌতুকও তিনি উদ্রেক করিয়াছেন। মাঝে মাঝে নীতি ও তত্ত্ব আলোচনা বাদ দিয়া তিনি সাধারণ চলমান জীবনের দিকে সহজ মন লইয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তখন মেয়েদের কথাবার্তায় কত বাস্তব সংসারের কৌতুক ও কারুণ্যমিশ্রিত উপাদান সন্ধান করিয়া পান—'কেহ বলিতেছে, পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে, আমার শাশুড়ী মাগী বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে, দিদি, আমার আর বাঁচতে সাধ নাই—বৌ ছুঁড়ী আমাকে দুপা দিয়া থেতলায়—বেটা কিছু বলে না; ছোঁড়াকে গুণ ক'রে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে, আহা, এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম, দিবারাত্রি আমার বুকে ব'সে ভাত রাঁধে—কেহ বলে, আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি, এই বেলা তার বিয়েটি দিয়ে নি।'

প্যারীচাঁদ অনেক মন্দ চরিত্র লইয়াই ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু একটি ভাল চরিত্র লইয়াও তিনি কৌতুক করিয়াছেন, এই কৌতুকের উদ্দেশ্য কোন আঘাত কিংবা শিক্ষা দেওয়া নহে, ইহার উদ্দেশ্য ভাল চরিত্রকে ভালবাসিয়াও তাহার সহিত একটু হাসিঠাট্টা করা। এই চরিত্রটি হইল বেচারাম। বেচারাম যত সংসারের কুকাজ ও কলুষিত মানুষের পরিচয় পাইতেছেন ততই সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাহার বিরক্তিসূচক একটি কথা বার বার প্রকাশিত হইয়া আমাদের কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে, তাহা হইল, 'দুঁর দুঁর!' এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, 'দুঁর দুঁর! এমন আমিও করিতে চাই না—মকদ্দমা জিতও চাই না—দুঁর দুঁর।' মাঝে মাঝে লেখক কৌতুকরস উদ্রেক করিবার জন্য কোন কোন চরিত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর আতিশয্যপূর্ণ কৌতুককর গুণ ও লক্ষণ আরোপ করিয়াছেন। যেমন বাবুরাম বাবুর বর্ণনা—

'বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা নাকে তিলক কস্তাপেড়ে ধুতি পরা, ফুলপুকুরে

জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত, কোঁচানো চাদরখানি কাঁধে এক গাল পান—'

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নামক পুস্তিকার আগড়ভম সেনের বর্ণনাও দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যথা—

'আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড পেটটি একটি ঢাকাই জালা—নাকটি চেপটা—চোখ দুটি মৃদঙ্গের তালা—হাঁটি বোড়া সাপের মত—দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবেয় তবকে চিক চিক করিতেছে—গোঁপ জোড়াটী খ্যাঙ্গড়ার মুড়া ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটা বেলা পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহার করেন, পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী সজনী ২ বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্তা জঙ্গলা গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন।'

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাংলার নবজাগ্রত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া এক অনশ্বর কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। হৃদয় ও মস্তিস্কের এরূপ বিস্ময়কর মিলন উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতির মাল্যভূষিত অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেও খুব কমই দেখা গিয়াছে এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যায়। নাট্যকার, নাট্যমঞ্চ-সংস্থাপক, কথ্যভাষার প্রবর্তক, হাস্যরসাত্মক নক্সারচয়িতা এবং মহাভারতের অনুবাদক ইত্যাদি বিচিত্র রূপে ও রসে তিনি যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তেমনি উদারচেতা, গুণগ্রাহী, পরোপকারী ও মহানুভব সমাজনেতা রূপে তিনি লোকসমাজে প্রীতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, অথচ এই অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিপুলতায় বাংলা সাহিত্যকে চিরস্মরণীর সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।[১]

কালীপ্রসন্নের প্রতিভার একদিকে মহাভারত অনুবাদ অন্যদিকে 'হুতোম প্যাচার নক্সা' রচনা। একই উৎস হইতে এরূপ বিপরীত সৃষ্টিধারার উদ্ভব কি ভাবে হইল? এ যেন একই আকাশে জলভারানত মেঘের গাম্ভীর্য ও চলচঞ্চল বিদ্যুতের চপলতা। কালীপ্রসন্নের এক হাতে শঙ্খ আর এক হাতে পিচকারী। একদিকে মহিমান্বিত অতীতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, অন্যদিকে বিকৃত বর্তমানের প্রতি ব্যঙ্গের রঙ নিক্ষেপ। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় লেখক নিজে বলিয়াছেন, 'জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্সা প্রসব করেছে, সেই কলমই ভারতবর্ষের নীতি-প্রধান ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রধান উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোকর্ষ বিধায়ক, মুমুক্ষু, সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য অবলম্বন স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।'

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালার সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—
কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে—এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্মজীবনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে এই কীর্তিমান পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালীজাতি লাভবান হইত।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' বাংলা সাহিত্যের একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের সমসাময়িক সমালোচকদের অনেকেই কিন্তু এই বইখানিকে অশ্লীল বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং 'আলালের ঘরের দুলালে'র সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে নিকৃষ্টতর প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ সমালোচনা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র যথার্থ মূল্যায়ন আজও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হয় নাই। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, কথ্যভাষার বিশুদ্ধ আদর্শ, সমাজ-বাস্তবতা, চিত্রণ-নৈপুণ্য, অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গি ও হাস্যরসসৃষ্টি সব দিক দিয়াই হুতোম আলাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ। অবশ্য এ কথা সত্য হুতোম ও আলাল এক শ্রেণীর গ্রন্থ নহে, কিন্তু তৎকালীন সমাজচিত্র অঙ্কন ও কথ্যভাষার সাহিত্য-মর্যাদা দেওয়া উভয় গ্রন্থেরই লক্ষ্য। সে দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, কালীপ্রসন্ন সমাজের যথাযথ রূপ যেরূপ নির্বিকার সূক্ষ্ম-সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন প্যারীচাঁদ তাঁহার রুচিবাগীশ ও নীতিভারাক্রান্ত দৃষ্টি দিয়া সেরূপভাবে দেখিতে পারেন নাই। ভাষার দিক দিয়াও প্যারীচাঁদের ভাষাকে মিশ্র ও গুরুচণ্ডালী বলিতে হয়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ভাষা একশ বছরের পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক কথ্য ভাষা বলিয়াই মনে হয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র একস্থানে লেখক নিজের রচনার পরিচয় দিয়াছেন—

> হে সজ্জন, স্বভাবের সুনির্মল পটে,
> রহস্যরসের রঙ্গে,
> চিত্রিনু চরিত—দেবী সরস্বতীর বরে।

স্বভাবের পটে তিনি যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন সেগুলি বাস্তবরসে ও চিত্রণ-নৈপুণ্যে অবিস্মরণীয় উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' খুলিলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার রূপটি আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত ও সমন্বয়ে তখন এই শহরে যে মিশ্রিত জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল তাহাতে বাবু ও ইয়ংবেঙ্গলী সম্প্রদায় পাশাপাশি অবস্থিত ছিল, পাদরী ও ব্রাহ্মের সহিত বৈষ্ণব ও গোস্বামী আসিয়া জুটিয়াছিল, যাত্রা, কবি ও হাফ আখড়াইয়ের রস পরিবেষিত হইতেছিল, গাঁজা, আফিং ও সিদ্ধির সহিত শেরি-শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কির নেশা

মিশিয়াছিল, চড়ক, রথ ও দুর্গোৎসবের সহিত বড়দিনের উৎসব আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই বিচিত্র সমাজরূপ ও জীবনগতি হুতোমের লেখনীতে রূপায়িত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে কাহিনী অবলম্বন করিয়া আবার কোথাও বা হঠাৎ-দেখা কোন চঞ্চল জীবনরূপের খণ্ডিত অংশের সন্ধানী হইয়া লেখক কলিকাতার রাস্তায় ও বাড়িতে, গলিতে গলিতে, ময়দানে ও গঙ্গাবক্ষে, প্রকাশ্য সভায় ও গোপন আসরে, আলোকিত উৎসব ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শুঁড়িখানায় নির্বিকার চিত্তে যাতায়াত করিয়াছেন। চোখের পটে তিনি যে আলোকচিত্র তুলিয়া লইয়াছেন, লেখনীর প্রক্ষেপক যন্ত্রে তাহাই তিনি নক্সার পটে চলচ্চিত্ররূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। এই চলচ্চিত্র দেখিবার সময় যেমন হর্ষ ও কৌতুকে আমরা উৎফুল্ল হই, তেমনি লজ্জা ও ধিক্কার-বোধে সঙ্কুচিত হই। কিন্তু লেখকের উক্তি স্মরণ রাখিতে হইবে, তিনি যে চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহা 'রহস্যরসের রঙ্গে', তত্ত্বকথা শুনাইবার, নীতিশিক্ষা দিবার ও সমাজ শোধন করিবার কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহার নক্সায় ব্যক্ত হয় নাই। সেই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্ন ও পরিচ্ছিন্ন, তাহা কোথাও দানা বাঁধিয়া চোখ পাকাইয়া নিজেকে জাহির করিতে চাহে নাই। তিনি জীবনকে গভীরভাবে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু জীবনকে হাল্কাভাবে দেখাইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার বলিবার কথাটি রঙ্গব্যঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার বলিবার রীতিটি হাস্যকৌতুকে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। হুতোম প্যাঁচার চক্ষু যেমন তীক্ষ্ণ, চঞ্চু তেমনি শাণিত। সেই শাণিত চঞ্চুর আঘাত হইতে কেহও পরিত্রাণ পায় নাই। জমিদার ও অবতার, ব্রাহ্ম ও পাদরী, কচি বুড়া ও ধেড়ে খোকা, মাতাল ও মোসাহেব, বাবু ও বাবাজী, বুকিং ক্লার্ক ও স্টেশন মাষ্টার কেহই একটু-আধটু আঁচড়-কামড় হইতে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত হাস্যরসিক তাঁহার হাসির আঘাত দিয়া শুধু কেবল পরকেই বিব্রত করেন না, নিজেকেও বিবৃত করেন। হুতোমও নিজেকে বাদ দেন নাই। তাঁহার কথাতেই ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে, 'সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা আমার বলা বাহুল্য। তবে কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্সার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।' লেখক যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা ছিল

কলুষিত, দুর্নীতিবিলাসী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত। সেই সমাজের অবিকৃত রূপ দেখাইতে যাইয়া তাঁহাকেও সেই সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য হইতে হইয়াছিল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া তিনি নির্মল স্থান হইতে উহার দিকে অবলোকন করেন নাই, সমাজের পঙ্কস্তরে নামিয়া পঙ্কলিপ্ত সমাজকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যদি তিনি উহ.র পঙ্কটুকু মুছিয়া ফেলিয়া উহার ধৌত ও পরিষ্কৃত রূপটিই দেখাইতেন তাহা হইলে তৎকালীন অনেক সমালোচকই সন্তুষ্ট হইতেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে সমাজের একটি কৃত্রিম ও অপ্রকৃত রূপই আমরা পাইতাম।

হুতোমের হাসি ব্যঙ্গরসাশ্রিত তাহা সত্য, কিন্তু এই ব্যঙ্গরসে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রস বেশি, ইহাতে হুলের খোঁচায় যত জ্বালা হয়, মধুর প্রলেপে তাহা অপেক্ষা আরাম লাগে অনেক বেশি। হুতোমের আসল উদ্দেশ্য একটু মজা করা, সকলে মিলিয়া একটু আমোদ করা এবং সেই উদ্দেশ্যেই কাহাকেও একটু চিমটি কাটিয়া কাহাকেও একটু খোঁচা দিয়া এবং কাহাকেও একটু চড়চাপড় মারিয়া চলিয়াছেন। হুতোমের প্রধান লক্ষ্য অবশ্য চরিত্রচিত্রণ তাহা সত্য, কিন্তু মাঝে মাঝে নানা গল্প অবতারণা করিয়া, কখনও বা নিজস্ব টীকা-টিপ্পনী জুড়িয়া দিয়া লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। লঘু ও কথ্য ভাষা ব্যবহারের জন্য এবং এই সব গল্প ও টীকাটিপ্পনীর ফলে 'হুতোমী নক্সা'য় এমন একটি মজলিসী ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটি পরিহাসোজ্জ্বল অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। লেখকের ভাষা-শক্তি ও বর্ণন-ক্ষমতা অসাধারণ। মাঝে মাঝে এমন রসাত্মক শব্দ এবং ইংরেজি ও বাংলামিশ্রিত কৌতুকের বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, ঘটনা ও দৃশ্যবর্ণনায় স্থানে স্থানে এমন তির্যক গতি ও আকস্মিক মোচড় আনিয়াছেন যে তাহা বিশেষভাবে হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। কখনও কখনও সামান্য বস্তু বুঝাইবার জন্য পর পর এমন দূর-ব্যবহিত উপমানের প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহাও যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ হইয়াছে।

লেখকের বর্ণনা-চাতুর্য, সরস টীকাটিপ্পনী ও কৌতুকচিত্রের সমারোহের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পুরাতন বর্ষের বিদায় এবং নববর্ষের আগমন কত লেখকের মনে কত উচ্চ ও মহৎ ভাবের উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু হুতোমের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে এই বিষয়টি কিভাবে ধরা পড়িয়াছে তাহা দেখুন—

'ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চ'লে গেলেন, বর্তমান

বৎসর স্কুলমাষ্টারের মত গম্ভীরভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড় বয়সে ছেলে হ'লে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।'

হাফ আখড়াই শুনিবার জন্য ছেলে বুড়া সকলেই মাতিয়া উঠিয়া বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদ কিভাবে নিজেদের সজ্জিত তাহার বর্ণনা দিতে যাইয়া লেখক তুচ্ছ অচেতন বস্তুকে কিভাবে মানবীয় উপমানের দ্বারা কৌতুকরসাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

'কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল, বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কোত্তে লাগলো। কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর এক রাত্রের ভাড়া আট আনা চ'ড়ে উঠলো। চার পুরুষে পাঁচ পুরুষে ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা, অকর্মণ্য হ'য়ে, নবাবী আমলে সিন্ধুক আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হ'য়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুন্সি ও চাবির শিকলী, হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ ক'রে ঘড়ীর চেনের অফিসিয়েটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।'

হুতোমের ঠাট্টা একবার আরম্ভ হইলে সহজে থামে না, জ্যা-মুক্ত বাণের মত একটির পর একটি বাক্য কৌতুকের এক একটি ফুলকির মত চারিদিকে ছুটিয়া চলে। লেখক যেন নির্দয়ভাবে হাসির পর হাসির বোমা ছুঁড়িয়া মারেন। দোহারের গানের বর্ণনা হইতেছে—

'এদিকে দোহারেরা নতুন স্বরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন রন কত্তে লাগলো। ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চোমকে উঠলো—কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো,—বোধ হ'তে লাগলো যেন, হাড়ীরে গোটাকতক শূয়ার ঠেঙিয়ে মাচ্চে। গাওনার নতুন স্বর শুনে সকলেই বড় খুসী হ'য়ে সাবাস! বাহবা!' ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগলেন—দোহারেরা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগলো, সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ধোপারা অঘোর ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো।'

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র কৌতুকরসের প্রাবল্য দেখা যায় কয়েকটি হুতোমী

গান ও অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক কয়েকটি গল্পের মধ্যে। গানগুলি প্রধানত মাতাল ইয়ার ও ভবঘুরের মুখেই শুনা গিয়াছে। কিন্তু ঐগুলির ভাষা ও ভাব এত উদ্ভট ও স্থূল অসঙ্গতিপূর্ণ যে উহারা প্রবল কৌতুকের আঘাতে শ্রোতার চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। একটি গান শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, গানটি রথের দিন একটি মাতালের মুখে শুনা গিয়াছে—

কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চূড়োর উপর মুখ পোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘটা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চলছে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাকা, বেহদ্দ ছেনালী॥

নক্সা আঁকিতে যাইয়া হুতোম মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে এমন সব গল্পের অবতারণা করিয়াছেন যেগুলির কৌতুকময়তা সশব্দ অট্টহাসিরই উদ্রেক করে। গল্প উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই, কিন্তু তবুও একটি গল্পের কিয়দংশ প্রবল কৌতুকহাস্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না—

'সমরভেকেশনে কলেজ বন্ধ হয়েচে, স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাছ ধ'রে বেড়াচ্ছেন। পণ্ডিতেরা দেশে দেশে গিয়ে চাষবাস আরম্ভ করেছেন, (ইংরেজী ইস্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়) ধনুবাবু সন্ধ্যার পর দুইচার স্কুল ফ্রেণ্ড নিয়ে, পড়বার ঘরে বসে আছেন, এমত সময় কলেজের প্যারীবাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারীবাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চারিদিকে দোর জানলা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি ক'রে দুধ খাবার মত ক'রে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগলো, ক্রমে ব্র্যাণ্ডি অন্তর্ধান হ'লেন। এদিকে বাবুদের মেজাজ গরম হ'য়ে উঠলো, দোর জানালা খুলে দেওয়া হলো, চেঁচিয়ে হাসি ও গররা চলতে লাগলো। শেষে শেরীও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরেজী ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো; ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে ধনুবাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে মালা ফিরুচ্ছিলেন;

ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চিৎকার ও রৈ রৈ শব্দ শুনে গিয়ে দেখলেন, বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হ'য়ে উঠলেন ও ধনুবাবুকে যাচ্চেতাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন। কর্তার গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠলেন ও ধনুও তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে একটা ঘুষো মারলেন। কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষতঃ ঘুষোটি ইয়ং বেঙ্গালি (বাঁদরের বাড়া); ঘুষি খেয়ে কর্তা একেবারে ঘুরে পড়লেন, বাড়ীর অন্য পরিবারেরা হাঁ হাঁ করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ীর ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো, মার কাছে গিয়ে বল্লেন, 'মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক, তোমার ভয় কি ? ও ওল্ড ফুল মরে যাক না কেন, ওকে আমরা চাইনে ; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, নূতন বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে ব'সে হেলথ ড্রিঙ্ক করবো, ওল্ড ফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফরমড বাবা চাই।'

হুতোম যখন কোন চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তখন এত সূক্ষ্মভাবে সরস বিশ্লেষণ করিয়াছেন, একটির পর একটি রঙের রেখা এত দ্রুত টানিয়া চলিয়াছেন যে আমাদের কল্পনাশক্তিও যেন সেই তুলিকার গতির সহিত সমতা রাখিতে পারে না। বর্ণনার এই নিখুঁত বাস্তবতা ও বিকৃত লক্ষণগুলির বিশদ উল্লেখের ফলেই চরিত্র-চিত্রগুলি এত কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলের জমিদার কলিকাতায় আসিয়া মদ ও ইয়ার লইয়া কিভাবে মাতিয়া উঠিতেন তাহারই একটু বর্ণনা দেওয়া হইতেছে—

'মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের ও তেলের কুপোর মত শরীর দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিনফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোছা গলায়—মৈমনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার, সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন। বয়েস ষাট পেরিয়েছে, অথচ রামকে আঁম, ও দাদা কাকাকে দাঁদা ও কাঁকা বলেন।'

হুতোমের বিদ্রূপ সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা, অনুদারতা ও স্বার্থপরতার প্রতি বর্ষিত হইয়াছিল। নিজে তিনি উদার ও প্রগতিবাদী ও পরোপকারী ছিলেন। সেজন্য মানুষের মধ্যে ঐ সব গুণের অভাব দেখিলে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া

উঠিতেন, এবং তাঁহার প্রতিবাদ বিদ্রূপের কশা হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিত। রেলওয়ে নামক নক্সাটির মধ্যে রেলওয়ে কর্মচারীদের অসাধুতা ও কর্তব্যহীনতা লইয়া তিনি যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারা যায় না। স্টেশন মাষ্টারের চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—

'যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলকেতার চ'নেবাজারে 'কম স্যার। গুড সপ স্যার। টেক টেক টেক নটেক নটেক একবার ো সী।' ব'লে সমস্ত দিন চীৎকার ক'রে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও সোলজারদের গাড়ী ভাড়া ক'রে মদের দোকান 'এম্পটিহাউস' সাতপুকুর দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাতড়ান, কাঁচপোকার আরসুলা ধরবার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে 'দি এস্টেশনমাষ্টার' হ'য়ে পড়েছেন, যাঁদের সঙ্গে একবারমাত্র এই মহাপুরুষরা কনট্যাকটে এসেছেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্মচারীদের নামে সর্বদাই কম্‌প্লেন করে থাকেন।'

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা সমাজমন বিশেষভাবে বিপ্লুত হইয়াছিল। এই সব ধর্ম নিজ নিজ মহিমা প্রচার করা সত্ত্বেও উহাদের আশ্রিত লোকেদের মধ্যে নানা সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি ও পরধর্মবিদ্বেষের ভাবও দেখা যাইত। কালীপ্রসন্ন সকলধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও সকল ধর্মাবলম্বী লোকেদের মন্দ দিকটিও ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেককে গোঁড়া ও কূপমণ্ডূক হইয়া, সর্বপ্রকার উন্নতি ও উদারতার প্রতি বিরূপ বিমুখ হইয়া উঠিতেন তাহার পরিচয় অনেক স্থানে দিয়াছেন। হঠাৎ অবতার নামক নক্সাটির মধ্যে পদ্মলোচনের বর্ণনা দিতে যাইয়া হুতোম লিখিয়াছেন—

'তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন, ইংরেজী পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরেজী পড়ান নি, অথচ বিদ্যাসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে উঠে নাই, বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই, এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়ার দলেই পড়ে।'

বৈষ্ণব গোস্বামীরাও হুতোমের হাতে কম নাস্তানাবুদ হন নাই। বৈষ্ণবদের পূর্বে প্রচলিত গুরুপ্রসাদি প্রথা তিনি যেরূপ সরস গল্পের মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ

করিয়াছেন এবং প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাবাজীদ্বয়ের যেরূপ ব্যঙ্গাত্মক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিবার নহে। গোস্বামীর চিত্র অঙ্কন করিয়া তিনি একস্থানে একটু কঠিন মন্তব্যসহ লিখিয়াছেন—

'হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটি রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনে। গোঁসাই বললেই একটা বিকটাকার ধুম্বলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহারাদি চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই।' নিজের ধর্মের লোকেদের প্রতি নির্মম হইয়াছিলেন বলিয়া অপর ধর্মের লোকেদের তিনি ·নিষ্কৃতি ·দেন নাই। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর কৃত্রিমতা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্মবোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসব হবে আবার ফি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মড়া কান্না কাঁদতে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদ ভাষা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পারেন না? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্ছে।'

পাদরীদের ধর্মপ্রচার ও দেশী খৃষ্টানদের দুর্দশা লইয়া ব্যঙ্গ করিতেও হুতোম ছাড়েন নাই, যথা—'কোথাও পাদরী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাছে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—স্ববর্দ্ধন চৌকীদারের মত পোষাক পেনটুলেন, ট্যাং-ট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী স্বরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত ·কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধহয় যেন পুতুল-নাচের নকীব কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালার ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপমার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।'

(কালীপ্রসন্নের হাস্যরসের দৃষ্টান্ত যতই দেওয়া যাক না কেন, দৃষ্টান্ত আর শেষ হয় না। তাঁহার প্রতিটি কথার বর্ণে, ভঙ্গিতে ও উচ্চারণে হাসির খেলা আর খুশির মেলা। হুতোমী নক্সায় সমাজের চিত্র ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু রকমারি কৌতুকের রঙীন তন্তু দিয়াই সেই নক্সা বয়ন করা হইয়াছে।)

দীনবন্ধু মিত্র

(বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক কে এ সম্বন্ধে চট করিয়া একটা মন্তব্য করা সহজ নহে; কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রকে এ সম্মান দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তাঁহার ন্যায় হাসাইতে কেহ পারেন নাই এবং শরৎচন্দ্র ব্যতীত সম্ভবত তাঁহার ন্যায় কাঁদাইতেও আর কেহ পারেন নাই। অন্যান্য লেখকদের সহিত হাসা যায়, আমোদ করা যায়, কিন্তু দীনবন্ধুর সহিত হাসিয়া আমোদ করিয়াই তৃপ্তি পাওয়া যায় না, তাঁহাকে ভালোবাসিয়া জীবনের সুখদুঃখের পথে নিত্যকার সঙ্গী করিতে হয়।) দীনবন্ধু শিল্পী হিসাবে, না মানুষ হিসাবে বড় ছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু শিল্পী সত্তা ও মানুষী সত্তার এরূপ নিবিড়তম সমন্বয় বোধ হয় আর কোথাও দেখি নাই। তিনি তাঁহার জীবনকে শিল্পের মধ্যে অবারিত করিয়া দিয়াছেন এবং শিল্পকে জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন।

দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক ছিলেন, উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বও ছিল, কিন্তু তবুও উভয়ের জীবনবোধ ও রসদৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ও বাঙালীকে অকৃত্রিম অনুরাগের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা সত্য, কিন্তু সেই অনুরাগ অনেকখানি ভাবাশ্রয়ী, বুদ্ধিগত ও আদর্শচারী। তিনি সমাজ ও জাতিকে তাঁহার উন্নত, বলিষ্ঠ ও আদর্শায়িত স্তরেই উন্নয়ন করিতেই চাহিয়াছিলেন। এক মার্জিত নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষাভিমানী রুচি ও প্রখর নীতিবোধ দিয়া তিনি মানুষকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু দীনবন্ধুর দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দীনবন্ধুও বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু শিক্ষা ও মর্যাদা তাঁহাকে ভাবচারী, আদর্শবিলাসী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী করিয়া তুলিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার আদর্শকল্পিত জগতে সমাজ ও জাতিকে তুলিতে চাহেন নাই, নিজেই তাঁহার শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যের সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া সমাজ ও জাতির সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিদেশী রোমান্সের আলোতে দেশী জীবনকে সুন্দর ও সরস করিয়া তুলিলেন না, সেই জীবনের স্থূল ও বিকৃত দিক যথাযথরূপে উদ্‌ঘাটন করিলেন। নীলকর অত্যাচার, সপত্নী

ও ঘরজামাইয়ের সমস্যা, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ-প্রথা ইত্যাদির মধ্য দিয়া বাংলার খাঁটি গ্রাম্য-জীবনের যে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহার সহিত দীনবন্ধু যেমন তাঁহার প্রাণসত্তাটি মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তেমনি শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত নবজাত নাগরিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খল ও উৎকেন্দ্রিক রূপের সহিতও তিনি পরিপূর্ণ ভাবে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কল্পনার রঙে জীবনকে সুন্দর করিতে চাহেন নাই, নীতি ও আদর্শের পালিশ দিয়া তাহাকে মার্জিত করিতে চাহেন নাই, ভাষা, ভঙ্গি, রস ও সৌন্দর্যের উৎসগুলি পুরাপুরি মুক্ত করিয়া দিয়া জীবনকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন।[১] হাস্যরসিক জীবনকে দেখেন তীক্ষ্ণ ও তির্যকভাবে, তাঁহার শুধু ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকিলেই চলে না, জীবনের বাস্তব-রূপ সম্বন্ধে একটি সদা-জাগ্রত ও অন্তর-সন্ধানী সূক্ষ্ম-সচেতন দৃষ্টি থাকা দরকার। রাজকার্য উপলক্ষে দীনবন্ধু দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর পর্যন্ত ঘুরিয়া হরেক রকমের মানুষ সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সত্য, কিন্তু শুধু কেবল এই অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি অদ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক চরিত্রসমূহ এত উজ্জ্বলভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার শাণিত-প্রখর বাস্তব-দৃষ্টি আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। করুণ ও গম্ভীর রসে জীবনের গভীর ও গুহাহিত দিকই কল্পনা ও অনুভূতির রঙে ফুটাইয়া তোলা লেখকের লক্ষ্য, কিন্তু হাস্যরসে জীবনের প্রকাশমান ও দৃষ্টিগোচর দিকটি কিছু অতিরঞ্জনের রঙ মিশাইয়া উদ্ঘাটন করাই হাস্যরসিকের উদ্দেশ্য। সেজন্য বাস্তব সংসারে ঠিক যেমনটি ঘটে তাহা অবিকল চিত্রিত করিতে না পারিলে হাস্যরসের প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস মুক্তি পাইবে না। সেজন্য যাহাদের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া তিনি হাসিবেন তাহাদের ভাষার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাগ্‌ভঙ্গি, প্রতিটি ছড়া ও প্রবাদ জানিতে হইবে; তাহাদের সংস্কার ও প্রবণতা, আচার ও আচরণের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, তাহাদের চোখের ইসারা, মুখের বঙ্কিম ভঙ্গি, হাত ও পায়ের চঞ্চল গতি সব কিছুই অতি প্রখর দৃষ্টি লইয়া দেখিতে

১। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় এ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—দীনবন্ধু নিজে প্রাণে মনে খাঁটি বাঙালী ছিলেন; তাই দোষভরা, গুণভরা, হাসিভরা, কান্নাভরা বাঙালীকে তিনি বুঝিতেন, এবং তাহার জীবনের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ছিল আন্তরিক। খাঁটি বাঙালী অর্থে এই বুঝায়, বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার মানস-প্রকৃতি ছিল বাঙালীর নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গঠিত; প্রকাশভঙ্গী ছিল বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতি; ভাষাটিও ছিল বাঙালীর দৈনন্দিন সহজ ভাষা, যাহা কেবল অভিজাত সমাজে নয়, মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে অন্তঃপুরেও বোধগম্য।' দীনবন্ধু মিত্র— পৃঃ ৩৪-৩৫

হইবে। ভবী, কামিনী ও হাবার মার রসিকতার ভাষা ও ভঙ্গি কিরূপ, বগী ও বিন্দী এই দুই সতীন ঝগড়ার সময় পরস্পরের প্রতি কি কি বিশেষণ প্রয়োগ করে, মূর্খ ও সরল কৃষকরা মিলিত হইয়া তাহাদের জীবনের কোন্ কোন্ আনন্দ ও বেদনা-মিশ্রিত বিষয় লইয়া আলোচনা করে, নেশাখোর ঘরজামাইগুলি কিভাবে তাহাদের অলস সময় নির্বোধ আমোদে অতিবাহিত করে, সুশিক্ষিত মাতালের মাতলামি এবং অশিক্ষিত নেশাখোরের ইতরামির মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা কতখানি, পূর্ববঙ্গীয় রামমাণিক্যের ভাষায় শব্দ ও বাগ্ধারার বৈশিষ্ট্য এমন কি উৎকলবাসী ভৃত্য রয়ুয়ার উৎকলী ভাষার বিশুদ্ধ রূপটি পর্যন্ত তিনি অভ্রান্ত ও অবিকৃত দৃষ্টি দিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। (তাঁহার দৃষ্টির এই সুতীক্ষ্ণ ও বিশ্বস্ত বাস্তবনিষ্ঠার জন্য তাঁহার বর্ণিত জগৎ এত অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক মনে হয় এবং সেই জগতের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি-জনিত হাস্যরস এত সাবলীল ও কলোচ্ছল হইয়া আমাদের অনর্গল আনন্দরসে মাতাইয়া রাখে।)

অনেক হাস্যরসিক লেখকদের জীবন-বৃত্তান্তে জানা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের লেখায় হাস্যরস সৃষ্টি করিলেও ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময় বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু দীনবন্ধু এরূপ ছিলেন না, তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি হাসির অফুরন্ত ফোয়ারা রূপেই বিদ্যমান ছিলেন। যে কেহই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছে, তিনি বন্ধুই হউন কিংবা পাঠকই হউন, তাহাকে শুষ্ক গাত্রে ও শুষ্ক মনে যাইবার উপায় নাই, দীনবন্ধু তাহার বসন ভিজাইয়া মন রসাইয়া দিয়াছেন।[১] বিজ্ঞ, গম্ভীর ও রাসভারী লোক তাঁহার পরম শত্রু। হাসির পিচকারী হইতে অনর্গল রঙ ছড়াইয়া দীনবন্ধু তাহাকে দলে টানিয়া আনিবেন। অথচ তাঁহার উপরে রাগ করাও চলে না, কারণ রঙ যে তিনিও মাখিয়াছেন এবং তিনি তো দূরে থাকিয়া হাসান না, তিনি যে সকলের মাঝে বসিয়া হাসেন। মার্জিত রুচির ঈষৎ-স্ফুরিত হাসির ক্ষণিক চমকে তাঁহার তৃপ্তি নাই, দুর্দমনীয় হাসির সশব্দ উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গেই তাঁহার আনন্দ। এজন্য তাঁহার হাসির উপর

১। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর রসবোধ আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কিনা বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবন স্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস সাগরে ভাসিত। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। —দীনবন্ধু জীবনী

কোন শুল্ক তিনি বসান নাই, কোন বিচার বিবেচনা দ্বারা সেই হাসিকে সংযত করেন নাই, কোন চিহ্নিত সীমার মধ্যে তাহা অবরুদ্ধ করিতে চাহেন নাই। এজন্য অনেক নীতিবিলাসী ও রুচিবাগীশ পণ্ডিত ও সমালোচক তাঁহার হাসিকে অশ্লীল ও নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যে-সব শিক্ষাভিমানী, শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক জীবনের মুক্ত ও বলিষ্ঠ রূপকে কৃত্রিম রুচি ও নীতির দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে চাহেন, নিজেদের অবদমিত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির লোল পঙ্কিল রূপের প্রতিকৃতি সর্বত্র কল্পনা করিয়া শিহরিত হন, এক নকল, কৃত্রিম ও মূল-বিচ্ছিন্ন জীবনের শূন্যগর্ভ ও ভাবাশ্রিত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন তাঁহারা অবশ্য দীনবন্ধুর হাসিতে অশ্লীল অশুচিতা আবিষ্কার করিয়া ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত হইবেন;[১] কিন্তু বিশ্বসত্যের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, জীবনের যথার্থ রূপ-সন্দর্শনে যাঁহার নির্বিকার আগ্রহ আছে, আনন্দের অনাবিল রসসম্ভোগে যাঁহার অনুরাগ আছে, তিনিই দীনবন্ধুর হাসিতে অকুণ্ঠভাবে যোগ দিবেন। যেখানে সচেতনভাবে অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্র আমদানী করিয়া নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনাই লেখকের উদ্দেশ্য সেখানেই অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু যেখানে জীবনের বাস্তব রূপ যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয় সেখানে অশ্লীলতা কোথায়? তোরাপ ও রাইচরণের শালীনতাবিরোধী উক্তিগুলি যদি বাদ দেওয়া যাইত, হাবার মা ও পেঁচোর মার রঙ্গরসিকতা যদি অবিকল বর্ণিত না হইত, প্রণয়পাগল জলধরের রসাল উক্তিগুলি যদি না থাকিত, নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের অমার্জিত ভাষার উপর যদি রুচির গিল্টিকরা রঙ শোভা পাইত, মাতাল নিমচাঁদ যদি ভদ্র ও সংযত ভাষায় কথা বলিত তবে আর যাহাই হউক, দীনবন্ধুকে আমরা পাইতাম না। জীবনের শুচি, শুভ্র, ও উন্নত দিক সত্য, আবার জীবনের অশুচি, পঙ্কিল ও পতিত দিকও সত্য। দীনবন্ধু দ্বিতীয় দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। কিন্তু হাসির পাবনী ধারায় সব কিছুই ধৌত করিয়া সকলকেই তিনি এক উদার, ক্ষমাস্নিগ্ধ জগতে স্থান দিয়াছেন।

১। এই সব লোকের বিরূপ সমালোচনার সমুচিত উত্তর ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন—'যাঁহারা বলেন শ্লীলতার চেয়ে অশ্লীলতার দিকেই দীনবন্ধুর ঝোঁক বেশি, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের সমগ্র জীবন দৃষ্টি শ্লীলও নয়, অশ্লীলও নয়,—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে হাসি বেপরোয়া, যেখানে অনুভূতির প্রীতি আছে সেখানে রঙ্গ বেপরোয়া। কালির দাগ নাই বলিয়া মনের কুণ্ঠা নাই, লেখা ও শ্লীলতা-অশ্লীলতার অলঙ্ঘ্য বিধিনিষেধের ঘোমটা টানিয়া বসে না।' ॥ দীনবন্ধু মিত্র—পৃঃ ৭৩ ॥

(জীবনের স্থূল বিপর্যয়, উদ্ভট অসঙ্গতি, কিম্ভূত বিকৃতি ও অন্যায় দুষ্কৃতি যেখানে যাহা দেখিয়াছেন সব কিছু হইতেই দীনবন্ধু হাস্যকর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।) ইহাদের গোপন রূপ অনাবৃত করিয়া, ভ্রান্ত অথবা অহিতকর দিকটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া তিনি ইহাদিগকে হাসির আসরে টানিয়া আনিয়াছেন। চতুর্দিক হইতে উত্থিত প্রবল হাসির তীক্ষ্ণ আঘাতে ইহারা আহত ও বিপর্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের ভ্রান্তি ও অন্যায় দেখিয়া আমরা হাসি, তবুও আমরা ইহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া দূরে সরাইয়াও দিতে পারি না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে কাছেই টানিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। বাস্তব জীবনে যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা ও পরিহার করি, শিল্পীর সীমাহীন সহানুভূতির স্পর্শে তাহারা সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। (ফলস্টাফের মত অসৎ ও মিথ্যাচারী চরিত্রও শিল্পীর অনবদ্য তুলিকা স্পর্শে আমাদের কাছে প্রীতিপদ হইয়া উঠিয়াছে। মলিয়েরের যে সব চরিত্রের অন্যায় ও অপরাধ লইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রতিই আবার বেশী সহানুভূতিশীল ছিলেন। এরূপ সহানুভূতি দীনবন্ধুরও অতিমাত্রায় ছিল বলিয়া তাঁহার চরিত্রগুলির ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়া শুধু কেবল হাসিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতি এক করুণ অনুকম্পাও বোধ করিতে হয়।) বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।' এই পরদুঃখকাতরতার জন্য তিনি ভ্রান্ত, বিকৃত ও অধঃপতিত চরিত্রের মধ্যে শুধু কেবল হাসি উপাদান সংগ্রহ করিতেন না, কান্নার উৎসও সন্ধান করিতেন। নিমচাঁদের বিফলীকৃত জীবনের বেদনা, রাজীবের আশাভঙ্গজনিত ও শাস্তিপীড়িত অবস্থার দুঃখ, বগী ও বিন্দীর মত কলহপটীয়সী রমণীর অনুতাপ, হেমচাঁদের বয়াটে জীবনের গ্লানি, গোপীনাথ ও পদী ময়রানীর মত ঘোর অন্যায়কারী চরিত্রের আত্মধিক্কার তিনি হাসির ফাঁকে ফাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরে কান্নার কালো মেঘ পুঞ্জিত হইয়াছিল, এবং সেই পুঞ্জিত মেঘ হইতে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-বিলাস তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলকে আলোকিত করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে সেই বিদ্যুৎ বিলাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন প্রবল বর্ষণধারায় তাঁহার চোখ ও মুখ সিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; 'নীলদর্পণে' তাঁহার প্রমাণ পাই। কিন্তু অন্যত্র সেই বিদ্যুৎবিলসিত শুভ্রোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের প্রীতিকর রূপ আমাদের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ উদ্রেক করে।

এই যে হাসি ও কান্নার অঙ্গাঙ্গী মিলন, ইহাতেই তো শ্রেষ্ঠ হাস্যরস হিউমারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।[১]

হ্যাজলিটের প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়ে—

'We cannot suppress the smile on the lip ; but the tear should also stand ready to start from the eye.' জগতের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টাগণ—শেক্‌সপীয়র, সারভ্যানিটস, ডিকেন্স প্রভৃতি এই করুণ হাস্যরসই সৃষ্টি করিয়াছেন। দীনবন্ধুও এই করুণ হাস্যরসের ধারা তাঁহার সাহিত্যে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে দৃষ্টিতে জীবনের হাসি ও কান্না এক হইয়া ধরা দেয়, যে দৃষ্টিতে জীবনের পাপ ও পুণ্য পরস্পরের আত্মীয় হইয়া উঠে, সেই উদার ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি তাঁহার ছিল। সংসারে পাপ ও পুণ্য অহরহই ঘটিতেছে; পুণ্যবান হইয়া পাপকে ঘৃণা করা স্বাভাবিক, পাপী হইয়া পুণ্যকে বিদ্রূপ করাও স্বাভাবিক, কিন্তু পুণ্যবান হইয়া পাপকে ক্ষমাশীল স্নেহ দিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া অস্বাভাবিক। অথচ দীনবন্ধু এই অস্বাভাবিক লোক ছিলেন। দীনবন্ধুর পূর্বে হাস্যরসিক লেখকগণ প্রধানত ব্যঙ্গমূলক হাস্যরসই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ সকলেই ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁহারা যাহাদের লইয়া হাসিয়াছেন, তাহাদের শাস্তি দেওয়া, শোধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের সহিত কোন প্রীতি ও অনুভূতির যোগ সেই সব লেখকের ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধুর মধ্যেই সর্বপ্রথম আমরা দেখিলাম যে, যাঁহাদিগকে আঘাত দিয়া আমরা হাসি, তাহাদিগকে ভালোবাসিয়া আবার আমরা কাঁদি। দীনবন্ধুর পরে হাস্যরসের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমরা পাইলাম 'কমলাকান্তের দপ্তরে'।

দীনবন্ধুর হাস্যরস হিউমারধর্মী হইলেও তাহা কখনও উদ্ভট ঘটনাশ্রিত প্রহসনে, কখনও উৎকৃষ্ট রসাত্মক কমেডিতে, কখনও প্রণয়রসাত্মক সামাজিক নাটকে এবং কখনও বা করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে।

১। দীনবন্ধুর হাস্যরস সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন, 'নিছক প্রহসন হইতে বেদনার অশ্রুদীপ্ত হাসি পর্যন্ত হাস্যরসের নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্তি, কথাবার্তায় ভঙ্গীভাবে চরিত্রচিত্রে ঘটনাসংস্থানে সর্বত্র, যে বিচিত্র ও উচ্ছ্বসিত রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথাও নাট্যকারের ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আছে শুধু স্নিগ্ধ রসকল্পনার সহজ ও উদার প্রীতি। চড়চাপড় কানমলা আছে সত্য, কিন্তু তাহার সবটাই রঙ্গ· সবটাই আনন্দ। তথাপি, এই অনাবিল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসিকের চক্ষুও যেন অশ্রুভারাক্রান্ত· হইয়া উঠে। কেবল করুণ রসকে হাস্যরস সমুজ্জ্বল করে নাই, হাস্যরসও করুণরসে স্নিগ্ধ হইয়াছে।

॥ দীনবন্ধু মিত্র। পৃঃ ৬২ ॥

তাঁহার 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কৌতুকরসাত্মক প্রহসন, ঘটনার উদ্ভট জটিলতার মধ্যেই কৌতুকরসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। 'সধবার একাদশী' চরিত্র-প্রধান করুণরসাত্মক কমেডি, 'নবীন তপস্বিনী' ও 'লীলাবতী' প্রণয়মূলক মিলনান্তক নাটক। 'নবীন তপস্বিনী'র মধ্যে জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা মালতীকে লইয়া যে উপকাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যথেষ্ট কৌতুকরসাত্মক হইয়াছে। 'লীলাবতী'র মধ্যে হাস্যরসের প্রবাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, শ্রীনাথ ইত্যাদি কয়েকটি চরিত্র অবলম্বন করিয়াই এই হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। 'নীলদর্পণ' গভীরতম কারুণ্যে নিষিক্ত বিয়োগান্তক নাটক হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার মাঝে মাঝে হাসির ক্ষণিক আলোকছটায় করুণরসের প্রবাহকে সরস করিয়া তুলিয়াছেন। গোপীনাথ, আদুরী ও রায়তদের চরিত্রের মধ্য দিয়া এই হাসির স্ফুরণ হইয়াছে।

দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতুকরসাত্মক হইল 'জামাই বারিক'। এই প্রহসনের কৌতুকরস কোন মাত্রা মানে নাই, কোন বিচারবিবেচনা করে নাই, তাহা নিয়ত প্রবল বেগে বাহিয়া চলিয়াছে। এই প্রহসনের রস উপভোগ করিবার কালে হাসির নির্দয় আক্রমণ হইতে মুহূর্তের জন্যও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এই উদ্দাম উতরোল হাসি আতিশয্যরঞ্জিত জটিল কাহিনীর পাকে পাকে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। একটি ব্যারাকে কতকগুলি জামাইকে পুরিয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা পাশ না পাইলে স্ত্রীদের সহিত দেখা করিতে পারে না, এই কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে উদ্ভট মৌলিকতা রহিয়াছে। আবার অন্যদিকে দুই সতীন কিভাবে স্বামীর দেহটি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে, কিভাবে চোর চুরি করিতে আসিয়া দুই সতীনের হাতে নাস্তানাবুদ হইয়াছে, তাহার বর্ণনাও অতিশয়িত কৌতুকের রঙে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। পরিশেষে দুই স্ত্রী নিগৃহীত স্বামী সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া কিভাবে মিলিত হইয়াছেন তাহার বিবরণও ছদ্ম ভক্তি ও বৈরাগ্যের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্ন কৌতুকরসের ধারাটিকেই মুক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রহসনটির মধ্যে ঘরজামাই ও বহুবিবাহ সমস্যার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে হয়তো নাট্যকার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কাহারও ভ্রান্তির নৈতিক পরিণতি দেখানো তাঁহার ধর্ম নহে। সেজন্য অভয়কুমারের সহিত কামিনীর মিলন ঘটাইয়া এবং পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার দুই পত্নীর পুনর্মিলনের আভাস দিয়া প্রহসনখানি শেষ করিয়াছেন। সাময়িক বিচ্ছেদের

পর এই দুইটি মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া মিলনের সর্বাঙ্গীণ আনন্দময়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র কৌতুকরস প্রধানত সরস ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়াছে। কৃপণ, অনুদার বিয়ে-পাগলা বুড়োকে জব্দ করিবার জন্য গ্রামের বালকেরা বিস্তৃত ষড়যন্ত্র জাল পাতিয়াছিল। ঘটক পাঠাইয়া বিবাহের সম্বন্ধ, বাসরঘরের আয়োজন, বালকদের ক'নে ও নারীর ছদ্মবেশে বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন, বাসরঘরে বর ও ক'নের সুদীর্ঘ প্রণয়সম্ভাষণ এবং সবশেষে সুখস্বপ্নবিভোর রাজীবলোচনের পেঁচার মাকেই ক'নেরূপে আবিষ্কার ইত্যাদির ঘটনার মধ্যে প্রবল কৌতুকরস সঞ্চারিত হইয়াছে।

'নবীন তপস্বিনী'র জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা-মালতীর কাহিনীর মধ্যেও ঘটনার কৌতুকময়তাই প্রাধান্য পাইয়াছে। প্রণয়রসিক জলধরের পরনারী সন্দর্শনে কাব্যময় অনুরাগ, মালতীভ্রমে জগদম্বার প্রতি সুগভীর প্রণয়নিবেদন, রতিকান্তের শয়নঘরে প্রেমের ফাঁদে পা দিতে যাইয়া বিপদের ফাঁদে পতন, মুখোস, চিটেগুড় ও তূলা দিয়া হোঁদল কুঁতকুঁতের রূপ ধারণ এবং অবশেষে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সর্বপ্রকার দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনাভোগের বিবরণ শেক্‌সপীয়ারের প্রহসনের অনুসরণে রচিত হইলেও দীনবন্ধুর কৌতুকতুলিকাস্পর্শে তাহা অতিমাত্রায় কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্রাশ্রিত হাস্যরসের আলোচনায় সর্বপ্রথমেই 'সধবার একাদশী'র অবিস্মরণীয় চরিত্র নিমচাঁদের নাম করিতে হয়। 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন। অবশ্য প্রহসন বলিতে যদি ইংরেজী সাহিত্যের Farce বুঝি, তবে 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন বলা চলে না, কারণ অদ্ভুত ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নিছক কৌতুকরস সৃষ্টি করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। 'সধবার একাদশী'র মধ্যে ঘটনার অবিরাম গতি ও জটিলতা খুব কমই আছে। শুধুমাত্র মোগলবেশধারী অটল-হিজড়ার কুমুদিনী-হরণ-বৃত্তান্তে ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক মৌলিকত্ব রহিয়াছে। বইখানি প্রধানত একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া অদ্বিতীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এবং সে হইল নিমচাঁদ। এই একমুখিতার ফলে ইহা কমেডি অপেক্ষা অধিকতর ট্রাজেডি-ধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। নিমচাঁদ করুণ হাস্যরসের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুধু কেবল করুণ হাস্যরস নহে, তাহার মধ্যে উইট ও হিউমারের সর্বোত্তম সমন্বয় হইয়াছে। সে হাস্যাস্পদ এবং হাস্যস্রষ্টাও বটে। তাহার চরিত্রের বিকৃতি ও অধঃপতন দেখিয়া

আমরা হাসি, আবার সেও তাহার বিদগ্ধ উক্তি ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যের দ্বারা আমাদের হাসাইয়াছে। সে ঘোর মদ্যাসক্ত, অটলবিহারীর অধঃপতনের জন্য সেই দায়ী, অশ্লীল ইয়ারকিতে সে অতিশয় পটু, সুনীতি, সুরুচি মান ও মর্যাদার প্রতি তাহার বিদ্রূপ অতিশয় তীব্র, কিন্তু এসব অন্যায় ও অপরাধ সত্ত্বেও তাহার প্রতি আমরা কখনও ঘৃণার ভাব দেখাইতে পারি না। তাহার হাস্যকর চরিত্রের অন্তরালে যে গভীরতর ট্রাজিক সত্তাটি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাই আমাদের তরল হাসিকে মুহূর্তমধ্যে নিবিড় বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। তাহার মত উচ্চশিক্ষিত, প্রজ্ঞাবান ও বহুদর্শী লোক সমাজের মধ্যে কয়টি দেখা যায় অথচ তাহারই এরূপ শোচনীয় অধঃপতন! সম্মান ও মর্যাদার উচ্চবৃক্ষে কত মর্কট বসিয়া তাহাদের লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছে আর তাহার মত লোক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া প্রহার ও পদাঘাত সহ্য করিতেছে। কিন্তু নিমচাঁদ তাহার অধঃপতন সম্বন্ধে অন্ধ ও নির্বোধ নহে। সে তাহার সূক্ষ্ম, আত্মসচেতন দৃষ্টি দিয়া সর্বনাশের পথে তাহার অনিবার্য অধোমুখী গতি লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে যেন তাহার অনুতপ্ত মন হাহাকার করিয়া উঠে—'হা জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্লে?' ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পুনরায় নিরুপায় স্বীকারোক্তি করে, 'মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই?' তাহার এই যে নিরুপায় দুঃখময় অবস্থা, সচেতন বুদ্ধির সহিত অনমনীয় প্রবৃত্তির এই যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব, ইহারই ফলে তাহার চরিত্র আমাদের সীমাহীন সমবেদনা আকর্ষণ করে। নিমচাঁদ মদ্যাসক্ত বটে, কিন্তু কোন নীচ ও অহিতকর কাজে তাহার কোন লোভ কি সমর্থন নাই। অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে অসৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে সে তাহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে। তথাকথিত নীতি ও ধর্মে তাহার বিশ্বাস নাই। আবার দুর্নীতি ও অধর্মের প্রতিও তাহার অনুরাগ নাই। সে যেন সব কিছু সম্বন্ধেই একটু নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তাহার এই নির্লেপ ও ঔদাসীন্যের ফলেই তাহার প্রতি আমাদের একটি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাব চির জাগরূক থাকে।

'নীলদর্পণে'র গোপীনাথও ঘোর স্বার্থপর ও অপকারী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও হিউমারের মৃদু স্পর্শে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গোপীনাথ অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকিলেও সেই অন্যায় সম্বন্ধে সে যেন সচেতন। স্বীয়

চরিত্রের আত্যন্তিক হেয়তা ও ঘৃণ্যতা লইয়া রসিকতা করিতেও সে ছাড়ে না। উড সাহেবের লাথি খাইয়া সে বলিয়াছে—

'সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়। নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন ক'রে? কি পদাঘাতই করেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌন পরা মাগ!'

তাহার এই আত্মসমালোচনা ও সরস বেদনা-করুণ উক্তিগুলির জন্য তাহার প্রতি আমাদের মনে সহনশীল ক্ষমা ও সমবেদনার ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে।

দীনবন্ধুর কয়েকটি চরিত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঈষৎ স্পর্শ আছে, অবশ্য কোথাও লেখকের অবিমিশ্র ঘৃণা ও নৈতিক শাস্তিবিধানের পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু কেবল ভোঁতারাম ভাট ও ঘটিরাম ডেপুটির প্রতি লেখকের ব্যঙ্গের মধ্যে যেন একটু ক্রুদ্ধ জ্বালার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ভোঁতারাম ভাট দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক।' অবশ্য ভোঁতারামের প্রতি ব্যঙ্গের মূলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা আছে বলিয়া হয়তো সেই ব্যঙ্গের মধ্যে একটু প্রদাহ বেশি পরিমাণে মিশিয়াছে, কিন্তু ভোঁতারামের মত 'রিফিউ' যে অনেকেই লেখে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ঘটিরামের প্রতিও নাট্যকার একটু অসহিষ্ণু বিরক্তি হয়তো প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত মূর্খ ও অপদার্থ লোক হাকিমের আসন দখল করিয়া বসিয়া সেই আসন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি কতখানি অসম্মান করিত তাহা দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। ভ্রান্ত, অপরাধী ও অধঃপতিত লোকের প্রতি দীনবন্ধুর দরদ ও সহানুভূতির সীমা ছিল না, কিন্তু ভণ্ড, অনুদার ও অযোগ্য ব্যক্তিকে মানসম্ভ্রমের উচ্চ আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলে তিনি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইতেন। সেজন্য গোকুল ও নকুলের মত কপট ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি সূক্ষ্ম বিদ্রূপের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। রাজীবলোচন ও জলধরের চারিত্রিক দোষ লইয়াও তিনি একটু বিদ্রূপের খোঁচা দিয়াছেন, কিন্তু সেই বিদ্রূপের জ্বালাও আবার তাঁহার সমবেদনার প্রলেপে স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজীবের প্রহারপ্রাপ্তি ও অন্তিম ব্যর্থতার মধ্যে নিছক হাসি নহে, হাসির সহিত কারুণ্যও একটু মিলিয়াছে। বৃদ্ধের বয়স গোপন করিয়া যুবকের ন্যায় আচরণ করিবার মধ্যে শুধু হাস্যকরত্ব নহে, বৃদ্ধবয়সের চিরন্তন বেদনার সুরও কিছু বাজিয়াছে। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি দেখাইয়া জলধর যত বড় অপরাধই করুক, তাহার প্রতি শাস্তি-

বিধানের পরিমাণও যেন একটু বেশি হইয়াছে। দর্শকের সহিত লেখকও যেন তাহার জন্য একটু সহানুভূতি বোধ করিয়াছেন।

দীনবন্ধু নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্রও কয়েকটি অঙ্কন করিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে অশ্রুসিক্ত সমবেদনার গভীরতর হৃদয়-সংযোগ নাই, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বুদ্ধিদীপ্ত আঘাত নাই, শুধু কেবল চিন্তাভাবনাবর্জিত কৌতুক-হাস্যের উচ্ছল প্রাণমাতানো লীলা রহিয়াছে। ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য, হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ, 'জামাই বারিকে'র জামাইগণ, আদুরী, পেঁচোর মা, হাবার মা, প্রভৃতি এই ধরণের কৌতুকরসাত্মক চরিত্র। ইহারা প্রায় সকলেই সরল, নির্বোধ চরিত্র, ইহাদের বাক্য ও আচরণ অবিরাম কৌতুকের আঘাতে আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়াছে। ভোলাচাঁদের নির্বোধ কথায় বিরক্ত হইয়া নিমচাঁদ যখন তাহাকে বলিয়াছে, 'ফের যদি সার সার করবি, এক বোতলের বাড়ি দিয়ে তোকে কাশী মিত্রের ঘাটে পাঠাব', তখন ভোলাচাঁদ বলিয়াছে—

'ভোলা। নো সার, সান্‌ইনলা সার, ডেড সার, ইয়োর ডটার সার, উইডো সার, ইলেভেন ডেজ ডু সার, হাঙ্গরী সার, দিস সাইড সার, দ্যাট সাইড সার, ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট সার।'

এ-হেন ভোলাচাঁদও আবার বাঙ্গাল রামমাণিক্যকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু রামমাণিক্য খাঁটি বিক্রমপুরবাসী, হাসিয়া অপমান বরদাস্ত করিবার স্বভাব তাহার নহে, সে তাই বলিয়াছে –

'রাম। পুঙ্গির পুৎ কেডা? হিটকাইচেন আর খ্যাপাইবার লাগচেন,—দ্যাশে হইতো, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাডা টানে বাইর করতাম আর অমাবস্যা দেকতেন, হালা গর্বস্রাব, হুয়ার, বল্লুক বৃত।'

রামমাণিক্যের কথায় অজস্র কৌতুককনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার স্ব-দেশ প্রীতি, সরল ও কুপিত স্বভাব, নানা বিষয়ে নানা কৌতূহল ও মন্তব্য অত্যন্ত সরস হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী ব্যাকরণের কয়েকটি গুরুতর অসঙ্গতি সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। 'মর্দাগোর পেরনাউন' ও 'মাইয়াগোর পেরনাউনে' যে কোনই সমরূপতা নাই ইহা সে গবেষণা করিয়া পাইয়াছে। ইংরেজী come শব্দটি সম্বন্ধেও তাহার মন্তব্য যথেষ্ট মৌলিক—

রাম। আর এই হালার পুৎ কোম, এংরাজীর কোমডা যে দিহি দেইচো, সে দিহি লাগচে, কোম্‌ আইবারও অয়, যাইবারও অয়, আমাগোর মাষ্টের

বঙ্গোচন্দ্র বলেন, কোমডা গর্বস্রাব, কোম আহেন ও, যান ও, আর কহন কহন থাহেন।'

মূর্খ, বয়াটে ও নেশাখোর হেমচাঁদ ও নদেরচাঁদ, বিশেষত নদেরচাঁদকে লইয়াও লেখক কম কৌতুকরস সৃষ্টি করেন নাই। কৌতুকরস সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে নদেরচাঁদের বক্তৃতার বেলায়। লীলাবতীকে দেখিতে যাইয়া সে এক অনবদ্য বক্তৃতা দিয়াছে, সেই বক্তৃতার একটু নমুনা দিতেছি—

নদে। প্রিয় বন্ধুগণ—প্রিয় বন্ধুগণ এবং প্রিয় বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ, অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিত পাটালীর নিকটে আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া-হাস্যভাজন।

নদেরচাঁদের বক্তৃতার মত 'জামাই বারিকে'র এক জামাইয়ের রামায়ণ ব্যাখ্যাও অদ্ভুত ও নিতান্তই মৌলিক। বালিরাজার আয়োজিত নৃত্যসভায় আগত খ্যামটাওয়ালী দুইটিকে লইয়া বালির সহিত রাম ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সীতা নামক খ্যামটাওয়ালীকে রামচন্দ্র এবং সূর্পনখা নামক খ্যামটাওয়ালীকে যে লক্ষ্মণ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা অতি অভিনব গবেষণা-প্রসূত, সন্দেহ নাই। আদুরী, হাবার মা ও পেঁচার মা এই তিনটি চরিত্র যথেষ্ট কৌতুকাবহ। আদুরীর সোয়ামী-স্মৃতি তাহার অন্তরে একেবারে জ্বল জ্বল করিতেছে বলিয়া 'যে সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়' তাহার দলে সে কিছুতেই যাইবে না এবং সাহেবের মুখে 'প্যাজির গোন্দো' বলিয়া সে কিছুতেই সেদিকে মাড়াইবে না। আদুরীর টিকাটিপ্পনী ও রঙ্গরসিকতা যথেষ্ট কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছে। হাবার মা ও পেঁচোর মার চেহারা অতি উৎকট, সেই চেহারার বর্ণনাই কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কৌতুকের প্রাবল্য এইখানে যে, উভয়ের এই পিলেচমকানো চেহারা সত্ত্বেও উভয়েই প্রেমরসে একেবারে হাবুডুবু। হাবার মা যেমন ময়রা বুড়োকে লইয়া পাগল, পেঁচোর মাও তেমনি রাজীবকে বিবাহ করিতে উন্মত্ত। রাজীবকে সে এত ভালোবাসে, অথচ রাজীব তাহার প্রতি নিতান্তই উদাসীন, এ দুঃখ রাখার কি জায়গা আছে? রাজীব খুশী হইবে আশা করিয়া বিবাহের আগেই সে রাজীবের পুত্র বলিয়া তাহার প্রিয় শূকর ছানাকে রাজীবের কোলে দিয়াছে। প্রেমের কি মহৎ দৃষ্টান্ত!

দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি তাহাদের কথাবার্তার সহিত এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া আছে সে শুধু কেবল কথার বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ-কৌশল দেখাইয়া

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। বার্গসোঁ বলিয়াছেন, কাহারও কথা শুনিয়া আমরা যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি অথবা আমাদের নিজেদের লইয়াই হাসি তবে তাহার কথা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময় (witty) ।[১] নিমচাঁদ, কিয়দংশে গোপীনাথ এবং লীলাবতী নাটকের শ্রীনাথ চরিত্রের কথায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য, নদেরচাঁদ, রাইয়ত ও জামাইদের কথা কমিক। আদুরী, হাবার মা, পেঁচোর মা ও তোরাপের কথা কিছুটা কমিক এবং কিছুটা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়। উহাদের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের নিদর্শন ফুটিয়াছে সরস বাগ্‌ভঙ্গিতে ও বহুতর ছড়া ও প্রবাদের রসাল প্রয়োগে।

১। A word is said to be comic when it makes us laugh at the person who utters it, and witty when it makes us laugh either at a third party or at ourselves. Laughter, P 104.

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের রস-প্রবাহিণী নির্দিষ্ট গতিপথে নিরুদ্বেল ধারায় অগ্রসর হইতেছিল। জীবনের খণ্ডিত ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া সেই ধারা পঙ্কিল ও স্রোতহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নিগ্ধ ও সঞ্জীবনী আলোকস্পর্শে তাহা কোটালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে স্ফীত ও ক্ষুরধারা হইয়া উঠিল এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে তাহা বিচিত্রবেণী হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। আমাদের সনাতন জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের উপাদান-গুলি বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কুশলী প্রতিভার যাদুদণ্ড-স্পর্শে নব প্রাণরসে অভিষিক্ত করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জীবন ও সাহিত্যের অজ্ঞাতপূর্ব রসের উপাদানগুলিও সযত্নে সংগ্রহ করিয়া বাংলা সাহিত্যে নবতর রস ও রহস্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার রচনাতেই সর্বপ্রথম আমরা দেশের সংকীর্ণ ও গতানুগতিক জীবনকে এক উদার আলোকদীপ্ত, অনন্ত সম্ভাবনাময় এবং অফুরন্ত বৈচিত্র্যশালী মহাজীবনরূপে দেখিলাম। আনন্দ ও বেদনার বিমিশ্র উপাদানে যে জীবন গঠিত, কমেডির প্রসন্ন আলোকপাতে যাহা মধুর এবং ট্র্যাজেডির কঠিন আঘাতে যাহা গভীর তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে রূপায়িত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে হাসি ও কান্না ছিল পরস্পরবিরোধী, পরস্পরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহারা স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই এই দুই ধারাকে মিলিত করিয়া দিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, আমাদের হাসির আলোক দেখিতে দেখিতে কান্নার কালো মেঘে লুপ্ত হইয়া যায়, আবার কান্নার নিবিড় কালো মেঘ ও হাসির চপল বাতাসে নিমেষের মধ্যে দূরে সরিয়া যায়। এই মেঘও আলোকের অবিরাম লুকোচুরি খেলাই তাঁহার সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই, 'তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও

রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।')

বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবত গম্ভীর, স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও আত্মসচেতন ছিলেন। দাম্ভিক বলিয়া তাঁহার বেশ একটু অপবাদও ছিল, তিনি সদালাপী, সামাজিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন বটে, কিন্তু সবত্র ও সর্ব সময়েই তিনি তাঁহার চতুর্দিকে একটি অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিতেন। হাসির গণতান্ত্রিক আসরে যে একটি সমধর্মী, বাধামুক্ত ও অবারিত আত্মীয়তার পরিবেশ রচিত হয়, সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও সংযত বূ্যহ রচনা করিয়া থাকিতেন। সেজন্য তিনি তাঁহার ভাণ্ডার হইতে হাস্যকৌতুকের রঙীন টুকরাগুলি অবিরাম ছুঁড়িয়া মারিতেন বটে, কিন্তু অনর্গল হাস্যের উত্তেজিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন না, স্মিত ও পরিতৃপ্ত দৃষ্টি দিয়া তাহা উপভোগ করিতেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।' এই স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসচেতনতার জন্য তাঁহার হাস্যরসে সূক্ষ্ম মননধর্মিতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত হাস্যরসিক লেখকগণ আমাদের সামাজিক জীবনের মর্মমূল হইতে একান্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে রসধারা উৎসারিত হইত তাহাই সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছিলেন। ঐ সব লেখকগণ অনেকে ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলেও দেশীয় রস ও রুচি হইতে তাঁহাদের মন বিযুক্ত হয় নাই, তাঁহাদের বাহ্য বিচারবুদ্ধি এবং ঐতিহ্য-বাহিত অন্তরসত্তার যেন একটি দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন রুচি ও রসবোধের একটি আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হইল। তাঁহার বৈদেশিক সংস্কৃতি-শীলিত ও উন্নত নীতি-মার্জিত দৃষ্টিতে প্রচলিত রসধারা গ্রাম্য, অশ্লীল ও কলুষিত বলিয়া বিবেচিত হইল। পূর্বতন রসধারা সম্বন্ধে, এইরূপ মন্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করিতে হইলে সেই রসধারার বিকৃতি অপেক্ষা মন্তব্যকারীদের পরিবর্তিত রুচিবাগীশ দৃষ্টিভঙ্গির দিকেই অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। (রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে

বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। একথা খুবই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই হাস্য চিরবাহিত অকৃত্রিম সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্বভৌম, বুদ্ধিবিলাসী ও নাগরিক জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র হাস্য হইতে ধূলা ও পঙ্কের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু সেই ধূলা ও পঙ্কের সহিত গ্রাম্য লোকের প্রাণের পরশ যে মিশিয়া ছিল। তাঁহার নির্মল ও শুভ্র হাস্য সভায়, দরবারে ও বুধমণ্ডলীর আসরে স্থান পাইল, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন মলিন জীবন ও কলঙ্কগুণ্ঠিত, দ্বিধাসঙ্কুচিত ব্রাত্য নরনারী-সমাজ সেই হাস্যের দিকে উৎসুক নয়নে তাকাইল, কিন্তু নিকটে যাইয়া তাহার উষ্ণ স্পর্শ লইতে পারিল না। অবশ্য তাঁহার কয়েকটি চরিত্র যথা—হীরার আয়ি, গোবরার মা, ব্রহ্ম ঠাকুরাণী, নয়ানবৌ, সাগরবৌ প্রভৃতির মধ্যে প্রাচীন জীবনধারার সহিত তাঁহার যোগ দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হাস্যরস জীবনরসের অঙ্গীভূত। সেখানে বীর, করুণ ও শৃঙ্গাররসের সহিত হাস্যরসও চলমান জীবনের সহিত সহজ ও সচলভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কখনও অন্যপ্রকার রসের প্রভাব হইতে মনকে হাল্কা ও মুক্ত করিবার জন্য এই হাস্যরস এক স্বস্তিকর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কখনও বা চরিত্রের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি হইতে ইহা উৎসারিত হইয়াছে, আবার কখনও বা কৌতুককর ঘটনার মধ্যে ইহা জমিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে অনেক স্থলেই পাঠকের সহিত একটি ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরস উপভোগ করিবার সময়েও পাঠকগণ লেখকের ব্যক্তিসত্তার একটি প্রত্যক্ষ ও আত্মসচেতন প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে। তাঁহার টীকাটিপ্পনী, মত ও মন্তব্য, শ্লেষ ও বক্রোক্তি পাঠক যখন বিশেষ আনন্দের সহিত উপভোগ করে তখন লেখকের মন ও মতের সহিতও তাহার পরিচয় ঘটে এবং লেখকের হাসাইবার সচেতন উদ্দেশ্য ও সক্ষম রীতিটি সম্বন্ধেও অবহিত থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিরাট প্রবন্ধ-সাহিত্যের তিনটি গ্রন্থে হাস্যরসসৃষ্টিই লেখকের মূল উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐ তিনটি গ্রন্থ হইল 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার হাস্যরস যেমন বহুধা-ব্যাপ্ত তেমনি বহু-বিচিত্র। কখনও তাহা কারুণ্যে ও সমবেদনায় অভিষিক্ত হইয়া হিউমারের উন্নত পর্যায়ে উঠিয়াছে,—যেমন 'কমলাকান্তের দপ্তরে', কখনও তাহা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে কণ্টকিত হইয়া

উঠিয়াছে,—যেমন 'লোকরহস্যে', কখনও বা তাহা কৌতুকরসে উতরোল হইয়া পড়িয়াছে,—যেমন বিদ্যাদিগ্‌গজ-বৃত্তান্তে। কোথাও তাঁহার হাস্যরস মধুর প্রণয়রসাত্মক কমেডির অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ ও কমনীয় আবার কোথাও বা বাক্‌চতুর নরনারীর সরস ও বুদ্ধিমার্জিত সংলাপে বিভাসিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের রূপ লাভ করিয়াছে।)

(হাস্যরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল হিউমার অথ া করুণ হাস্যরস। সেই হাস্য-সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈপুণ্য কতখানি সে-সম্বন্ধেই প্রথম আলোচনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের হিউমারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 'কমলাকান্তের দপ্তর'। ইহা যে শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়া অনবদ্য শুধু তাহাই নহে, ইহাতে লেখকের আত্মরূপও পরিস্ফুট হইয়াছে। কমলাকান্ত স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের মত ও আদর্শ, হাসি ও বেদনার সহিত তাঁহার পরিপূর্ণ একাত্মতা রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিরূপের মধ্যে একটি বিরোধিতা যে লক্ষ্য করা যায় তাহা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল ব্যক্তিত্ববান, প্রখর মর্যাদাসম্পন্ন, সদা-সক্রিয় এবং কথায় ও আচরণে কঠোর সংযমনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, নেশাখোর কমলাকান্তের সঙ্গতি কোথায়? কিন্তু সঙ্গতি না থাকিলেও মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য জীবনের অভিনব রসসন্ধানী হইয়া তাঁহার ভদ্র, মার্জিত, নিয়ম ও সংযমবেষ্টিত আত্মস্বাতন্ত্র্যের নির্মোক খুলিয়া ফেলিয়া জীবনের উপেক্ষিত, অসংলগ্ন উৎকেন্দ্রিকতার স্তরে নামিয়া আসিলেন। বিচারক কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, শাসনের দণ্ডটি কৌতুকের যাদুদণ্ড হইয়া পড়িল, সেই তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল এবং চাপা অধরোষ্ঠের ভিতর হইতে স্নিগ্ধ হাসির প্রসন্ন দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ প্রবন্ধে জীবনের গভীর তত্ত্ব আলোচনা করিয়া জাতিকে জীবন সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্তে হাসির তরল প্রবাহ সৃষ্টি দ্বারা জীবন সম্বন্ধে পাঠককে শিথিল,অমনোযোগী ও অবজ্ঞাশীল করিয়া পুনরায় প্রচ্ছন্ন ও অন্তঃশায়ী ভাবতাৎপর্যের দ্বারা জীবনের প্রতি অধিকতর চিন্তাশীল ও তত্ত্বসন্ধিৎসু করিবার উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। হাসির ছদ্ম আবরণের অন্তরালে এক সুগভীর জীবনদর্শনের ইঙ্গিত দেওয়াই কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য। জীবন সম্বন্ধে অতিমাত্রায় গম্ভীর ও আলিপ্ত হইলেই জীবনকে জানা যায় না। এক লঘু ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়া জীবনকে দেখিলেই জীবনের প্রকৃত সত্য ও রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব। কমলাকান্তের মধ্য দিয়া এই দৃষ্টিই বঙ্কিমচন্দ্র মানব-

জীবনের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র সঞ্চালন করিলেন। কমলাকান্তকে দেখিয়া আমরা হাসি, তাহার কারণ সে সাধারণ সমাজজীবনের ব্যতিক্রম—সে আফিং খাইয়া চারপায়ীর উপর বসিয়া ঝিমায়, সে নানা উদ্ভট কথা ভাবে ও বলে, মঙ্গলা গাই ও প্রসন্ন গোয়ালিনী ছাড়া সংসারের কাহারও সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সে অফিসে সাহেবের মনোরঞ্জন করিতে জানে না—অফিসের কাগজপত্রে কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই, লক্ষ্যহীনভাবে থাকা ও চলাই তাহার ধর্ম। সাংসারিক স্বার্থবদ্ধ ও আত্মসুখান্বেষী লোকের কাছে সে হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কি? কিন্তু তাহার প্রতি আমরা যে অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাস্যের বাণ নিক্ষেপ করি তাহা কিছুক্ষণ পরেই প্রতিহত হইয়া আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসে। আমরা যখন তাহার নেশাখোর ও বাতিকগ্রস্ত রূপের গভীরে তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল ও দার্শনিক রূপটি আবিষ্কার করিতে পারি, যখন তাহার আপাত-তরল ও অসংলগ্ন উক্তির অন্তরালে গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার সন্ধান পাই, তখন আমরাই তাহার কাছে ক্ষুদ্র ও অপ্রতিভ হইয়া পড়ি। কমলাকান্ত বোকা ও পাগল সাজিয়া আমাদের বোকা ও পাগল বানায় মাত্র। আমাদের স্থূল ও নির্বোধ দৃষ্টি তাহার রূপ দেখিয়া অর্বাচীন আমোদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম ও বুদ্ধিমান দৃষ্টি তাহার স্বরূপ বুঝিয়া শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে। সে শেক্সপীয়ারের Fool ও Touchstone-এর সমগোত্রীয়, এবং ডিকুইন্সির নির্লিপ্ত আফিংখোরের যোগ্য সহোদর। বাংলা সাহিত্যে সে একটি বংশের আদি পুরুষ, তাহার উত্তরপুরুষদের মধ্যে আমরা করিমচাচা, ভজহরি, দিলদার, গোলামহোসেন প্রভৃতি বহু বিচিত্র আকর্ষণীয় চরিত্রই পাইয়াছি।

কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ সমাজ-জীবনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বহুতর ত্রুটি, ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। সে দেখিয়াছে, মানুষ বৃক্ষের ফলের মত বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ও রস লইয়া প্রকাশ পায়, কত লোক আবার পতঙ্গের মত বহ্নিতে ভস্মসাৎ হইতেছে, কেহ কেহ বা বসন্তের কোকিলের ন্যায় সুখের দিনে অবিরাম মধু বর্ষণ করে কিন্তু দুঃখের দিনে সাথী হয় না, কেহ কুকুরের আবার কেহ বা বৃষের পলিটিকস করিতেছে, মনুষ্যত্বহীন বাঙালীজাতি ভ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। এ-সব দেখিয়া সে হাসিয়াছে, কিন্তু সেই হাসি উদ্দাম ও উতরোল নহে, তাহা মৃদু ও অনুচ্চ, তাহা অশ্রুসিক্ত ও সমবেদনায় কোমল। হিউমারের হাসি যেন কান্নার

সরোবরে আলোর ফুটন্ত কমল, সেই হাসিই ফুটিয়াছে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। কমলাকান্তের অনুভূতি জীবনের গভীরতম স্তর স্পর্শ করিয়াছে, সেই স্তরে হাসি ও কান্না বিধর্মী নহে, সধর্মী।[১] একা, আমার দুর্গোৎসব, একটি গীত, বুড়াবয়সের কথা, কমলাকান্তের বিদায় ইত্যাদি প্রবন্ধে হাসির বীণা অপেক্ষা কান্নার বাঁশীই বাজিয়াছে। কমলাকান্তের বিদায়ে কমলাকান্ত বলিয়াছে, 'তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।' মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু যেমন কান্নায়, তেমনি কমলাকান্তের প্রথম লেখা ও শেষ লেখাটিতে, অর্থাৎ একা ও কমলাকান্তের বিদায়ে শুধু কেবল কান্নার সুরই শুনিয়াছি। কমলাকান্তের কান্না মানুষের চিরন্তন দুঃখের জন্য— একাকিত্ব, পরাধীনতা বার্ধক্য প্রভৃতি অনিবার্য ও অপরিমেয় বেদনার জন্য।

হাসিকে কান্নার দ্বারা গভীর করিয়া ও কান্নাকে হাসির দ্বারা হাল্কা করিয়া কমলাকান্ত জীবন সম্বন্ধে এক অতি স্বচ্ছ ও সত্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। সেই দৃষ্টি প্রীতিকেই মূল শক্তি ও সান্ত্বনা রূপে লাভ করিয়াছে। কমলাকান্ত নিরাসক্ত কিন্তু সিনিক নহে, কাহারও সহিত তাহার সাংসারিক বন্ধন নাই, কিন্তু সকলকেই সে প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে। কমলাকান্ত বলিয়াছে, 'প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' প্রীতির দৃষ্টিতে সবই অন্তরঙ্গ, সবই সুন্দর, এই প্রীতির দৃষ্টিতেই ভ্রান্ত, দুর্বল ও দোষযুক্ত মানুষ কমলাকান্তের কাছে অন্তরঙ্গ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্ত একদিন বিদায় লইল, হাসিয়া কাঁদিয়া, ভালোবাসিয়া বিদায় লইল। আমরা তাহাকে হারাইলাম কিন্তু তাহার দপ্তরটি লাভ করিলাম। তাহার গায়ে আমরা অবজ্ঞার ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু তাহার ধূলিমলিন দপ্তরটির মধ্যে আমরা বহুমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়াছি। ভীষ্মদেব খোশনবীস বলিয়াছেন যে, 'ইহা যিনি পড়িবেন তাঁহারই নিদ্রা

১। এই প্রসঙ্গে লে হাণ্টের চমৎকার উক্তি উল্লেখযোগ্য—

It does not follow that everything witty or humorous excites laughter. It may be accompanied with a sense of too many other things to do so, with too much thought, with too great a perfection even, or with pathos and sorrow. All extremes meet, excess of laughter runs into tears, and mirth becomes heaviness. Mirth itself is too often but melancholy in disguise.

Wit and Humour by Leigh Hunt, (Smith, Elder & Co.), 1890.

আসিবে।' কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা যিনি পড়িবেন তাঁহারই নিদ্রা ভাঙ্গিবে, এবং তাঁহার জাগ্রত চোখে পৃথিবীর যত আলো আর ছায়া সব ঘনাইয়া আসিবে।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে হিউমার, অর্থাৎ করুণ হাস্যরসের পরিচয় পাই, 'লোকরহস্যে' তাহা নাই। 'লোকরহস্যের' হাস্যরস করুণ নহে, তাহা নিষ্করুণ, তাহা প্রীতিতে স্নিগ্ধ নহে, অসহিষ্ণু আঘাতে পীড়িত। 'লোকরহস্যে' বঙ্কিমচন্দ্র বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী এবং তাঁহার শাস্তি অলঙ্ঘ্য ও ক্ষমাহীন। 'লোকরহস্যের' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে তিনি ইহার পরিচয় দিয়াছিলাম কৌতুক ও রহস্য বলিয়া, কিন্তু এই কৌতুক ও রহস্য ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ টাইপ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, 'এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত লেখকগণ আধুনিক-পূর্ব সমাজের দোষ ও অসঙ্গতি লইয়াই হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সমাজের জটিল ও বিস্তৃত রূপ তাঁহাদের লেখায় উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজের নান অহিতকর প্রবৃত্তি ও অনিষ্টকর আচরণ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, দেশী ও বিদেশী ভাবধারার সমন্বয় সাধন করিয়া এক কল্যাণময় সমাজ-প্রতিষ্ঠার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই জাতির অন্তরে স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বে ইয়ংবেঙ্গলী দৌরাত্ম্যে সমাজ-মন বিশেষভাবে পীড়িত ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে প্রাচীনের অন্ধ আত্মরক্ষার চেষ্টা অন্যদিকে নবীনের অপরিণামদর্শী আত্মঘাতের মোহ, এই দুইয়ের বিপরীত তাড়নায় যখন সমাজ অস্থির ও বিপন্ন তখন তাহাকে রক্ষার জন্য পাঞ্চজন্য হাতে জনার্দনের মত বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি নূতন দৃষ্টি লইয়া প্রাচীনকে দেখিলেন, বিদেশী অস্ত্রদ্বারা সনাতন দেশী আত্মাকে রক্ষা করিলেন। শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী নব সমাজের অন্ধ মোহ, বিকৃত অনুকরণ ও বিজাতীয় ভাব আচরণ তাঁহার অব্যর্থ শরসন্ধানে বিদ্ধ হইল এবং ক্ষতমুখে উহাদের দূষিত গ্লানি ও বীজাণু অনাবৃত হইয়া পড়িল। 'লোকরহস্যে' তাঁহাকে এই ক্ষমাহীন শরসন্ধানীরূপেই আমরা দেখিতে পাই। এখানে তাঁহার ব্যঙ্গের শরগুলি অতি দৃঢ়, তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত। কার্লাইল বলিয়াছিলেন, 'Thirty millions—mostl

fools' বঙ্কিমচন্দ্রও যেন তিন কোটি লোকের নির্বুদ্ধিতা ও অধোগতি দেখিয়া তাহাদের প্রতি নির্মম বিরক্তি লইয়াই এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন। বিকৃতবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি, পরানুকরণপ্রিয় সম্প্রদায়কে তিনি যেন মানুষী শ্রেণীতে বসাইতেও রাজি নহেন। সেজন্য তাহাদিগকে তিনি ব্যাঘ্র, গর্দভ ও হনুমান রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। সুইফট Gulliver's Travels-এর চতুর্থ খণ্ডে Houyhuhumsদের দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মানুষকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'লোকরহস্যে' বিকৃত মানুষকে পশু অপেক্ষা হেয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল অবশ্য ভরসা দিয়া বলিয়াছে, মানুষও ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া বানর স্তরে উপনীত হইবে—

'আমাদিগের ভরসা আছে, মনুষ্যপশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।' মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া আনিয়া এবং পশুদিগের হাবভাব ও কথাবার্তা মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া লেখক যে উদ্ভট অবস্থা-বিপর্যয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গের সহিত কৌতুক আসিয়া মিলিয়াছে। হনূমদ্বাবু সংবাদে হনূমান নব্যবাবুর আকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া ভাবিয়াছে—

'কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।'

সুবর্ণ গোলক আখ্যায়িকাটিতে কৌতুকরসের উদ্দাম উচ্ছ্বাসই দেখা গিয়াছে। আখ্যায়িকাটি লোকরহস্যের অন্যান্য প্রবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র; ইহাতে ব্যঙ্গের তীব্রতা নাই, এখানে রহস্য-জটিল কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রীতিকর হাসির সরস ধারাই উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধে সামাজিক দোষ ও অন্যায় লইয়া বিদ্রূপাত্মক জ্বালাময় হাসিই উদ্রেক করা হইয়াছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সার্থক প্রয়োগ প্রধানত irony বা শ্লেষাত্মক রীতি অবলম্বন করে। সেজন্য বক্তা যাহা বলেন তাহার বিপরীত দিকটিই তিনি দেখাইতে চান। তাঁহার প্রশংসা যত অধিক হয়, তাঁহার নিন্দাও তত অধিক তীব্র হইয়া উঠে। তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যত গুরুগম্ভীর হয়, তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্ধ চরিত্র ততই লঘু ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। বাবু প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক। প্রবন্ধটিতে মহাভারতীয় বর্ণনারীতির অবতারণা করিয়া এমন একটি ছদ্ম মহিমা ও

গাম্ভীর্যের জাল বিস্তার করা হইয়াছে যে তাহার ফলেই বাবুচরিত্রের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা আরও বেশি প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজস্তোত্র ও গর্দভ এই প্রবন্ধ দুইটিতে ইংরাজ ও গর্দভকে দেবজ্ঞানে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বিভিন্ন বাক্যে পৌরাণিক রীতিতে স্তব করা হইয়াছে বলিয়াই তাহা এত তীক্ষ্ণঘাতী ও তিক্ত ব্যঙ্গরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

'লোকরহস্যে' ব্যঙ্গের লক্ষ্য বহুধাব্যাপ্ত। ইংরেজের বিকৃত অনুকরণ, স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন, বিদেশী পণ্ডিতের নির্বোধ গবেষণা, তরল কাব্যিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় লেখকের ব্যঙ্গদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইংরেজের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিবার বিকৃত প্রবৃত্তি লইয়াই বেশীর ভাগ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ইংরেজ স্তোত্রের মধ্যে বলা হইয়াছে—

'হে ভগবন! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।'

এই ভগবান ইংরেজকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করিতে চাই বলিয়াই আমরা তাহাদের নিষ্ঠীবনে আমাদের রসনা পবিত্র করিয়া হনুমানের সগোত্র বলিয়া সম্ভাষিত হই, বন্ধুর সহিত হাতাহাতি করিয়া হা ডু ডু বলি এবং মূর্খ স্ত্রীর কাছেও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি, মাতৃভাষার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পালিশ ষণ্ঠীর (Polished Society) সেবা করি। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের মহৎ মূর্খতা লইয়াও লেখক উপহাস করিতে ছাড়েন নাই। গর্দভ প্রবন্ধটির এক স্থানে বলা হইয়াছে—

হে রজকগৃহভূষণ। কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপনপূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী মণ্ডপ মধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দভলোকে প্রবেশ করিলে, প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল বলিয়া মহা গর্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই। রামায়ণের সমালোচনা ও কোন স্পেশিয়ালের পত্র নামক প্রবন্ধ দুইটিতে বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্ভট গবেষণা লইয়া লেখক যে সরস ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। রামায়ণ সম্বন্ধে গবেষণার একটু নিদর্শন দেওয়া যাক—

'বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে, ইহা স্বীকার

করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এবিষয়ের এক প্রমাণ। রামায়ণ শব্দের সংস্কৃত কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধহয় রামায়ণ শব্দটি রামা যবন, শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, কেবল ব কার লুপ্ত হইয়াছে। 'রামা যবন' বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মী্ক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।'

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'ও ব্যঙ্গরসাত্মক, তবে বইখানিতে একটি অবিচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ গল্পের ধারা রহিয়াছে। সেই গল্পের ধারা লেখকের ব্যক্তিসত্তার আরোপের ফলে কোথাও ব্যাহত হয় নাই এবং গল্পের পরিণতিও লেখকের নির্দেশিত কোন শাস্তি কিংবা শিক্ষার দ্বারা ভারগ্রস্ত হয় নাই। গল্পটির মধ্যে যে অসম্ভাব্য উদ্ভটত্ব রহিয়াছে তাহাতে ইহা যথেষ্ট কৌতুক-রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুকরসের প্রাবল্যের জন্য ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ জ্বালাময়তা কোথাও পীড়াদায়ক হয় নাই এবং বইখানির প্রীতিকর উপভোগ্যতাও বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। দীনবন্ধু ঘটিরাম ডেপুটির কথা লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন মুচিরামের কথা। ঘটিরাম ও মুচিরামের মত ডেপুটিগণ অত্যন্ত অশিক্ষিত ও অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু কেবল নির্লজ্জ খোসামোদ ও নির্বিকার পদলেহনের দ্বারা কিভাবে উচ্চতম সম্মান ও পদমর্যাদায় ভূষিত হইতেন তাহারই দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ভট গল্পচ্ছলে দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ডেপুটি হইয়া সেই ডেপুটিকেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাত্র করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার আঘাতের পাত্র শুধু কেবল অপদার্থ ডেপুটি নহে, সেই অপদার্থ ডেপুটিকে যাহারা অন্যায়ভাবে উচ্চতম পদ ও খেতাব দিয়াছিলেন সেই সব উর্ধ্বতন রাজকর্মচারীও বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদায় কাজ করিয়াছিলেন, সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার বিশেষ কোন অভিযোগ ছিল না। সুতরাং তিনি এরূপ বই যেন লিখিলেন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ইহার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক জীবনী-লেখক অক্ষয় দত্তগুপ্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তিনি নিজ সার্বিসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়া-ছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে

বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দার্হ ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলীতে যে হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা খুবই সূক্ষ্ম, জটিল ও মিশ্রিত; তাহা কোথাও লেখকের টীকা-টিপ্পনী এবং কোথাও বা ঘটনা চরিত্র অথবা সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহার উপন্যাসে হাস্যরস অন্য রসের অধীন, সেখানে ঘটনা ও হৃদয়বৃত্তির আনন্দ-বেদনা-রহস্য মিশ্রিত ধারার মধ্যে হাস্যরস একটি উপধারার মত মিশিয়াছে, ক্ষণিকের বুদ্বুদছটা ও কলোচ্ছ্বাসে তাহা মূল ধারাকে একটু আলোড়িত ও উল্লসিত করিয়াছে মাত্র। সেজন্য নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্য উপন্যাসের রসধারা হইতে দূরে সরিয়া হাসির উদ্ভট ও মৌলিক উপাদান অন্বেষণ করিবার সুযোগ লেখক পান নাই। ঘটনা ও চরিত্রের আত্যন্তিক উৎকেন্দ্রিকতা ও বিস্ময়কর উদ্ভটত্ব তাঁহার উপন্যাসে বিশেষ নাই। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্র তিনি বেশী সৃষ্টি করেন নাই। মৃণালিনীর কালা জনার্দন চরিত্রও কৌতুকরসাত্মক, কিন্তু চরিত্রটির বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

কৃষ্ণকান্তের উইলের কৃষ্ণকান্ত চরিত্রটিকে আমরা হিউমার অথবা করুণ হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। কৃষ্ণকান্তের দুই রূপ—একদিকে তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ন্যায়নিষ্ঠ জমিদার, অন্যদিকে তিনি পরিহাসপ্রিয়, প্রীতিমান ও উদারচেতা ব্যক্তি। কমলাকান্তের ন্যায় তিনিও আফিঙের ভক্ত, নেশায় বিভোর হইয়া তিনি অশ্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণীকে আফিঙের ভাগ দিতে চান, কখনও রোহিণীকে ইন্দ্রাণীর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কার্তিক মহাদেবকে জ্যেঠা মহাশয় সম্বোধন করিবার জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। যে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীর প্রতি আসক্তির জন্য গোবিন্দলালকে বিষয়চ্যুত করিয়াছিলেন, তিনিই আবার প্রথমে রোহিণীকে লইয়া একটু প্রচ্ছন্ন রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই। গোবিন্দলাল রোহিণীকে অন্দরে লইয়া যাইতে চাহিলে কৃষ্ণকান্ত তাহার উপরে এক চাল চালিলেন! তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের মতিগতির উপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না, এক নগদীর সহিত রোহিণীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'দুর্গা। দুর্গা। ছেলেগুলো হলো কি?' দুষ্ট বুড়ার রসিকতায় সত্যই না হাসিয়া পারা যায় না। কৃষ্ণকান্তের এই প্রসন্ন

হাস্যোদ্দীপক ও উদার চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আমরা হাসি বটে, কিন্তু আমাদের সহানুভূতিশীল চিত্তের প্রীতিও তাঁহার জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

রজনীর হীরালাল একটি ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্র। তখনকার মূর্খ সম্পাদক ও চরিত্রহীন সমাজসংস্কারকের চরিত্র ব্যঙ্গ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র হীরালালের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। হীরালাল স্তুশ্চুভিশ্চশাৎ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। সে মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখিয়াছিল। রজনীকে বিবাহ করিয়া দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করিতেই সে চায়। কানা মেয়ে রজনীর শব্দভেদী লাঠিতে সে পড়িয়া গেলে শাসাইতে লাগিল যে আবার খবরের কাগজ করিয়া রজনীর নামে আর্টিকেল লিখিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও গভীর রসের বিশ্লেষণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে সামাজিক জীবনের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নানা কৌতুককর উপাদানের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। পুকুরঘাটে পল্লীবাসিনী রমণীদের পরম মুখরোচক পরচর্চা, জমিদার বাড়ির অন্তঃপুরে চাকর চাকরাণীদের তুমুল হট্টরোল, অন্তঃপুরিকা মহিলাদের রঙ্গরসিকতা, পোষ্টবাবু ও তাহার পিয়াদার আপেক্ষিক গুরুত্ববোধ ইত্যাদি নানা দিকে তাঁহার কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি সঞ্চরণ করিয়া কৌতুক সংগ্রহ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বাগ্‌চতুরা ও পরিহাসনিপুণা নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শেক্‌সপীয়ারের রোজালিণ্ড পোরশিয়া প্রভৃতি চরিত্রের ন্যায় তাহাদের অনেকের চরিত্র কমেডিরসাত্মক ও তাহাদের কথাবার্তায় উইট অথবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈবলিনী, বিমলা, মতিবিবি, দেবীচৌধুরাণী, গিরিজায়া, শান্তি, লবঙ্গলতা প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে করা যায়। শৈবলিনী, মতিবিবি, দেবীচৌধুরাণী, শান্তি প্রভৃতি চরিত্র মূলত প্রণয়রসাত্মক হইলেও তাহাদের পরিহাসপ্রিয়তা ও বাগ্‌চাতুর্যের নৈপুণ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লরেন্স ফষ্টারকে লইয়া শৈবলিনীর রসিকতা ও টমাস সাহেবকে লইয়া শান্তির অবজ্ঞামিশ্রিত পরিহাস প্রভৃতি বাঙালী মেয়ের দুঃসাহসিক রসবোধ ও অসংকোচ প্রগল্‌ভতার দৃষ্টান্তস্থল। বিমলা ও লবঙ্গলতার জীবনে ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন বেদনার ধারা প্রবহমাণ হওয়া সত্ত্বেও বাহিরে তাহারা দুইজনেই রঙ্গরসিকা নারীর ছদ্মবেশ সব সময়েই ধারণ করিয়া আছে। ঘোর বিপদের পরিবেশে প্রহরীর

সহিত বিমলার প্রেমের অভিনয় তাহার অসাধারণ মানসিক স্থিরতা ও রঙ্গরস সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। মৃণালিনীর সখী গিরিজায়া আর একটি সুচতুরা বাগ্‌পটীয়সী চরিত্র। তাহার কথা, গান ও রসিকতা সবকিছুর মধ্যেই মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের কল্যাণসাধনের শুভকামনা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়া সে আমাদের কাছে এত স্নিগ্ধরসাত্মক ও প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সহিত দিগ্বিজয়ের কৌতুকজনক প্রীতি-সম্বন্ধ Merchant of Venice নাটকের গ্র্যাসিয়ানো ও নেরিসার কৌতুক-মিশ্রিত প্রেমের মতই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে তাঁহার পাঠক-পাঠিকার সহিত অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া বৈঠকী ও মজলিসী ঢঙে তাহাদের কাছে নানা টীকাটিপ্পনী ও সরস উক্তি ও মজাদার মন্তব্য করিয়াছেন। বইয়ের ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে কোথাও তিনি পাঠিকার সহিত রসিকতা করিয়া বই বন্ধ করিতে বলিতেছেন, কোথাও পাঠক মহাশয়ের রাগ ভাঙাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কোথাও চাকর চাকরাণী সম্বন্ধে একটু সরস মন্তব্য করিতেছেন কোথাও বা কোকিলের কুহুস্বরের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিরহিণী নারীর বিরহবেদনা লইয়া একটু ঠাট্টা করিতেছেন। কখনও কখনও তিনি সামান্য বস্তুকে অসামান্য ও মহিমান্বিত করিয়া নানা টীকাটিপ্পনীর মধ্য দিয়া হাস্যরস উদ্দীপন করিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রসিদ্ধ লাঠি-প্রশস্তি স্মরণ করুন। 'বিষবৃক্ষে'র তামাকু-স্তুতিতেও অনবদ্য কৌতুকরস সৃষ্টি হইয়াছে। সেই স্তুতি হইতে কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

'হে সর্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি। তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁকে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃত ধূমরাশি সমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি। হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবক্রাগ্রভাগ মুখনলের শোভা। কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ। হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী। অলসজন প্রতিপালিনী ভার্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার কি মহিমা জানিবে? হায়! এই তামাকুসেবা বঞ্চিত অরসিক ব্যক্তি সত্যই হতভাগ্য!'

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ত্রৈলোক্যনাথ বর্তমান সাহিত্য-সমাজ হইতে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন একথা দুর্ভাগ্যক্রমে সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের রসরচনার ক্ষেত্রে তিনি যে একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ সাধক, তাহা আজ নূতন করিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে। আজ আর ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত সেই তাম্রকুটপায়ী, অবসরসুখী খোসগল্পপ্রিয় আড্ডাধারী সমাজ নাই ; ভূতপেত্নী-ডাকিনী-যোগিনীদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি এখনকার লোকের কোন বিশ্বাস ও কৌতূহল নাই ; বাস্তবতার স্থূল ও প্রত্যক্ষ পরিবেশ হইতে উদ্ভট ও অতিশয়িত জগতের বাধাহীন বিস্তারে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার মানসিক উদারতা ও কল্পনাশক্তিও বর্তমান পাঠকের নাই। এই সব কারণেই হয়তো ত্রৈলোক্যনাথ এখন অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছেন। যদি কোন দিন আমরা অসার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দম্ভ ও সংকীর্ণ বাস্তবতার মোহ ত্যাগ করিয়া উদার রসবোধে জাগ্রত হইতে পারি, তবেই হয়তো ত্রৈলোক্যনাথের যথাযোগ্য মূল্য দিতে পুনরায় সমর্থ হইব।

(জীবনের যে ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হাস্যরসিকের পক্ষে আবশ্যক তাহা ত্রৈলোক্যনাথের পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন রোমান্সের ন্যায় বর্ণাঢ্য ও ডিটেকটিভ গল্পের ন্যায় চমকপ্রদ। কিভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি হীনতম অবস্থা হইতে উচ্চতম অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার কাহিনী লেখকের কোন ভুতুড়ে গল্পের মতই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুতর মানুষের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহার সাহিত্যের পটভূমিও সুন্দরবন হইতে উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের উজিরগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। শুধু কেবল এই বহু ব্যাপক অভিজ্ঞতাই নহে, এই অভিজ্ঞতার সহিত ত্রৈলোক্যনাথের প্রগাঢ় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে অধিকারের নিমিত্ত, ইউরোপীয়গণ তাঁহার বিশেষ সন্ধান করিয়া থাকেন। এক জ্যোতিষ ও সঙ্গীতবিদ্যা ভিন্ন সকল বিদ্যাতেই

তাঁহার অল্পাধিক অভিজ্ঞতা আছে।'[১] এই ভূয়িষ্ঠ জ্ঞানের ফলেই তিনি বিশ্বজগৎ ও মানবজগতের সকল তত্ত্ব ও রহস্যই অবগত ছিলেন এবং সেজন্য এক সমুন্নত ও বুদ্ধিদীপ্ত স্তর হইতে তিনি মানবজীবনের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলি পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ যাহা লইয়া আলোচনা গবেষণা করে, যাহার মূল্য ও গুরুত্ব সে নির্ণয় করিতে চায়, তাহার লঘু ও কৌতুককর দিক দেখাইয়া আবার একটু হাস্যপরিহাস করিতেও সে ভালোবাসে। সেজন্য লেখক মানবদেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ, জীবিত ও মৃতের মধ্যে যোগাযোগ, চুম্বকের লৌহ আকর্ষণ, ভূমিকম্প, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলীর রহস্য ইত্যাদি দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচিত বিষয়গুলি কৌতুক-তুলিকায় রঞ্জিত করিয়াছেন। বস্তুবিজ্ঞান লইয়া তিনি অত্যন্ত গভীরভাবেই মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সেই বিজ্ঞানের বাস্তবতা হইতে নিশ্চিন্ত পলায়নের উপায় খুঁজিলেন—ঘেঁ্যাঘেঁা, গোগোঁ, নাকেশ্বরী, লাউমুখী ও নারিকেলমুখীদের জগতে যাইয়া আসর পাতিলেন। বিজ্ঞানের রীতি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন। এমনকি যে স্বদেশী-দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রচার সম্বন্ধে তিনি সারাজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই স্বদেশীদ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী লইয়াও তিনি রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই, আমাদের মনে হয়, ডমরুচরিত্রের একটি গল্পের সেই দুই আমির মত স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথেরও দুই আমি ছিল। তাঁহার গল্প-উপন্যাসে অকেজো রসিক আমিটিই ক্রমাগত কেজো তাত্ত্বিক আমিটিকে নাস্তানাবুদ করিয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ তরল ও গম্ভীর উভয় প্রকার রসই পরিবেষণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার গম্ভীর রস স্বাভাবিক ও সাবলীল নহে; তাহা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম আবেগ ও অনুভূতির বর্ণনা করিয়া মধুর প্রণয়রসাত্মক চিত্র অঙ্কন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, রমণীয় সৌন্দর্যসৃষ্টি করিবার নিপুণতাও তাঁহার ছিল না। খেতু ও কঙ্কাবতী কিংবা হীরালাল ও কুসুমের প্রণয়-বৃত্তান্ত কোথাও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু উদ্ভট ও অসম্ভব জগতের মধ্যে যাইয়া কৌতুকময় ঘটনা ও চরিত্র আবিষ্কার করিবার অসাধারণ দক্ষতা তাঁহার রচনায় দেখা যায় না। প্রায়ই দেখা যায়, একটি বাস্তব সামাজিক কাহিনীর অন্তর্বর্তী কোন কৌতুকজনক কাহিনী অবতারিত হইয়াছে। এই কৌতুক-কাহিনী অবতারণার জন্য লেখককে হয়তো flash back রীতিতে কোন

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৮৭২

চরিত্রের অতীত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে হইয়াছে। যেমন 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' ও 'ডমরু চরিত্রে' অথবা কোন স্বপ্নদর্শন কিংবা রোগবিকারের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, যথা 'কঙ্কাবতী' ও 'বীরবালা' উপন্যাস দুইটিতে।

অদ্ভুত কাহিনী ও কিম্ভূত চরিত্র হইতে ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরস উৎসারিত হইয়াছে। তাহাকে অদ্ভুত রস কিংবা উদ্ভট রস বলা যাইতে পারে, কিন্তু হাস্যরসের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কৌতুকরসের শ্রেণীতেই তাহাকে ফেলিতে হইবে। সেই কৌতুকরসের সহিত কোথাও বা ব্যঙ্গরসের ঈষৎ জ্বালা, কোথাও বা করুণ হাস্যরসের কিঞ্চিৎ প্রলেপ আছে, কিন্তু তবুও কৌতুকরসের উচ্ছ্বসিত আতিশয্য প্রায় সব স্থানেই বজায় রহিয়াছে। লেখকের অসাধারণ মৌলিক উদ্ভাবনী-শক্তির ফলে আমরা তাঁহার রচনায় এমন সব ঘটনা ও চরিত্র দেখিলাম যাহারা আমাদের চিরবদ্ধ ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কার একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া অদম্য কৌতুকের আঘাতে অবিরাম আমাদের চিত্তকে বিলোড়িত করিয়াছে। চাঁদের শিকড়, এক টাকার ভূমিকম্প, নরমুণ্ড লইয়া নারিকেলমুখী ও লাউমুখীর ভাঁটা খেলা, কুমীরের পেটে জীবন্ত গহনাপরা সাঁওতাল রমণীর নিশ্চিন্ত অবস্থান, মানুষের অর্ধদেহের সহিত গোরুর কোমর ও পদদ্বয়ের অপূর্ব সংযোগ, ঘ্যাঁঘোঁ ও নাকেশ্বরীর শুভ পরিণয় ইত্যাদি অদ্ভুত ও অভাবনীয় ব্যাপার যেমন লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি বাঘ-জামাই, ভূত-কোম্পানী, ব্যাঙ-সাহেব, চন্দ্রলোকের দুর্দান্ত সিপাহী, মাতাল ভূত, খাঁদা ভূত, সাহেব ভূত, নাকেশ্বরী ইত্যাদি উদ্ভট চরিত্রও তিনি অত্যন্ত সরসভাবে অঙ্কন করিয়াছেন।

কৌতুকরসের এই আত্যন্তিক প্রাবল্যের জন্য তাঁহার অপ্রাকৃত ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা তীব্র ও জ্বালাময় হইতে পারে নাই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সার্থক প্রয়োগের জন্য একটি সংযত, বুদ্ধি-সচেতন পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। ত্রৈলোক্যনাথের ভূত-ভূতিনীদের মধ্যে অনেকেই বাস্তব সংসারের মানব-মানবী চরিত্রের কৌতুককর বিকৃতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের স্বভাব ও আচরণ এত বিরূপ ও বিসদৃশ যে এক অদম্য ও অনিয়ন্ত্রিত হাসির উতরোল উচ্ছ্বাসে আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তা সব কিছুই ভাসিয়া যায়, ব্যঙ্গের জ্বালা-যন্ত্রণা তখন হাসির অনর্গল প্রবাহে শান্ত ও শীতল হইয়া পড়ে। লেখকের ব্যঙ্গ স্পষ্ট ও শাণিত হইয়া উঠিয়াছে বাস্তব কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে। বাস্তব কাহিনীতে ঘটনার উদ্ভটত্ব ও তজ্জনিত হাসির প্রচণ্ডতা নাই, সেখানে

লেখক সূক্ষ্ম-সন্ধানী শ্লেষ ও অন্তরশায়ী বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত পাঠকের মনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। সমাজের লোভ ও স্বার্থপরতা, নীচতা ও নির্মমতা কাপট্য ও কুটিলতা তখন তাঁহার ব্যঙ্গের অব্যর্থ শরে বিদ্ধ হইয়া কদর্য কুৎসিতরূপে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিলাম অর্থপিশাচ তনুরায় কপট ধর্মধ্বজাধারী ষাঁড়েশ্বর, বিয়ে-পাগলা জনার্দন চৌধুরী ও ফোকলা দিগম্বর, নৃশংস শয়তানরূপী গুরুদেব প্রভৃতি সমাজদেহকে নিরন্তর কলুষিত ও পীড়িত করিতেছে। ইহাদের লইয়া লেখক হাসিয়াছেন, কিন্তু সেই হাসি প্রকাশিত হইয়াই ক্রুদ্ধ শাসনের অপ্রকাশিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মানবের প্রতি সীমাহীন দরদ ও সহানুভূতি ছিল বলিয়াই যাহারা মানবসংসারকে নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করে তাহাদের প্রতি তাঁহার তীব্র অভিযোগ ছিল।[১] এই দরদ ও সহানুভূতি অধিক পরিমাণে ছিল বলিয়াই হাস্যরসের লেখক হওয়া সত্ত্বেও করুণ রসকে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। কোন কোন স্থানে তো করুণ রসের একেবারে অত্যধিক প্রাবল্যই দেখা যায়। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' নামক গল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিধিরামের দুঃখ-লাঞ্ছনার বর্ণনাতে হয়তো কৌতুকের ক্ষীণ স্পর্শ আছে কিন্তু তাহাতে যে বেদনার আতিশয্য আছে তাহাই আমাদের অন্তরকে অভিভূত করিয়া রাখে। পরিশেষে নিধিরামের প্রাণত্যাগের যে দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অপরিমেয় কারুণ্য কখনও মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায় না। কঙ্কাবতী, মুক্তামালার গড়গড়ি মহাশয় ও ডমরুধর প্রভৃতি চরিত্র অবান্তর ও ও অলৌকিক জগতের যত কৌতুক-জনক অভিজ্ঞতাই লাভ করুক না কেন তাহাদের অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুর্গতির বিবরণ করুণরস হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই।[২]

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'পৃথিবী যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষ আর একটু যদি হৃদয়বান হয়, আর একটু পরার্থপর হয়, আর একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সংসারের দু-একটি কণ্টক উৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর একটু ভদ্ররকম ও বাসোপযোগ্য হয়। ইহাই তো যথেষ্ট। ইহার বেশি আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তাই তদধিক কিছুই তিনি চাহিতেন না।'

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা—প্র. না. বি.

২। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে।'

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা প্র. না. বি.

ত্রৈলোক্যনাথের কৌতুকরসের প্রভাব প্রধানত অপ্রাকৃত ও অলৌকিক জগৎ হইতে উৎসারিত হইয়াছে একথা পূর্বে আমরা বলিয়াছি। ভূত-পেত্নী, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি অশরীরী সত্তা মানুষের মনের মধ্যে ভয় ও রহস্যই উদ্রেক করিয়া থাকে, অথচ তাহারাই এখানে হাস্যকৌতুক উদ্রেক করিয়াছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, লেখক যদি এই সব অশরীরী সত্তাদের জগৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে হয়তো ইহারা বিশ্বাসী মনের মধ্যে ভয় ও রহস্য উদ্রেক করিতে সক্ষম হইত এবং ইহাদের কাহিনীও ভৌতিক কাহিনী অথবা রূপকথায় পর্যবসিত হইত। কিন্তু লেখকের তাহা উদ্দেশ্য নহে তিনি লৌকিক ও অলৌকিক জগৎ দুইটি পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন। সেজন্য উত্তেজিত কল্পনার ডানায় ভর দিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভয় ও রহস্য-মিশ্রিত অলৌকিক জগতে উড়িয়া যাইবার কোন উপায় নাই। ক্ষণে ক্ষণে বাস্তবতার আঘাতে আমাদের ভয় ও রহস্যবোধ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই লৌকিক ও অলৌকিক জগতে আমাদের কল্পনা আকস্মিক ভাবে এবং অতি দ্রুত সঞ্চালিত হয় বলিয়া মনে যে অতর্কিত আঘাত লাগে তাহারই ফলে আমাদের প্রবল কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। একই বস্তু লেখকের উদ্দেশ্য ও রচনারীতির তারতম্যের ফলে ভিন্ন রসাত্মক হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' কিংবা শরৎচন্দ্রের শ্মশান-অভিজ্ঞতায় প্রকৃত ভূতের অস্তিত্ব না থাকিলেও ঐ সব স্থানে এক প্রকার ভৌতিক রসের সঞ্চার হইয়াছে, আর ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় ভূতের এত ছড়াছড়ি থাকিলেও সেখানে লৌকিক রসেরই উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। আসলে ভৌতিক জগতের বর্ণনা লেখকের উদ্দেশ্য নহে, উপায় মাত্র। ঐ জগতের ছদ্মাবরণের মধ্য দিয়া তিনি মানবীয় জগতের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

ভূত-প্রেত সম্বন্ধে, একপ্রকার সহজাত ধারণা ও সংস্কার আমাদের সকলের মনেই আছে। তাহাদের স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে একপ্রকার আশা আমাদের মনে সঞ্জাত থাকে, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় সেই আশা যখন রূঢ় আঘাত

১। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'কঙ্কাবতীর' আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা এ-স্থানে উল্লেখযোগ্য—কিন্তু ভূত প্রেতের আবরণ ভেদ করিয়া যদি আর একটু ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তখন ইহার আসল মূর্তি ধরা পড়ে, তখনই ইহার ব্যঙ্গরসটির আস্বাদন পাই। এই রস উপলব্ধি করিতে না পারিলে রস-রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

কঙ্কাবতীর ভূমিকা—পৃঃ ২৸৹

পায় তখনই আমাদের কৌতুকবোধ উত্তেজিত হইয়া উঠে। কাণ্টের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি পুনরায় এখানে উল্লেখ করিতে চাই, 'The comic is an expectation dwindled into nothing'.

আমাদের চিরপোষিত আশা অকস্মাৎ বিপর্যস্ত করিয়া কৌতুকরস উদ্রেক করিবার জন্যই লেখক ভৌতিক জগতের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, তাঁহার বর্ণিত ভূতগুলি খুবই অদ্ভুত। তাহারা মানুষের মতই খুব ধূমধামের সহিত বিবাহ করিয়া থাকে, কেহ বা সাবান মাখিয়া সভ্য, ভব্য, নব্য ভূত হইয়া উঠে; কেহ কেহ আবার কোম্পানী খুলিয়া বসে, নাম দেয় স্কল, স্পেলিটন এণ্ড কোং, কেহ আবার যমপুরীতে যাইয়া যমরাজকে ঘোল খাওয়াইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আড্ডা গাড়ে, কেহ বা মাসিকপত্রের সম্পাদক হইবারও যোগ্যতা অর্জন করে। তাহারা রাগে, হাসে, কাঁদে, ভালোবাসে, ভয় পায়, অসুখে ভোগে, কোট প্যাণ্ট পরে, আবার চণ্ডুও খায়। তাহাদের এইরূপ স্বভাব ও আচরণ অনুক্ষণ আমাদের সংস্কার ও কল্পনাকে ঘা দিয়া অবিরাম কৌতুকের দোলায় নাচাইতে থাকে।

শুধু কেবল ভৌতিক জগতের মধ্যে নহে, নানারূপ জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের জগতের মধ্যেও মানবীয় ভাব ও আচরণ আরোপ করিয়াও লেখক কৌতুকরস যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রেক করিয়াছেন, মাছেদের সভা ও বক্তৃতা, কাঁকড়া মহাশয়ের কেশবিন্যাস, ব্যাঘ্রজামাতার শ্বশুরালয়ে বিহার, সপত্নী মশিকাদের ঝগড়া, রক্তবতীর সখী-সৌহার্দ্য, হাতী ঠাকুর পোর পরোপকার, ব্যাঙ সাহেবের হিট মিট ফ্যাট ও হিস ফিশ ড্যাম ইত্যাদি চোস্ত ইংরেজী বুকনি কখনও ভুলিবার নহে।

ভৌতিক জগৎ ও ইতর প্রাণীজগতের উপর মানবীয় জগতের ক্রিয়াকলাপ ও হাবভাব আরোপ করা ছাড়াও বর্ণিত জগতের যথাযথ রূপ বজায় রাখিয়া উদ্ভট ঘটনার অবতারণা দ্বারা লেখক কৌতুক উৎপাদন করিয়াছেন। শিকড় কাটা যাইবে আশঙ্কা করিয়া চাঁদের ম্রিয়মাণ হইয়া পড়া, আকাশ হইতে গির্জার চূড়ায় পড়িয়া সেখানে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকা, ঘুড়ির সঙ্গে আকাশপথে উড়িয়া সমুদ্রে যাইয়া পড়া, ঝিনুকের পেটে থাকিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ, উড্ডীয়মান বৃক্ষে চাপিয়া ডাকিনীদের স্থানে গমন, সিন্দুক, হাঁড়া, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল ইত্যাদির শূন্যপথে উড্ডয়ন, কুমীরের পেটে বসিয়া সাঁওতাল রমণীর বেগুন বিক্রয়, দুই আমির বিপর্যয়, আকাশমার্গে ময়ূরের পিঠে চাপিয়া চলিতে

চলিতে হঠাৎ ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে পতন, ডমরুর অর্ধমানুষ ও অর্ধ গোরুর দেহ ধারণ ইত্যাদি বুদ্ধি ও কল্পনার অনধিগম্য ব্যাপারগুলি অপ্রতিরোধ্য কৌতুকের আক্রমণে আমাদের চিত্তকে পর্যুদস্ত করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ কোথাও মৃদু ও নিরুত্তাপ এবং কোথাও বা একটু শাণিত ও প্রখর। ব্যঙ্গ সাধারণত নীতিমূলক ও শাস্তিদায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ কোন কোন স্থানে নীতি ও শাস্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিছক আমোদকেই উদ্দেশ্য করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নয়নচাঁদের ব্যবসা ও ডমরুচরিতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নয়নচাঁদ ও ডমরুধর দুইজনেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও জাল-জুয়াচুরি দ্বারা নিজেদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। সুতরাং একটি নীতি-নির্দেশিত পরিণাম হয়তো তাহাদের উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখক সে-দিক দিয়া যান নাই। তিনি উভয়কেই বক্তা করিয়া উহাদের দ্বারাই নিজেদের কুকীর্তির কথা বর্ণনা করাইয়াছেন। উহারা নিজেদের প্রতিই শ্লেষ ও বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছে এবং সেজন্যই উহাদের চরিত্র এত উপভোগ্য হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি একটি অন্তরঙ্গ সহানুভূতির ভাব জাগ্রত হয় বলিয়া উহাদের নৈতিক শাস্তির কথা আমাদের আর মনে থাকে না। যে শীতলা ও জগদম্বার প্রতি উহাদের অচলা ভক্তি দেখানো হইয়াছে সেই ভক্তি আসলে তাহাদের অন্যায় ও অধর্মের একটি কৈফিয়ত বলিয়া সেই ভক্তির প্রতিও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। নয়নচাঁদ অপেক্ষা ডমরুধর অনেক বেশি ধূর্ত, চতুর, নিপুণ ও অভিজ্ঞ। নয়ন শুধু কেবল শীতলা মূর্তি দেখাইয়া লোক ঠকাইয়াছিল, কিন্তু ডমরু যে কতভাবে কত লোককে ঠকাইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে ডমরু সকলকে ঠকাইয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় ঠকাইতে পারে নাই তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশীকে। এলোকেশী তাহাকে মুড়ো খেঙরা দিয়া যেভাবে সময়ে অসময়ে ঝাড়িয়াছে তাহাতে ডমরুর কোন অপরাধই আর আমাদের মনে থাকে না। ডমরুধরের অপরিমিত অর্থলোভ ছিল বটে, কিন্তু রসবোধও তাহার কম ছিল না। পর পর কয়েক পক্ষ তো সে গ্রহণ করিয়াছেই, উপরন্তু দুর্লভী বাগ্‌দীর দুর্লভ প্রেমের জন্যও মাঝে মাঝে সে সাধ্যসাধনা করিয়াছে। অবশ্য যে চেহারা লইয়া সে এতগুলি রমণীর মনোরঞ্জন করিতে চাহিয়াছিল তাহা সত্যই কার্তিকের চেহারাকেও ম্লান করিয়া দেয়। একদিন সেই কার্তিকের মতই ময়ূরের পিঠে চড়িয়া আকাশপথে যখন সে

যাইতেছিল তখন পিণ্ডের মুখে তাহার রূপ কি চমৎকারভাবেই না ব্যক্ত হইয়াছে—

'আহাঃ মহাশয়ের কি রূপ! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার ভিতর হইতে খড়ি মাটীর আভা বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার উস্কোখুস্কো পালক আবৃত কাক ভূষণ্ডীকে মনে হইল, বহুকালের প্রাচীন ছেৎলাপড়া বাঁশের ঝোড়ার ন্যায় মহাশয়ের অস্থি পঞ্জর দেখা যাইতেছে। দধিপুচ্ছ শৃগালের পর্বত গহ্বরের ন্যায় আপনার দন্তশূন্য মুখগহ্বর। তাহার দুই ধারে কি দুইটি কাক বসিয়াছিল? ঐ যে ঠোঁটের দুই কোণে শুভ্র বর্ণের কি পড়িয়াছে। আপনার টোল পড়া গাল দুইটি দেখিয়া হনূমানের চড় প্রহারিত রাবণ মাতুল কালনেমির গণ্ডদেশ আমার স্মরণ হইল। পক্বচুল পরিবেষ্টিত মস্তকের মধ্যস্থিত বিস্তৃত টাক দেখিয়া আমার মনে হইল, বিধাতা বুঝি পূর্ণচন্দ্রটিকে বসাইয়া তাহার চারিদিকে শুভ্রবর্ণের মেঘ গাঁথিয়া দিয়াছেন।'

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের নায়ক একজন বৃদ্ধ। 'বাঙ্গাল নিধিরাম,' 'নয়নচাঁদের ব্যবসা,' 'ফোকলা দিগম্বর,' 'ডমরু চরিত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলির নায়ক সকলেই পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধ। লেখক নিজেও পরিণত বয়সেই সাহিত্য সাধনা সুরু করিয়াছিলেন, সম্ভবত সেজন্যই তিনি নিজের বয়সের চরিত্রকেই নায়করূপে অঙ্কন করিয়াছেন। আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসেই মজলিসী আড্ডার পরিবেশে নায়কের মুখ দিয়া অতীতের অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য বয়সের প্রবীণতা এসব স্থলে অপরিহার্যরূপেই দেখাইতে হইয়াছে। লেখকের সাহিত্য কাহিনী স্মরণ করিতে গেলেই একটি পলিতকেশ, রঙ্গরসিকতাপ্রিয় আড্ডাধারী বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সহিত আমরা হাসি, আবার তাহাকে লইয়াও আমরা হাসি। ইহাদের প্রধানত দুইটি বাতিক, অর্থ আর বিবাহ। নয়নচাঁদ ও ডমরুধরের কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের সহিত বিবাহবাতিকগ্রস্ত ফোকলা দিগম্বর ও জনার্দন চৌধুরীর নামও উল্লেখ করা দরকার। দিগম্বর বিবাহ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ও ওস্তাদ। বার বার তিনি দয়াপরবশ হইয়া অনেককেই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু বাদ সাধিয়াছে তাঁহার স্ত্রী। এবারও তিনি নবকার্তিক সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিয়া ব্যর্থ হইলেন। তখন তাঁহার কি উগ্র মূর্তি! লেখকের বর্ণনা—

'তাম্বূলরঞ্জিত লালা,—রক্তের ন্যায় তাঁহার দুই কষ দিয়া প্রবাহিত হইতে

লাগিল। ফুলকাটা কামিজের বক্ষদেশ ও বেলফুলের মালা ভিজিয়া গেল। ঘোর উগ্র মূর্তি! তাহার উপর শোণিতপ্রায় লালার প্রবাহ—তাঁহাকে ঠিক যেন রক্তমুখী মন্দা কালীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল।'

এই অঙ্কের চূড়ান্ত দৃশ্য তখন দেখা গেল, যখন রঙ্গমঞ্চে গলাভাঙ্গা দিগম্বরী প্রবেশ করিল। তখন ফোকলা দিগম্বর ও গলাভাঙ্গা দিগম্বরীর যে তাণ্ডব সুরু হইল তাহার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে পাঠকের আত্মসম্বরণ করা সত্যই কঠিন। জনার্দন চৌধুরীর চরিত্র ফোকলা দিগম্বরের মত অতখানি কৌতুক-জনক না হইলেও উহার ক্ষমতাশালী অনিষ্টকারিতার জন্য উহার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গের মধ্যে ঝাঁঝ ও জ্বালা একটু বেশি মিশিয়াছে।

তবে ব্যঙ্গের সর্বাপেক্ষা তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা দেখা গিয়াছে প্রধানত তিনটি চরিত্র-চিত্রণে। উহারা হইল 'কঙ্কাবতী'র তনু রায় ও ষাঁড়েশ্বর এবং 'মুক্তামালা'র গুরুদেব। তনু রায়ের অর্থগৃধ্নু, নীচাশয়তার সীমা নাই। অর্থের লোভে একটির পর একটি কন্যাকে বিক্রয় করিতে তাহার বিন্দুমাত্র বাধে না। এমন কি বাঘের ভয়ে ভীত হইয়াও সে অর্থের আশা ছাড়ে না এবং অর্থ পাইয়া মূর্তিমান বাঘকেও জামাতা করিতে তাহার আপত্তি নাই। ষাঁড়েশ্বরের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। ষাঁড়েশ্বর বাবাজী পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁহার দালানে হরিসংকীর্তনের কত না ঘটা! এই হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত ছাগ ও মহাকুক্কুট সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ায় কোন অনাচার তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তারীফ শেখের বাড়ী হইতে বিশুদ্ধ মুরগীর মাংস আনিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, তারীফ শেখ হয়তো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে। কি সর্বনাশ, বরফ! হাত তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, 'আমার খাওয়া হইল না। বরফ মিশ্রিত মুরগী খাইয়া শেষে কি জাতিটি হারাইব!' এই বরফ খাইয়াছিল বলিয়াই তো তিনি খেতুকে জাতিচ্যুত করিয়া সনাতন ধর্মের মান মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন!

ত্রৈলোক্যনাথ-অঙ্কিত সর্বাপেক্ষা নৃশংস চরিত্র বোধ হয় 'মুক্তামালা'র গুরুদেব। সেই গুরুদেবের আত্যন্তিক নির্দয়তার চিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া লেখক অসহিষ্ণু বেদনা ও ক্রোধে হাসিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ছাগল হত্যার যে বীভৎস দৃশ্য তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে গুরুদেবকে মানুষের পর্যায়ে ফেলিতে আমাদের দ্বিধা হয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ইন্দ্রনাথের রচনায় আমরা নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসের পরিচয় পাই। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি যাহা লিখিয়াছেন—কবিতা, উপন্যাস, প্রহসন, চুটকী, নক্সা, সব কিছুই অবিমিশ্র রঙ্গব্যঙ্গে সরস হইয়া উঠিয়াছে।) ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের লইয়া অবারিত হাস্যকৌতুকে মত্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার রসাল উক্তিগুলির বৈদ্যুতিক স্পর্শ অনবরত তাঁহার সন্নিহিত লোকেদের আমোদচঞ্চল করিয়া রাখিত।[১] (জীবন ও জগৎকে তিনি এক বক্র-কুটিল দৃষ্টির শাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া মজা পাইতেন।) যে কেহ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত সেই তাঁহার ব্যঙ্গ-স্ফুরিত মুখের দুই একটি মিঠেকড়া মন্তব্য না শুনিয়া অব্যাহতি পাইত না। তেমনি সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির কোন বিষয়ই তাঁহার বিদ্রূপ-কষায়িত লেখনীকে ফাঁকি দিতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথের হাস্যরস লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে তাঁহার মানসপ্রকৃতি ও ভাবাদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। ইন্দ্রনাথ বঙ্কিম-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের যে বিশিষ্ট মানস-প্রবণতা ও মতবাদ দেখা গিয়াছিল তাহার প্রভাব ইন্দ্রনাথের উপরেও দেখা গিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নব-জাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাবোন্নত বিপ্লব-বন্যা সুরু হইয়াছিল তাহা ঐ শতাব্দীর শেষভাগে অনেকটা নিরুদ্ধ ও শান্ত হইয়া আসিল। পাশ্চাত্য আলোকের স্পর্শে যখন আমাদের বহুদিনকার সুপ্তিমগ্ন দৃষ্টি উন্মেষিত হইয়াছিল তখন ক্ষণকালের জন্য একটা ভাঙ্গিবার ইচ্ছা, একটা পরিবর্তনের মোহ আমাদের অন্তর অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রচলিত ধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া একটা অনিশ্চিত ও বিজাতীয় আদর্শের স্বপ্নে আমরা বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

১। তাঁহার কথায় কথায় রস, সুতরাং সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। তিনি শুধু লেখায় পঞ্চানন্দ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূর্ত পঞ্চানন্দ। ঘরে বাহিরে কাজে অকাজে সকল অবস্থায় সকল স্থলে সকল সময়েই তাঁহার পঞ্চানন্দ মূর্তির স্ফূর্তি দেখা যাইত, রহস্য ও রসিকতা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। এমন যে শুষ্ক হাড়ের ব্যবসায়, আইন ব্যবসায়—তাহাতেও তাঁহার রসবিস্তারের কিছুমাত্র অজ্ঞতা ছিল না।

॥ ইন্দ্রনাথ স্মৃতি। ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী ॥

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই পাশ্চাত্য আলোক যখন আমাদের চোখে সুস্থ হইয়া আসিল তখন সেই আলোকে আমরা আমাদের সত্তাকে নূতনভাবে আবিষ্কার করিতে চাহিলাম। সেই আলোকে অতীতের অন্ধকার দূর হইল, বর্তমানের মোহ অপসারিত হইল। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের সুমিত সামঞ্জস্যসাধনই তৎকালীন শিক্ষিত লোকেদের উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু সবক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য বোধ ও মানসিক ভারসাম্য যে অক্ষুণ্ণ রহিল তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে অনেকস্থলেই পূর্ববর্তী যুগের পাশ্চাত্য মোহের প্রতিক্রিয়াস্বরূপই যেন সনাতন ভাবাদর্শের প্রতি একটা অন্ধ ও নির্বিচার আনুগত্য দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে যে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদস্বরূপই শেষভাগে নব্য হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটিল। কিন্তু বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা হিন্দুধর্মের যে উদার ও সার্বভৌম রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা সকলে উপলব্ধি ও অবলম্বন করিতে পারিলেন না। সেজন্য ধর্মের বাহ্য ও ব্যবহারিক দিকটিই তাহার সব রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান লইয়া অধিকাংশ লেখকের চিন্তা ও চেতনায় বদ্ধ হইয়া গেল। এই রক্ষণশীল ধর্মাসক্তির ফলে সর্বপ্রকার প্রগতিমূলক সামাজিক আন্দোলন এবং জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাস তখন নিন্দিত ও উপহসিত হইতে লাগিল। লেখকগণ অনেকেই নব যুক্তি ও বিচারবোধ দ্বারা প্রাচীন সমাজের অচল ও অনুপযোগী রীতিনীতিগুলিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। নারী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সাম্যবোধ, নারী-পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি এককালে প্রগতিবাদী লেখকদের দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকগণ ইহাদিগকে অত্যন্ত গর্হিত ও সমাজক্ষতিকর ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ় হস্তে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের কবিতায়, গিরিশচন্দ্রের নাটকে ও অমৃতলালের প্রহসনে প্রাচীনের প্রতি একটি অন্ধ মোহ এবং নূতনের প্রতি একটি বিকৃত বিদ্বেষের ভাবই দেখা যায়। তাঁহাদের এই মনোভাব কখনও গম্ভীর, অশ্রুমগ্ন জীবনগাথায় এবং কখনও বা লঘু হাস্যচপল জীবন-তামাশায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

(ইন্দ্রনাথ এই লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। সেজন্য তাঁহার লেখাতেও প্রগতিবাদী সমাজরূপের প্রতি তীব্র উপহাস এবং পুরাতন বিধিব্যবস্থার জন্য সুগভীর মমত্বই ধরা পড়িয়াছে।) ব্রাহ্মধর্মের উদার ও উন্নত

আদর্শ, বিধবা-বিবাহ পুনঃপ্রচলনের প্রচেষ্টা, জাতিভেদ দূরীকরণের আন্দোলন স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি বিষয় লইয়া তিনি তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আসর জমাইয়াছেন।) বাক্‌সর্বস্ব, তরল ভাবাশ্রয়ী ও দুর্বলচিত্ত বাঙালী যুবকদের ভারত-উদ্ধারের চেষ্টাও তাঁহার শ্লেষ-কণ্টকিত লেখনীর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে।) সমাজের মধ্যে যখন প্রবল প্রাণশক্তির প্রকাশ হয় তখন তাহার সংঘাতে কিছু ক্লেদাক্ত ফেনোচ্ছ্বাস উপরে ভাসিয়া উঠিবেই। শুধু কেবল ফেনোচ্ছ্বাসের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রাণশক্তির কল্যাণময় অস্তিত্বের মূল্য স্বীকার না করা অন্যায়। অবশ্য ব্যঙ্গকার জীবনপ্রবাহের উপচীয়মান ফেন-বুদ্‌বুদ-চঞ্চল অসার দিকটাই তাঁহার শর-নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই প্রবাহের প্রতি সামগ্রিক ও অপক্ষপাতী দৃষ্টির পরিচয় না দিলে তিনি কেবল শ্রেণীবিশেষের বিদূষক হন মাত্র, সর্বশ্রেণীর রসিক হন না। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরস তৎকালীন স্বাধীন ভাববিরোধী প্রাচীন আদর্শনিষ্ঠ সমাজের কাছে যতই প্রীতিকর হউক না কেন, চিরকালীন বিচিত্র রুচি ও ভাববিশিষ্ট লোকের কাছে কখনও আদরণীয় হইতে পারে না। তাঁহার দৃঢ় আপোসহীন সামাজিক মতবাদ ছিল বলিয়া তাঁহার তরল হাস্যধারার গভীরে সব সময়েই কোন সুস্পষ্ট রক্ষণশীল সমাধানের ইঙ্গিত থাকিত। 'পাঁচু ঠাকুরে'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, 'রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের—এখন আবার বলিতে হয়—পাঠিকা মহাশয়দের মনে থাকে।'

অর্থাৎ লেখকটিকে আমরা যতই লঘু ও তরল মনে করি না কেন, আসলে তিনি তাহা নহেন। তিনি গুরুগম্ভীর উপদেষ্টা, সমাজ-সংশোধনের মহৎ কর্তব্য পালন করিবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। হাসির খেলা দ্বারা ভুলাইয়া শাসনের জাঁতায় পেষণ করাই তাঁহার কাজ। 'পাঁচু ঠাকুরে'র পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদেশ নামক নক্সায় তিনি বলিয়াছেন, 'মহাব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত, দেবদত্ত মহাস্ত্র তোমার হস্তে দিয়াছি, বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইবে। যে পাপী সেই ভয় করে। তুমি পাপীর শাস্তি বিধান করিবে।' শাস্তি বিধান তিনি অবশ্যই করিয়াছেন, কিন্তু মুস্কিল এই যে, পাপী যে কে তাহা কোন্ পুণ্যবান বিচার করিতে পারেন? ভাল মন্দ সম্বন্ধে, চূড়ান্ত মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কাহারই বা আছে?

আশুতোষ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আজীবন সমাজহিতব্রতী স্বধর্মনিষ্ঠ আশুতোষের এই কাজ কোন্ উদারচেতা ব্যক্তি অন্যায় বলিয়া অভিহিত করিবেন? ইন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যে সত্যই মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মধুচক্রের সন্ধান লইতে যাইয়া শুধু যে হুলের খোঁচায় জ্বালাতন হইতে হইবে তাহা নহে, সেই মধুচক্রের অভ্যন্তরে যে মধু সঞ্চিত আছে তাহা আস্বাদ করিলেও বুঝা যাইবে যে তাহা ফুলের নির্যাস নহে তাহা পরিশুদ্ধ নিম্বরস।

ইন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা সাময়িকতার ভাবই লক্ষিত। সেজন্য আইন আদালত, স্বায়ত্তশাসন ও পৌরব্যবস্থা, ইলবার্ট বিল, কঙ্গরস, সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ ইত্যাদি বিষয় লইয়া তিনি যথেষ্ট রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াছেন। সমসাময়িক জীবন বৈচিত্র্যের দিকে সাংবাদিকসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল বলিয়া তাঁহার কাব্য ও উপন্যাসেও তিনি রসসাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সংবাদসাহিত্য সৃষ্টির দিকই অধিকতর প্রবণতা দেখাইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার সাহিত্য সমসাময়িক কালে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও পরবর্তীকালে তাহার মূল্য ও রস ফুরাইয়া গিয়াছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রনাথের হাস্যরসকে প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের হাস্যরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা কিছুতেই মানিতে পারা যায় না। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের হাস্যরসে যে কালাতিশায়ী সাধারণীকৃতি ও ভাব-গভীরতা রহিয়াছে ইন্দ্রনাথের হাস্যরসে তাহা নাই। তাহা ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহার আলোকময় পুচ্ছতাড়না দ্বারা সকলকে সচকিত ও ঝলসিত করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' এই দুইখানি হইল ইন্দ্রনাথের উপন্যাস। ইন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না। উপন্যাসে পরিবেশ-রচনা, সৌন্দর্য-বর্ণনা ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। 'কল্পতরু' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল এবং বাংলাসাহিত্যের প্রথম ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস বলিয়া সকল সমালোচকের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বইখানি

১। ॥ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ২৩॥

উপন্যাস হিসাবে সার্থক নহে, এবং ইহার কাহিনী এবং অন্তর্নিহিত রসধারার সহিত ব্যঙ্গরসের কোন অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্যাত্মক যোগ নাই। কাহিনীর মূল ধারা লঘু হাস্যরসাত্মক নহে, তাহা গুরু করুণরসাত্মক। যে কাহিনীতে ভ্রূণহত্যা নরহত্যা ইত্যাদির আতিশয্য রহিয়াছে, যেখানে তিন চারিটি অতি করুণ মৃত্যুর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে তাহার সহিত হাস্যরসের কোন মৌলিক ও স্বাভাবিক যোগ থাকিতে পারে না। স্নেহশীলা পিসী এবং হতভাগী বিমলার শোচনীয় মৃত্যু লেখকের সকল ব্যঙ্গকেই যেন চরম ব্যঙ্গ করিয়া সমবেদনার অশ্রুধারায় আমাদের অন্তর সিক্ত করিয়া দিয়াছে। লেখক ব্যঙ্গকৌতুকের যে সব উপাদান গ্রন্থমধ্যে আমদানী করিয়াছেন সেগুলি কাহিনীর ভিতর হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত নহে। সেগুলি লেখকের ব্যক্তিসত্তা হইতে কাহিনীর উপরে অনেক স্থলেই অসংলগ্নভাবে আরোপিত।[১] লেখকের ego অথবা অহং এত প্রধান যে, তিনি বার বার তাঁহার উপন্যাসের ঘটনা ও তাঁহার মধ্যস্থলে আসিয়া উপন্যাসের সহিত পাঠকের নিবিড় যোগ ঘটিবার পথে বাধা দিয়াছেন। তিনি যে টীকাটিপ্পনী, মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও অনেক স্থলেই অসময়োচিত ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে। স্বয়ং নায়ক নরেন্দ্রনাথকে লেখক কল্পতরু বলিয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত নরেন্দ্রের চরিত্রকে আমরা কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করিতে পারি না, সেজন্য তাহার সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব ও মন্তব্য আমরা অকারণ ও অসঙ্গত না বলিয়া পারি না। নরেন্দ্র হয়তো একটু নীচ, স্বার্থপর কপট ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের কোন গুরুতর ঘটনাতেই তাহার দায়িত্ব নাই। আসলে লেখকের রাগ ব্রাহ্মধর্মের উপর। নরেন্দ্রকে কপট ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রূপে অঙ্কন করিয়াই তিনি তাহাকে ব্যঙ্গের পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু নরেন্দ্র নহে, লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য আরও অনেক, যথা, স্বার্থপর, পরোপজীবী গবেশচন্দ্র, নীচ প্রবঞ্চক রামদাস, দাম্ভিক ও শোষক জমিদার কালীপদ ধর, কপট, ধর্মভেকধারী বাবাজী ইত্যাদি। চরিত্রগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া লেখক যে ব্যঙ্গরসের অবতারণা

১। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য মন্তব্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য—'কল্পতরুর যে রসিকতা তাহা ঔপন্যাসিক উৎস হইতে প্রবাহিত নহে, তাহা উপন্যাসের অগ্রগতি রোধকারী, অবান্তর মন্তব্যের সান্নিবেশ। আমরা যখন লেখকের রসিকতায় হাসি, তখন উপন্যাসের কথা আমাদের মনে থাকে না'
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ২য় সং পৃঃ ৩০৭

করিয়াছেন তাহার অনেক স্থলেই বর্ণনাশক্তি ও চরিত্র-চিত্রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গবেশচন্দ্রের আকৃতি-বর্ণনা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইতেছে—

'বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহা তদীয় মূর্তিদর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকমে শূকর-কেশর-সম্মার্জনীর শাসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু দুটি প্রকাণ্ড, যেন পানশী নৌকার পিতলের চোক। কানের পরিবর্তে, যেন দুর্গাপ্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধখান করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়া দিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের পিঠ। গোঁপের নীচে দাঁত, দাঁতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডার চর্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান।' মাঝে মাঝে লেখকের মন্তব্য ব্যঙ্গের ঝাঁজ হইতে মুক্ত প্রসন্ন রসিকতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তবে এরূপ নির্দোষ ও নিষ্কণ্টক রসিকতা তাঁহার বইয়ে বেশী নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গবেশচন্দ্র মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইলে মধুসূদনের যে সুখ হইল তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখক বলিয়াছেন—

'হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময় তূলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ, অন্ধকার গলি রাস্তার ভিতর লণ্ঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ, নিদ্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে চোরের যেমন সুখ; মালিনীর সহিত আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন সুখ, বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতালের যেমন সুখ; এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে হইলে গ্রন্থকারবিশেষের যেমন সুখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদনের তদপেক্ষাও অধিক সুখী হইল।'

ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ক্ষুদিরাম'কে খাঁটি উপন্যাস বলা যায় কিনা সন্দেহ।[১] লেখক ইহাকে গালগল্প বলিয়া ভালোই করিয়াছেন তবে ইহাকে ব্যঙ্গচিত্র—বলাই বোধ হয় ঠিক হইবে। ব্রাহ্মধর্ম এবং ঐ ধর্ম-প্রবর্তিত নানা প্রগতিমূলক আন্দোলনের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যেই এই

১। ঘটনা সন্নিবেশের আকস্মিকতা ও তরল রসিকতার অতি প্রাধান্যের জন্য গভীর একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের অভাব গ্রন্থখানির ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী হইয়াছে।

॥ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৩০৭—৩০৮ ॥

বইখানি লিখিত। লেখকের মুখপাত্র বোধ হয় বামুনঠাকুর। তাহার মুখ দিয়া বড় বড় উপদেশাত্মক কথা বলাইয়া লেখক এই গ্রাম্য অশিক্ষিত ও নিম্নবৃত্তিজীবী লোকটিকেও শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী ক্ষুদিরাম ও ভুসীভোজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে চাহিয়াছেন। কৈবর্তের ছেলে ক্ষুদিরাম বাবু সাজিয়া ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্য হইয়া উঠিল, ইহা দেখাইয়া লেখক ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদহীনতা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ভুসীভোজনের ভগিনী-উদ্ধারের বর্ণনা করিয়াও তিনি ব্রাহ্মদের বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের চেষ্টাকেও তীক্ষ্ণ শ্লেষের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন, পরিশেষে প্রেমনিকেতনে আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম সভ্য ও সভ্যাদের যে বক্তৃতা ও পারস্পরিক মিলনের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে চূড়ান্ত ব্যঙ্গের পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। সভার 'সভাপত্নী' শ্রীমতী নিস্তারের বক্তৃতা একটু উদ্ধৃত হইল। তিনি তাঁহার শঙ্খচিরুণী বিনিন্দিত চীঁ চীঁ রবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—

'হৃদয়রঞ্জনগণ! এবং হৃদয়রঞ্জিনীগণী! আমি এ সভার পত্নী হইয়া, ভয় পাইতেছি। আমার সব চেয়ে যোগ্যতরী বীরাঙ্গনা এ সভায় বিরাজমনা। (পুরুষ কণ্ঠে না না) কিন্তু যখন আমাকে সম্মান করাই সভ্য-সভ্যীদের অভিপ্রায় তখন আমার পশ্চাৎ পদী হওয়া আবশ্যক করে না। (করতালি) যেমন সাধ্য আমি, ততদূর পর্যন্তই নির্বাহ করিতে থাকিব। (খুব পার্বেন খুব পার্বেন শব্দ)।'

লেখকের ব্যঙ্গরসের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু রঙ্গরসের স্পর্শও আছে। সে-সব স্থলে লেখকের সহিত মিলিয়া একসঙ্গে তৃপ্তিকর হাসি হাসা যায়। স্ত্রীলোক লইয়া তিনি যে রসিকতা করিয়াছেন তাহা একটু উপভোগ করা যাক—

'স্ত্রীলোক চেতন নহে, অচেতন নহে, উদ্ভিদ নহে, তিন প্রকারের পদার্থের কোন পদার্থই নহে। স্ত্রীলোক, অপদার্থ। স্ত্রীলোক পৃথিবীতে হয় না, কেবল আকাশে ফোটে।...স্ত্রীলোকের কণ্ঠে শব্দ হয় বা, কেবল সঙ্গীত হয়, নেত্রে দৃষ্টি হয় না, কেবল কটাক্ষ হয়, রসনায় রস জমে না, শুধুই সুধা; ওষ্ঠাধরে হাসি নাই, কেবল বিজলি; নাসায় নিশ্বাস নাই, কেবল মলয়ানিল; ঐ যে বাহু মনে করিতেছ, উহা বাহু নহে, অশ্বমেধের অশ্ব বান্ধিবার নিমিত্ত বনলতা; তুমি যাহাকে পাদচারণ মনে করিতেছ, তাহা পাদচারণ নহে, উহা জ্যোতির লীলা মাত্র; উহাই দেখিবার জন্য আকাশে চপল চমকে—আমি আবার স্ত্রীলোক জানি না'

একস্থানে নর মৎকুণের যে ভীষণ সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রবল কৌতুকরসে আমাদের হাস্যপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। ছারপোকা সম্বন্ধে লেখকের গুরুগম্ভীর বর্ণনা শুনুন—

'নরমৎকুণের ভীষণ রণ বর্ণনে আমার প্রায় সাধ হইতেছে। কিন্তু তাহা ত পারিব না। কেহই যাহা করিতে সাহস পায় নাই, আমি সামান্য ব্যক্তি কেমন করিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব? নিরাপদ কন্দর হইতে ছারপোকার সেই উদ্যমপূর্ণ নিষ্ক্রমণ, সেই নিঃশব্দ পদসঞ্চার, মানবগ্রীবার উপর সেই অন্ত্রভেদী অব্যর্থ সন্ধান, পার্শ্ব পরিবর্তন হইতে না হইতে বিদ্যুৎ গতিতে সেই অন্তর্ধান,—এসব বর্ণনা করা কি আমার সাধ্য ।'

ইন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল 'ভারতউদ্ধার' নামক পঞ্চ সর্গবিশিষ্ট ব্যঙ্গ কাব্য। এই বইখানির মধ্যেই তাঁহার ব্যঙ্গসৃষ্টির সর্বাধিক নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বইখানি মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের এক অতি নিখুঁত ও সার্থক প্যারডি। 'মেঘনাদে'র অনুকরণে ইহার সূচনাতেও বাণীবন্দনা রহিয়াছে। শুধু কেবল তাহাই নহে, ইহার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিপুণ অনুকরণ রহিয়াছে, এমন কি মধুসূদনের নামধাতু প্রয়োগের বিশিষ্টতাকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়া ইন্দ্রনাথ অনুরূপ বহু নামধাতু প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—বর্দাস্তিতে, হস্তিল, দ্বিতীয়িলে, ভোতাইতে, শীতলিয়া, পরাস্তিব, কাসাইল, হাঁচাইল ইত্যাদি। ইন্দ্রনাথের উপন্যাসের মত এই কাব্যে ব্যঙ্গরসের ধারা অসংলগ্ন ও নিঃসম্পর্কিত নহে, তাহা কাহিনীর ভিতর হইতে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত। কাব্যখানির কাহিনীর মধ্যে এমন একটি উদ্ভট মৌলিকত্ব রহিয়াছে, ইহার পরিবেশ-রচনায় মাঝে মাঝে এমন আকস্মিক anti-climax সৃষ্টি করা হইয়াছে যে ইহা পড়িবার সময় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত প্রবল হাস্যবেগে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে হয়। ভারত উদ্ধারে যাইবার পূর্বে সংগ্রামের নায়ক বিপিন তো স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়াই আকুল। স্ত্রীও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, যদি নিতান্তই যাইতে হয়, তবে যাইবার পূর্বে তিনি যেন একটু আলু ভাতে ভাত খাইয়া যান। যেমন বীর তেমনি তার খাদ্য বটে। বিপিনের স্ত্রীর কথাগুলি শুনা যাক—

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,

(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।" বিপিন সম্মত,

ইংরেজ ও বাঙালী সৈন্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ আঘাতের সহিত উদ্দাম কৌতুকের মিলন হইয়াছে। যুদ্ধের climax হইল সেখানে, যেখানে একদিকে লাউ ও অন্যদিকে বঁটি প্রহরণ লইয়া প্রবল যুদ্ধ বাধিল। লেখকের বর্ণনা কিছুটা উদ্ধৃত হইল—

অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ,
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙালী সৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গবিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি বদন লক্ষ্যি, অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু
রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবনভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।

ইংরেজরা এ-পর্যন্তও অবশ্য সন্ধির প্রস্তাব করে নাই, কিন্তু যখন উকিল সৈন্যগণ ভীম পরাক্রমে বঁটি ও শামলা লইয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর হামলা করিল তখন তাহারা বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিল—

তথাপি উকীল সৈন্য বঁটি হস্তে করি,
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক হারিল ইংরেজ।

শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল

আলোচ্য কাব্যের নামকরণ হইতেই কবির ব্যঙ্গের মূল লক্ষ্য সহজেই বুঝা যাইবে। জাতীয় আন্দোলনের মহৎ আশা ও আবেগরঞ্জিত দিক লইয়া অনেক লেখকই অনেক কাব্য উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ঐ আন্দোলনের অসার ও অবাস্তব দিকটিই হাসির রঙে রাঙাইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিলেন। বোধ হয় লেখকের প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার-বদ্ধ মন বিদেশী ভাবাশ্রিত ঐ আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দিহান ছিল। যে সব স্বদেশী ভাবোদ্দীপিত যুবক ইংরেজের হাত হইতে ভারত উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিত তাহাদের পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালী কত অবাস্তব ও হাস্যকর এবং তাহাদের চরিত্র কত ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষোচিত লেখক ব্যঙ্গের খোঁচায় তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। নায়ক বিপিন স্বদেশের উদ্ধারচিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার আর তো কোন অস্ত্র নাই, আছে কেবল আমাদের দেশীয় বঁটি, সেই বঁটি দিয়াই সে ইংরেজদের একেবারে বঁটাইয়া দিতে চায়—

হায় রে দুঃখের কথা অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি দেহে।
বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজ।

এ হেন বীরপুরুষ কিন্তু পুলিশের ভয়ে এমনি ভীত যে, বন্ধুকেই পুলিশ ভাবিয়া একেবারে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন এবং শেষ পর্যন্ত একেবারে—

আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন রহিত,

আর্য কার্যকরী সভায় স্বদেশী বীরগণের শূন্যগর্ভ আস্ফালন ও ডন কুইক্সোটের মত যুদ্ধের সদর্প আহ্বানও লেখকের দ্বারা কম উপহসিত হয় নাই। বীরত্বের কি ভয়ঙ্কর বহিঃপ্রকাশ—

বলিতে বলিতে
ভীমবেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কসিল।

প্রবল শক্তিসম্পন্ন ইংরেজদের সহিত অস্ত্রশস্ত্রহীন বাঙালীদের সংগ্রামের বিসদৃশতা লইয়াও লেখক কঠিন বিদ্রূপ করিয়াছেন। সুয়েজ খালে ছাতুর বস্তা ফেলিয়া ইংরেজদের দেশে ফিরিবার পথ রোধ করা এবং বঁটি ও বালিমেশানো জলভর্তি পিচকারী লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া এবং গোলাবারুদের অভাবে লঙ্কা পটকা দ্বারাই যুদ্ধ চালাইবার আয়োজনের মধ্যে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের হাস্যকর অসম্ভাব্যতাই লেখকের ব্যঙ্গমিশ্রিত লেখনীদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের পরাজয় এবং বাঙালীদের জয় ও ভারত উদ্ধারের বর্ণনার মধ্যে লেখকের একান্ত কঠোর শ্লেষাত্মক দৃষ্টিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'পাঁচুঠাকুরে'র মধ্যে নক্সা অথবা চুটকী জাতীয় লেখাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখক কাব্য-উপন্যাসে যে সব বিষয় সম্বন্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি এই বইয়ের মধ্যে আরও স্পষ্টতর এবং কঠোরতরভাবে লেখকের দ্বারা আলোচিত এবং উপহসিত হইয়াছে। কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে এখানে ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেন নাই, লেখক স্বয়ং হাতিয়ার লইয়া এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সমসাময়িক সমাজনীতি ও রাজনীতির কোন বিষয়ই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও সংস্কারের উদ্ভট মোচড় দিয়া তিনি ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণের দশ অবতার আমরা জানি, কিন্তু পঞ্চানন্দের দশ অবতার হইল পুলিশ, আদালতের আমলা, খোদ মেজিষ্টার, জেলার জজ, উকীল, জমীদার, ব্রহ্মোত্তর-ভোগী সংবাদপত্র, প্রজা এবং দশম অবতার কল্কী হইলেন স্বয়ং পঞ্চানন্দ। পঞ্চানন্দ বঙ্গদেশের যে ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা জানিলাম—

'বঙ্গদেশে এক্ষণে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত; কতক পুরুষ জাতি, কতক স্ত্রীজাতি।

এই পুরুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, রাজপুরুষ, দ্বিতীয় রোজকেরে পুরুষ; তৃতীয়, কাপুরুষ।'

সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত লোকেদের অসার মর্যাদা ও অসঙ্গত গৌরব লইয়াও তিনি অনেক বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। মান নামক রচনাটির মধ্যে তিনি বলিলেন—

'ধোপাকে ভার দিও। সে দুটী পয়সায় তোমার সঙ্গদোষ, চরিত্রদোষ, সকল দোষ ধুইয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া

দিবেঃ তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবকে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে; আর ধোপা দু পয়সার চাকর। মানের জন্য আবার ভাবনা?'

বাঙালীর অনুকরণপ্রিয়তা, কৃত্রিম রাজনীতি বিলাস; অসার প্রগতিবাদিতা ইত্যাদি লইয়া বহু স্থানেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, তবে ইহার চূড়ান্ত রূপ দেখিতে পাই বঙ্গীয় ভারত হিতৈষীর প্রতিজ্ঞাপত্র নামক রচনায়। লেখকের সর্বাপেক্ষা রাগ বোধ হয় স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সাম্যবোধের উপর। স্ত্রী-স্বাধীনতা নামক রচনাটিতে একটি কৌতুককর গল্পের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের উদ্ভট অবস্থা-বিপর্যয়েব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গল্পের নায়িকা কামিনীসুন্দরী বাহিরে কাজকর্ম, ফুর্তি ও আমোদ লইয়া থাকেন এবং ঘরে থাকেন তাঁহার পরিবার ভৈরব দাস। লেখকের কথায়—

'পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনীসুন্দরী আদর করিয়া তাহাকে ভয়ী বলিয়া ডাকেন। ভয়ী, কামিনীসুন্দনী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।'

তবে উদ্দাম কৌতুকমিশ্রিত ব্যঙ্গের উৎকট আতিশয্যের নিদর্শন বোধ হয় রহিয়াছে গোরাচাঁদ নামক আখ্যায়িকার মধ্যে। আখ্যায়িকার নায়ক নারী-পুরুষের সাম্যে প্রবল বিশ্বাসী। তাহার স্ত্রীর প্রসববেদনার কথা শুনিয়া সে ভাবিল, এ বিষয় অন্যায়; স্ত্রী জাতিই কেবল প্রসববেদনায় কষ্ট পাইবে আর পুরুষ তাহার কোন অংশই গ্রহণ করিবে না। এ অন্যায় সে কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। সে বলিল,

('হ্যাঁ আমি স্বীকার করি যে, এপর্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতির বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কু-অভ্যাস। কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কুসংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়তে হয়, বাগ-বাজার ছাড়তে হয়—সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্চি না। আমি ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ি করব, সেখানে নিজে প্রসব করব, —তবু তোমাকে আর কষ্ট সহ্য করতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিতে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।')

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

যোগেন্দ্রচন্দ্র ইন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। বস্তুত উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও সাহিত্যধর্মের মধ্যে এক গভীর মিল দেখা যায়। তবে রচনাশক্তিতে ইন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর এবং তাঁহার হাস্যরসও অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরমত-অসহিষ্ণুতা ও রক্ষণশীলতা ইন্দ্রনাথ অপেক্ষাও বেশী ছিল। সেজন্য বইয়ের পর বইয়ে একই ধরণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণাত্মক দৃষ্টি ও রচনাভঙ্গির পরিচয় পাইয়া বিরক্ত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে বটে, কিন্তু লেখকদের আমরা সব সময়ে সংকীর্ণ পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে দেখিতে চাই। যে মুহূর্তে আমরা তাঁহাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা সংকীর্ণ দলীয়তা আবিষ্কার করিয়া ফেলি সেই মুহূর্তেই তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল আমাদের কমিয়া যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী এক উদার ও সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া আমাদের রসোন্মুখ চিত্তকে অবিচ্ছিন্নভাবে আকর্ষণ করিয়া চলেন। তাঁহার কোন মত বা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে পাঠকদের অসচেতন মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, প্রকাশ্যভাবে তাহাদের পূর্ব প্রস্তুত মনের উপর চাপিয়া বসে না। যোগেন্দ্রচন্দ্রও ইন্দ্রনাথের ন্যায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও পরোক্ষ রীতির মধ্য দিয়া তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই, মুদ্গর ও মুষল হাতে লইয়া স্বয়ং প্রকাশ্য সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে সাহিত্যিক যোদ্ধার সুবিধা এই যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ নির্বাক ও নিরস্ত্র। সেজন্য প্রতিপক্ষকে তিনি পরাজিত ও ধূলিশায়ী করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে যে পাঠকের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন না। যোগেন্দ্রচন্দ্রের আত্যন্তিক গোঁড়ামি ও অতিশয়িত উষ্মার ফলে পাঠকের মন অনেক সময়েই তাঁহার সহিত সহযোগিতা করে না এবং সেজন্য তাঁহার শিক্ষা ও শাস্তিদান অনেক স্থানেই ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের বইগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্য হইল শিক্ষিত, প্রগতিবাদী, সমাজ সংস্কারক ও স্বদেশহিতৈষী পুরুষ ও নারী চরিত্র। সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে বলা যায়, তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ-

বিদ্ধ চরিত্রের টাইপ হইল 'মডেল ভগিনী'র নায়িকা কমলিনী ও 'চিনিবাস চরিতামৃতে'র নায়ক চিনিবাস। এই দুইটি চরিত্রকেই বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন পরিবেশে তাঁহার লেখায় আমরা বার বার পাইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, কপট ও অন্তঃসারশূন্য জাতীয় আন্দোলনের প্রতি গভীর ঘৃণা, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কঠোর ক্রোধ এবং শ্রদ্ধাভক্তিহীন বিজাতীয় আদর্শের প্রতি একান্ত অশ্রদ্ধাই তাঁহার রচনার সর্বত্র পা স্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার আদর্শ চরিত্র কমলিনীর স্বামী ব্রাহ্মণ—আচারনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ ও সংসার-বিরক্ত। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ যে সমাজের প্রতিনিধি তাহারও যেমন দোষ ও দুর্বলতা আছে, তেমনি কমলিনী যে সমাজের প্রতিনিধি তাহাও শুধুমাত্র বিকৃতি ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ নহে। অথচ লেখকের দৃষ্টি ঐ সব দিকে নিবদ্ধ হয় নাই। সেজন্য হাস্যরসিকের উদার ও সমদর্শী মনোভাব তাঁহার নাই। তাঁহার হাসিতে দলনির্বিশেষে সকলে মিলিত হইয়া যোগ দিতে পারি না।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাসি শাণিত ব্যঙ্গের সূচিমুখে উদ্গত হইয়াছে। লেখকের মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়ামি এবং বিপক্ষমতের প্রতি অসংবৃত বিদ্বেষের ফলে তাঁহার ব্যঙ্গোৎসারিত হাসি অনেকস্থানেই শুকাইয়া নিছক গালাগালি অথবা নীরস তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হইয়াছে। লেখকের ব্যঙ্গরস প্রধানত চরিত্রাশ্রিত, ঘটনাশ্রিত নহে। তিনি ঔপন্যাসিক বটে, কিন্তু উপন্যাসের জটিল ঘটনা সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহা হইতে ব্যঙ্গকৌতুকের ধারা উৎসারিত করিতে পারেন নাই। তুচ্ছ বিষয়কে গুরুতর ভাষার আবরণে আবৃত করিয়া এবং লঘু ও হীন চরিত্রকে ছদ্মগম্ভীর অথবা mock-heroic রীতিতে বর্ণনা করিয়া তিনি হাস্যরস উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন। লেখকের হাস্যরসের আর একটি উৎস হইল অতিরঞ্জন। অবশ্য হাস্যরস সৃষ্টি করিতে যথাযথ ঘটনা ও চরিত্রকে একটু বাড়াইয়া বলিতে হয় তাহা ঠিক, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের অতিরঞ্জন অনেক সময় প্রবল হাস্যকৌতুক উদ্রেক করিলেও তাহা সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। অনেক স্থলে এই অতিরঞ্জনের ফলেই তাঁহার লেখায় সূক্ষ্ম ও মার্জিত রুচির অভাব দেখা যায়। যে দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন সেগুলি অতিশয় অতিরঞ্জিত হওয়াতে যেমন অবিশ্বাস্য ও উপেক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি লেখকের রচনাও অশ্লীল ও অমার্জিত ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।[১]

১। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'লেখকের বিদ্রূপাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস সৃজনে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় সর্বত্রই বিদ্যমান। অবশ্য এই প্রণালীতে

যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রধানত উপন্যাসিক, তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ, যথা—'কালাচাঁদ' 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি বৃহৎ উপন্যাসের শ্রেণীতে পড়ে। 'বাঙ্গালীচরিত, নামক গ্রন্থের তিনটি ভাগে ছোট গল্প ও নক্সা জাতীয় রচনার সমষ্টি রহিয়াছে। উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মডেল ভগিনী' ও 'চিনিবাস চরিতামৃত' এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যঙ্গরসাত্মক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। তবে ঔপন্যাসিক হিসাবে যোগেন্দ্র-চন্দ্রকে কখনই খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। কাহিনীর নিপুণ বর্ণনা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-সৃষ্টি, নরনারীর সুগভীর চরিত্র-বিশ্লেষণ কোন দিক দিয়াই তাঁহার উপন্যাস উন্নত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। (তাঁহার ব্যঙ্গরসাত্মক উপন্যাসেও ব্যঙ্গরসের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্রভাবে উৎসারিত হয় নাই।) 'মডেল ভগিনী'তে কমলিনীকে বিদ্রূপ করিতে করিতে মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া তাহাকে যেরূপ নারকীয় চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগের মধ্যে এমন করুণ ও বীভৎস রসের অবতারণা করিয়াছেন এবং অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্যদুষ্ট শাস্ত্রালোচনা এত বেশী প্রাধান্য পাইয়াছে যে ব্যঙ্গকৌতুকের পরিবেশ যেমন রূঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তেমনি পাঠকের আনন্দজনক রসানুভূতিও তাহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। 'চিনিবাস চরিতামৃতে'ও চিনিবাসের বৃদ্ধা মাতার শোকাবহ মৃত্যুতে উপন্যাসের ব্যঙ্গাত্মক হাস্যপ্রবাহ করুণরসে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চিনিবাসের কোন উৎকট প্রায়শ্চিত্ত কিংবা বীভৎস পরিণতি নাই বলিয়া লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ পাঠকের অন্তরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এখানে লেখক নিজে শাস্তি দেন নাই, সেজন্যই পাঠকের ঘৃণা ও ক্রোধপূর্ণ মন তাহার শাস্তির চিন্তায় উন্মুখ হইয়া উঠে।

'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের প্রতি লেখকের তীব্রতম বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। তৎকালীন ব্রাহ্মদের আদর্শ ও আচরণের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে হয়তো কিছু কিছু কৃত্রিমতা ও আতিশয্য দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সেগুলিকেই বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত মুখে উদ্ঘাটন করা হয়তো শোভন ও সঙ্গত নহে। কমলিনীর পিতা ডে' রামচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের উদারনীতিতে বিভোর হইয়া নাপিতকে প্রেমালিঙ্গন দিতে

হাস্যরস-সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সম্পূর্ণ ইতরতা-বর্জিত নহে। স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়া সুরুচি ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

॥ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৩০৮ ॥

উদ্যত হইয়াছিলেন, গুরুদেবের গলায় গলরজ্জু দেখিয়া দুঃখে সহানুভূতিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এসব বিষয়ের বর্ণনা ব্যঙ্গমূলক হইলেও যথেষ্ট হাস্যজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মদের ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ লইয়া যে উৎকট ব্যঙ্গ বইখানাতে করা হইয়াছে তাহা সংযম ও শালীনতার সীমা অতি অশোভনরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। 'মডেল ভগিনী' এই নামটির মধ্যেই লেখকের কটু বিদ্রূপ ধরা পড়িয়াছে। এই ভগিনী অথ.ৎ কমলিনীর যে চরিত্র-চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা প্রথম দিকে সহনীয় ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাতে সরস ও উপভোগ্য হইলেও শেষদিকে লেখকের অনাবৃত ও অসহিষ্ণু ঘৃণায় নিতান্তই বিকৃত ও বিরস হইয়া পড়িয়াছে। ব্যঙ্গের মধ্যে লেখকগণ সাধারণত শ্লেষ অথবা ব্যাজস্তুতিরীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বর্ণিত প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে একটা বৈপরীত্য থাকে বলিয়াই তাহা পাঠকের কাছে আমোদজনক ও আকর্ষণীয় হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে লেখক সেই ভিতর ও বাহিরের বৈপরীত্য বজায় রাখিতে পারেন না, যেখানে প্রচ্ছন্ন কণ্টক ও অন্তঃশায়ী আঘাত প্রকাশ্য বিচার ও অনাবৃত শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেখানে ব্যঙ্গ কোথায়, রসও বা কোথায়? লেখক কমলিনীর প্রতি তাঁহার বিষম বিরূপতা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একস্থানে বলিয়াছেন,

'কলি-কলুষ-নাশিনী কুল-পঙ্কজিনী কমলিনী কোথায়? সেই বঙ্গভূমি-দুন্দুভি, সেই দেব-দৈত্য-দানব-দলনী-দিগম্বরী, সেই ত্রিতাপ-নাশিনী তারা ত্রিনয়নী কোথায়? সেই সদাদ্বন্দ্ব সমররঙ্গিণী, সেই অনন্ত রূপিণী ভুবন ভুলানী উন্মাদিনী কোথায়? সেই শিক্ষিত পুরুষ প্রাণহারিণী, সেই ভবধামে ভ্রাতাময় জীবনী, সেই আদর্শ রমণী, মডেল ভগিনী আজ কোথায়?'

কমলিনী চরিত্রের এই অতিরঞ্জিত ভাষ্য শুনিয়া আমাদের হাস্যের পরিবর্তে বরং লেখকের প্রতি বিদ্রূপেরই উদ্রেক হয়। কমলিনীর অতি কমনীয় স্পর্শ-কাতর ভাববিহ্বলতা, তাহার ক্ষণে ক্ষণে বিলাপ, হা-হুতাশ, মূর্ছা ভ্রাতাদের প্রতি তাহার মধুর ও পবিত্র অনুরাগ ইত্যাদি বিষয় লইয়া লেখক যে সরস ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা খুবই উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কারাবদ্ধ স্বামীকে অখাদ্য খাওয়াইবার দৃশ্যে তাহার চরিত্র যেমন অস্বাভাবিক হইয়াছে, তেমনি অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়াছে তাহার অন্তিম নারকীয় প্রায়শ্চিত্তভোগের দৃশ্য। মানুষকে হাসাইবার উদ্দেশ্য যিনি লইয়াছেন তিনি মানুষের প্রতি কঠোরতম শাস্তি বিধান করিতে একটুও কাতর হন না, ইহাই আশ্চর্য মনে হয়।

কমলিনীর মত এত অধিক বিদ্রূপ ও ঘৃণা লেখকের কাছে আর কেহই পায় নাই বটে, তবে শিক্ষিতা, সংস্কারমুক্তা, আধুনিক ভাবাপন্না নারীচরিত্র বহুস্থলেই তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে। 'চিনিবাস চরিতামৃতে'র মধ্যে গৃহশাসনমুক্তা, আলোকপ্রাপ্তা রমণীদের দ্বারা স্বদেশ-উদ্ধার প্রচেষ্টাকে তীব্র উপহাস করা হইয়াছে। অশ্বচালনায় পটীয়সী হইলেই মেয়েদের দ্বারা স্বদেশ-উদ্ধার সম্ভব ইহা দেখাইয়া উহাদের অশ্বচালনার যে প্রতিযোগিতা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। নিতাই তাঁতীর অশিক্ষিত বোন রামমণিকে যেভাবে অদ্বিতীয় জ্ঞানবতী ও চিনিবাসের রাজনৈতিক কর্মের প্রধান সহকর্মিণীরূপে অঙ্কন করা হইয়াছে তাহাতে চরিত্রটি বিশেষভাবে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। রামমণি বাংলা ভাষায় কথা খুব কমই বলে। গম্ভীরভাবে সে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যে সব উপদেশ বিতরণ করে তাহা লঙ্ঘন করা অন্য কাহারও পক্ষে তো নহেই, এমন কি স্বয়ং চিনিবাসের পক্ষেও সম্ভব নহে। চিনিবাসের অভাগী মা ছেলের জন্য ব্যাকুল মৃতপ্রায় হইয়া যখন অবশেষে সেই রাজা উপাধিধারী সন্তানকুলতিলকের সন্ধান পাইল এবং তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন রামমণি চিনিবাসকে দেবভাষায় আদেশ দিল—

'রাজন! কিং করিতেছং—ইয়াং বৃদ্ধাং দুষ্টাং পাপিনিং ভিখারিনীং পদাঘাতং কৃত্বাং—দূরং কুরু, দূরং কুরু,—বলা বাহুল্য রামমণির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। আধুনিক শিক্ষার ফলে যে সব নারী চিরপ্রচলিত গার্হস্থ্য ধর্মের নীতি ও আদর্শগুলি বিসর্জন দেয়, যাহারা সাম্য ও উন্নতির কথা মুখে ঘোষণা করিয়া শাশুড়ী, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি নিতান্তই অভক্তি ও অবজ্ঞা দেখাইয়া থাকে তাহাদের প্রতি লেখক 'বাঙালী চরিতে'র বিভিন্ন রচনায় বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মেমসাহেব নামক যে নক্সাটি আছে উদাহরণ স্বরূপ তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলা ভাষায় আউট এবং ইংরেজী ভাষায় হব হব আউট মিসেস কাদম্বিনী মিত্র রোগীদের ধরিয়া ধরিয়া চিকিৎসা করেন। স্বাস্থ্য ও শালীনতা সম্বন্ধে তাঁহার কড়া নজর। শাশুড়ীর হাতে পায়ে গোবর মাখা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠেন, তাহার গায়ে সেমিজ না দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হন, বলেন—

'তোমার অঙ্গে সেমিজের উপর কোর্তা নাই কেন—আমার সম্মুখে অন্ততঃ

সেমিজ গায়ে দিয়া আসা উচিত ছিল—বৃদ্ধে, তোমার আবরণহীন বেশ দেখিয়া আমার অতিশয় লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তুমি স্বামী নগেন্দ্রের জননী, সুতরাং তুমি কিছু দয়ার পাত্রী,—তোমাকে আমার এই কোর্তাটী দিলাম, শীঘ্র অন্তরালে গিয়া অঙ্গ বিধৌত করত উহা পরিধান কর।'

শিক্ষিত, সমাজ-সংস্কারকামী ও নকল স্বদেশ হিতৈষী যুবকদের চরিত্র লইয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বহুস্থানে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান চিনিবাস-চরিত্র। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে উপন্যাসখানি লিখিলেন তাহার নামকরণের মধ্যেই তীব্র শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত রহিয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের অনুকরণে 'চিনিবাস চরিতামৃত' এই নামকরণ করিয়া লেখক মর্মান্তিক ব্যাজস্তুতির পরিচয় দিয়াছেন। সামান্যতম অবস্থা হইতে চিনিবাসের অভাবনীয় উন্নতি এবং রাজা উপাধি প্রাপ্তির কৌতুককর কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিতকে মনে করাইয়া দেয়। বইখানিতে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি কঠোর বিদ্রূপ অকারণ ও অসঙ্গত নহে। চিনিবাসের মত অনেক নকল স্বদেশনেতাই সাধারণ লোকেদের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজের নীচ স্বার্থ সিদ্ধ করে এবং জনবিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া শুধুমাত্র নিজের সম্মান ও সম্পদই বৃদ্ধি করে। কিন্তু যিনি দেশের কথা চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া আকুল তিনিই তাঁহার বৃদ্ধা, স্নেহাতুরা মাতার প্রতি এত নির্মম ও হৃদয়হীন। লেখক ছদ্ম বাহ্যসত্তার সহিত প্রকৃত সত্তার এই বৈপরীত্য দেখাইয়া ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সহায়সম্বলহীনা হতভাগী মাতা পুত্রের নাম জপ করিতে করিতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে তাহাকেই সম্বোধন করিয়া স্বদেশের উদ্ধারকারী সন্তান লিখিলেন—

'অয়ি! মায়াবিনি! দুষ্টচরিত্রে! কুলকলঙ্ককারিণি। কুলস্যাস্যবিনাশিনি! তোর মুখ দেখিলেও পাপ হয়। তোকে জননী সম্বোধন করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।' টাউন হলে চিনিবাসের লোমহর্ষণ বক্তৃতার বর্ণনায় ব্যঙ্গের সহিত রঙ্গরসও মিলিত হইয়াছে। সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় চিনিবাস জাতিভেদ, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সুপবিত্র ভ্রাতৃভাব স্থাপনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। জ্বালাময়ী ভাষার স্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

'ভারতে সেই ভ্রাতৃভাবের অভাব—সেই ভাব—সেই মহাভাব। ভারতীয় নরনারী মধ্যে এখনি প্রচলিত হউক—এখুনি প্রচলিত হউক—আর, বিলম্ব সহে না—সহে না, সহে না। (ঘন ঘন করতালি)।'

চিনিবাসের মত চরিত্র লেখক আরও কয়েকটি সৃষ্টি করিয়াছেন। 'বাঙ্গালী চরিতে'র প্রথম ভাগে প্রার্থনা নামক গল্পটিতে বেকার যুবকদের স্বদেশ-উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে উপহাস করা হইয়াছে। 'বাঙ্গালী চরিত' দ্বিতীয় ভাগের বড়বাবু, গদাধর, ক্যাবলচন্দ্র ইত্যাদি চরিত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। গদাধর লেখাপড়া শিখিয়া মস্ত একজন দেশভক্ত হইয়া বসিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ওজস্বিনী ভাষায় ছাড়া সে কথা বলিত না। একদিন তাহার বাল্যবন্ধু হরিদাস তাহার চোখ টিপিয়া একটু রসিকতা করিতে গিয়াছিল বলিয়া গদাধর বিষম ক্রোধে তাহার প্রতি তেজোগর্ভ ছন্দোবদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিল—

উত্তরিল, গদাধর, ক্রোধে কম্প দেহ—
কে তুমি হে কৃষ্ণকায়? ভোমরা ভরম
হয় দেখি তব দেহ; কুকণ্ঠে উগার
কেন কাল পেঁচা সম কিচমিচে ধ্বনি;
(এবে) অনেক সঙ্গেতে আসে সখা সখা বলি
আলাপিতে মোর সনে এ ঐশ্বর্য কালে।
ভাই বল, খুড়া বল, বাবাইয়া বল—
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়!

হঠাৎ-বাবু ক্যাবলরামের সর্বাপেক্ষা বেশী রাগ বাবার উপরে। বাবার রং কালো বলিয়াই তো ক্যাবলরামের রং কালো হইয়াছে। তাহার এই রঙের জন্য ইংরাজের বুট-পদ-রজ ও সাবান মাখা সবই ব্যর্থ হইল। পিতাকে দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া পুত্র মনে মনে বলিতেন—

'রে মূর্খ পিত! তোমার বর্ণ দগ্ধ অঙ্গারের ন্যায় এরূপ কৃষ্ণবর্ণ কেন? তোমার নিমিত্তই, প্রতিদিন শতবার বিধৌত হইলেও আমার এ দেহের মলিনত্ব ঘুচিতেছে না; আমি বলিতেছি—এ পাপে তোমার সদ্গতি লাভ হইবে না।'

'মডেল ভগিনী'তে কমলিনীর বিলাত-ফেরত দাদা চ্যাটার্জী সাহেবের উৎকট সাহেবীয়ানা লইয়াও লেখক কম বিদ্রূপ করেন নাই। চ্যাটার্জী সাহেবের গায়ের রঙও ক্যাবলরামের মতই আলকাতরাকেও হার মানায়, অথচ নিজেকে তিনি খাস বিলাতী সাহেব বলিয়াই মনে করেন। সব কিছু দেশী জিনিসের প্রতি তাঁহার বড়ই ঘৃণা। বাংলা ভাষায় কথা বলা তিনি নিতান্তই অপমানজনক মনে করিয়া থাকেন। লেখকের কথায়—

'চ্যাটার্জী সাহেব, বাঙ্গালা কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছেন। বুঝিতে

পারুক আর না পারুক—প্রায় পনের আনা লোকের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে মনের ভাব বদল করেন। যেখানে নিতান্ত উপায় নাই সেখানে তাঁহার ভাষা হিন্দী, তবে কদাচিৎ দু' একস্থলে ব্যতিক্রম আছে—তখন ভাষা, বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা। যথা—কমলিনীর মাতা আহারের সময় চ্যাটার্জিকে যদি বলেন, বাছা, আর একটু খাও। চ্যাটার্জি বাঙ্গালায় উত্তর দেন, হামি আর খাইতে পারব না।'

যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখার অধিকাংশ স্থলে কঠোর ব্যঙ্গবিদ্রূপের আতিশয্য থাকিলেও মাঝে মাঝে কটু ও তিক্ত রসবর্জিত মৃদুমধুর শ্লেষমিশ্রিত হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাঙ্গালী চরিতে'র কয়েকটি লেখায় এই ধরণের হাস্য-রসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। হঠাৎ-কবি গোবর্ধনের কাব্যিকতা লইয়া লেখক একটি মনোরম পরিহাসাত্মক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। দাসী যখন আসিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, বেলা অনেক হইয়াছে, মাঠাকরুন এখনও ভাত খেতে পান নাই, আপনি শীঘ্রই আসুন', তখন গোবর অনবদ্য কবিতায় উত্তর দিল—

যাও দাসী ধীরে ধীরে মন্থর গমনে ;
পার্থিব মাতাকে বল—'ভাত খাবো না।'

মাতা আশঙ্কিত হইলেন, সত্যই ছেলে পাগল হইয়া গেল কিনা, কিন্তু ছেলে তাহাকে ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাহার স্তোত্র রচনা করিল—

কজ্জল পূরিত লোচন ভারে,
স্তনযুগ শোভিত মুক্তা হারে—

মা কিন্তু এই স্তোত্র শুনিয়া প্রসন্ন হইলেন না, তাহার মাথায় জল ঢালিয়া বিষ্ণুতৈল মাখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহরহস্য নামক গল্পচিত্রটির মধ্যে কামিনীকুমার যখন জানিল যে, তাহার প্রস্তাবিত বধূ ইংরেজীতে আউট নহে তখন বিবাহ ও সংসারের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়াই একদিন অন্তর্ধান করিল। নব্যপন্থী বাবুদের ইংরেজী-জানা কন্যা বিবাহ করিবার উৎকট সখ লইয়া লেখক এখানে পরিহাস করিয়াছেন। পূজার চিঠিতে প্রবাসী স্বামীর প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ জানাইয়া স্ত্রী কিভাবে পূজার লম্বা ফর্দ পেশ করিয়াছেন তাহার বর্ণনাও বিশেষ হাস্যজনক হইয়াছে। ছোকরা বাবুর মধ্যে নয় বৎসরের বধূর কাছে অপূর্ব কাব্যোচ্ছ্বাসময় ভাষায় প্রচণ্ড প্রেম জ্ঞাপন এবং জামাই বাবুতে বারমেসে জামাই নীলমণিবাবুর অসার আত্মম্ভরিতা লইয়াও লেখক রমণীয় রসিকতা করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র যেমন mock-heroic অথবা ছদ্ম গম্ভীর ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। তেমনি ছদ্ম গম্ভীর ভাষার অবতারণা করিয়াও অনেক স্থলে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। তুচ্ছ পরিবেশে নিতান্ত সাধারণ বিষয়ের বর্ণনা যখন অতিমাত্রায় গুরুগম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তখনই এই হাস্যজনক ছদ্মগম্ভীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিনিবাস মুচির সহিত এই ভাষায় কথা বলিয়াছে যথা—

'মুচিবর। ময়দান-সভার উপযোগী, চতুর্দিক্ষু প্রবাহিত অনিল-সভার অনুরক্ত, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কণ্ঠধ্বনি তুমি পাইলে কোথায়? তুমি ঐ কমনীয় কণ্ঠনালী-নিঃসৃত ললিত-ভৈরব আরাব দ্বারা এইমাত্র কি অনির্বচনীয় অব্যক্ত নিনাদ করিতেছিলে? হে মুচিকুল-তিলক! আমায় বুঝাইয়া বল, কোন্ উদ্দেশ্যে তোমার ঐ কোমল কণ্ঠকূজন ব্যয়িত হইয়াছিল?'

'রমণীরত্ন' নামক লেখাটিতে কিশোরীবাবুর কুপিতা স্ত্রীর বর্ণনাতেও এরূপ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়—

'যে মূর্তিতে পূতনা, গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহারার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন, এ মূর্তি তদপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, যে মূর্তিতে মহারাক্ষসী ভীষণবদনা ভীষণা, স-পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গপথ-গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, সে মূর্তি আজ অতি কোমল কমনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ কিশোরীবাবু সে দাবানলসদৃশ, অভ্রভেদীশিখ মহাগ্নির নিকট যাইয়া কি বলিবেন?'

রবীন্দ্রনাথ

জগৎ ও জীবন নিয়ত দুই বিপরীত শক্তির সংঘাতে চলিষ্ণু বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে। মানুষের মনোজগতেও দুই বিরোধী শক্তি অবিরাম ক্রিয়া করিয়া চলিতেছে—কখনো সেখানে হাসির অলকানন্দা ঝরিয়া পড়িতেছে আবার কখনো বা কান্নার ভোগবতীধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হাসিতে কান্নায় মিশিয়া জীবন চলে, সেজন্য জীবন একঘেয়ে পুরাতন ও বিস্বাদ নহে।[১] হাসিতে জীবনকে যখন হাল্কা মনে করি তখন অশ্রুভারানত মেঘগুলি আকাশে জমিতে থাকে, আবার যখন অশ্রুর গুরু মেঘভার জীবনের উপর চাপিয়া বসে, তখন কোথা হইতে প্রসন্ন বাতাসে সেই মেঘগুলি অদৃশ্য-লোকে উড়িয়া যায়। (যাঁহারা শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী তাঁহারা এই হাসিকান্নামিশ্রিত জীবনের উভয় দিক সমান কৌতূহল ও অনুরাগ লইয়া দেখিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও এরূপ একজন জীবনশিল্পী। জগতের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য ও জীবনের গভীরতম রহস্যের অন্তর্লোকে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। মানবজীবন ও বিশ্বজীবনের সর্বাঙ্গীণ ও চিরন্তন মিলনের রহস্য তাঁহার মত জগতের অন্য কোন লেখক বোধ হয় জানিতে ও জানাইতে পারেন নাই। কিন্তু জীবনের গভীরে ডুব দিয়া তিনি পরিপূর্ণ শান্তি, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের দুর্লভ রত্নটি সন্ধান করিয়া পাইলেও জীবন-প্রবাহের উপরে যে আলোকোজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি হাসিয়া খেলিয়া উদ্দেশ্যহীন আবর্ত রচনা করিয়া চলিয়াছে তাহাদের প্রতিও তিনি উদাসীন হন নাই।) মনে হয় মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার তত্ত্বান্বেষণ এবং সৌন্দর্য-পরিক্রমা হইতে বিদায় লইয়া এই অকারণ হাসিখুশির প্রবাহে সাঁতার কাটিতে চাহিয়াছেন। ইহা যেন তাঁহার অবকাশ-বিনোদনের উপায়, মনোবিলাসের অঙ্গ। (রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রধানত গীতিধর্মী, সেজন্য বস্তুপরিবেশ অতিক্রম করিয়া স্বপ্নরঞ্জিত ভাবলোকের দিকে উড়িয়া যাওয়াই

১। হ্যাজলিটের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য- To explain the nature of laughter and tears, is to account for the condition of human life, for it is in a manner compounded of these two! It is a tragedy or a comedy—sad or merry, as it happens.

Wit & Humour (The Comic Writers) by W. Hazlitt, P. 1

হইল তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু হাস্যকৌতুক হইল বিশেষভাবে বস্তুজগৎ ও সামাজিক পরিবেশের সামগ্রী, সেজন্য তাঁহার প্রতিভার মৌল ধর্মের সহিত হাস্যকৌতুকের একটি অনিবার্য বিরোধ আছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ যেমন অবারিত নীল আকাশে উড়িবার পর মাঝে মাঝে তাহার ছোট নীড়টিতে বিশ্রাম লইতে আসে, তেমনি কবিপ্রতিভাও দূরাস্তৃত ভাবলোক হইতে সময় সময় বিদায় লইয়া এই মর্ত্যজগতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মাটিতে মানুষের জীবন আবেগ-অনুভূতি, রস ও রহস্যে মধুর, আবার নানা বক্র ভঙ্গি, তির্যক গতি ও আকস্মিক পরিস্থিতিতে অদ্ভুত ও হাস্যকর। জীবনের এই অদ্ভুত ও হাস্যকর দিকের প্রতিও তিনি তাঁহার কৌতুক-প্রফুল্ল মনটি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন। কবি তাঁহার কাব্যের অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর একটি দ্বন্দ্বের কথা বলিতেন। এই অসম্পূর্ণ Real এর প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি মাটি ও মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এই আসক্তির ফলেই তাঁহার ঊর্ধ্ব ভাবচারী কাব্যের মধ্যে যেমন বাস্তবমুখীনতা দেখা গিয়াছে তেমনি আবার ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রহসন, চিঠিপত্র ইত্যাদি সামাজিক মানব-সংক্রান্ত নানা বিচিত্র সাহিত্য-ধারাও তাঁহার প্রতিভা হইতে উৎসারিত হইয়াছে।)

(রবীন্দ্রনাথের মনে হাস্যকৌতুকের যে অনর্গল ধারার অফুরান উৎসটি ছিল তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও প্রিয়জনেরা। তাঁহার কথায় ও মন্তব্যে কৌতুককণাগুলি হীরকের দ্যুতির মত ঝকমক করিত এবং যখন তিনি তাঁহার সুনির্বাচিত শব্দসমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত বাক্যপূর্ণ সংলাপের স্রোত মুক্ত করিয়া দিতেন তখন তাহা হইতে হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত হাস্যপরিহাসের জলকণাগুলি তাঁহার সন্নিহিত ব্যক্তিদের অভিভূত হৃদয়গুলিকে সরস ও সিক্ত করিয়া দিত। রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এমন বেশ কয়েকজন লেখায় তাঁহার রসরুচির আলাপ ও সংলাপের পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথের হাস্যপরিহাস' নামক গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য উক্তি-প্রত্যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে যে কৌতুকপ্রভা ঝলসিয়া উঠে, কবির হাস্য-পরিহাসের দৃষ্টান্তে তাহার স্থান নাই। কারণ তাঁহার সন্নিকটে যাঁহারাই আসিতেন তাঁহারাই তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নির্বাক ও অভিভূত হইয়া যাইতেন। তাঁহারা শুধু মাত্র ছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা ও বিস্ময়াপ্লুত ভোক্তা। রসের

দরবারে তাঁহাদের কেহ কখনো হয়তো দুই একটি নজরানা দিতেন, কিন্তু সকলেই সেখান হইতে অপরিমিত ধনসম্পদ লইয়া ফিরিতেন। রবীন্দ্রনাথের রসিকতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি, কোন গ্রাম্য ও রুচিগর্হিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা অথবা কোন অতিশয়িত ও মাত্রাতিরিক্ত আবেগ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইত না। (তাহা সূক্ষ্ম, শাণিত, মাজিত ও বৈদগ্ধ দীপ্ত।) তাহা Wit-এর আলোকে সমুজ্জ্বল এবং Humour-এর গাঢ় রসে গভীর।) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৌতুক-হাস্য নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভব-ক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। কবির সরস কথাবার্তায় এই কৌতুকহাস্যের নিদর্শন পাওয়া যাইত। সেজন্য অনেক সময় তিনি কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া শ্রোতাদের চিত্তে আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা জমাইয়া তুলিতেন এবং শেষে কৌতুকের খোঁচায় সেই গাম্ভীর্য উন্মোচন করিয়া ফেলিতেন এবং শ্রোতাদের চিত্ত হঠাৎ প্রীতিকর স্বস্তি পাইয়া প্রবল হাস্যবেগে হাল্কা হইয়া পড়িত।) অনেক সময় প্রচলিত কথার এক অভিনব অর্থব্যঞ্জনার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া, অথবা কোন কথার কিঞ্চিৎ বিকৃতি ও বিপর্যয় ঘটাইয়া তিনি পরিহাসের ফোয়ারা মুক্ত করিয়া দিতেন।) কবির সম্বন্ধে সকলের মনে যে এক সসঙ্কোচ ও সসম্ভ্রম মনোভাব ছিল কবির রসিকতায় তাহা সহজ ও ঘনিষ্ঠতা-প্রয়াসী হইয়া উঠিত। এই অসামান্য লোকটির মধ্যে চপলতা ও রসিকতার সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের অন্তর প্রসন্ন আমোদে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িত। অবশ্য কবির গাম্ভীর্য কোন সময়ে শিথিল হইত না, এবং সেজন্যই তাঁহার রসিকতার আবেদন ছিল আরও গভীর। যিনি হাসাইতে চান তিনি যদি না হাসেন তবে শ্রোতারা তাঁহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া অধিকতর কৌতুক বোধ করেন।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের ধারা আলোচনা করিতে গেলে সমসাময়িক কালের পরিচয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কবির ব্যক্তিমানসের বিশিষ্টতা ইত্যাদি বিশেষভাবে জানা দরকার। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি অনবরত বিবর্তিত হইয়াছে এবং সেই বিবর্তন-ধারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাস্যরসের প্রকৃতি নব নব রূপ লাভ করিয়াছে।

যৌবনের উন্মেষকালে, যখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি শিলা-অবরোধে আবদ্ধ নদীর উৎসের মতই প্রকাশের আবেগে অস্থিরভাবে পাষাণপ্রাচীরে আঘাত

করিতেছিল তখন হইতেই জীবনের রঙ্গব্যঙ্গের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন যৌবনের উদ্ধত আপোষহীন মনোভাব এবং নবলব্ধ মতবাদের অসহিষ্ণুতা তাঁহার রচনার মধ্যে উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিপক্ষকে হারাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তিনি তাঁহার যুক্তি ও বিচারের অস্ত্রগুলি সুতীক্ষ্ণ করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[১] আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ধর্মকলহের ক্ষুদ্রতার মধ্যে সোৎসাহে মাতিয়া গিয়াছিলেন। স্বীয় ধর্মমতের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্যে তিনি গাণ্ডীব ধারণ করিয়া মহারথী ভীষ্ম সদৃশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নব্যহিন্দুসমাজের সহিত এই সময়ে তাঁহার যে মসীযুদ্ধ হয় তাহাতে সাহিত্যের শুভ্র পীঠস্থান শুধু কেবল কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। দামু ও চামু, ধর্মপ্রচার, হিংটিং ছট ইত্যাদি কবিতায় এবং আর্য ও অনার্য, একান্নবর্তী, গুরুবাক্য প্রভৃতি নাটিকায় বিরুদ্ধধর্ম ও সমাজবাদীদের প্রতি কবি রূঢ় আঘাত হানিয়াছিলেন। বিদেশী ইংরাজদের প্রতি নির্লজ্জ বশ্যতা, বিজাতীয় আচরণের প্রতি নির্বোধ আসক্তি ও নকল স্বদেশীয়ানার বিকৃতি ও ভণ্ডামি লইয়াও তিনি কম আঘাত করেন নাই। টৌনহলের তামাসা, অকালকুষ্মাণ্ড প্রভৃতি প্রবন্ধে, এবং দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর প্রভৃতি কবিতায় ইহার নিদর্শন মিলিবে। বিপক্ষ সমালোচকদের অসার সাহিত্য-রচনার প্রতিও রবীন্দ্রনাথ কম বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। গোঁফ এবং ডিম ও তার্কিক নামক প্রবন্ধে এবং লেখার নমুনা, সারবান সাহিত্য প্রভৃতি নাটিকায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। (স্বীয় মতের আত্যন্তিক তীব্রতা ও বিপক্ষ মতবাদীদের প্রতি অসহিষ্ণু অবজ্ঞা ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ তখন যেখানেই হাস্যকৌতুকের আশ্রয় লইয়াছেন সেখানে তাহা শ্লেষের তীক্ষ্ণ কণ্টকে ও বিদ্রূপের নির্মম আঘাতে পরিণত হইয়াছে।)

(কিন্তু সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের এই শ্লেষ ও বিদ্রূপপ্রিয়তার অনাবৃত ও অবারিত প্রকাশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।) যৌবনের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

১। 'তরুণ লেখকের সর্বগ্রাসী চিত্তে বিচিত্র সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, সমাজ ও রাষ্ট্রসমস্যা জাগিতেছে, কিন্তু সবগুলিই লঘুভাবে আলোচিত। বালক প্রথম রঙের বাক্স উপহার পাইয়া যেমন তেমন করিয়া নানা প্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় যেমন অস্থির হইয়া উঠে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষায় শক্তি পাইয়া আপনমনে কেবলই রকম বেরকম রচনা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সামান্য বিষয়কে বড়ো ও গম্ভীর বিষয়কে লঘু করিয়া কেবল লেখার জন্যই যেন লিখিতেছেন।'

॥ রবীন্দ্র জীবনী। ১ম।—১৪০॥

সৃষ্টিশক্তি যেমন পরিপূর্ণ সিদ্ধির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাস্যরসও ব্যক্তিবিদ্বেষ ও অসহিষ্ণু আক্রমণের কর্দমাক্ত আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ, নির্মল ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।) 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলির মধ্যে এই প্রীতিকর হাস্যরসের বহু নিদর্শন রহিয়াছে।) ঐ গল্পগুলির মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা ও জ্বালা যে স্থানে স্থানে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা কোন স্থায়ী প্রবাহের সৃষ্টি করে না। বেশির ভাগ গল্পের মধ্যে হাস্য ও করুণরসের ধারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক অবিচ্ছিন্ন জীবনরস হইয়া রহিয়াছে।) যে গভীর ও সর্বাত্মক সহানুভূতি লইয়া লেখক গল্পগুলির মধ্যে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহার প্রকাশ হাস্যরসের মধ্যেও দেখা গিয়াছে।) সেজন্য তাহা স্নিগ্ধ, প্রীতিপ্রসন্ন ও আনন্দমধুর। (ছোটগল্পের এই স্নিগ্ধমধুর হাস্যরস পূর্ণতম পরিণতি লাভ করিল প্রহসনগুলির মধ্যে। 'গোড়ায় গলদ'; 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা'র মধ্যে একান্নবর্তী বাঙালী পারিবারিক জীবনের রস ও মাধুর্য স্নিগ্ধ পুষ্পসৌরভের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। রোমান্সের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটারঞ্জিত জগতে স্নিগ্ধ রসিকতা যেন বৃষ্টিধৌত রৌদ্রের মতই প্রহসনগুলির মধ্যে শোভা পাইয়াছে। যে অন্তর হইতে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে কোন বিক্ষোভ ও তিক্ততা ছিল না, তাহা ছিল ঊর্ধ্ব নীলাকাশের মতই উদার ও সুন্দর।)

চিত্তের এই পরিতৃপ্ত প্রসন্নতা পরিণত যৌবনে রচিত তাঁহার গদ্যসাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায়। 'ছিন্নপত্র' ও 'পঞ্চভূতে'র লেখাগুলিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। জগৎ ও জীবনের প্রতি তখন তাঁহার যে সুগভীর প্রীতি ও সহানুভূতি মনের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই স্পর্শে তৎকালীন হাস্যরসের মধ্যেও এক তৃপ্তিকর ও নির্মল আনন্দদায়ক ধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

'বলাকা' ও সবুজপত্রের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষা যে শিল্পরূপ ও রসরূপ লাভ করিয়াছিল পরবর্তীকালে তাহার সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা গিয়াছিল। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গদ্য ও পদ্য যাহাই লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার ভাষার অপরূপ ঐশ্বর্য, অলঙ্কারের বিচিত্র সৌন্দর্য এবং চিত্র-সংগীতের অদম্য উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে এবং সবুজপত্রের নবীনতার আকর্ষণে কবি তাঁহার রচনারীতির পরিবর্তন করিয়া তাহাকে কথ্য, লঘু ও সচল করিয়া তুলিলেন। 'বলাকা' হইতে তাঁহার যে বাস্তব মানবসাধনা

সুরু হইল তাহারই প্রয়োজনে তিনি স্বপ্ন ও সৌন্দর্যঘেরা নিছক শিল্পজগৎ হইতে বিদায় লইয়া প্রাত্যহিক সমস্যাপূর্ণ মৃত্তিকাজগতে সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির পূর্ববর্তী অধ্যায় শ্রেষ্ঠ, না পরবর্তী অধ্যায় শ্রেষ্ঠ সেই বিতর্কে যোগ দিতে চাহি না, কিন্তু কাব্যের দিক দিয়া 'সোনার তরী,' 'চিত্রা' ও গদ্যরচনার দিক দিয়া 'গল্পগুচ্ছ,' 'ছিন্নপত্র,' 'জীবনস্মৃতি,' 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অতুলনীয় উৎকর্ষ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন দ্বিমত হইবে না। প্রথম দিকের রচনার মধ্যে যে হৃদয়ের সরসতা ছিল তাহাই শেষ দিকের রচনায় প্রখর বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। (মানসীর পর হইতে কবির রচনায় যে স্নিগ্ধ রমণীয়তা, হাস্যকৌতুকের যে অশ্রুনিষিক্ত মমতাকরুণ স্পর্শ পাওয়া যায় শেষ বয়সের রচনায় উহাদের কোন নিদর্শন ছিল না।) (সেখানে বক্রোক্তির সূচীমুখগুলি খোঁচা দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে ও বুদ্ধির বঙ্কিম রেখায় রসিকতা বিদ্যুৎ ঝলকের মত দ্রুত খেলিয়া গিয়াছে। প্রথম দিকের রচনা যেন হিউমার অর্থাৎ করুণ হাস্যরসের পূর্ণতোয়া নদী, ধীর মন্থর গতিতে শীতল শীকর ছড়াইয়া ও কোমল পলিমাটি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু শেষদিকের রচনা যেন উইট অর্থাৎ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পাহাড়ী নদী, আবেগ নহে বেগই তাহার ধর্ম। শিলায় শিলায় প্রতিহত হইয়া উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুগুলিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়াছে।)

'বলাকা'র মধ্যে প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজের প্রতি কবির শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ('বলাকা'র পর 'পলাতকা' ও 'লিপিকা'তেও অনুদার সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি তিনি কোথাও কোথাও পরিহাস-রঞ্জিত মৃদু আঘাত হানিয়াছেন।) 'পুনশ্চ' হইতে কবির গদ্যকবিতার ধারা সুরু হইল এবং এই 'পুনশ্চ' কাব্যে প্রাত্যহিক বাস্তব পরিবেশ হইতে হাস্যপরিহাসের অনায়াসলব্ধ ও অজস্রসঞ্চিত উপাদান গ্রহণ করেন।) গদ্যরচনায় কবির লেখনী শাণিত তলোয়ারের ন্যায় প্রখর সূর্য কিরণে চোখ ঝলসানো আলো বিকিরণ করিতেছিল। সেই তলোয়ারের বাঁকা মুখে দুর্বল ও দুষ্ট স্থানগুলি উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছিল। 'শেষের কবিতা' ও 'বাঁশরী'র মধ্যে এই ধরণের রচনার নিদর্শন পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার বয়স যত বাড়িয়াছে হৃদয়াবেগে ও মনোভঙ্গি ততই ঠিক বয়সের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়াছে অর্থাৎ বার্ধক্যে উপনীত

হইয়া তিনি যৌবনের ধর্মে অনুপ্রাণিত হইলেন আর পরিণত বার্ধক্যে তিনি শিশুর সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। 'প্রহাসিনী', 'তাসের দেশ', 'সে' 'গল্পসল্প', 'খাপছাড়া', 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি' ইত্যাদি পুস্তকে তিনি শিশুমনের খেয়ালখুশি লইয়া বিলাস করিয়াছেন। এই সময় একদিকে রঙের রেখায় তিনি যেমন উদ্ভট ও অসংলগ্ন জগৎকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তেমনি কালির লেখায় আবোল তাবোল ও খাপছাড়া জীবন লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়াছেন। এই সব পুস্তকে মাঝে মাঝে বয়স্ক মনের বুদ্ধিবিলসিত উপাদান আছে বটে, কিন্তু কার্যকারণ-সূত্রহীন, পারম্পর্যহীন হাসি ও খুশির প্রবাহে শুধু মাতিয়া থাকাই কবির উদ্দেশ্য। এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের জগতে যে কৌতুকের বিস্ফোরণ ঘটিতে থাকে তাহাকে সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মধ্যে আনা যায় না। তাহা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হুল্লোড়ের অট্টরোল।

কবিতা

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম দিকে ব্যঙ্গ এবং শেষ দিকে কৌতুকরসই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমরা উপরে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার এমন (কবিতাও কয়েকটি আছে যেগুলিতে স্নিগ্ধ পরিহাসোজ্জ্বল রসিকতাই বড় হইয়া উঠিয়াছে) (ঐসব কবিতার হাস্যরস মৃদু, অনুচ্চ ও হৃদয়ের অনুভূতির সহিত যুক্ত। কয়েকটি পত্রের মধ্যে এই হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মানসী'র পত্র ও শ্রাবণের পত্র নামক কবিতা দুইটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুইখানি পত্রই কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত। প্রথম কবিতাটিকে কবি রসিকতা করিয়া তাঁহার কাব্য ও কল্পনা জগৎ হইতে বিদায় লইতে চাহিতেছেন --

দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর মায়াডোর,
কবিতায় আর মোর নাহি কোনো দাবি,
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার,
সেগুলো চাপাই কার স্কন্ধে তাই ভাবি।
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দু'দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি মানুষেরা অস্থিচর্মসার।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে কিন্তু কবি ঠিক বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ, সেখানে তিনি বস্তুজগৎ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কল্পনার সৌন্দর্য-জগতেই পরিক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন—

আমলা শামলা স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসিগল্প গান।
নেই বাঁশি, নেই বঁধু নেই রে যৌবনমধু,
মুচেছে পথিকবধূ সজল নয়ান।
যেন রে শরম টুটে কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল।
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।

'বিসর্জন' নাটকে সুরেন ঠাকুরকে লিখিত উৎসর্গপত্রখানিতে সমালোচকের প্রতি শ্লেষ থাকিলেও উহাতে রসিকতার সুরই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'মানসী'র নবদম্পতির প্রেমালাপ নামক কবিতাটিতেও অল্পবয়সী কন্যার বিবাহের প্রতি একটু শ্লেষ থাকিলেও উহার রঙ্গরসই অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে। বিবাহবাসরে বর প্রেমাবেগে উদ্বেল হইয়া কনেকে যখন বিশ্বের প্রেমরাজ্যের সকল কথা নিবেদন করিতেছে, বালিকাবধূর মন তখন পড়িয়া রহিয়াছে মেনিবিড়াল, টোপাকুল ও পুতুলের জগতে। বরের উন্মুখ প্রত্যাশার সহিত বার বার কনের অবোধ উত্তরের এমন একটি বৈপরীত্য ঘটিয়াছে যাহা প্রবল হাস্যবেগে আমাদের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। বর ও কনের প্রেমালাপের একটু নমুনা দিতেছি—

বর।......

জনম অবধি বিরহে দগধি
এ পরান হয়ে ছিল ছাই,
তোমার অপার প্রেম পারাবার,
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বলো একবার আমিও তোমার
তোমা ছাড়া কারে নাই চাই।'
ওঠ কেন, ওকি, কোথা যাও, সখী

কনে। (সরোদনে) আইমার কাছে শুতে যাই।

(কবির 'ক্ষণিকা' 'কণিকা' প্রভৃতি কবিতায় নিগূঢ় অর্থপূর্ণ হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।)

(নির্দোষ ও নিষ্কণ্টক রসিকতা কবির শেষ বয়সে রচিত 'প্রহাসিনী'র কয়েকটি কবিতাতেও দেখা যায়।) পরিণয় মঙ্গল, ভাইদ্বিতীয়া, মাল্যতত্ত্ব ইত্যাদি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পরিণয় মঙ্গলে গৃহকল্যাণী বধূর পরানুবর্তিতার প্রতি ঈষৎ শ্লেষ থাকিলেও প্রসন্ন রসিকতার সুরই ইহাতে প্রধান। সুগৃহিণী হইবার জন্য নানা সরস উপদেশের মধ্যে কবি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মনুসংহিতাটি,
'স্ত্রী স্বামীর ছায়া সম' মনে যেন হোঁশ রয়।

ভাই দ্বিতীয়ায় কবি আশা করিয়াছেন তিনি যেন জন্ম জন্মান্তরে শুধু ভাই হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ভগ্নী হইবার দায় নৈব নৈবচ। মাল্যতত্ত্ব একটি অপূর্ব কবিতা। জগামালীর দেওয়া মালাকে গ্রহণ করিয়া কবি বাস্তবমলিন সত্যকে সাদর স্বীকৃতি দান করিলেন। কবি বলিলেন,

একদিন তো ছন্দে বাঁধা অনেক কলরবে
অনেক রকম রঙ চড়ানো স্তবে
সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান
আজকে যদি বলি আমার প্রাণ
জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাঁটি,
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি।

(কবির অনেক কবিতায় সূক্ষ্ম-কোমল আবেগ ও অনুভূতি প্রধান হইলেও উহাদের মধ্যে মাঝে মাঝে হাস্যরসের একটি ক্ষীণধারা অন্তঃসলিলা নদীর মতই প্রবাহিত হইয়াছে। কারুণ্য ও কোমলতার সহিত এই হাস্যরস মিলিত হইবার ফলে অনেক সময়েই কবিতাগুলির মধ্যে রসবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। 'সোনারতরী'র যেতে নাহি দিব কবিতায় গোড়ার দিকে খুঁটিনাটি বাস্তব সংসারের চিত্র ভাবাবেগসমৃদ্ধ কবিতাটির মধ্যে সরসতা সৃষ্টি করিয়াছে। পুরস্কার কবিতাটির মধ্যে কবি ও কাবপত্নীর হাস্য-পরিহাসও যথেষ্ট প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। পরশ পাথর, আকাশের চাঁদ ও গানভঙ্গ কবিতাগুলিতে মানুষের ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার চিত্রের মধ্যে যে হাস্যরস আছে তাহা কারুণ্য ও সমবেদনায়

অভিষিক্ত। এই করুণ হাস্যরসেরই অবতারণা হইয়াছে পুরাতন ভৃত্য ও দুই বিঘা জমি নামক কবিতা দুইটিতে। 'ক্ষণিকা'র কবির বয়স, সেকাল ও জন্মান্তর কবিতাগুলিতে কবির প্রীতিকর রসিকতা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। সেকাল কবিতায় কালিদাসের কালের কথা বলিতে বলিতে আধুনিক রমণীদের সম্বন্ধে কবি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খুবই সরস—

পরেন বটে জুতামোজা চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা অন্যদেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।

'পলাতকা'র অনেকগুলি কবিতায়, যথা—মুক্তি, ফাঁকি, নিষ্কৃতি ইত্যাদির মধ্যে রসিকতার স্পর্শ থাকিলেও উপেক্ষিত ও নিগৃহীত নারীজীবনের প্রতি সমবেদনাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য নিষ্কৃতি কবিতার বাবা চরিত্রটির মধ্যে নিছক ব্যঙ্গের আঘাতই রহিয়াছে। 'পুনশ্চ'র গদ্যকবিতাগুলিতে বাস্তব জীবনের নানা ছোটখাট কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সেই কাহিনীগুলিতে যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কোন চকিত ও চলমান মুহূর্তের অনুভূতি পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি কোথাও হাস্যকৌতুকের চমকপ্রদ স্পর্শে উহাদের প্রবাহ সরস ও চমৎকারী হইয়া উঠিয়াছে। তিনু (অপরাধী) ও ছেলেটার অবোধ ছেলেমানুষী, ক্যামেলিয়ার জন্য ব্যর্থ যুবকটির অক্লান্ত সাধনা, সাধারণ মেয়ের রঙীন স্বপ্ন, কিনু গোয়ালার গলির কনিষ্ঠ কেরাণীর বাস্তব জীবনে অবাস্তব কল্পনা, ভীরু সুনীতের হঠাৎ-লব্ধ পৌরুষ ইত্যাদির মধ্যে হাস্যকৌতুকের মৃদু শিঞ্জিনী যথেষ্ট সরসতা সঞ্চার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকবিতাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রথম যৌবনে রচিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে ঝাঁঝ ও তিক্ততা অত্যন্ত বেশি। ঐ কবিতাগুলির অনেকস্থলে ব্যক্তিবিদ্বেষ ও অনুদার ধর্মবোধই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেজন্য উহাদের কোন সর্বজনীন ও প্রীতিকর আবেদন নাই। মাত্রাতিরিক্ত রূঢ়তার ফলে অনেক কবিতাই রুচি ও শালীনতাবর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কবি এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়া পরবর্তী কালে অনেক কবিতাই তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতে বাদ দিয়াছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র (১ম সং) পত্র কবিতাগুলির কয়েকটিতে তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। নব্য হিন্দুয়ানীর প্রতি যে উগ্র আঘাত তিনি হানিয়াছিলেন

তাহাতে তাঁহার উদার ও ধর্মসমন্বয়বাদী দৃষ্টি ছিল না, তাহাতে তাঁহার অসহিষ্ণু ব্রাহ্মসত্তাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ—স্থলচরবরেষু নামক কবিতায় আর্যামি ও হিন্দুয়ানীকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া তিনি লিখিলেন—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচালো সব জিবের ডগা কাঁটার মত গায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন আমিই কল্কি গাঁজার কল্কি হবেন বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।
পাড়ায় এখন কত আছে কত কব তার,
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা অবতার!
দাঁতের জোরে হিন্দু শাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে।
দাঁত কপাটি লাগে, তাদের দাঁতখিচুনীর ভঙ্গি দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উৎকট বিদ্বেষের অশোভন আক্রমণ রহিয়াছে শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু নামক পত্রকবিতায়। চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এই দুই নব্যহিন্দুনেতাকে তিনি অত্যন্ত রূঢ় ও শালীনতা-বিরোধী আঘাত করিয়াছেন, যথা—

আদর পেয়ে নাদুস নুদুস আহার করচে ক'সে,
তরিবৎটা শিখলে নাক বাপের শিক্ষা দোষে।
ওরে দামু চামু!
এস বাপু, কানটি নিয়ে, শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে তবেই নাচার!
হায় দামু হায় চামু!
পড়াশুনো কর, ছাড় শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘোষে তোলরে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।
ওরে দামু ও চামু
ভদ্রলোকের মান রেখে চল ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু।)

পয়সা চাও ত পয়সা দেব থাক সাধু পথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু)

'সোনার তরী'র হিং টিং ছট নামক কবিতাটিও চন্দ্রনাথ বসুকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিত অনেকে ইহা অনুমান করিতেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এ অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন।[১] সামান্য বিষয় লইয়া যাহারা গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বর সৃষ্টি করে এবং নানা জটিল দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইতে যায় তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করিয়াই কবিতাটি রচিত। 'মানসী'র ধর্মপ্রচার কবিতাটিতে উদারচেতা, ক্ষমাব্রতী খ্রীষ্টান পাদ্রীর উপর হিন্দুধর্মের গোঁড়া সমর্থকদের কাপুরুষোচিত আক্রমণকে কবি তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের অসহিষ্ণু ও হিংসাত্মক নীতি অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি কবির বিদ্বেষও এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যথা—

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো।
আর্যশাস্ত্র উদ্ধার করি,
কোমর বাঁধিয়া লাগো।
কাছাকোঁচা লও আঁটি,
হাতে তুলে দাও লাঠি।
হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা,
খৃষ্টান হবে মাটি।

যে সব নব্য হিন্দুনেতা হিন্দুদের নানা সংস্কার ও আচরণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থন করিতে চাহিতেন তাঁহাদের প্রতি কবি শাণিত বিদ্রূপ করিয়াছেন 'কল্পনা'র উন্নতি লক্ষণ নামক কবিতায়—

কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ
হিন্দুধর্ম সত্য
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।

১। শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'আমাদের মনে হয় রূপকথা লিখিতে গিয়া জিনিসটা এই রূপ লইয়াছিল, মনের অচেতনে যে বিরক্ততা ছিল, তাহা তাঁহার অজ্ঞাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল।' ॥ রবীন্দ্র জীবনী (১)—২৪৫ ॥

টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজমশক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

বাঙালীজীবনের অসার বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা, আরাম ও বিলাসপ্রবণতা এবং বাহ্যজীবনের গতি ও সংগ্রামবিমুখতাকে বিদ্রূপ করিলেন কবি দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর প্রভৃতি কবিতায়।

অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি,
গৃহের প্রতি টান
তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

॥ দুরন্ত আশা ॥

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে সাধারণ বাঙালীজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্মম সত্যের আঘাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইঁহারা আত্মপ্রশংসায় স্ফীত হইয়া উঠেন এবং মসীযুদ্ধে নিজেদের বীরত্ব জাহির করিয়া থাকেন—

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
দু হাতে দাও তালি।
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি।
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো,
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখো
কলম আর কালি।

॥ দেশের উন্নতি ॥

ইঁহারা দেশবিদেশের ইতিহাস পড়িয়া বীররসে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বীরত্ব ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দেন তাহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।—

আরে, আরে এসো, এসো ননিবাবু।
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু,
কালকের দেব শোধ।

॥ বঙ্গবীর ॥

(রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস কৌতুক লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিল শেষ বয়সে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে।) ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কবি পরিণত বার্ধক্যে শিশুমনের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। (সেজন্য শিশুমনের প্রীতিকর উদ্ভট কৌতুকরসের প্রতি তাঁহার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা গিয়াছিল।) এই প্রবণতার নিদর্শন রহিয়াছে 'প্রহাসিনী', 'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি', 'গল্প সল্প', 'ছড়া' প্রভৃতি রচনার মধ্যে। 'খাপছাড়া'য় শ্রীরাজশেখর বসুকে লিখিত কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে—সিদ্ধের।...

এই পঙ্‌ক্তিগুলি পড়িলেই বৃদ্ধ কবির চপল ছেলেমানুষী করিবার ঝোঁক সহজেই বুঝা যাইবে। ছেলেমানুষের যে কৌতুকজগৎ তাহা গভীর ও বিস্তৃত নহে, তাহা তরল ও ক্ষণিকের। তাহা ইন্দ্রধনুর রঙীনবর্ণবিলাস, বড় সুন্দর কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ী। তাহা রমণীয় আলোকছটায় উজ্জ্বল ভাসমান বুদ্‌বুদের ন্যায়, মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায়। এজন্য কবির কৌতুকরসাত্মক কবিতাগুলি আকারে ছোট এবং প্রকারে গতিশীল। বাস্তব জীবন হইতে ঘটনা ও চরিত্র লইয়া অতিরঞ্জনের প্রলেপ লাগাইয়া কবি উহাদিগকে কৌতুকজনক করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ মানুষের চোখে যাহা নুড়ি হাস্যরসিকের কাছে তাহাই চকমকি পাথর হইয়া উঠে। তিনি যখন তাহা হইতে আলো বাহির করেন তখন সেই আলোকে আমাদের বিস্মিত চোখ ঝলসাইয়া যায়। উদ্ভট বিপর্যয় ও অস্বাভাবিক বিকৃতির বর্ণনা করিয়া কবি যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন সেগুলির মধ্যে কৌতুকরস উদ্দাম ও নিছক শিশুর মনোরঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। যেমন 'খাপছাড়ার' প্রথম কবিতাটি—

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির

পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।

পাঁচ নম্বর কবিতাটির মধ্যে দাড়ির যে প্রচণ্ড মহিমা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর—

তিরিশটা খুর একে একে
ভাঙল যখন পটাং
কামারটুলি থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি
কোদাল করাত সাবল।

বর এসেছে বীরের ছাঁদে, হাতির হাঁচি, পাগড়িতে তার জুতা-জোড়া পায়ে রঙিন টুপি প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও এই ধরণের কৌতুকরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য লইয়া অন্যান্য হাস্যরসিক কবিদের মত রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি কৌতুককবিতা রচনা করিয়াছেন। 'প্রহাসিনী'র কয়েকটি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভোজনবীর কবিতাটিতে হয়তো কবি অতিভোজনবিলাসীদের লইয়া সূক্ষ্ম শ্লেষ করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাটির আদ্যোপান্ত গুরুভোজনের প্রশস্তিতে ভরিয়া রহিয়াছে—

অসংকোচে করিবে কষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।

সুসীম চা চক্র ও চাতক এই দুইটি কবিতায় চায়ের যে প্রশস্তি রচিত হইয়াছে তাহা চাপায়ীদের কাছে চিরকাল উপভোগ্য হইয়া থাকিবে—

হায় হায় হায়
দিন চলে যায়।
চা স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!

টগবগ উচ্ছল

কাথলিতল জল

কল—কল—হে!

কীটপতঙ্গ ও জন্তুজানোয়ার লইয়াও কবি কয়েকটি কৌতুককবিতা রচনা করিয়াছেন। 'প্রহাসিনী'র লিখি কিছু সাধ্য কী ও মশক মঙ্গল গীতিকা নামক কবিতা দুইটিতে মশকের উৎপাত লইয়া কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ছড়া'র ৪নং কবিতায় কাবুলি বিড়াল লইয়া যে হুলস্থূল কাণ্ডের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারও কৌতুকজনকতা উল্লেখযোগ্য। 'সে'র ৮নং রচনায় বাঘের সম্বন্ধে যে দুর্দান্ত কবিতা ও হাস্কা ছড়া রহিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে আসিবে।

উপরে নিছক কৌতুকরসাত্মক কবিতার কথা উল্লেখ করা হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর এক শ্রেণীর কৌতুককবিতা আছে যেখানে কৌতুকের সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও সচেতন জীবনবোধের সংস্পর্শ রহিয়াছে। কোথাও একটু বাঁকা মন্তব্য, কোথাও একটু সূক্ষ্ম শ্লেষের খোঁচা দিয়া কবি তাঁহার কৌতুকের গতিকে হাসির শুভ্রোজ্জ্বল আলোক হইতে মনের প্রচ্ছন্ন গুহায় চালিত করিয়াছেন। 'খাপছাড়া' ও 'প্রহাসিনী'র মধ্যে এই ধরণের অনেকগুলি বুদ্ধিমিশ্রিত কৌতুক-কবিতা রহিয়াছে। স্ত্রীর বোনকে শালা বলায় তাহার নিদারুণ অভিমান (খাপছাড়া—৬১), কিংবা শালী কথা না বলাতে সংসারে গভীর বৈরাগ্য—

বেদনায় সারা মন

করিতেছে টনটন

শ্যালী কথা বলল না

সেই বৈরাগ্যে।

॥ খাপছাড়া—৭২ ॥

প্রভৃতি বর্ণনায় কবির পরিহাসরসিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। সুন্দরী স্ত্রীর রান্নায় দোষ থাকিলেও রূপমুগ্ধ স্বামী তাহাতে কোন দোষ পান না। তাহারই বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি লিখিলেন—

খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,

ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার,

চিনি কম পড়ে বটে পায়সে

স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে—

যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার।

॥ খাপছাড়া—৩৪ ॥

বক্তৃতাবাগীশ দেশহিতৈষী, হাস্যদমনকারী গুরু, প্রাইমারী স্কুলের ভয়ঙ্কর পণ্ডিত, প্রসাদপুষ্ট হীনচেতা সমালোচক প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর সামাজিক মানুষের প্রতিই কবি হাস্যসরস বিদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়াছেন। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কবির মন্তব্য একস্থানে অতিশয় সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

মন উড়ু উড়ু। চোখ ঢুলু ঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নিরবাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে, এতো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।
কবি বলে, তার কারণ আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক'।

'প্রহাসিনী'র নারীপ্রগতি নামক কবিতায় বরনারীদের বীরনারীর রূপ লইয়া চমৎকৃত কবি লিখিয়াছেন—

রেল গাড়ী আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহসে, এ তড়িৎগতি,
পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

কবির ছড়াজাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে ধ্বন্যাত্মক ও ঝঙ্কারবহুল শব্দসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস পরিস্ফুট। অনেক সময় তিনি শব্দের তালবেতালের হাতে ডুগডুগি দিয়া এক উদ্ভট সুরজাল রচনা করিয়াছেন। এই সব কবিতার অর্থ

গৌণ, শুধু ধ্বনির আবোল-তাবোল নৃত্যই ইহাদিগকে কৌতুকরসাত্মক করিয়া তুলিয়াছে। 'ছড়া'র মধ্যে এই ধরণের কবিতার বহুলত্ব চোখে পড়ে। যথা—

গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল

অথবা, মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।

কোন কোন কবিতায় কবি বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া কৌতুকরস পরিবেষণ করিয়াছেন। অবশ্য এই ধরণের কবিতার সংখ্যা বেশি নহে। উদাহরণস্বরূপ শুধু একটি কবিতার উল্লেখ করা যাক। 'প্রহাসিনী'র সংযোজিত অংশের অন্তর্ভুক্ত নাসিক হইতে খুড়ার পত্র নামক কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল -

তুম ছাড়া কোই সমজে না তো হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিলখিল কর্কে হাস্তা।
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

নাটক ও প্রহসন

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও প্রহসনে হাস্যরসের ধারা উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে এই নাটক ও প্রহসনের বিভাগে হাস্যরস সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তৃতি ও প্রবলতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম দিকের নাটকগুলির মধ্যে হৃদয়াবেগ এবং শেষ দিকের নাটকগুলির মধ্যে তত্ত্বময়তাই প্রধান, কিন্তু এই উভয় প্রকার নাটকের মধ্যেই হাস্যরস এক অনিবার্য ধারা রূপে প্রবাহিত হইয়া নাটকের কাহিনীকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতমূলক ট্র্যাজিক নাটক। করুণ ও গভীর

রস ঐসব নাটকের মূল রস হইলেও হাস্যরসের উপাদান নাটকীয় উদ্বেগ ও উত্তেজনা হইতে দর্শকের মনকে মুক্ত করিয়া উহার মধ্যে ভাবাবেগের সমতা আনিবার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাধারণ জনতার চরিত্র আনয়ন করিয়া তাহাদের কথাবার্তা ও হাবভাবের মধ্য দিয়াই এই নাটকীয় relief-এর উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জনে' সাধারণ লোকেরা যখন আসিয়াছে তখনই নাটকের ভাবপরিবেশ এক দূরাস্তৃত করুণ ও গম্ভীর জগৎ হইতে হঠাৎ যেন পরিচিত মাটির জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই জগতের লোকগুলি মাটির মতই সরল ও সাধারণ, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, বুদ্ধি-বিবেচনা নাই, সাহস ও শক্তিও নাই। তাহারা মুখ বুজিয়া সব অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে এবং সহনসীমা অতিক্রম করিলে মরিবার আগে জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের ভ্রান্তি ও ভীরুতা, অসঙ্গতি ও অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়াছেন, কিন্তু সেই হাসির সহিত সাধারণ মানুষের জন্য সমবেদনায় তাঁহার হৃদয়ের অশ্রুবাষ্পও কিছু কিছু মিশিয়াছে। চরিত্রগুলি অতি স্বল্প স্থানই অধিকার করিয়া আছে এবং নাটকের পরিণতিতে তাহাদের কোন হাতও নাই কিন্তু তাহারা আমাদের অন্তরের মধ্যে বেশ স্থায়ী আসন দখল করিয়া বসে। 'রাজা ও রাণী'র কুঞ্জর, কিনু এবং 'বিসর্জনে'র হারু, গণেশ, অক্রুর প্রভৃতি চরিত্র কখনও ভোলা যায় না।

সাঙ্কেতিক নাটকগুলির মধ্যেও এই সাধারণ চরিত্রগুলি একটি অপরিহার্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সব নাটকের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে যখন আমাদের দূরচারী কল্পনা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চরণ করিতে থাকে তখন বাস্তব জগতের এই চরিত্রগুলি মানবীয় প্রকৃতির বিচিত্র রস-সংবেদনে আমাদের চিত্তকে সরস আবেগে সতেজ করিয়া তোলে। 'প্রায়শ্চিত্তে'র প্রজাদল, 'অচলায়তনে'র শোণপাংশু ও দর্ভকগণ, 'মুক্তধারা'র উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের নাগরিকদল, 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরস্থিত শ্রমিকবৃন্দ হাস্যকৌতুকের বিচিত্র উপাদান দ্বারা ঐসব নাটকের সরসতা আনয়ন করিয়াছে। বিভিন্ন জনতার মধ্যে কয়েকটি চরিত্র স্বকীয় বিশিষ্টতায় কৌতুকরসের এক একটি টাইপ চরিত্ররূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মুক্তধারা'র রসিক যাত্রাওয়ালা হুব্বা, 'রক্তকরবী'র ঈর্ষাপরায়ণা চন্দ্রা ও স্বার্থান্বেষী মোড়ল, তপতীর শালীলাঞ্ছিত কুন্দন প্রভৃতি চরিত্রগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসসৃষ্টির সচেতন উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন

করিয়াছেন। সেগুলিতে কোথাও রঙ্গ এবং কোথাও বা ব্যঙ্গ পরিস্ফুট হইয়াছে। কোথাও চরিত্রের অন্তর্নিহিত হাস্যকর উপাদান উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে হাস্যরস স্ফূর্ত হইয়াছে আর কোথাও বা সংলাপের ক্ষুরধার দীপ্তি ও শাণিত বক্রমুখের আঘাতে হাসির আলোক ঝলমল করিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'র দেবদত্ত চরিত্রটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। দেবদত্ত রাজার বয়স্য, হাস্যপরিবেষণই তাহার কাজ। কিন্তু দেবদত্ত সাধারণ বিদূষক নহে, তাহার বিদূষকের ছদ্মরূপের নীচে তাহার মানহিতৈষী দরদী সত্তাটি প্রচ্ছন্ন আছে এবং তাহার আপাতনির্বোধ উক্তির মধ্যে বুদ্ধিমার্জিত ও বৈদগ্ধ্য-শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাণগুলি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদাঠাকুর, ঠাকুর্দা প্রভৃতি গূঢ় আধ্যাত্মিক রসাত্মক চরিত্র হইলেও তাহাদের উক্তির মধ্যে বাউলসুলভ একটি সরল ও স্নিগ্ধ রসিকতার সুর বিদ্যমান। 'প্রায়শ্চিত্তে'র বসন্তরায় উদার ও প্রীতিপ্রসন্ন রসিকতার একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। কিন্তু চরিত্রটি আমাদিগকে যেমন হাসাইয়াছে, তেমনি আবার কাঁদাইয়াছে। হিউমারের রসে চরিত্রটি অভিষিক্ত। সামাজিক জীবনে যে সব ক্ষুদ্রতা, নীচতা বিকৃতি, ও ভণ্ডামি রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি উৎপাদন করিত সে-সব বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত করিয়া তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারা উহাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রগুলির মধ্যে নাট্যকারের ব্যক্তিগত মত ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার আঘাতও অনেকসময় স্থূল ও অতিশয়িত রূপ ধারণ করিয়াছে। সেজন্য এই সব চরিত্র যে হাস্য উদ্রেক করে তাহা নির্দোষ ও নির্মল নহে, তাহা বিতর্ক, সংশয়, ক্ষোভ ও অসন্তোষমিশ্রিত। প্রাণহীন শিক্ষা ও হৃদয়হীন শিক্ষকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন প্রতিবাদ ছিল। 'মুক্ত-ধারা'র গুরুমহাশয়, 'অচলায়তনে'র মহাপঞ্চক ও 'রক্তকরবী'র অধ্যাপক চরিত্রের মধ্য দিয়া ঐ ব্যঙ্গমিশ্রিত প্রতিবাদ তিনি জানাইয়াছেন। 'রক্তকরবী'র কপট ধর্মধ্বজাধারী গোঁসাই ও পুরাতত্ত্বসর্বস্ব পুরাণবাগীশ এবং 'ফাল্গুনী'র নীতি ও তত্ত্ববাগীশ আনন্দবিমুখ দাদা প্রভৃতি চরিত্রও নাট্যকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টান্তস্থল।

'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' এই দুইখানি বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল রঙ্গ অথবা ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্য উদ্রেক করা। 'হাস্যকৌতুকে'র সব লেখাগুলিই হইল ক্ষুদ্রাকার কৌতুকনাটক। ইউরোপীয় শারাড-এর (Charade) অনুকরণে লিখিত ঐ নাটিকাগুলি হেঁয়ালিনাট্য নামে প্রথম বাহির হইয়াছিল,

ব্যঙ্গকৌতুকের লেখাগুলির মধ্যেও কয়েকটি নাটিকা রহিয়াছে। হাস্যকৌতুকের নাটিকাগুলির মধ্যে কৌতুকই প্রধান। কোথাও একটু শ্লেষের খোঁচা, কোথাও বা একটু ব্যঙ্গের আঘাত থাকিলেও নাটিকাগুলির মধ্যে নিছক কৌতুকসৃষ্টিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য আকারে ছোট হইলেও উহাদের কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট বিস্ময়জনক উপাদান ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাব রহিয়াছে। ছাত্রের পরীক্ষা, পেটে ও পিঠে, অভ্যর্থনা, রোগের চিকিৎসা, চিন্তাশীল প্রভৃতি নাটিকাগুলির প্রধানত ছোটদের উদ্দেশ্যেই রচিত। ছাত্রের পরীক্ষায় নির্মম শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি ঈষৎ শ্লেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। অভ্যর্থনায় এম, এ, পাশ করা চতুর্ভুজবাবুর গর্বান্ধতা বেশ একটু বিদ্রূপে বিদ্ধ করা হইয়াছে। রোগীর বন্ধু, সূক্ষ্মবিচার, আশ্রম পীড়া, খ্যাতির বিড়ম্বনা, অন্ত্যেষ্টি সৎকার প্রভৃতি নাটিকাগুলিতে কৌতুকরসের প্রাবল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্রমপীড়ায় প্রেম, ভাষা ও প্রত্নতত্ত্ব এই তিনপ্রকার বাতিক লইয়া প্রচুর কৌতুক করা হইয়াছে। তবে কৌতুকের সর্বাপেক্ষা আধিক্য বোধ হয় রহিয়াছে খ্যাতির বিড়ম্বনায়। নাটিকাটির শেষে গায়ক-বাদকদের যেখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইল সেখানে কৌতুকের উদ্দাম তাণ্ডব সকলকে যেন উত্তেজনার চরম স্তরে টানিয়া আনিল। অন্ত্যেষ্টি সৎকারে বাবার মৃত্যুর পূর্বেই ছেলেরা কিভাবে মৃত্যু-পরবর্তীকালের সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিল তাহার বর্ণনায় অকৃতজ্ঞ সন্তানদের প্রতি মন অসন্তুষ্ট হইলেও কাহিনীর উদ্ভট মৌলিকতায় প্রবল কৌতুকবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয়। চিন্তাশীল ও রসিক এই দুইটি নাটিকায় অনর্থক গুরুচিন্তা ও নিম্নস্তরের রসিকতার প্রতি লেখক একটু উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ রূঢ় ও স্পষ্ট ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে আর্য ও অনার্য, একান্নবর্তী ও গুরুবাক্য নামক নাটিকাগুলিতে। আর্যামি, প্রাচীন পারিবারিক আদর্শ, অন্ধ গুরুভক্তি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায় এই নাটিকাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

'ব্যঙ্গকৌতুকে'র নাটিকাগুলি প্রধানত ব্যঙ্গধর্মী। কিন্তু বশীকরণ নাটিকাটি কৌতুকজনক ঘটনাজটিল প্রহসন। কয়েকটি রচনায় সংলাপ থাকিলেও সেগুলিকে খাঁটি নাটক বলা চলে না, কারণ একটি অথবা দুইটি চরিত্রের দীর্ঘ ও অনাটকীয় উক্তি লইয়াই ঐ রচনাগুলি লিখিত। বিনিপয়সার ভোজ ও অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি একসংলাপী নাটিকা (Dramatic Monologue)

বিনিপয়সার ভোজে অক্ষয়বাবুর দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের এত আতিশয্য বর্ণিত হইয়াছে যে অক্ষয়বাবুর প্রতি সমবেদনা প্রবল হইয়া আমাদের হাস্যপ্রবণতাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তত্ত্বপ্রচারের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানাইলেন সারবান সাহিত্য নামক লেখাটির মধ্যে এবং নূতন অবতারে অবতারবাদ ও অন্ধ ভক্তিবিহ্বলতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিলেন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা' এই তিনটি হইল রবীন্দ্রনাথের খাটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসন। তবে এই তিনটি প্রহসনের হাস্যরস তিনটি স্বতন্ত্র ধারা অবলম্বন করিয়াছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র হাস্যরস আশ্রয় করিয়াছে চরিত্রকে। বৈকুণ্ঠ, কেদার, তিনকড়ি, অবিনাশ, ঈশান, বিপিন প্রভৃতি চরিত্রের নানা অসঙ্গতি, বিকৃতি, দোষ ও দুর্বলতাই প্রহসনটির হাস্যরসের উৎস হইয়াছে। 'চিরকুমার সভা'র হাস্যরস প্রধানত নির্ভর করিয়াছে বিদ্যুৎপ্রভ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের উপর। এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রই তাহাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা চিত্তচমৎকারী বাক্যের দ্বারাই হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে। 'শেষরক্ষা'র হাস্যরস অবলম্বন করিয়াছে প্রধানত জটিল ঘটনাকে। ভুলভ্রান্তি-জনিত এক অশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হইতেই নাটকটির প্রবল কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে। ঘটনাশ্রয়ী বলিয়াই এই প্রহসনটির কৌতুকরস সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় যে হাস্যরস প্রবাহিত হইয়াছে তাহা হিউমার অথবা করুণ হাস্যরসের পর্যায়ে পড়ে। জায়গায় জায়গায় করুণরস এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে মনে হয়, প্রহসনটি বুঝি ট্র্যাজেডির সীমানায় প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছে। স্নেহশীল, উদারচিত্ত ও একান্ত ভদ্র চরিত্র বৈকুণ্ঠের বাতিক দেখাইয়া নাট্যকার হাসালেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনকড়ির চরিত্রেও এই কারুণ্য ও সমবেদনা বর্তমান। অবিনাশের মতপরিবর্তন ও মনোরমা-বাতিক লইয়াও নাট্যকার যথেষ্ট পরিহাস করিয়াছেন। তাঁহার রাগ বোধ হয় একমাত্র কেদার চরিত্রটির প্রতি, কিন্তু নাট্যকারের প্রসন্ন উদারতা এই প্রহসনের মধ্যে এত বেশি পরিস্ফুট যে, কেদারকে শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত করিয়াও তাহার প্রতি তিনি কোন নির্মম শাস্তির বিধান করেন নাই।

'চিরকুমার সভা'র পরিকল্পনার মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুকজনকতা রহিয়াছে। যাহারা কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়াছে তাহারাই কিভাবে

তাহাদের ব্রত ভাঙিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল তাহার বর্ণনা যথেষ্ট কৌতুকোদ্দীপক হইয়াছে। অবশ্য কৌমার্যব্রত সম্বন্ধে যদি তাহাদের সত্যকার নিষ্ঠা থাকিত এবং বিবাহের প্রতি তাহাদের বিরূপতা আরও প্রবল হইত, তবে তাহাদের ব্রতভঙ্গ আরও বেশি কৌতুকোদ্দীপক ও আনন্দজনক হইত। ঘটনার রহস্যজনক উদ্ভটত্ব প্রধানত দেখা দিয়াছে শৈলবালার পুরুষবেশ ধারণ করিয়া চিরকুমার সভার সভ্য হওয়া এবং তাহারই ফলে নানা জটিল কৌতুকময় সংকটসৃষ্টির মধ্যে। নাটকটির মধ্যে কয়েকটি পুরুষ ও নারীচরিত্রের সরস ও মধুর প্রণয়কাহিনীর আবর্তজটিল বিবর্তন ও মিলনান্ত পরিণতির ফলে ইহা নিছক প্রহসনের স্তর হইতে উন্নীত হইয়া Comedy of Romance-এর পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীশ-বিপিন এবং নৃপবালা-নীরবালা জোড়ায় জোড়ায় নাটকের মধ্যে উপস্থিত করাতে যে সমান্তরাল সাদৃশ্য বা Parallelism-এর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কৌতুকরস বৃদ্ধি করিয়াছে। নির্মলার সহিত প্রকাশভীরু পূর্ণর সঙ্কুচিত প্রেমের বর্ণনাও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। 'চিরকুমার সভা'র হাস্যরসের প্রধান উৎস হইল অক্ষয় ও রসিক। কিন্তু তাহারা নিজেরা হাস্যাস্পদ নহে। তাহারা হাস্যকার। তাহাদের চরিত্রের মধ্যে কোন ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি নাই, কিন্তু তাহারা কথার মধ্যে হাসির রৌদ্র-ঝলসিত ঝরনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। দুইজনই তাহাদের পারিবারিক সম্বন্ধের পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে। একজন ভগ্নীপতি আর একজন ঠাকুরদা। একজন শালীবাহন আর একজন নাতনীতারণ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সংসারের আত্মীয়-সম্বন্ধের মধ্যে যেখানে হাস্য-পরিহাসের সুমধুর অবকাশ আছে সেখানে মনের আনন্দে যথেচ্ছ বিহার করিয়াছেন। অক্ষয়ের গান ও রসিকের সংস্কৃত শ্লোক পুষ্পিত মধুবনের সুমধুর কুহুধ্বনির মতই হাস্য-পরিহাসের রমণীয় জগৎকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'চিরকুমার সভা'র সভাপতি চন্দ্রবাবুর চরিত্র কারুণ্যসিক্ত হাস্যরসের দৃষ্টান্ত। আত্মভোলা, আদর্শপ্রাণ ও বাস্তববুদ্ধি রহিত চরিত্রটির কথায় ও আচরণে আমরা হাসি বটে, কিন্তু তাঁহার একক ও অসহায় রূপটি দেখিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ও অনুরক্ত না হইয়া আমরা পারি না। দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয় অবিমিশ্র ও অবারিত কৌতুকরসের দৃষ্টান্ত।

'শেষরক্ষা'র মধ্যে হাস্যরস যে রহস্যজটিল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রহসনটি যেন এক সর্বজনীন ভুলের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভুল বোঝা, ভুল চেনা, ভুল জানা প্রভৃতি নানা ভুল

তালবেতালের মতই ইহাতে যেন নানা উদ্ভট কাণ্ডকারখানা বাধাইয়া বসিয়াছে।[১] চন্দ্রকান্ত-ক্ষান্তমণি, গদাই-ইন্দু, বিনোদ-কমল ও ললিত-কাদম্বিনীকে লইয়া নানা কৌতুকজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মুহুর্মুহুঃ এমন আকর্ষণ-বিকর্ষণ সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, এক অনর্গল কৌতুকরসের উদ্বেল প্রবাহে আমাদের দিশাহারা হইয়া ভাসিয়া চলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক 'তাসের দেশে'র মধ্যে বিভিন্ন তাসের মানব মানবীর মত ভাব ও আচরণ দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত কৌতুক বোধ হয়। ছক্কা, পঞ্জা, গোলাম, প্রভৃতির যান্ত্রিক নিয়মনিষ্ঠ নাচগান যেমন কৌতুকজনক, তেমনি রুহিতন, হরতনী, ইস্কাবনী, টেক্কানী প্রভৃতি তাসীতাসিনীদের মানুষের মত দেহ ও মনের প্রসাধনের প্রতি অনুরাগও হাস্যোদ্দীপক। তাদের আকৃতির মধ্যে মানুষের প্রকৃতি—আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে এই বৈষম্যই অনবরত কৌতুকের আঘাতে আমাদের মনকে উত্তেজিত করিতে থাকে।

গল্প-উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে হাস্যরসের অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত ও উচ্ছ্বসিত প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার অনবদ্য গল্পগুলিতে। তাঁহার গল্পগুলি যেমন রচনাশৈলী ও শিল্পরীতির দিক দিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সমপর্যায়ভুক্ত, তেমনি জীবনরসের দিক দিয়া সেগুলি চিরন্তন সাহিত্যরসসম্ভোগীর আস্বাদনের সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ যখন গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি লিখিতেছিলেন তখন তিনি হৃদয়াবেগের দিক দিয়া মানুষের জীবনকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। সেই জীবন আনন্দবেদনার গঙ্গাযমুনায় মগ্ন। সেজন্য গল্পগুলি পড়িবার সময় বেদনার আঘাতে আমাদের হৃদয় বিক্ষত হইতে থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসির প্রলেপে সেই ক্ষতজ্বালা জুড়াইয়া যায়। গল্পগুলির মধ্যে সুগভীর হৃদয়রসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া হাস্যকৌতুকের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপটি আমরা সেগুলির মধ্যে দেখিতে পাই না। কোন ফেনিল

১। শেষরক্ষাতে এসে রবীন্দ্রনাথ চরিত্র সৃষ্টির দিকে ততটা লক্ষ্য না রেখে ঘটনাসংস্থানের আকস্মিকতার উপরেই জোর দিয়াছেন বেশী। এখানে চরিত্রগুলির মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যার উপর আশ্রয় করে হাস্যরসের সৃষ্টি হতে পারে। শুধুমাত্র ঘটনাচক্রের মধ্যে পড়ে এরা comedy of errors গড়ে তোলবার যন্ত্র মাত্র হয়েছে।

॥ রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস—সরোজকুমার বসু ॥

বুদ্‌বুদ, জটিল আবর্ত ও ক্রীড়াশীল তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে হাস্যকৌতুকের রূপ পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু তাহা সেই মূল রসধারার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়া আছে। তাহা আভাসে ইঙ্গিতে মুহূর্তে মুহূর্তে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু অকাট্যরূপে প্রকটিত হইয়া আমাদের দৃষ্টির উপর জবরদস্তি করে না। গল্পগুলির হাস্যরস প্রবহমান বাতাসের মত, বিকীর্ণ ফুলের গন্ধের মত মনকে পুলকিত করে কিন্তু যেন ধরা দিতে চায় না। কোথাও একটু তির্যক দৃষ্টি, কোথাও বা রসাল দুই একটি রঙের আঁচড়, আবার কোথাও হয়তো হঠাৎ-আলোকিত কোন ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি হাস্যকৌতুকের অবিরাম স্নিগ্ধ স্পর্শের দ্বারা গল্পগুলিকে অশেষ প্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে।

নিছক কৌতুকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বেশি গল্প লেখেন নাই। এই ধরণের গল্পের মধ্যে ইচ্ছাপূরণ নামক গল্পটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুত্রের পিতা হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং পিতার পুত্র হইবার বাসনার ফলে যে কৌতুককর পরিস্থিতিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের বর্ণনাই গল্পটির মধ্যে প্রবল কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছে। একটা আষাঢ়ে গল্পকেও এই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। আদ্যন্ত মৃদু এবং প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে রচিত গল্পগুলির মধ্যে দর্পহরণ, অধ্যাপক প্রভৃতি গল্পগুলি পড়ে। ইংরেজীনবিশ গর্বান্ধ স্বামী গল্প লিখিবার প্রতিযোগিতায় কিভাবে স্ত্রীর নিকট পরাজিত হইলেন তাহারই শ্লেষাত্মক বর্ণনা রহিয়াছে দর্পহরণ গল্পটিতে। অসার বিদ্যার অহঙ্কার ও উদ্ধত অহমিকার প্রতি চাপা শ্লেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে অধ্যাপক নামক গল্পটিতে। কৌতুক ও ব্যঙ্গের মিশ্রণ হইয়াছে রাজটিকা গল্পটিতে। একদিকে শালী ও অন্যদিকে ইংরেজ এই উভয় সঙ্কটে নবেন্দুর চরিত্র কৌতুকের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য নবেন্দুর মধ্য দিয়া খেতাবপ্রয়াসী ইংরেজের স্তাবক লোকদের প্রতি বিদ্রূপও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের অনাবৃত কঠোরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচারক গল্পটিতে। বিচারক মোহিত অত্যন্ত কড়া বিচারক ও মেয়েদের চারিত্রিক বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সতর্ক ও প্রখরদৃষ্টি। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে যে মেয়েটির তিনি সর্বনাশ করিয়াছিলেন তাহারই ফাঁসির হুকুম তিনি দিলেন। বিচারক এই কথাটির মধ্যে লেখকের মর্মান্তিক ব্যঙ্গই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হাস্যরসের সহিত কারুণ্যের মিশ্রণ হইয়াছে ঠাকুরদা গল্পটিতে। ঠাকুরদা নিজের দারিদ্র্য ও হীন অবস্থা গোপন করিবার জন্য লোকের কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলিতেন এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার অসহায়

ও নিরুপায় অবস্থার জন্য তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মন পূর্ণ হইয়া উঠে। অবশেষে এই সজ্জন ও সদাশয় লোকটি একটি কুৎসিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা কিভাবে বিব্রত ও লাঞ্ছিত হইলেন তাহার বিবরণ পড়িবার সময় সমবেদনায় ও অশ্রুভারে আমাদের অন্তর অভিভূত হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে রচিত গল্পগ্রন্থ 'সে' ও 'গল্পসল্প' ছোটদের ভুলাইবার জন্য বাস্তবের সহিত অবাস্তবের মিলন ঘটাইয়াছে। 'সে'-র চিত্র, গল্প ও ছড়াগুলি অসংলগ্ন আবোলতাবোল-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত। 'সে'র উৎসর্গপত্রে কবি লিখিয়াছিলেন 'যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।' আজগুবির সহিত অনেক গূঢ় তত্ত্বের সমাবেশ হইয়াছে ইহার গল্পগুলিতে। গল্পসল্পে নাতনী কুসমীকে দাদামহাশয় পুরাতন দিনের অনেক জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীবনগুলি তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ। ছেলেবেলার স্মৃতিকথা আলোচনা করিয়া নানা কৌতুককর ঘটনাই গল্পগুলির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কবির কৈফিয়ৎ—

আমাদের কাল থেকে ভাই,
একালটা আছে বহু দূরে—
মোটা মোটা কথাগুলো তাই
বলে থাকি খুব মোটা স্বরে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকে লিখিত উপন্যাসগুলিতে যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মৃদু, অনুচ্ছ্বসিত ও গূঢ়-সঞ্চারিত। তাহা হৃদয়রসস্নিগ্ধ হিউমার। তাহা মনকে প্রসন্ন ও সিক্ত করে, কখনও বা বেদনার করুণ স্পর্শে মনকে কিছু ভারাক্রান্ত করে। কিন্তু শেষ দিকে, বিশেষত 'গোরা'র পরে লিখিত উপন্যাসগুলিতে হৃদয়ের স্পর্শ অপেক্ষা মননের ধাক্কাই বড় হইয়াছে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের শাণিত ঝলক ও বিরোধমূলক অলঙ্কারের চিত্তচমৎকারী ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার উপন্যাস যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র ঝলসিত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।[১]

১। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—'এই উপন্যাসগুলিকে উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিপরীত ধারার সমাবেশ দেখা যায়। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি প্রায় সর্বত্রই epigram-এর লক্ষণাক্রান্ত। Merdith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসের একপ্রকার তীক্ষ্ণ কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত, অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থগৌরবের দ্যোতনা (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে।

॥ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ॥

প্রথম যুগের উপন্যাস হইতে তিন রকম হাস্যরসের তিনটি দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করা যাক। কৌতুকরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'গোরা'র কৈলাস চরিত্রটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার চেহারার বর্ণনা লেখক এভাবে দিয়াছেন, 'বেঁটেখাটো আঁটসাঁট মজবুত গোছের চেহারা, কামানো গোঁফদাড়ি কিছুদিন ক্ষৌরকর্মের অভাবে কুশাগ্রের ন্যা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।' তাহার বাড়ি ও বৌ লাভ করিবার কল্পনা সেই অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পাইবার স্বপ্নের মতই পাঠকের মনে কৌতুক সঞ্চার করিয়াছে। 'গোরা'র পানুবাবু চরিত্রটি ব্যঙ্গরসের উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম হইলেও ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীদের অনুদারতা, ক্ষুদ্রতা ও পরমতঅসহিষ্ণুতাকে কতখানি নিন্দা করিতেন তাহার নিদর্শন মিলিবে এই চরিত্রটিতে। স্বজাতি ও স্বদেশের মর্যাদাকে ছোট করিয়া যাহারা আত্মগৌরব বোধ করে তাহাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদও এই চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন। সে নিজেকে নিরঙ্কুশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে যতবার চেষ্টা করিয়াছে ততবারই পরাজয়ের অনপনেয় কালিমায় নিজের মুখমণ্ডলকে কুৎসিত ও হাস্যকর করিয়া ফেলিয়াছে। 'নৌকাডুবি'র ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে হিউমারের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সদাশয় ও সুরসিক লোকটি সবসময়ে একটি সরস ও উপভোগ্য রসে পাঠকের চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া রাখে।

শেষ যুগের বৈদগ্ধ্যদীপ্ত হাস্যরসের একটি সার্থকতম দৃষ্টান্তরূপে এই যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেষের কবিতা'র আলোচনা করা যাইতে পারে। শেষের কবিতার বাগ্‌ভঙ্গি উহার নায়ক অমিত রায়ের মতই প্রচলিত, প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সব কিছুর বিরুদ্ধে এক উদ্ধত ও দুর্দান্ত প্রতিবাদ। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি কথাই হীরকের দ্যুতির মতই উজ্জ্বল আলোকবিলাসে সতত চঞ্চলগতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যে রোমান্সের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে বিরোধাভাস, বিষম, অসঙ্গতি ও বিরুদ্ধ-বিন্যাস প্রভৃতি অলঙ্কারের উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া উৎক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। বইখানি পড়িবার সময় প্রতি পদে পদে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরীক্ষা দিয়া ইহার অন্তঃশায়া রসধারা সম্ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তবুও কোথাও মনে হয় না যে, ইহার অন্তর্নিহিত ভাব ইহার ভঙ্গিজালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নীল আকাশে তারার চুমকীর মতই ভাবের সহিত ভঙ্গি

এখানে এক হইয়া রহিয়াছে। 'শেষের কবিতা'য় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সহিত প্রায়ই ব্যঙ্গবিদ্রূপের রসান মিশিয়াছে। অমিতের মতই রবীন্দ্রনাথ স্টাইলের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল কিন্তু ফ্যাসানের প্রতি ঘোর বীতশ্রদ্ধ। উগ্র ফ্যাসানদুরস্ত উন্মার্গগামী নরনারীদের মুখোস তিনি একটু নির্মমভাবেই উন্মোচিত করিয়াছেন। অমিতের দুই বোন লিসি সিসির বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিলেন, 'এরা খুটখুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি।' কিন্তু লেখকের ব্যঙ্গ সর্বাপেক্ষা শাণিত ও কঠোর হইয়াছে নরেন মিটার ও তাহার বোন কেটি মিটারের চরিত্র চিত্রণে। আহেলা বিলাতী ও মার্কটীবৃত্তিনিপুণ নরেন মিটারের চিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া লেখক বলিয়াছেন, 'ওর স্ল্যাভ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা।' কেটি মিটার তাহার দাদারই যোগ্য বোন। তাহার বাঙালী নারীসমাজ বহির্ভূত উৎকট আকৃতি ও দেহসজ্জার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে তীক্ষ্ণছুরিকার মর্মভেদী আঘাতের বহু চিহ্ন বিদ্যমান। তাহার পাদুকার বর্ণনা দিতে যাইয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, 'সবচেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুরওয়ালা জুতাজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।'

প্রবন্ধ ও আলোচনা

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় প্রবন্ধ বিভাগেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁহার হাতে এক নূতন রসসৌন্দর্য ও শিল্পোৎকর্ষে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। শুধু কেবল বিতর্ক ও বিচার নহে, তত্ত্ব ও তথ্যসন্নিবেশ নহে, প্রবন্ধের মধ্যে অনুভূতিরসাপ্লুত হৃদয়ের যে স্পর্শ আনা যায়, আবেগ ও কল্পনার অঙ্গরাগে যে ইহাকে অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি দান করা যায় তাহার পরিচয় পাইলাম আমরা তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যে।

এই রসাল রমণীয়তার জন্যই তাঁহার প্রবন্ধে আমরা বস্তু অপেক্ষা লেখকের সরস, অনুভূতিকোমল হৃদয়ের স্পর্শটুকুই বেশি পাই। কখনও হাসির শুভ্র আলোক ছড়াইয়া, কখনও কৌতুকজনক কোন ঘটনার রঙ চড়াইয়া, কখনও বা গভীরভাবে রসিকতার দুই একটি অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকেই পাঠকের সম্মুখে সতত তুলিয়া ধরেন।

ব্যঙ্গকৌতুকের মধ্যে যে প্রবন্ধগুলি আছে সেগুলিতে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ভাবই প্রধান। মৃদু-শ্লেষাত্মক হাস্যরসপ্রধান প্রবন্ধগুলির মধ্যে রসিকতার ফলাফল-মীমাংসা প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম করা যাইতে পারে। রসিকতার ফলাফল প্রবন্ধটিতে লোককে হাসাইতে যাইয়া বিপত্তির সরস বিবরণ রহিয়াছে। অরসিকের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষের ভাবই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মীমাংসায় রোমান্টিক ব্যাধির এক বাস্তব চিকিৎসার মধ্যে হাস্যরসের প্রবলতা দেখা গিয়াছে। বাঁশির সুরে একজন রোমান্টিক নায়িকা বিরহিণী রাধিকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল 'আমার এ কী হইল, এ কী বেদনা। নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া চমকি চমকি উঠি।' ইহার উত্তর বেশ উপযুক্ত, 'তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পূবে হাওয়া বহিলে যে দ্বার রোধ করিয়া দাও সেটা ভালোই কর।' ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য, প্রত্নতত্ত্ব, লেখার নমুনা, পয়সার লাঞ্ছনা প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ও লেখকের সুস্পষ্ট মত ও পথ ব্যক্ত হইয়াছে। ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য ও পয়সার লাঞ্ছনায় বিদেশী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুইটিতেই রূপকের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। পিঁপড়ের প্রতি ডেঞেদের ঘৃণা ও তাহাদের খাদ্য আত্মসাৎ করিবার মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিদ্বেষ ও তাহাদের খাদ্য হরণ করা হইয়াছে। পয়সার লাঞ্ছনায় দরিদ্র ও দুর্ভাগ্যপীড়িত জনগণের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর মানুষের বিজাতীয় অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের চিত্র বিদ্রূপকষায়িত ভঙ্গিতে অঙ্কিত হইয়াছে। নিম্ন-অবস্থার মানুষদের মধ্যে যাহারা ভণ্ড ও ভেজাল তাহারাই শুধু সামাজিক-ভাবে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব ও লেখার নমুনা এই দুইটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধমতবাদীদের লেখা ও গবেষণার প্রতি বিদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নব্যহিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরব ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহারা

বিদ্রূপবিদ্ধ হইলেন প্রত্নতত্ত্ব প্রবন্ধটিতে। নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া যাঁহারা তৎকালীন সাহিত্যে তরল ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন তাঁহারা উপহসিত হইলেন লেখার নমুনায়।

অন্তরঙ্গ সুরে রচিত চিঠিপত্রগুলির মধ্যে নানা হাস্যকৌতুকের উপাদান ছড়াইয়া রহিয়াছে। কথোপকথনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে রসিক ও বিদগ্ধ সত্তাটি ফুটিয়া উঠিত তাহাই ধরা পড়িয়াছে তাঁহার চিঠিপত্রগুলির মধ্যে। চিঠিপত্রের বিশিষ্ট শিল্পটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হইল। তাঁহার পূর্বে চিঠিপত্রে থাকিত শুধু মাত্র সংবাদ, তাহা ছিল প্রয়োজনের বাহন, অপ্রয়োজনের আনন্দদূত নহে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে সংবাদ সাহিত্যে পরিণত হইল, তথ্যবস্তু রসপ্রবাহে রূপান্তরিত হইল। 'ছিন্নপত্রে'র পত্রগুলির কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচনা করা যাইতে পারে। পত্রগুলি তিনি যখন লিখিতেছিলেন তখন যৌবনের আনন্দরসে তাঁহার হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়াছিল, বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য ও হৃদয়স্পর্শ লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রীতিপ্রসন্ন সত্তাটি সর্বদাই উন্মুখ হইয়া ছিল। একদিকে জীবনের গভীরে ডুব দিবার জন্য গভীর অনুরাগ, অন্যদিকে জীবনের বহিঃপ্রকাশিত ফেনিল লীলাচঞ্চল তরঙ্গে বিলাস করিবার প্রবল আগ্রহ—এই দুই রকম প্রবৃত্তিই তাঁহার মধ্যে তখন দেখা গিয়াছিল। সেজন্য পৃথিবীর রহস্য ও সৌন্দর্য ব্যক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মানুষের জীবনের ছোটখাট হাস্যকর দিকগুলি তুলিয়া ধরিবার ইচ্ছাই দেখা গিয়াছে পত্রগুলির মধ্যে। স্কুলের ছেলেরা বিকৃত বিশুদ্ধ ভাষায় কিভাবে আবেদন পেশ করিল (পত্র—১৭), যৌবতীর মান ভাঙ্গাইবার জন্য নৌকার মাঝিরা কি সুরে কেমন করিয়া গান গাহিল (পত্র—৯৩), দার্জিলিঙের পথে যাইবার সময় কবির কিরূপ বাক্স Phobia (পত্র—৯) হইল এই সকল টুকরা টুকরা ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি হাস্যকৌতুকের কণা ছড়াইয়া চলিয়াছেন। তুচ্ছ ও অনালোচ্য বিষয় গুরু গম্ভীর রীতিতে আড়ম্বরের সঙ্গে বর্ণনা করিয়া তিনি অনেক স্থলেই কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। এক স্থানে বাতের উপর তিনি যে সরস মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইল—

'কোমরে বাত হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা যামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়—অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত

কেউই বাতের উপর এক ছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারও বাত হয় নি।'

'জীবনস্মৃতি'র প্রবন্ধগুলিও স্নিগ্ধ রসিকতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। পরিণত বয়সে পশ্চাৎপ্রসারী দৃষ্টি দিয়া যখন ছেলেবেলাকার দিনগুলি দেখা যায়, তখন তাহাদের মধ্যে অনেক হাস্যকৌতুকের রমণীয় উপাদানই চোখে পড়ে। ছোটবেলায় মনের মধ্যে যে প্রবৃত্তি ও প্রবণতা, ভয় ও রহস্য বাসা বাঁধিয়া থাকে বয়স্ক মনের নিকট সেগুলি কতই না কৌতুক যোগাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ শৈশবে পুলিসম্যানের নামে কিরূপ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, রেলিংগুলিকে ছাত্র জ্ঞান করিয়া কিভাবে তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা চালাইতেন তাহার বর্ণনা অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে অতিশয় সরস করিয়া দিয়াছেন। ছোটবেলায় যে সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া আমোদ পাইয়াছিলেন তাহাদের চরিত্র সরস ভঙ্গিতে প্রীতির স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কৌতুকপরায়ণ কৈলাস মুখুজ্যে, সুপক্ক বোম্বাই আম সদৃশ স্নিগ্ধ-মধুর শ্রীকণ্ঠবাবু কালো মোম-জামা-মণ্ডিত, দোর্দণ্ড-প্রতাপ লাঠিয়াল এবং প্রেতলোকের সংগীতসাধক মুনশি প্রভৃতি চরিত্র জীবনস্মৃতির পাঠক কোনদিন ভুলিতে পারিবেন না।

হাস্যপরিহাসের সরস স্পর্শে গুরুগম্ভীর তত্ত্ববস্তুও কিরূপ উপভোগ্য হইয়া উঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পঞ্চভূতের প্রবন্ধগুলির মধ্যে। হাস্যরসের আলোচনায় 'পঞ্চভূতে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই বইখানিতেই রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক সম্বন্ধে দুইটি অতুলনীয় প্রবন্ধ—কৌতুকহাস্য ও কৌতুকহাস্যের মাত্রা রহিয়াছে। হাস্যকৌতুকের প্রকৃতি ও প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার মন তৎকালে যে বিশেষভাবে সজাগ ছিল তাহা ঐ প্রবন্ধ দুইটি হইতেই বুঝা যায়। ক্ষিতি, অপ (স্রোতস্বিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ (সমীর), ব্যোম এই পাঁচটি চরিত্রের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে আনিয়া তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কথোপকথনের অবতারণা করিয়া নানা দুরূহ ও জটিল তত্ত্বকে রমণীয় ও সম্ভোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির চঞ্চল মেয়েলী ভাব ও আচরণ এবং ব্যোমের অদ্ভুত সাজসজ্জা ও গম্ভীর আকৃতিই সর্বাপেক্ষা বেশি হাস্য উদ্রেক করিয়াছে। ব্যোম অন্যান্য সভ্যদের দ্বারা উপহসিত হইলেও আসলে তত্ত্ব আলোচনায় সেই বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশি অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আসলে তাহারা সকলেই সম্মিলিতভাবে এক একটি অখণ্ড তত্ত্বই প্রতিপন্ন

করিয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে তর্কবিতর্ক এবং পরস্পরের প্রতি শ্লেষ-মন্তব্য প্রভৃতি ছল মাত্র এবং তত্ত্ব-আলোচনাই মুখ্য, কিন্তু ঐ ছল হইতেই হাস্য-কৌতুকের প্রবাহ উৎসারিত হইয়াছে।

'লিপিকা'র রচনাগুলিতেও হাস্যরসের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। ১নং বিভাগের রচনাগুলি গদ্যকবিতার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা চলে এবং গাঢ় অনুভূতির স্পর্শ থাকায় এই রচনাগুলিতে হাস্যকৌতুকের উপাদান নাই। ২নং ও ৩নং রচনাগুলিতে গল্পের মাধ্যমে নানা তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে। নামের খেলায় নামের প্রতি সকল মানুষের স্বাভাবিক লোভ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে। ভুল স্বর্গে বেকার লোকটি কেজো লোকের স্বর্গে যাইয়া যে বিভ্রাট বাধাইয়া বসিল তাহারই কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কর্তার ভূত ও তোতাকাহিনী এই দুইটিই হইল বিদ্রূপাত্মক রচনা। কর্তার ভূতে আমাদের দেশবাসীর আত্মবিশ্বাসের অভাব ও অতীতের প্রতি অন্ধ ও ভীতিবিহ্বল আনুগত্যকে কঠোর বিদ্রূপের আঘাতে বিপর্যস্ত করা হইয়াছে। তোতা কাহিনীতে জীবনের আনন্দরস হইতে বঞ্চিত করিয়া সীমাবদ্ধ ও নিয়মনিয়ন্ত্রিত রূঢ় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থিগণকে যে দুর্বোধ ও কৃত্রিম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার বিরুদ্ধে আনন্দবাদী, শিক্ষাসংস্কারক কবি তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা করুণহৃদয় সহানুভূতিশীল লেখক হইলেন শরৎচন্দ্র। অন্যান্য লেখকের মধ্যে অন্যান্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্র হইলেন খাঁটি বাঙালী। বাঙালীর হৃদয়মথিত প্রেম ও কোমলতার অমৃতধারায় তাঁহার প্রতিভা অভিষিক্ত হইয়াছিল। সেই প্রতিভার প্রখর দীপ্তি ও উজ্জ্বল বর্ণ-বিলাস আমাদের বুদ্ধিবিলসিত দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু তাহার শান্ত ও শীতল চন্দ্রিকারাশি আমাদের হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া দেয়। জীবনের ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সুকৃতি ও বিকৃতি সব কিছুই তিনি সহানুভূতিসিক্ত ও সমবেদনা-করুণ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন। সেজন্য যাহা স্থূল, যাহা সাধারণ ও যাহা অসুন্দর সে-সব বস্তু তাঁহার সাহিত্যে এক বেদনারসসিঞ্চিত সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে। ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু থাকিলেই তাহা মনোহর হইয়া উঠে, জলপূর্ণ সরোবরেই পদ্মের রূপ বিকসিত হয়। তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে বেদনার করুণ অশ্রুস্পর্শে। জীবনের বেদনা-উৎস হইতে উদ্ভূত সৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশ আমরা দেখি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্র জীবনরসের নির্বিকার ও নির্বিচার ভোক্তা। সেই রস শুধু মধুর নহে। তাহা কটু, অম্ল, তিক্ত ও কষায় প্রভৃতি আস্বাদের সহিত যুক্ত। সেজন্য স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির সহিত ভুলভ্রান্তি, বিকৃতি ও অসঙ্গতি প্রভৃতি জীবনের বাহ্য ও স্থূল উপাদানগুলিও তাঁহার সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু যে বেদনারস তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে তাহার সিক্ত স্পর্শে হাস্যকৌতুকের উপাদানগুলিও বেদনাশ্রুধৌত হইয়া উঠিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বে জলবেষ্টিত বালুকাভূমি সূর্যালোকে ঝলসিতে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অনবরত জলপ্রবাহে সিক্ত হয়। শরৎচন্দ্রের হাস্যপরিহাসও বিমল আনন্দ-কিরণ ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেদনার করুণ প্রবাহে অভিস্নাত হয়। তিনিই বোধ হয় আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ করুণ হাস্যরসস্রষ্টা। তাঁহার হাসি যেন অশ্রুর জমাট তুষাররাশি, যেন জলভারানত মেঘের বুকে চঞ্চল বিদ্যুৎ-বিলাস।

যথার্থ হিউমারশিল্পীর মত শরৎচন্দ্র যাহাদের লইয়া হাসিয়াছেন তাহাদের আবার নিবিড়ভাবে ভালোবাসিয়াছেন, যাহারা জীবনের প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে পারে না, অন্ধকারাচ্ছন্ন গোপন সুড়ঙ্গপথে যাহারা তাহাদের বিড়ম্বিত

জীবন বহন করিয়া চলে, যাহারা হলাহলপাত্র অশ্রুজলের সঙ্গে মিশাইয়া পান করে তাহারাই শরৎচন্দ্রের পরিচিত ও প্রিয় চরিত্র। তাহাদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য বর্ণনা করিয়া তিনি আমাদের কাঁদাইয়াছেন কিন্তু তাহাদের ত্রুটি ও বিকৃতি, ভ্রান্তি ও দুর্বলতা দেখাইয়া তিনি আমাদের হাসাইয়াছেনও বটে। নন্দমিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমী, থাকোবাবা ও সাধুজী, প্রিয়নাথ ও কৈলাস খুড়া, দীননাথ ও ধর্মদাস, এবং পোড়াকাঠ প্রভৃতি চরিত্র নিতান্তই তুচ্ছ ও সাধারণ, কিন্তু স্নিগ্ধ পরিহাসের স্পর্শে তাহারা এক একটি অবিস্মরণীয় হাস্যরসের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের সমস্যাজটিল, আবর্তসঙ্কুল পথে যাহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে তাহাদের বেদনা ও জিজ্ঞাসা তিনি চোখের জলের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু যাহারা নিত্যকার সমাজের পায়েচলা পথটিতে আনাগোনা করে, যাহারা আমাদের অন্তরঙ্গ ও আত্মীয় তাহাদের প্রতিও তিনি তাঁহার কৌতূহলী ও কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের কলহ ও ভালোবাসা, ভুল-বোঝাবুঝি ও সাময়িক মন-কসাকসি, বাতিক ও অন্যমনস্কতা, ক্ষুদ্রতা ও নীচতা তিনি হাস্যপরিহাসের আঘাতে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। যাহাদের লইয়া তিনি মজা করিয়াছেন, তিনি তাহাদেরই একজন, রঙ মাখাইতে যাইয়া তিনি নিজেও রঙ মাখিয়া ফেলিয়াছেন। যে আঘাত তিনি তাহাদের দিয়াছেন সেই আঘাত তিনি দ্বিগুণ সহ্য করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার হাস্যরস প্রধানত হিউমার-ধর্মী হইলেও তাহাতে যে ব্যঙ্গ একেবারে নাই তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় করুণা ও সমবেদনায় পূর্ণ ছিল বলিয়াই মানুষের নীচতা, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা ও অপচিকীর্ষা দেখিয়া মাঝে মাঝে তিনি অসহিষ্ণু ও তিক্ত হইয়া উঠিতেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলি, গোলোক চাটুজ্যে, রাসবিহারী প্রভৃতি চরিত্রকে সেজন্য তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবুও তাহাদের শাস্তির ভার তিনি গ্রহণ করেন নাই, সেই ভার তিনি দিয়াছেন পাঠকদের উপর।

শরৎচন্দ্রের হাস্যরস প্রধানত চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াছে। চরিত্রগুলিতে কখনও তাঁহার রঙ্গ, কখনও বা ব্যঙ্গ ফুটিয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে নেপথ্যেই অবস্থান করিয়াছেন, কোথাও পাঠক ও তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে নিজেকে আনিয়া ফেলেন নাই। মাঝে মাঝে কাহিনী বর্ণনা কালে দুই একটি সরস মন্তব্য ও কৌতুকজনক উক্তি করিয়া পাঠকের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু যেখানে তিনি

নিজেই হাস্যরস পরিবেষণের ভার লইয়াছেন সেখানে তিনি তাঁহার নিজস্ব বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। সেখানে তাঁহাকে আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি হাস্যরসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখিতে পাই। সেখানে তাঁহার ভাষায় কৌতুকের কথাগুলি শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকের মত বিরাজমান। বাক্যবিন্যাস-প্রণালী ও বলিবার ভঙ্গিটি হাস্যকৌতুকের রঙীন চূর্ণে মার্জিত। নিজের মুখের আকৃতি গম্ভীর করিয়া, পাঠকের মনে কৌতূহল ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়া, কখনও রহিয়া সহিয়া, কখনও বা অকস্মাৎ তিনি কৌতুকের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকেন। পাঠক হস্তচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার হস্তনির্দেশে যেন হাসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একবার হাসি আরম্ভ হইলে শরৎচন্দ্র যেন নির্মম ও ক্ষমাহীন হইয়া উঠেন। একটির পর একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পাঠকের দেহ ও মন প্রায় অসাড় করিয়া ফেলেন। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের মেজদার নিদারুণ অধ্যয়ন নিষ্ঠা ও দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের লোমহর্ষণ ঘটনা প্রবল কৌতুকরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমেই মনে আসিবে। মেজদার প্রতি ব্যঙ্গ করিতে লেখক ছাড়েন নাই তাহা সত্য এবং মেজদার পরীক্ষার ফলাফল ও অবিচল অধ্যয়নসাধনার একটি গুরুতর বৈষম্যের ফলে তাহার চরিত্র অধিকতর কৌতুকাবহ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কৌতুকের প্রাবল্য দেখা গিয়াছে থুথুফেলা, নাকঝাড়া, তেষ্টাপাওয়া ইত্যাদি টিকিটের প্রবর্তন ও তাহাদের নিখুঁত ও সুচারু তত্ত্বাবধানে। মেজদার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যে এই কৌতুকপর্বের চূড়ান্ত পরিণতি, 'কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলো তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই কি অদৃষ্টের অন্ধ বিচার? যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে!' এই রোমাঞ্চকর অধ্যয়নপর্বের পরেই দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্ব। মেজদার সেই প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া আঁা আঁা শব্দ, পিসেমশাই ও তাহার দুই ছেলের গগনবিদারী চিৎকার, শ্রদ্ধাস্পদ ভট্‌চায্যিমশাইকে চোর মনে করিয়া দরওয়ানদের বেদম ঠেঙানি, হিন্দুস্থানী দরওয়ানদের অভূতপূর্ব পরাক্রম এবং পরিশেষে ক্রুদ্ধ ভট্‌চায্যি মশাইয়ের অনবদ্য হিন্দী বকুনি, 'এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া'—এই সবের মধ্য দিয়া যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ঘটিল তাহাতে হাসির আঘাতে আঘাতে আমাদের নিতান্তই

বেসামাল হইয়া পড়িতে হয়। প্রবল কৌতুকের দৃষ্টান্তস্বরূপ মেঘনাদবধের অ-পূর্ব অভিনয় ব্যাপারটিরও উল্লেখ করিতে হয়। বিরাটদেহ ও বিশালপেট মেঘনাদ যখন প্রচণ্ড লাফ দিয়া স্টেজে প্রবেশ করিলেন তখন ফুটলাইটের পাঁচ ছয়টি ল্যাম্প উল্টাইয়া গেল এবং তাহার কোমরবন্ধটাও পটাস করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিন্তু বীর মেঘনাদ অবলীলাক্রমে এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্যই শোনা যাক—'ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।' 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে জাহাজে উঠিবার আশায় প্রতীক্ষারত যাত্রীদের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও শরৎচন্দ্রের বাস্তব বর্ণনানৈপুণ্য ও কৌতুকের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। পিলেগকা ডগদরির যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতুকজনক। জাহাজের লোকেদের যে সম্মিলিত জাতীয় সংগীতের বর্ণনা লেখক দিয়াছেন তাহা তো দস্তরমত রোমাঞ্চকর। কিন্তু এই বিভিন্নজাতীয় গায়কদের মধ্যে কাবুলিয়ালার গানের মত এত আমোদজনক বোধ হয় আর কাহারও গান নহে। শরৎচন্দ্রের উক্তি, 'জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কিনা জানি না, না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায়, একথা কে ভাবিতে পারে?' বর্মী স্ত্রীকে ঠকাইয়া যে বাঙালী যুবকটি দেশে রওনা হইল তাহার বিদায়-দৃশ্যটির মধ্যে প্রবল কৌতুকরস থাকিলেও লেখক যেন সেই কৌতুকরসে যোগ দেন নাই, তিনি যুবকটির হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধেই তীব্র নালিশ জানাইয়াছেন। আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় অভিভূত বর্মী স্ত্রীকে কপট সান্ত্বনা দিবার ছলে যখন সে বাংলা ভাষায় বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম!' তখন নিকটবর্তী বাঙালী শ্রোতাদের কাছে তাহা কৌতুকাবহ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে মানবচরিত্রের এক আত্যন্তিক নৃশংসতার দিকও লেখকের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

অবিমিশ্র কৌতুকরস সৃষ্টি করিবার জন্য শরৎচন্দ্র যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়িবে 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের নন্দমিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর কথা। টগর বোষ্টমী জাত বোষ্টমের মেয়ে, বিশ

বছর কৈবর্তের ঘর করিতেছে বটে কিন্তু কখনও তাহাকে হেঁসেলে ঢুকিতে দেয় নাই। নন্দ একটু নিরীহ গোছের, একটু রসিকও বটে, কিন্তু টগর বোষ্টমীর ঐ ভাঁটার মত চোখের কড়া নজরে এবং মোটা জোড়া ভুরুর প্রখর শাসনে তাহাকে সর্বক্ষণ বন্দী থাকিতে হয়। নন্দমিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধের জয়পরাজয়ের কথা শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু আমরা অনুমান করিতে পারি টগর বোষ্টমীরই নিশ্চয় জয় হইয়াছিল। সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র লইয়া শরৎচন্দ্র অনেক স্থলেই কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে যে সাধুবাবার শিষ্যত্ব শ্রীকান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভোজনবিলাস, গঞ্জিকাসেবা ইত্যাদি বিবিধ উচ্চাঙ্গের পারমার্থিক সাধনার যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা বিশেষ কৌতুকজনক। আর একজন কৌতুকরসাত্মক সাধু হইলেন চরিত্রহীনের থাকোবাবা। মদ ও গাঁজার প্রতি ইঁহার আসক্তি অসাধারণ, তবে ইনি পূর্বোক্ত সাধুবাবার ন্যায় শান্তস্বভাব ও উদারচেতা নহেন, ইঁহার মেজাজ অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং মুখের ভাষাও অত্যন্ত স্পষ্ট ও শাণিত, কথায় কথায় ইনি লোকের সঙ্গে সন্ন্যাসীর অবিধেয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসেন। বেহারীর হাতে ত্রিশূল দেখিয়া তাহার কুকুরের মত সভয় চীৎকারের দৃশ্যটি ভুলিবার নহে।

কারুণ্যসিক্ত হাস্যরসাত্মক চরিত্রগুলির আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথ ডাক্তারের কথা মনে পড়িবে। এই সরল, আত্মভোলা পাগলাটে ও উদারহৃদয় ডাক্তারটিকে কখনও ভোলা যায় না। হোমিওপ্যাথির প্রতি তাহার অসামান্য শ্রদ্ধা, হোমিওপ্যাথি ঔষধগুলিও তাহার নখদর্পণে, কিন্তু তাহার শুধু নাই একটুখানি বাস্তববুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান। পরাণ চাটুয্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া হোমিওপ্যাথির মান রাখিবার জন্য ক্যাষ্টর অয়েল সেবন, পা-মচকানর চিকিৎসা করিতে যাইয়া মৃত্যুভয়ের ঔষধ ব্যবস্থা করা, রোগীর আশায় হা পিত্যেশ করিয়া বসিয়া থাকা এবং হোমিওপ্যাথির ঔষধগুলি বীজমন্ত্রের মত জপকরা প্রভৃতির বর্ণনা পড়িতে পড়িতে প্রবল হাস্যবেগে উত্তেজিত হইতে হয়, কিন্তু শুধু কেবল হাসির মধ্য দিয়া চরিত্রটি শেষ করা যায় না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রটির প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ ও সমবেদনা জন্মিতে থাকে তাহাই আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইয়া বসে, তাহার প্রতি সকলের অনাস্থা ও অবজ্ঞা, স্ত্রী জগদ্ধাত্রীর তীব্র ভর্ৎসনা এবং অবশেষে গোলোক চাটুয্যের পৈশাচিক ব্যবহার প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের করুণরসাপ্লুত

অন্তর হইতে তাহার জন্য অপরিমেয় সমবেদনা ক্ষরিত হইতে থাকে। 'চন্দ্রনাথে'র দাবাখেলার বাতিকগ্রস্ত স্নেহশীল বৃদ্ধ কৈলাসখুড়ার চরিত্রটি এরকম আর একটি করুণ হাস্যরসাত্মক চরিত্র। কৈলাসের সরস কথাবার্তা ও দাবার প্রতি অত্যধিক আসক্তি আমাদের কৌতুক উদ্রেক করিলেও তাহার অনাবিল স্নেহের প্রকাশ এবং বিচ্ছেদকাতর জীবনের পরিণতি আমাদের অন্তঃকরণকে সমবেদনায় আর্দ্র করিয়া দেয়। 'অরক্ষণীয়া'র পোড়াকাঠচরিত্রটি হিউমারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিশীল জীবনবোধের অদ্ভুত ক্ষমতা পোড়াকাঠের মধ্যে তিনি স্নেহ ও সহানুভূতির শীতল রসধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন! তাহার কালো, রোগা এবং লম্বা দেহ, অনাবৃত মাড়িযুগল, বীভৎস হাসি এবং কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠস্বর প্রভৃতি সকলের মনে ভয়মিশ্রিত কৌতুক উদ্রেক করে। কিন্তু সেই আবার তাহার অর্থপিশাচ স্বামীর কবল হইতে জ্ঞানদাকে উদ্ধার করিয়াছে, রূপার গোট বাঁধা দিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং চোখের জল ফেলিয়া তাহাকে ও তাহার মাকে বিদায় দিয়াছে। যে পোড়াকাঠরূপে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম আসিয়াছিল, সুরভিত চন্দনবৃক্ষ হইয়াই সে তাহার হৃদয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের দোষ ও দুর্বলতা লইয়া শরৎচন্দ্র অনেক হাস্যপরিহাস করিয়াছেন। ইহারা ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর, অপরের অহিত ও অপকার করিবার জন্য ইহারা সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু ইহারা বড় গরীব ও হীন অবস্থাপন্ন। সেজন্য ইহাদের নীচতা ও অন্যায় কাজ দেখিয়া আমরা ইহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞাই প্রকাশ করি। ইহাদের দুইটি সার্থক দৃষ্টান্ত হইল পল্লীসমাজের ধর্মদাস ও দীনু ভটচাজ। ধর্মদাস শুধুমাত্র ধর্মেরই দাস বটে, সেজন্য ছোটলোকদের প্রতি তাহার নিদারুণ ঘৃণা এবং রমেশের হিতৈষী হইয়া অপর সকলের নিন্দায় তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। তাহার নিরবচ্ছিন্ন কাসির মধ্য দিয়া সে সত্য ও হিতকথা বলিবার জন্যই আকুলি বিকুলি করিয়াছে। দীনু ও তাহার উলঙ্গ অভুক্ত ছেলেমেয়েদের বর্ণনা দিতে যাইয়া লেখক আমাদের হাসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দারিদ্র্যপীড়িত পল্লীবাসীদের একটি অতিবাস্তব ও করুণ চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই রকম আর একটি চরিত্র হইল এই উপন্যাসের বাঁড়ুয্যে মশাই। বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মুখে কলিকাতার নিন্দা, বিনা পয়সায় কথায়

ভুলাইয়া জিনিস আত্মসাৎ করিবার সুচতুর দক্ষতা প্রভৃতি দেখাইয়া শরৎচন্দ্র যথেষ্ট হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন, খাপছাড়া ও অন্যমনস্ক। প্রত্যেক সামাজিক মানুষ যখন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চরিত্র সম্বন্ধেও সচেতন, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ও ক্রিয়াকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত তখনই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে একা, বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ও অন্যমনস্ক তখনই সে হাস্য উদ্রেক করে। এই সম্বন্ধে বার্গসোঁ খুব ভালো আলোচনা করিয়াছেন। বার্গসোঁ বলিয়াছেন, যখন আমরা আমাদের প্রতিবেশী ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে, উদাসীন হই, তখনই কমেডির জগৎ আরম্ভ হয়।[১] শরৎচন্দ্রের অনেক নায়ক এরূপ উদাসীন ও অন্যমনস্কপ্রকৃতির। অবশ্য এই উদাসীনতা ও অন্যমনস্কতার জন্যই তাহারা নায়িকাদের যত্ন ও ভালোবাসা সহজে ও অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু তাহাদের শিশুসুলভ সংসার-অনভিজ্ঞতা, কথায় ও কাজে এক অবোধ সরলতা এবং সুখ ও স্বার্থ সম্বন্ধে আত্যন্তিক অবহেলা তাহাদের চরিত্রকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কথায় ও আচরণে আমরা মজা বোধ করি, কিন্তু তাহাদের প্রতি এক স্নেহশীল সহানুভূতিতেও আমাদের অন্তর পূর্ণ হইয়া থাকে। 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। সুরেন্দ্রনাথ শিশুর মত অসহায় এবং সাংসারিক সকল ব্যাপারেই অপটু। তাহার এই অসহায়, অপটু ভাব অনেক সময়েই কৌতুক উৎপাদন করিয়াছে। 'দত্তা'র নরেনও এইরকম একটি খেয়ালী আত্মভোলা ও অবোধ চরিত্র। তাহার খাওয়াপরার দিকে লক্ষ্য নাই, চলাফেরা সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই, কোন জিনিসকে গোপন করিবার জন্য তাহার কোন যত্নও নাই। বিজয়ার মনের গোপনতম রহস্য না জানিয়া এই আনাড়ী বৈজ্ঞানিকটি এক এক সময় এমন এক একটি কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে যাহা অপরের কাছে বিশেষ কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্যমনস্কতা ও

১। **Comedy can only begin at the point when our neighbour's personality ceases to affect us. It begins, in fact, with what might be called a growing callousness to social life.' Any individual is comic who automatically goes his own way without troubling himself about getting into touch with the rest of his fellow beings. It is the part of laughter to reprove his absent mindedness and wake him out of his dream.**

Laughter Burgson : P. 134

আত্মবিস্মৃতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা পাইলাম 'নিষ্কৃতি'র বড় ভাই গিরিশের চরিত্রে। এই স্নেহশীল, মহাপ্রাণ আত্মবিস্মৃত লোকটি সংসারের সকল কলহ বিবাদ, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে নিজের এক স্বতন্ত্রলোকে যেন অবস্থান করিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাকে পঙ্কিল সংসার-আবর্তের মধ্যে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু তাহার নিস্পৃহ উদাসীনতার বর্ম ভেদ করা সম্ভব হয় নাই। সে এমন কথা বলিয়াছে, এমন আচরণ করিয়াছে যে ঈর্ষা ও স্বার্থের সব ষড়যন্ত্র একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার অসচরাচর-দৃষ্ট সংসার-অনভিজ্ঞতা, আপন স্বার্থের প্রতি একান্ত ঔদাসীন্য প্রভৃতি হাস্যজনক হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বজনীন প্রীতি ও সহানুভূতির আসনেও তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সর্বশেষে এই অদ্ভুত লোকটি যে অপ্রত্যাশিত কাজটি করিয়া বসিল তাহাতে এক আকস্মিক বিস্ময়জনিত কৌতুকবোধের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রসন্ন স্বস্তির তৃপ্তিকর স্পর্শে আমাদের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে।

শরৎচন্দ্রের এমন কয়েকটি চরিত্র আছে যাহাদের চরিত্র হইতে হাস্যরস উৎসারিত হয় নাই, যাহারা নিজেরাই সচেতনভাবে শাণিত ও চমৎকারী বাক্যের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছাপাইয়া অনেক সময় তাহাদের স্নিগ্ধ পরিহাস, চটুল রসিকতা কিংবা ধারাল বিদ্রূপ তৈলাধার প্রদীপের উপরিস্থ উজ্জ্বল শিখার ন্যায় শোভা পাইয়াছে। 'গৃহদাহে'র উপভোগ্য চরিত্র মৃণালের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৃণাল সেকেলে পল্লীসমাজভুক্ত রঙ্গরসিকা রমণী। অন্যের স্ত্রীকে সতীন বলিয়া সম্বোধন করা, নিজের স্বামীকে অপরের সহিত ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করা —এ সব রসিকতা অচলার মত আধুনিকী নারীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু একথা সত্য যে, গৃহদাহের গভীর সমস্যাজটিল বিষাদক্লিষ্ট কাহিনীর মধ্যে যখনই মৃণাল আসিয়াছে তখন সূর্যালোকে দূরীভূত কুয়াশাজালের ন্যায় সব বিষাদ ও ম্লানিমা যেন বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মী ও কমললতা এই দুইটি চরিত্রই পরিহাসপ্রিয় রমণীর আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত। রাজলক্ষ্মীর আসল সত্তাটি হইল অন্তর্দ্বন্দ্বপীড়িত অশ্রুসর্বস্ব একটি বিধবা রমণী, কিন্তু কালো জলের উপরিস্থ শাদা ফেনার ন্যায় তাহার নিবিড় বেদনাঘন আসল সত্তাটির উপরে একটি রঙ্গরসচঞ্চল ছদ্ম বাইজীসত্তা আছে। তাহার বিলোল কটাক্ষ এবং নূপুরশিঞ্জিত চঞ্চল চরণের ন্যায় কৌতুকবিলসিত বাক্যগুলি উষ্ণ মদিরার উড্ডীন বাষ্পের মতই চতুর্দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার স্বভাবপ্রসন্ন মূর্তিটি আমাদের পরিতৃপ্ত

অন্তরকে ভরিয়া রাখে। মাঝে মাঝে সে তাহার অন্তরবেদনা গোপন করিয়া 'শ্রীকান্তে'র সহিত তরল রসিকতায় নিজেকে খুব সহজ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু বর্ষাকালে প্রসন্ন সূর্যালোক যেমন নিমেষের মধ্যেই কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তেমনি মুহূর্তকালের মধ্যেই তাহার কৌতুকপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল অন্তরবেদনাও ম্লান হইয়া পড়ে। রাজলক্ষ্মীর ন্যায় কমললতা ও হাস্যপরিহাসের রঙের প্রলেপ দিয়া তাহার দুঃখময় জীবনের কালো রূপ লুক্কায়িত রাখিতে চাহিয়াছে। এই আনন্দময়ী কীর্তনরসে মাতোয়ারা বৈষ্ণবীটি শুধু কেবল শ্রীকান্তের মন নহে সমগ্র উপন্যাসের পরিবেশটিও মধুর আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অসামান্য সৃষ্টি কিরণময়ীর ক্ষুরধার রসিকতার একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। কিরণময়ী হৃদয়বতী সহনশীলা নারী নহে, সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মননশীলা নারী। জীবনের দুর্ভোগ ও বঞ্চনা তাহার বুভুক্ষু মনকে বাঁকাইয়া একটি ধনুকে পরিণত করিয়াছে। সেই ধনুক হইতে যে-সব তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সেগুলি প্রতিরোধ করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। দংশনোদ্যত সর্পের ন্যায় তাহার বাঁকা ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া নির্গত বাক্যগুলি তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় অপরের মর্মে যাইয়া বিদ্ধ হয়। কিন্তু কিরণময়ীর ব্যঙ্গবিদ্রূপগুলি শুধু কেবল অপরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় না, সেগুলি তাহার নিজের প্রতিও উদ্দিষ্ট হয়। তাহার হীন অবস্থা ও দুর্বল হৃদয়বৃত্তিকে কঠোর বিদ্রূপ দ্বারা বিদ্ধ করিতেও তাহার বাধে না। কিরণময়ীর বাক্যগুলি তাহার রূপের ন্যায়—অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করে, আবার অনির্বাণ আগুনে দগ্ধ করে।

যে-সব চরিত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি লইয়াই এখন আমরা আলোচনা করিব। 'শ্রীকান্তে'র নতুনদাচরিত্রটিই প্রথম উল্লেখ করা যাক। তাহার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি।' তাহার উৎকট স্বার্থপরতার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র তাহার প্রতি কঠোর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বোধ হয় এই একটি মাত্র চরিত্রকে শাস্তি না দিয়া পারেন নাই। দর্জিপাড়ার ঠুন ঠুন পেয়ালাসাধক এই অসাধারণ বাবুটি অবশেষে যে বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন তাহা বোধ হয় তাঁহার নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার প্রাপ্য শাস্তিরূপেই লেখকের দ্বারা বিহিত হইল। 'চরিত্রহীনে' সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী শশাঙ্কমোহনের চরিত্রের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র অন্যান্য বহু ব্যঙ্গলেখকদের মত অত্যুগ্র সাহেবিয়ানার প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ নিক্ষেপ

করিয়াছেন। শশাঙ্কমোহন সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'শশাঙ্ক-মোহনের রংটা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ, তিনি বাঙলা বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজী বলিতেন ভুল।' 'শেষপ্রশ্নে' নীতিবাগীশ, প্রচলিত সমাজবিধির গোঁড়া সমর্থক অক্ষয়চরিত্রটিও শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গরসের একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত। এই সব চরিত্র যে কত অসার ও কৃত্রিম তাহা তিনি অব্যর্থ বিদ্রূপের আঘাতের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। কমলের নীতিদ্রোহিতার ঘোর নিন্দা করিয়া অবশেষে তিনিই সেই কমলের একখানি চিঠি পাইবার জন্য কি ব্যগ্র লোলুপতাই না দেখাইলেন! অন্ধ অতিশায়িত প্রভুভক্তি ও নীচ স্বার্থসিদ্ধির ব্যঙ্গাত্মক রূপ ফুটিয়াছে 'দেনা পাওনা'র গোমস্তা এককড়ি নন্দীর চরিত্রে। ছিদ্রসন্ধানী, নিন্দানিপুণা ও কলহপরায়ণা অনেকগুলি স্ত্রীচরিত্রই ব্যঙ্গের স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে দেখা গিয়াছে। 'অরক্ষণীয়া'র স্বর্ণমঞ্জরী, 'চন্দ্রনাথে'র হরিবালা, 'বিন্দুর ছেলে'র এলোকেশী, 'পল্লীসমাজে'র মাসী প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথা মনে আসিবে। কিন্তু এই ধরণের চরিত্রগুলির মধ্যে সেরা বোধ হয় 'বামুনের মেয়ে'র রাসমণি। ছোট জাতের প্রতি তাঁহার ঘৃণা, মিথ্যা রচনায় তাঁহার অসাধারণ পটুতা, অপরের জাত ও কুলরক্ষায় তাঁহার গভীর আগ্রহ এবং ঘটকালীতে তাঁহার অসামান্য নিপুণতা। গোলোক চাটুয্যের যোগ্য সহকারিণী রূপে রাসমণিকে খাড়া করিয়া শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের একজোড়া জঘন্যতম পুরুষ ও নারী চরিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রগুলির মধ্যে তিনটির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। ঐ তিনটি চরিত্র হইল গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোলক চাটুয্যে ও রাসবিহারী। মানুষের দুর্বলতম হৃদয়বৃত্তি এবং গভীরতম অপরাধ শরৎচন্দ্র ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তিনি দেখিয়াছেন ধর্মের নামে মানুষ ঘৃণ্যতম অধর্ম আচরণ করিতেছে, নীতির নাম করিয়া অতি কুৎসিত দুর্নীতির মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, উদার ও উপকারী সাজিয়া নিজের বিকৃত স্বার্থ সিদ্ধ করিতেছে সেখানে শরৎচন্দ্রের মমতাকরুণ দৃষ্টিতে অভিশাপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি কখনও সংযম হারান নাই। সেজন্য এই চরিত্রগুলি অঙ্কনে তিনি কখনও নিজের উষ্মা কি অসহিষ্ণু মন্তব্য জোর করিয়া চাপান নাই কিংবা তাহাদের কোন উৎকট নৈতিক শাস্তিবিধানও করেন নাই। যেখানে লেখক যত নীরব সেখানেই তাঁহার ব্যঙ্গ তত মর্মভেদী।

কাপট্য, ভণ্ডামি ও অসাধুতার একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত হইল 'পল্লী-সমাজে'র

গোবিন্দ গাঙ্গুলী চরিত্র। গোবিন্দ গাঙ্গুলী অদ্বিতীয় অভিনেতা, নিজের আসল নীচ উদ্দেশ্য গোপন করিয়া অতি সরস ও আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা অপরের মনোরঞ্জন করিতে তাহার জুড়ি নাই। একবার রমেশ ও আর একবার বেণী ঘোষালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোপনে দুইজনের বিরুদ্ধে দুইজনকে লাগাইয়া সে শুধু কেবল নিজের হীন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় তাহার মত সদালাপী, পরোপকারী আত্মীয় আর নাই, আসলে তাহার মত হীন, ক্রুর ও কুটিল লোকও আর চোখে পড়ে না।

তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী যত নীচ ও স্বার্থপর লোকই হউক না কেন 'বামুনের মেয়ে'র গোলোক চাটুয্যের অপরিমেয় নীচাশয়তা ও নৃশংসতার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যেও এরূপ একটি অবিমিশ্র শয়তানচরিত্র বোধ হয় আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। প্রতি নিশ্বাসে যে মধুসূদনের নাম করিতেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সে মধুসূদনের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজই করিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূর্তিমান অবতার যে, সেই আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধের মরশুমে ছাগল-ভেড়া চালান দিবার ব্যবসায়ে লিপ্ত। এমন কি গোরু চালান দিবার জন্য মুসলমান ব্যবসায়ীকে চড়া সুদে টাকা ধার দিতেও তাহার আপত্তি নাই! অপরের কুল ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যাহার দুশ্চিন্তার অবধি নাই, সেই আবার একটির পর একটি করিয়া অসহায় নারীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত। তাহার কৃত্রিম বহিঃসত্তার ছদ্মাবরণের সহিত আসল সত্তাটির এত গুরুতর বৈষম্য যে, এই বৈষম্যেই আমাদের হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু এই হাস্য প্রসন্ন ও নির্মম নহে, তাহা ক্ষোভে মলিন ও অসন্তোষে তিক্ত। গোলোক চাটুয্যে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি উদ্ধৃত হইল—

১। সেই হিন্দুচূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি এইমাত্র তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন।

২। ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী চাটুজ্যেমহাশয় দগ্ধ হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম বোধ করি বা বিষের মতই বোধ হইতে লাগিল······।

৩। স্নান, পূজাহ্নিক এবং যথাবিহিত সাত্ত্বিক জলযোগাদি সমাপনান্তর মূর্তিমান ব্রাহ্মণ্যের ন্যায় গোলোকে চাটুয্যে মহাশয় ধীরে নীচে অবতরণ করিলেন···।

যে লোকটি জঘন্যতম অন্যায় ও অপরাধ করিয়াছে, সেই সমাজের উচ্চতম শীর্ষে অবস্থিত হইয়া উহাকে পরিচালনা করিতেছে। ইহাই দেখাইয়া শরৎচন্দ্র গোলোকের মারফত আমাদের সমাজ ও সমাজপতির বিরুদ্ধে কঠোরতম বিদ্রূপের আঘাত হানিয়াছেন।

ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুঅঙ্কিত হইল রাসবিহারীর চরিত্র। এরূপ একটি মার্জিত, পরিপাটি ও অভিনয়কলানিপুণ ভণ্ড ও অসাধু চরিত্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। তাঁহার সংযম এত অটল, কথাবার্তা এত স্নিগ্ধ ও কোমল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও পরমপিতার প্রতি নিষ্ঠা এত প্রবল যে, সাধারণ লোকের সাধ্যই নাই তাঁহার কথা ও আচরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইবে। কেবলমাত্র শেষের দিকে দুইবার বিজয়ার কাছে তাঁহার বহু শিক্ষা ও সাধনালব্ধ মুখোসটি অনাবৃত হইয়া গিয়াছে, এবং ঐ দুই স্থানেই চরিত্রটি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। বিজয়ার সম্পত্তি দখল করিবার জন্য বিলাসবিহারীর সহিত তাহার বিবাহের সুকৌশলী উদ্‌যোগ ও আয়োজন, বিলাসের উদ্ধত চরিত্র সংযত রাখিবার এবং বিজয়ার কাছে অতি সুচতুর উপায়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, নিমন্ত্রিত লোকেদের সম্মুখে বিজয়াকে প্রতিবাদ করিবার সুযোগ না দিয়া বিজয়া ও বিলাসের আসন্ন বিবাহের কথা ঘোষণা করিয়া উহাকে একটি অনিবার্য ব্যাপাররূপে সকলের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, পরমকারুণিক জগদীশ্বরের ধ্যানে তদ্গত ও অশ্রুবিহ্বল হইয়া নিজের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা এ-সমস্ত কাজগুলি তিনি এত সুচারু ও সুদক্ষভাবে করিয়াছেন যে, তিনি সব অবস্থা নিজের অনুকূলেই আনিয়া ফেলিয়াছেন। তবে শেষ রক্ষা আর হইল না। পাঠক রাসবিহারীর প্রকৃত মনোভাব ও উদ্দেশ্য জানে বলিয়াই তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজ তাহার মনের মধ্যে ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্য উদ্রেক করে, কিন্তু তাঁহার নিখুঁত অভিনয় এবং সুমার্জিত অন্যায় আচরণ দেখিয়া তাঁহার তারিফ না করিয়াও পারে না। সেজন্য লোকটি বার বার জয় লাভ করিয়া সর্বাশেষে যখন পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল তখন পরিতৃপ্তির সহিত একটু সহানুভূতির ভাবও যেন মিশিয়া থাকে। রাসবিহারীর প্রতি কথায় ও ব্যবহারে শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই বাণ সূক্ষ্ম হইলেও অসহ্য জ্বালাময় নহে এবং তাহাতে রঙ্গের খাদও কিছু মিশিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের আলো ও আঁধারের রহস্য-মিতালীর মধ্যে যেন একটি বাঁকা বিদ্যুৎ ঝলকের মতই প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব। আমাদের জলভারানত নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সাহিত্য-জীবনের মধ্যে এই বিদ্যুৎঝলক এক তীব্র জ্বালাময় জ্যোতির পরশ আনিয়া দিল। তাহাতে আমাদের জীবনের যত পুঞ্জিত বেদনা ও মদির-বিহ্বল স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যেই যেন স্বচ্ছ, লঘু ও তরল হইয়া গেল। প্রবহমান জলধারা যেমন সূর্যের আলোকে বাষ্প হইয়া ঊর্ধ্ব শূন্যে বাহিত হয়, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যেও তেমনি আমাদের করুণ জীবনরসধারাকে রঙীন বাষ্পের আকারে ঊর্ধ্বে উড়িতে দেখিলাম। এতদিন জলকেই সত্য ভাবিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হইয়াছি, এখন বাষ্পকেও সত্য দেখিয়া হাসিয়া খেলিয়া তাজা হইয়া উঠিলাম!

প্রমথ চৌধুরীর রসদৃষ্টি আলোচনা করিতে গেলে সমসাময়িক যুগপ্রবণতার কথা উল্লেখ করিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে একটি নূতন জীবন জিজ্ঞাসা, সমাজসচেতনতা, প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করে সবুজপত্রের মধ্যে। প্রমথ চৌধুরী যৌবনে দাও রাজ টীকা নামক প্রবন্ধটির মধ্যে বলিয়াছেন, 'সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্তব্য, ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনি আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।' এই যৌবনআবেগে উদ্দীপিত হইয়াই সবুজপত্র সেদিন প্রচলিত নীতি, সংস্কার ও জীবনবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইলেন। পরবর্তী কল্লোল-যুগে সমাজবিপ্লব যে বহ্ন্যুৎসবের আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার সূচনা হইয়াছিল এই সবুজপত্র হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নিশলাকা হইতেই। এই বিপ্লবাত্মক আদর্শের রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছিল প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ভাষা, ভঙ্গি ও রসবোধের ক্ষেত্রে। তাহারই ফলে

সাধুভাষার গম্ভীর প্রবাহের স্থলে আসিল চলিত ভাষার লঘু ও চটুল ধারা, হৃদয়ের সরসতার পরিবর্তে আমরা পাইলাম বুদ্ধির ঋজু তীক্ষ্ণতা, এবং চরিত্র ও ঘটনা ছাড়িয়া হাসির হীরকদ্যুতি ঝলসিয়া উঠিল এনগ্রেভকরা বাক্যের সূক্ষ্ম মার্জিত মুখে।

প্রমথ চৌধুরীর রসপ্রতিভার বিকাশে তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও কম নহে। ধনী ও অভিজাত পরিবারে তাঁহার জন্ম। সেজন্য তিনি জীবনে পাইয়াছিলেন নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান অনুশীলনের সুপ্রচুর অবকাশ। বৃহৎ বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবিরাম অধ্যয়নের ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বক্র, সংশয়ী ও অবিশ্বাসীভাব আসে তাহা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যেও দেখা গিয়াছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে না মিশিলে, মানুষকে না ভালবাসিলে মাটির পরশ না পাইলে জীবনের মধ্যে স্নিগ্ধ, কোমল সমবেদনা জাগ্রত হয় না, তাহা ইস্পাতের মত কঠিন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণ মাটির মানুষের সহিত যোগ না থাকিলেও তিনি একক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও নিজের জীবনকে অবরুদ্ধ রাখেন নাই। তিনিও গোষ্ঠীভুক্ত, আড্ডাধারী লোক ছিলেন। তাঁহার 'চার ইয়ারী কথা' 'নীল লোহিত,' 'ঘোষালের ত্রিকথা' ইত্যাদি গল্পগুলি এক সরস আড্ডার পরিবেশেই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বজন-পরিমণ্ডলের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ-অধিকার নাই। সেখানে শেরি-শ্যাম্পেনের পাত্র কানায় কানায় উচ্ছল, ইংরেজী বকুনি ও ফরাসী কেতার ছড়াছড়ি, সূক্ষ্ম বিতর্ক ও বিচারের ঝলকিত ঘাতপ্রতিঘাত। প্রমথ চৌধুরী বীরবলের রসিকতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র।' কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বীরবলও বিদূষক বটে, কিন্তু তিনি বাদশাহের বিদূষক। তাঁহার শিষ্য প্রমথ চৌধুরীও প্রকৃত রাজা-বাদশাহের বিদূষক না হইলেও রাজা-বাদশাহের মত মার্জিতরুচি, সংস্কৃতিমান, সীমাবদ্ধ, অভিজাত সম্প্রদায়েরই বিদূষক।[১] সেজন্য তাঁহার হাস্য-পরিহাস দ্রুতচালিত শাণিত তরবারির মত নিমেষে চোখ

১। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'তাঁর প্রকৃতির মধ্যে মধ্যযুগের সভাসদসুলভ বৈশিষ্ট্য ছিল। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, মজলিশী মন, অভিজাত মানসিকতা—সব কিছু মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্যের রেশটুকু যেন তাঁর মনের গড়নে ও বলার ঢংয়ে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

॥ বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী। পৃঃ ১৩—১৪ ॥

ঝলসিয়া দেয় এবং দেখিতে দেখিতে মর্ম ভেদ করিয়া যায়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী শুধুমাত্র বিদূষক নহেন, তিনি সাহিত্যিক-বিদূষক।) রাজসভার বিদূষকের মত রাজসভার সাহিত্যিকও তাঁহার সগোত্র। জয়দেব ও ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বহু লেখার মধ্যেই এই সগোত্র-সম্পর্ক প্রমাণিত হইয়াছে। ভাষা ও রসিকতার দিক দিয়া ভারতচন্দ্রকে তিনি নিজের গুরুর আসনেই অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজসভার কবিদের মনোরঞ্জন করিতে হয় আমোদপ্রিয় রসবিলাসী রাজা ও সভাসদ্‌বর্গের। সেজন্য তাঁহাদের কবিতায় প্রচ্ছন্ন ভাব যাহাই হউক না কেন তাহাতে ভাষা ও শিল্পের জৌলুস ও সুমিত অলঙ্কার পারিপাট্য থাকা দরকার। (প্রমথ চৌধুরীও তাঁহার পূর্বসূরী রাজসভার কবিদের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সাহিত্যে ভাব অপেক্ষা ভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, হৃদয়সংস্পর্শী হিউমার অপেক্ষা বাক্যচ্ছুরিত উইটই তাঁহার সাহিত্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে।)

(প্রমথ চৌধুরীর মানসগঠন ও রসবোধের উপর ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সর্বজনবিদিত। স্বচ্ছ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, তীক্ষ্ণ ও মার্জিত বাগ্‌নৈপুণ্য, হাস্যপরিহাস পটুতা এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফরাসী সাহিত্যকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ফরাসীজাতির হাস্যকৌতুকপ্রবণতার কথা আলোচনা করিতে যাইয়া চৌধুরী মহাশয় ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'ফরাসী জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। যার হাতে তরবারি আছে, সে লগুড় ব্যবহার করে না। ভল্টেয়ারের হাসির যে বিশ্বজয়ী শক্তি ছিল, তার তুলনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল জেরেমিয়ার উচ্চবাচ্য যে ব্যর্থ এ সত্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।' ফরাসীজাতি হাস্যপরিহাসপ্রিয় হইলেও তাহাদের হাস্যপরিহাসে হিউমারের স্নিগ্ধ গভীরতা নাই, তাহাতে উইট-এর প্রখর উজ্জ্বলতাই বিদ্যমান।[১] ইংরেজজাতি ভাবগভীর, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, সেজন্য তাঁহাদের হাস্যরস প্রচ্ছন্ন, বিষাদমধুর ও হৃদয়স্পর্শযুক্ত, কিন্তু ফরাসীরা প্রকাশ্য আমোদপ্রিয় তরলচিত্ত, বাক্‌নিপুণ জাতি। ইংরেজের হাস্যরস ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য হইতে

১। প্রিস্টলী বলিয়াছেন, **Life in France is leavened by wit, and life in England is leavened by humour.'**

"English Humour by J. B. Priestly, P. 5

উৎসারিত অন্তঃশীল সলিলপ্রবাহ, কিন্তু ফরাসীর হাস্যরস বাক্যসংঘাত জনিত ভাসমান ফেনধারা—উজ্জ্বল কিন্তু অগভীর।[1] ফরাসী সাহিত্যের এই বিশেষ জীবনদৃষ্টি ও বুদ্ধিধর্মী বাগ্‌বিলাসী হাস্যরসই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের তিনজন সাহিত্যনেতা তিনরকম রস সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর কারবার বুদ্ধি লইয়া, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্র হৃদয় এবং রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিপূর্ণ মিলনে। প্রমথ চৌধুরীতে উইট, শরৎচন্দ্রে হিউমার এবং রবীন্দ্রনাথে উইট ও হিউমারের অপূর্ব আত্মীয়তা। শরৎচন্দ্র কান্নায় বিগলিত, রবীন্দ্রনাথ হাসি ও কান্নায় দোলায়িত কিন্তু প্রমথ চৌধুরী শুধুমাত্র হাসিতে মুখরিত। হাসি ও কান্না নামক সনেটে চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন—

> তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
> সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
> হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
> মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ॥

আমাদের দেশের সাধারণ ধারণা এই যে, গাম্ভীর্যই হইতেছে মানুষের ভূষণ এবং হাসি এক নিম্নস্তরের ইতরামি ছাড়া আর কিছুই নহে। সেই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি লিখিলেন, 'আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অদ্ভুত ধারণা এদেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।' (ভারতচন্দ্র)

প্রমথ চৌধুরীর হাসিতে কোন স্থায়ী প্রভাব ও গভীর উদ্দেশ্য পরিস্ফুট নহে। কিন্তু সেই হাসি একেবারে নির্মল ও নিষ্কণ্টকও নহে। তাঁহার হাসি আমীলিত

---

1. The huge volume of laughter provoking words, shapes, gestures, in medieval French life, art and letters, is generally speaking, too explicit to deserve the name of humour. It expresses the lighter hearted, merrier temper of the French, their greater susceptibility to the joy of living—that national addiction to gaiety which remained, as far as the eighteenth century. their main feature in the opinion of the outside world, and formed a sharp contrast with the English who, as Froissort perhaps said, and the Duc de Sully may have remarked, took their pleasure sadly.

The Development of English Humour by L. Cazamian, P. 37.

নয়নের কুটিল ভঙ্গিতে, ভ্রূভঙ্গের কুঞ্চিত রেখায় ও বক্র ওষ্ঠাধরের বঙ্কিম ইঙ্গিতে প্রকাশিত। তাহাতে মাঝে মাঝে বিরক্ত তর্জনী সমাজের ভ্রান্তি ও দুর্বলতার দিকে স্থিরনিবদ্ধ হইয়া থাকে এবং শাসনের কশা ঝিলিক মারিয়া উঠে। Bernard Shaw নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক

এ চাবুক যে তিনি একেবারে পান নাই ও ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে। ভারতচন্দ্র নামক প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন, 'সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।' প্রমথ চৌধুরীর বক্রদৃষ্টি আমাদের জীবনের মূঢ়তা ও জড়তার প্রতি; আমাদের অতীতবিলাসী, প্রগতিবিরোধী জীর্ণ ও প্রবীণ মনোভাবের প্রতি। তিনি একটি উন্নাসিক বুদ্ধিসর্বস্ব দৃষ্টি লইয়া জীবনের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার শ্লেষের আঘাতে হৃদয়ের ভিত্তি টলিয়া গিয়াছে এবং ব্যঙ্গের ফুৎকারে আসক্তির স্নেহার্দ্র প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। উইট অথবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য লইয়া যাঁহাদের কারবার তাঁহারা জীবনের গুরু ও গভীর বিষয়কে এইভাবে লঘু ও তরল করিয়া দেখেন। যাহা সাধারণত প্রশংসা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করে তাহাই তাঁহাদের মনে এক লঘু, পরিহাসোচ্ছল ভাব জাগ্রত করে।[১]

বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের রস ফুটিয়া উঠে তুলনা ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া। সেজন্য ইহাতে সাধারণত দুইটি বস্তুর অবতারণা করা হয়।[২] এই দুইটি বস্তুর আপাত-

১। হ্যাজলিট এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

Wit, as distinguished from poetry, is the imagination or fancy inverted, and so applied to given objects, as to make the little look less, the mean more light and worthless; or to divert our admiration or wean our affections from that whice is lofty and impressive, instead of producing a more intense admiration and exalted passion, as poetry does.

Wit & Humour (Lectures on the Comic Writers)—P. 15

2. Wit may be defined to be the Arbitrary Juxtaposition of Dissimilar Ideas, for some lively purpose, of Assimilation or Contrast generally of both.'

Wit and Humour by Leigh Hunt, P.8

সাদৃশ্যের মধ্য দিয়া বৈসাদৃশ্য অথবা আপাত-বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়া সাদৃশ্য দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য। কোন সময়ে এই দুইটি বস্তু ব্যক্ত, আবার কখনও বা ইহাদের একটি ব্যক্ত ও অপরটি অব্যক্ত থাকে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে প্রধানত যে অলঙ্কারগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হইল শ্লেষ, বিরোধাভাস, বিরোধোক্তি, প্রতি-বিন্যাস বা বিরুদ্ধ বিন্যাস। শ্লেষের মধ্যে একটি কথার দুইটি অর্থ থাকে। বুদ্ধিমান পাঠক প্রচ্ছন্ন অর্থটি আবিষ্কার করিয়া কৌতুক বোধ করেন। বিরোধাভাসে (Epigram) আপাতবিরোধের মধ্যে গূঢ় সামঞ্জস্য এবং বিরোধোক্তির (Oxymoron) মধ্যে দুইটি উগ্র-বিরোধী শব্দকে পাশাপাশি রাখিয়া আপাত বিরোধের সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। প্রতি-বিন্যাস বা বিরুদ্ধ বিন্যাস অলঙ্কারে প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের একত্রিত বিন্যাসের মধ্য দিয়া বিরুদ্ধ ভাবের ব্যঞ্জনা করা হয়। এই অলঙ্কারগুলি প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু অনেক সময় লেখক যেন শব্দের মোহে পড়িয়া গিয়াছেন, সেজন্য ভাব ও বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শব্দের পর শব্দের মিলন ও সংঘাত ঘটাইয়া এক সুনিপুণ সাহিত্যিক ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। শব্দ ও বাক্যের নানারকম বিন্যাস ও সুচতুর প্রয়োগরীতির মধ্য দিয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা যায় বটে, কিন্তু যদি ঐসব শব্দ ও বাক্য ভাবব্যঞ্জনা ও বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটনে সাহায্য না করে তবে ঐ চমৎকারিত্ব স্থায়ী ও দীর্ঘ-উপভোগ্য হয় না।[১]

প্রমথ চৌধুরীর কবিত্বশক্তির নিদর্শন 'সনেট পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ' এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা গীতিকাব্য রচনার অনুকূল ছিল না, কারণ গীতিকাব্যের মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবানুভূতি স্বপ্ন ও সৌন্দর্যময়তা এবং আত্মগত আবেগোচ্ছ্বাস থাকে সেগুলি তাঁহার মনোরাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ, শিল্পসুঠাম রূপের মধ্যেই তাঁহার মার্জিত, কলানিপুণ প্রতিভা সাবলীল প্রকাশ লাভ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সনেট সংযত ও আঙ্গিকনিয়ন্ত্রিত হইলেও কবিতা তো বটে। অথচ প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌বিলাসী, ব্যঙ্গনিপুণ প্রতিভা কবিতার ভাব ও

১। হ্যাজলিটের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

After all, verbal and accidental strokes of wit, though the most surprising and laughable, are not the best and most lasting. That wit is the most refined and effectual, which is founded on the detection of unexpected likeness or distinction in things, rather than in words.

Wit & Humour—Hazlitt, P. 22

সৌন্দর্যের একান্তই বিরোধী ছিল, সেজন্য কবিতা লিখিলেও কবিতার জগৎকে তিনি যেন প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। কবিদের চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করিয়া তিনিও বহিঃপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাঁকা চোখে সৌন্দর্য ও ভাবাবেগ সব বিরূপ ও বিকৃত হইয়া দেখা দিয়াছে। সমালোচকদের প্রতি একটু শ্লেষ থাকিলেও নিজের সনেট সম্বন্ধে তাঁহাদের যে উক্তি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য—

আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ,
চরণের আভরণে নাহিক নিক্বণ,
বুকে নাই রাজযক্ষ্মা, উদরে উদরী।
শিখর দশনা তন্বী, শ্যামা ক্ষামোদরী,
মসীকৃষ্ণ স্থির তার নির্ভীক ঈক্ষণ।
মুগ্ধ নেত্রে মূঢ়ে শুধু করে নিরীক্ষণ,—
এ রূপ পশে না হৃদে নয়ন বিদরি।

॥ আমার সনেট। পদচারণ ॥

অনেক সময়েই কবি সনেটের শেষদিকে বিষয়-বহির্ভূত এমন একটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহা পাঠকের একটি বিশেষ রসমগ্ন অনুভূতিকে আকস্মিক আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। কাঁটালী চাঁপা কবিতাটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। চাঁপার পুষ্পসত্তা বর্ণনা করিতে করিতে কবি শেষে বলিলেন—

পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার,
সর্বধর্ম সমন্বয় লোভে হ'য়ে অন্ধ,
স্বধর্ম হারিয়ে হলে সর্বজাতি—বার।

অনেক কবিতায় তিনি প্রকৃতির বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রচলিত বর্ণনারীতি ও অলঙ্কার বর্জন করিয়া স্থূল বাস্তব ও সংস্কারবিরুদ্ধ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের চিরকালীন কাব্যসংস্কার ও সূক্ষ্ম কল্পনাচারিতা ইহাতে রূঢ় আঘাত পায় এবং তাহারই ফলে হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বর্ষা নামক কবিতার কিয়দংশ উল্লেখ করা যাক—

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,

পুটুঁলি পাকিয়ে গুলো
জুড়িয়ে আকাশ।
হাতীর মতন ধড়
নাহি তাহে নড় চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়
চারিদিক ছেয়ে।

প্রমথ চৌধুরী ভীরুতা ও জড়তা, অকালপক্কতা ও অতিবিজ্ঞতার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। সেজন্য তাঁহার কবিতায় ইহাদের প্রতি অনেক স্থলেই শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। জয়দেবের প্রভাবে বাঙালীজাতির ইন্দ্রিয়বিলাস ও পৌরুষহীনতার প্রতি শ্লেষাত্মক বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিনি লিখিলেন—

উন্মাদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।
রণক্ষত চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে॥
পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন।
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥

॥ জয়দেব। সনেট পঞ্চাশৎ ॥

কবিতার জগতে যাঁহারা সুনীতি ও সুরুচি বজায় রাখিবার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপহাস করিয়া কবি বলিলেন—

সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ী
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।

॥ কবিতা লেখা। পদচারণ ॥

বন্ধুর প্রতি নামক কবিতাটিতে কবি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিতাটির মধ্যে তিনি যতপ্রকার আমি আর নীতি আছে সব কিছুর প্রতিই তাঁহার তীব্র অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে তাঁহার অসহিষ্ণু উষ্মার ফলে ব্যঙ্গের আর্টও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কবিতাটির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইল—

ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।
নীতি আর রাজনীতি আর ধর্মনীতি,
যত গরু গরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।
প্রিয় শিষ্য কারো নই তুমি আর আমি,
আমাদের রোগ খোঁজা গুরুবাক্যে মানে,
অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে মানে,
যা কিছু বোকামি নয় তাহাই ক্ষ্যাপামি।

॥ বন্ধুর প্রতি। পদচারণ ॥

যে ভাবানুভূতি ও প্রাণরসের অভাবে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা নিখুঁত শিল্পনিষ্ঠ হইয়াও আনন্দাবেগ সঞ্চার করিতে অক্ষম হইয়াছে তাহাদের অভাবে তাঁহার গল্পও জীবনের বিতর্কসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াও জীবনের রসসৃষ্টিতে সার্থক হইতে পারে নাই। কাহিনীর অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন গতি, হৃদয়বৃত্তির সুগভীর বিশ্লেষণ, জীবনের আনন্দবেদনামিশ্রিত রসঘন রূপ তাঁহার গল্পে আমরা পাই না। সেখানে বিতর্কিত কাহিনীর উপলব্যথিত গতি, আলোচনা-কণ্টকিত বৃত্তান্ত এবং শুষ্ক মননের শাণিত-কুটিল দৃষ্টিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১]

তাঁহার গল্পগুলি এরূপ খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন ও অপ্রাসঙ্গিক কথা-কণ্টকিত হইবার কারণ, গল্পগুলি একটি বৈঠকী পরিবেশে রচিত হইয়াছে। সেজন্য গল্পের বক্তা ও শ্রোতাকে বর্ণিত গল্পের মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে এবং তাহারই ফলে গল্পের অবিচ্ছিন্ন রসপ্রবাহ বার বার ব্যাহত

১। তাঁহার সমস্ত গল্পেরই তর্কমূলক বাগ্‌বিতণ্ডাজড়িত উৎপত্তিক্ষেত্র আছে এই ঊষর ক্ষেত্রেই তাহারা কণ্টককুসুমের ন্যায় ফুটিয়াছে। বিশেষত যে ভাবাবেশমূলক প্রতিবেশের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর গল্প-উপন্যাসের উদ্ভব, তাহাকে তিনি নানা অবান্তর আলোচনা, কূটতর্ক, অতর্কিত ও হাস্যকর পরিণতি এবং সর্বোপরি একটা শুষ্ক, ভাববিমুখ, ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাবের দ্বারা খণ্ডিত ও প্রতিহত করিয়া তাহার ভাবগত ঐক্যকে রেণুপরমাণুর আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন।—

॥ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৩:৪ ॥

হইয়াছে। অনেকগুলি গল্পে তিনি রোমান্সের রঙীন পরিবেশ রচনা করিয়াছেন কিন্তু রোমান্সের রস-আস্বাদন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, রোমান্সের রসে পাঠকের মনকে মগ্ন করিয়া হঠাৎ এক আকস্মিক বিদ্রূপের অট্টহাসিতে তিনি সব স্বপ্ন ও কল্পনার জাল ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ইহাতে যে শুধু রোমান্সের জগৎ বিপর্যস্ত হয় তাহা নহে, পাঠকের মনোজগৎও বড় বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।[১] গল্পগুলির মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণশ্লেষাত্মক মন্তব্য ও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গবিদগ্ধ উক্তিগুলি সূর্যকরোজ্জ্বল বর্শাফলকের মতই শোভা পাইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর এক অদ্বিতীয় মিথ্যাবাদী ও অসামান্য রসস্রষ্টা গল্পকথক হইল নীললোহিত। নীললোহিতের গল্পগুলির মধ্যে এক উদ্ভট কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায়। মত্ত দাঁতাল হাতীর কানে নিধুবাবুর টপ্পা গান গাহিয়া তাহাকে বশীভূত করা, সঘোটক দুইহাজার ফুট নীচে পড়িয়াও সম্পূর্ণ অক্ষত হইয়া থাকা, বার বার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়াও আশ্চর্যভাবে উদ্ধার হইয়া আসা, কাইজারের কাপ্তেন পদ প্রত্যাখ্যান করা, লোমহর্ষণ ডাকাতিতে জড়াইয়া পড়া —এসব মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত ঘটনার মধ্য দিয়া কৌতুকরস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলার মধ্যে সুরাট কংগ্রেসের বাস্তব পরিবেশে একটি রোমান্সরঙীন কাহিনীর অবতারণা করিয়া লেখক আমাদের মনকে দোলায়িত করিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান ও রোমান্সের বিচিত্র-মধুর জগৎ জুতানিক্ষেপের বৃত্তান্তে এক আকস্মিক অ্যান্টিক্লাইমেক্স-এর সশব্দ অট্টহাসিতে কৌতুক ফাটিয়া পড়িয়াছে। এই অট্টহাসিতে কংগ্রেসের দলাদলি ও রোমান্সের স্বপ্নমধুর অনুভূতি সব ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর আর এক সরস মিথ্যাবাদী গল্পকথক হইল ঘোষাল। তবে রায়মহাশয়ের বৈঠকখানায় সে যে গল্প বলিয়াছে তাহা সহজে জমিয়া উঠিতে পারে নাই। স্মৃতিরত্ন মহাশয়, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি সভ্যদের সংশয়, বিতর্ক, আলোচনা ও প্রতি-আলোচনায় ঘোষালের গল্প প্রতি পদে প্রতিহত হইয়াছে।

১। 'গল্পগুলির পটভূমিকাসৃষ্টিতে তিনি যেন আধুনিক জগৎ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছেন। অনেকগুলি গল্পে পুরানো পৃথিবীর স্বাদ পাওয়া যায়। গল্পগুলির মধ্যে একটি তীব্র ও বক্র সমালোচনাত্মক দৃষ্টি আছে, কিন্তু গল্পগুলি যেন পুরাণো দিনের মূল্যবান ফ্রেমে সযত্নে বাঁধানো। গল্পগুলি নৈমিত্তিকের নয়, অথবা আজকেরও নয়, ক্ষীণসুরভি রোমান্সও যে না আছে, এমন নয়। কিন্তু সে রোমান্সকে যেন আকস্মিকভাবে চরম আঘাত হানার জন্যেই আনা হয়েছে।

॥ বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী। রথীন্দ্রনাথ রায়। পৃঃ ৬২ ॥

কিন্তু ঘোষালের গল্প সম্বন্ধে যিনি যতই সন্দেহ প্রকাশ করুন না কেন, ফরমায়েস অনুযায়ী চট করিয়া গল্পের স্থান ও পাত্রপাত্রীর পরিচয় পরিবর্তন করিয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ঘোষালের। ফরমায়েসী গল্পের মধ্যে ঘোষাল গল্পের ঘটনাস্থান কখনও মন্দির আবার কখনও বা দালান করিয়া ফেলিতেছে, গল্পের নায়িকাকেও কখনও হিন্দুস্থানী, কখনও মুসলমানী, কখনও বাঙালী ব্রাহ্মণ কন্যা, কখনও কুমারী আবার কখনও বা সধবা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, ইহাতে অনবরত আমাদের মন একটির পর একটি ধাক্কা খাইয়া যেন কাহিল হইয়া পড়ে। ঘোষালের বর্ণনার মধ্যে নানা টীকা-টিপ্পনী ও পরিহাসকুটিল ভঙ্গি প্রভৃতি বিশেষ সরস হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে পূর্বরাগের কত না বর্ণনা আছে। কিন্তু ঘোষালের একটি বর্ণনা শুনুন—

'চার চক্ষুর মিলন হবা মাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল।'

ঘোষালের ত্রিকথার বীণাবাই গল্পটির রসের বাঁধুনি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সভ্যদের অপ্রাসঙ্গিক ও বাধাসৃষ্টিকারী বিতর্ক ও আলোচনা গল্পটির মধ্যে তেমন নাই। এখানে করুণরস অনেকটা অকৃত্রিম বলিয়া কৌতুকরস তেমন প্রাধান্য পায় নাই। কিন্তু তবুও লেখক চরম কারুণ্যের মধ্যেও কৌতুকের দুই একটি কণা না ছড়াইয়া পারেন নাই। মৃত্যুভয়ভীতা বীণা ঘোষালকে বলিতেছে, 'তুমি আমার পাণিগ্রহণ করে, I mean হাত ধ'রে আমাকে সুমুখের চৌকাঠটা পার ক'রে দেও।'

প্রমথ চৌধুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প হইল 'চার ইয়ারী কথা'। বইখানি প্রকৃত পক্ষে চারটি স্বতন্ত্র গল্পের সমষ্টি। গল্পের কথকদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়াই বিচ্ছিন্ন গল্পগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হইয়াছে। গল্পগুলির কথক চার ইয়ার লেখকেরই সগোত্র। তাহাদের চালচলন, মানসিক কৃষ্টি ও হৃদয়াবেগ বিদেশের মাটি হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছে। মানুষের

স্নেহ-ভালোবাসা, রোমান্সের ইন্দ্রধনুরঙীন জগৎ গল্পগুলির মধ্যে এক আকস্মিক আঘাতে নিতান্ত বিসদৃশ রূপ লইয়া যেন ধুলিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পই একটি প্রেমকাহিনী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রেমের রসাল ও রহস্যময় রূপের বিশদ বর্ণনা দ্বারা পাঠকের মনকে রসাপ্লুত করিবার পর হঠাৎ সেই মনকে রূঢ় আঘাতে বিপর্যস্ত করিয়া তিনি যেন বেশ মজা উপভোগ করিয়াছেন। সেনের প্রথম ও শেষ ভালবাসার বর্ণনার মধ্যে এক জ্যোৎস্না-লোকিত রজনীর মদবিহ্বল রোমান্স জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেন যখন তাঁহার জুলিয়েটকে অত্যাচারী নরপশুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বীরদর্পে অগ্রসর হইল তখনই সে বুঝিতে পারিল মেয়েটি পাগল। মেয়েটির অট্টহাসিতে তাহার রোমান্সের স্বপ্নলোক খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সীতেশের জীবনে যে একটি মেয়ে আসিয়াছিল সেই মোহিনী সুন্দরীর প্রকৃত পরিচয় আমরা জানিতে পারিলাম গল্পের শেষে তাহারই নিজের লেখার মধ্য দিয়া, 'পুরুষ মানুষের ভালবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক।' মন হরণ করিয়া অবশেষে ধন হরণ—স্ত্রী জাতির প্রতি একটু শ্লেষ যেন গল্পটির মধ্যে ফুটিয়াছে। সোমনাথের গল্পে সোমনাথ ও রিণীর সম্বন্ধটি আকর্ষণ বিকর্ষণের অবিরাম দ্বন্দ্বে কৌতূহলোদ্দীপক ও কৌতুকময় হইয়া উঠিয়ছে। দার্শনিক ও প্রণয়বিদ্বেষী সোমনাথ প্রেমে পড়িয়া অবশেষে কিভাবে প্রতারিত হইয়াছিল তাহারই শ্লেষাত্মক বর্ণনা রহিয়াছে গল্পটির মধ্যে। মাঝে মাঝে লেখক সোমনাথের মুখে বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে যে-সব টিপ্পনী দিয়াছেন সেগুলি খুবই সরস হইয়া উঠিয়াছে, যথা—'মনে হল, যেন ব্রহ্মদেশের কোন রাজঅন্তঃপুর থেকে একটি শ্বেত হস্তিনী তার স্বর্ণশৃঙ্খল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে।', 'সেই রক্তমাংসের মনুমেণ্টের সঙ্গে এই বলে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন,' 'সে ভদ্রলোকের মুখের রং এত লাল যে, দেখলে মনে হয়, কে যেন তার সদ্য ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে', 'এমন সময় এই বিলাতি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী আমাকে বললেন'—ইত্যাদি। শেষ গল্পটিতে প্রেমের উদ্ভটত্ব অত্যন্ত বেশি এবং সেজন্য প্রেমের প্রতি শ্লেষও এখানে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া টেলিফোনযোগে দশ বৎসর পূর্বে পরিচিত বিলাতের এক দাসীর মুখ দিয়া প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করা এবং ঘনীভূত বেদনারসে পাঠকের মনকে অভিভূত করিয়া অবশেষে পরলোক হইতে টেলিফোন করার সংবাদ দিয়া লেখক রোমান্সস্বপ্নপ্রিয় পাঠকের মনকে শ্লেষের খোঁচায় বিদ্ধ করিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার সার্থকতম রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে। বিচার, বিতর্ক, আলোচনা ও সমালোচনা প্রভৃতি ধর্ম যেমন তাঁহার কবিতা ও গল্পের রস ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তেমনি আবার তাঁহার প্রবন্ধগুলির গুণ বহু পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছে। সরস সৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা প্রখর বিচারশক্তিই তাঁহার মধ্যে বড় ছিল। সেজন্য তাঁহার আসল ক্ষেত্র ছিল গল্প ও কবিতা নহে, প্রবন্ধ ও সমালোচনা। তাঁহার প্রকৃতি-বিরূপ, সৌন্দর্যবিরোধী মনোভাবের পরিচয় প্রবন্ধগুলির মধ্যেও বিদ্যমান। কবিরা বর্ষা ও বসন্ত লইয়া কত না কাব্য রচনা করিয়াছেন। আর প্রমথ চৌধুরীর চোখে 'বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায়।' কবিকল্পিত বসন্তকেও তিনি এক বক্র বাস্তব দৃষ্টি লইয়া খোঁচা দিয়া যেন আনন্দ পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মলয়সমীরণ যদি সোজা পথে সিধে বয়, তা হলে বাঙ্গলাদেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধ'রেই নেওয়া যায়, যে, বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে পড়ে,—তা হলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে, কি লতায় ঝোলে, তা' আমাদের কারও জানা নেই।'

প্রমথ চৌধুরী সাময়িকপত্র-সম্পাদক ছিলেন। সেজন্য সাময়িক রাজনীতির আলোচনায় তিনি জড়িত না হইয়া পারেন নাই। দু' ইয়ারকি, দেশের কথা, তেল-নুন-লকড়ি প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। বীরবলের টিপ্পনীতে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে রাজনৈতিক সমস্যার উপর নানা টীকাটিপ্পনী করিয়াছেন। বইখানির ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, দেশে যখন লর্ড কার্জনের উপদ্রব হয়, তখন সে উপদ্রবে—যাঁদের চোখ ও মুখ 'একসঙ্গে ফোটে তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলুম একজন।' রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে যখন কোন লঘুবিষয়ের সহিত তুলনা করা হয় তখন তাহা কৌতুক উদ্রেক করে। কংগ্রেসের দুই বিবদমান দলকে তিনি যখন বৌ-মাষ্টারের দল ও বৌ মাষ্টারের ভাঙ্গাদল নামক দুই যাত্রাদলের সহিত তুলনা করিলেন তখন সেই রাজনৈতিক দলাদলির আলোচনাও সরস হইয়া উঠিল। গুলীখোরের আবেদনপত্রটি কমলাকান্তের দপ্তরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পত্রটি আদ্যন্ত মৃদু ব্যঙ্গের সুরে রচিত। নিষ্ক্রিয় অপদার্থ ও আত্মম্ভরি ভারতবাসীর প্রতি বিদ্রূপ ইহাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। গর্জন ও সরস্বতী

সংবাদের মধ্যেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ লুক্কায়িত রহিয়াছে। গর্জন কার্জনের অপভ্রংশ এবং সরস্বতী ভারতবাসীর প্রবুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। ভারতবর্ষের লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, আন্দোলন করে, সেজন্য তাহাদের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইংরেজ শাসক তাহার শাসনের দণ্ডকে গুরুমহাশয়ের বেত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর এই সরকারী জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ব্যক্ত হইয়াছে লেখাটির মধ্যে।

প্রমথ চৌধুরীর বাক্যাশ্রয়ী বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় এই প্রবন্ধগুলির মধ্যেই বেশি পাওয়া যায়। অনেক প্রবন্ধের বক্তব্য-অংশ ছাড়াইয়া বিদ্যুৎ-বিভাসিত বাক্‌চাতুর্য আমাদের দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া রাখে। এই বাক্‌চাতুর্যের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ও তোমরা নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধটির প্রত্যেক বাক্যেই Antithesis অথবা প্রতিবিন্যাস অলঙ্কারের দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে ছেকানুপ্রাসের ব্যবহার দ্বারা ধ্বনিসাম্যের মধ্য দিয়া অর্থবৈষম্য সৃষ্টি করিয়া চমৎকারিত্ব আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যথা—'তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বেরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।' যমক ও শ্লেষ অলঙ্কারের সুচতুর প্রয়োগে চৌধুরী মহাশয়ের লেখা অত্যন্ত সরস হইয়া উঠিয়াছে। যমকের একটি উদাহরণ—'বাঙালীর রচনা যে পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে সে পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না।' শ্লেষের উদাহরণ ভূরি ভূরি রহিয়াছে। একটি সভঙ্গ শ্লেষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—'যদি বর্ণনার গুণে কোন কবির হাতে বেল কুল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে তার বেলকুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' একই শব্দে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত করিয়া অনেক সময় লেখক বাক্যের মধ্যে সরসতা আনিয়াছেন, যথা—'প্রকৃতির বিকৃতি ঘটালো কিংবা আর প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম।' বিরোধাভাস ও বিরোধোক্তির প্রচুর নিদর্শনও বীরবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়। বিরোধাভাসের একটি দৃষ্টান্ত—'এক কথায় বলতে গেলে যে কোন ভাষারই হোক না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচতে হলে আগে মরা দরকার।' অনেক সময় লেখক একই বস্তুর বিভিন্ন দিক উল্লেখ করিয়া অর্থব্যঞ্জনার মধ্যে গুরুতর ব্যবধান সৃষ্টি দ্বারা রসিকতা করিয়াছেন, যথা—'কদলীবৃক্ষের অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস, সে কারণ আমরা যদি

বঙ্গসাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তা হলে বঙ্গ সরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলী ভক্ষণই লেখা আছে।’ বিশিষ্ট বাগ্‌ধারার মধ্যে শব্দের সামান্য পরিবর্তন দ্বারাও অনেকসময় গুরুতর অর্থবৈষম্য·ঘটানো হইয়াছে, যথা—‘কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো কথায় মন ভেজে।’

বাংলা কাব্যে হাস্যরসের ধারা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি বিচিত্র ধরণের কাব্যে মধুসূদনের পরে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বটে, তবে রঙ্গরহস্যপূর্ণ কবিতার প্রতিও তিনি একেবারে উপেক্ষা দেখান নাই। মধুসূদনের উদাত্ত ও গম্ভীর ভাবমগ্ন প্রতিভা যেমন প্রহসনের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছিল, হেমচন্দ্রের বিষাদময়, তত্ত্বপ্রিয় মানসধর্মও হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে এমনি এক অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। হেমচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনেও সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও মজলিসী লোক ছিলেন।[১] অনেক সময়েই তিনি বন্ধুবান্ধবের মনোরঞ্জনের জন্য অথবা তাহাদের ফরমায়েসে কৌতুককবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেজন্য কোন গভীর ও চিরন্তন জীবন প্রেরণা হইতে তাঁহার হাস্যরস উৎসারিত হয় নাই। সমসাময়িক কোন ঘটনা অথবা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কোন উত্তেজনা অবলম্বন করিয়া তিনি কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। হেমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গরসের মধ্যে যে স্থানিকতা ও সাময়িকতা দেখা গিয়াছিল হেমচন্দ্রের কবিতাতেও ঠিক সেরূপ লক্ষ্য করা যায়। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্রের মতই তিনি সমসাময়িককালে প্রচুর জনসম্বর্ধনা লাভ করিলেও পরবর্তীকালের স্থায়ী জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্রের হাস্যরস লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইলে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথা স্মরণ রাখা উচিত। তখন দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন স্বরু হইয়াছে এবং ইলবার্ট বিল প্রভৃতি লইয়া তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। হেমচন্দ্র নিজে জাতীয় আন্দোলনের একজন

১। 'রহস্যালাপে হেমচন্দ্র পশ্চাৎপদ ছিলেন না, কোন মজলিসে বা সভায় তিনি বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর ন্যায় হাসির তুফান তুলিতে পারিতেন। রহস্য কবিতা রচনায়ও হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন। বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিগণকে পত্র লিখিতে হইলে প্রায়ই তিনি হাস্যরসসম্বলিত পয়ারের আশ্রয় লইতেন। ॥ হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ। ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩ ॥

প্রবর্তক ও প্রবল সমর্থক ছিলেন। 'ভারতসঙ্গীত', 'বৃত্রসংহার' ইত্যাদি কাব্যে তিনি যে জাতীয় উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা জনগণের চিত্তকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। (তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে ভারতবিদ্বেষী ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপই বর্ষিত হইয়াছে। তবে শুধু কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধে নয় স্বদেশীয় লোকের কৃত্রিমতা, বিজাতীয়তা ও অনুকরণমোহ লইয়াও তিনি কম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন নাই। তবে অনেক স্থলেই তিনি বিচিত্র সামাজিক লোক ও তাহাদের অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া শুধু কেবল অবিমিশ্র কৌতুক উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন) তখন বিদেশী ভাবাদর্শ ও আইনকানুন আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে অদ্ভুত জটিলতা ও অসমঞ্জস পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছিল তাহা হইতেই হেমচন্দ্র তাঁহার কৌতুকরসের বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রেলগাড়ী ও দেশলায়ের স্তব এই দুইটি কবিতায় নিছক কৌতুকরসই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইংরেজের আমদানী রেলগাড়ীকে বিস্ময়াপন্ন ভারতবাসীর দৃষ্টি দিয়া বর্ণনা করিয়া কবি যথেষ্ট কৌতুক সঞ্চার করিয়াছেন, যথা—

এসো কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র করে সাজ।
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি
বাক্স, ব্যাগ, তল্পি ধরি,
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং—কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ বোলে,
ছাড়িবে নিশান—দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি ঘড়ি তাজ;—
ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।

দেশলায়ের স্তব কবিতাটি আরও বেশি কৌতুকাবহ। দেশলাই নামক অতি তুচ্ছ বস্তুটি কবির সুগম্ভীর ও অলঙ্কারবহুল বর্ণনাগুণে অস্বাভাবিক মর্যাদা লাভ করিয়াই কৌতুকরসকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল—

প্রণমামি খর্বদেহ অন্ধকারহারি।
নমামি অশেষরূপ অবনীবিহারি।

নমামি মোমের ডাঁটি 'ফস্ফরে'তে মলা।
ঊনবিংশ শতাব্দীর অনলের শলা।
তব গুণে, গুপ্ততাপ, তৃপ্ত জগজন।
প্রণমামি দেশলাই দেবের ইন্ধন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র মত হেমচন্দ্রের হুতোম প্যাঁচার গানেও তৎকালীন কলিকাতা শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া হাস্যপরিহাস করা হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি বহু দেশবিখ্যাত ব্যক্তির কৌতুককর বর্ণনা কবিতাটির মধ্যে রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেকের আকৃতি ও প্রকৃতি কবির অদ্ভুত উদ্ভাবনীশক্তি ও বর্ণনাচাতুর্যের ফলে অতিশয় সরস হইয়া উঠিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে কবি লিখিলেন 'বুলবুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই'। বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণনায় হইলেন—'ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস, টোল—স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।' রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে তিনি বলিলেন—'দ্বাপুরে ভূষুণ্ডী—বুড়ো সবেতে মহৎ, বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্বত।' রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইলেন—'ইংরিজি বিদ্যা বাগানে ফার্ষ্টরেট মালী, ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি।' সাবাস হুজুক শহরে নামক কবিতায় ভোটরঙ্গের বর্ণনা উপলক্ষে কবি তৎকালীন সমাজের বিচিত্র ধরণের মানুষের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম সমাজদৃষ্টি ও অতিশয় সরস চিত্রণ-চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীবাবুর সাজসজ্জার বর্ণনা একটু শুনুন—

বলতে কেমন পাকাগোঁফ কলপ শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপী বুড়োর মাথায়॥
ঝুঁটিদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বায়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্র ছটা॥
ঘুণ ধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ত্যাড়া টুপী।
লেন বসানো 'বেলাকু ক্যাপে' ঝোলে শিল্পখুপী॥
অপরূপ শোভা, আহা বাবরিছাঁটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে॥
সামলার স্থকার্ণিস, মোড়াসার ফের।
মোগলাই ধুমুচির মাথা ধন্না ঘের॥

ব্ল্যাক হ্যাট ফেল্ট টুপী, বোম্বায়ে লণ্ঠন।
লাইন বাঁধা সারি সারি 'জাইন' কেমন॥
বাঙ্গালী বাবুর সাজ আমার চখে বালি।
নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙ্গালী॥

বাঙালীর জাতীয় জীবনের বাক্‌সর্বস্বতা, ভীরুতা ও ভণ্ডামি বিদ্রূপ করিয়া দাঁতভাঙ্গা কাব্য নামক কবিতাটির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালী বীরের বর্ণনা খুবই চমকপ্রদ—

কথায় পাথর কাটে কোঁচা করে মাল সাটে
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী।
গিন্নী ঘরে কান্না করে আসি মন্দ রাগভরে
সে দিনের পত্রিকা ছড়ায়,
যত পড়ে গাত্র জ্বলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে
ডুকুরিয়া কতই ফোঁপায়।
পত্রিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ
অপমান সহিতে কি পারে,
গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাহে ধড় ফড়
শেষে দুঃখে যায় গোসাগারে।
গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহজ্বালা
তখনি সে হয় নিবারণ;
আবার সকালে উঠে হাঁপায়ে আফিসে ছুটে
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ।

(সাহিত্যসাধক চরিতমালা হইতে গৃহীত)

বাঙ্গালীর মেয়ে কবিতাটির মধ্যে বাঙালী নারীসমাজের একটি অতি সরস ও বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অশিক্ষিত এবং কোমল ও পরনিন্দা-প্রিয় রমণীদের চরিত্র ঈষৎ ব্যঙ্গের আঘাতে বিদ্ধ করিয়া কবি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন—

নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায় বেড়ানী,
পেটভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি।
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,

রসনা কলের গাড়ি চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গীন,
খেয়ে যান নিয়ে যান, আর যান চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে !

বাজিমাৎ, হায় কি হলো এবং নেভার নেভার কবিতাগুলি প্রধানত রাজনীতিবিষয়ক এবং এই কবিতাগুলির মধ্যেই কবির ব্যঙ্গবিদ্রূপ শাণিত ও ও জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে। বাজিমাৎ কবিতাটিতে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক একজন উকিল তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডোয়ার্ডকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিবারের মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার ফলে হিন্দুসমাজে যে তুমুল প্রতিবাদ উঠিয়াছিল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। হেমচন্দ্রও এই প্রতিবাদে যোগ দিয়া তীব্র এবং কিছুটা অমার্জিত ভাষায় জগদানন্দের এই কার্যকে নিন্দা করিয়াছিলেন। কবি লিখিলেন--

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায় !
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুল তলায় !
পুণ্য দিনে বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে ॥
কোথায় কৈশবী দল ? বিদ্যাসাগর কোথা ?
মুখুয্যের কাবচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা ॥

হায় কি হলোর মধ্যে ইলবার্ট বিল এবং তৎকালীন অন্যান্য অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ইলবার্ট বিলের উল্লেখ করিয়া কবি লিখিলেন—

হায় কি হলো কপাল পোড়া, উমেদারের পেশা,
পড়লো চাপা, জাঁতার তলে—সাহেব বড় গোষা।
অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায় !
এ পোড়া ছাই ইলবার্ট বিল কেন হায় হায়।

ইলবার্ট বিল লইয়া এদেশীয় ইংরাজ সমাজে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহার এক তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে নেভার নেভার নামক কবিতায়—

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্র্যানশন্ম কেশুয়িক, মিলার—

নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার !
নেভার সে অপমান, হতমান বিবিজান্
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের জানানা
বিবিজান ! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না
হিপ হিপ হিপ হুরে হ্যাট কোট বূট পরে
সদা ভাবে জগতরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—নেভার—নেভার ॥
নেভার—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে—সন্ধান আমাদের জানানা ;
দেহে প্রাণ, বিবিজান ! কখনো তা হবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় হাসির গান লিখিয়া এত অধিক জনপ্রিয়তা আর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। বর্তমানে হয়তো আমরা তাঁহার হাসির গানগুলি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এককালে এই গানগুলি বাংলার সর্বত্র আনন্দরসের উচ্ছ্বসিত মত্ততা আনিয়া দিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন না, তিনি সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন বটে। সেজন্য তাঁহার মুখে গীত হইয়া এই হাসির গানগুলি আরও বেশি খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিল।[১] তাঁহার পরবর্তী এবং অধিকতর সমৃদ্ধ সাহিত্য-জীবনে করুণ ও গম্ভীর রসাত্মক নাট্যরচনাতেই তাঁহার সৃষ্টিশক্তি নিবদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু বৈদগ্ধ্যদীপ্ত ও মার্জিত-রুচিস্নিগ্ধ, হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত ও প্রহসনরচয়িতারূপেই তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১। সুদীর্ঘ সাত আটবৎসর ধরিয়া গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, শহরে শহরে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বত্রই এসময়ে হর্ষ, কৌতুক, কবিত্ব ও রসিকতা প্রভাবে সকলকে যেন যথার্থ মাতাইয়াই তুলিতেছিলেন,—চারিদিকে হাস্যামোদের অনাবিল উৎসধারা যেন দুর্বার বেগে উন্মুক্ত, উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া নাচিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। বহু শতাব্দীর নিষ্পেষণ-শীর্ণ এই মরণোন্মুখ, নির্জীব ও অবসন্ন জাতিকে একটি দিনের নিমিত্ত—মুহূর্ততরেও যিনি একবার এমন করিয়া উৎসাহে ও উল্লাসে হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিতে পারেন তাঁহার নিকট এ দুর্ভাগ্য দেশ যে কতদূর অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা সহসা বলিয়া শেষ করা সহজ নহে।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৮৩—২৮৪ ॥

হাস্যকৌতুকের জগৎ হইতে ভাবমগ্ন বিষাদময় জগতের দিকে কেন তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চারিত হইল তাহা আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের পটভূমিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। রঙ্গরসে তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এই রঙ্গরসপ্রিয়তা যৌবনকালেই তাঁহার স্বভাবের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি বিবাহ করিয়া মধুর দাম্পত্যজীবন স্বরু করিলেন তখনই শিলারোধমুক্ত নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার অন্তর হইতে হাস্যরসের অজস্র-নিঃসৃত ধারা প্রবাহিত হইল। প্রেমময়ী পত্নীর সান্নিধ্য আমোদ-প্রিয় বন্ধুদের সংসর্গ, কর্মজীবনের স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা—এই সব কারণে সতত পরিপূর্ণ জীবনের নিশ্চিন্ত আমোদপ্রমোদে তিনি নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন। জীবন তখন ছিল একটি লাস্যময়ী, কলোচ্ছলা চঞ্চলা নদীর মত। তাহা উদ্দাম ও উতরোল, তাহা কৌতুকপ্রবাহে উদ্বেল ও সঙ্গীতের নেশার মাতোয়ারা।[১] সেই সময় তিনি 'আষাঢ়ে,' 'হাসির গান' ও তাঁহার প্রহসনগুলি রচনা করিলেন। কিন্তু বাধা-বন্ধনহীন দুর্দমনীয় জীবনবেগ কখনও চিরস্থায়ী হয় না, দ্বিজেন্দ্রলালের যৌবনতরল আনন্দরসের ধারাও একদিন শুকাইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে যৌবনের নিকুঞ্জবনে প্রৌঢ়ত্বের ছায়া পড়িল, অদৃশ্য বিধাতার নির্মম বিধানে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে হারাইতে হইল। জীবন আগে ছিল কমেডির আলোকে উজ্জ্বল, এখন তাহা হইল ট্র্যাজেডির অশ্রুতে গভীর। সেজন্য তাঁহার রচনার বিষয় পরিবর্তিত হইল, তাহার রসও পরিবর্তিত হইল। রঙ্গব্যঙ্গের আসর হইতে সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের মুক্ত ক্ষেত্রে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যক্তি প্রেমের ক্ষুদ্র চপলতা স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের মহৎ গাম্ভীর্যে রূপান্তরিত হইল।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভায় কৌতুক ও করুণ, চপল ও গম্ভীর দুইপ্রকার ধর্মই নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গানে হাসিবার সহিত ভাবিবার উপাদানও একই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।[২] বস্তুত তিনি আমাদিগকে

১। 'তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে প্রকৃতই মনে হইত—সে জীবনখানি হাস্যামোদ, উৎসাহ ও রঙ্গরসের অফুরন্ত আধার, তাহা যেন প্রীতি ও আহ্লাদের চির-প্রবাহী, স্নিগ্ধ-শুভ্র উৎস ধারা।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৩০৮ ॥

২। আষাঢ়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়—'আষাঢ়ে রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা,

হাসিতে হাসিতে ভাবাইয়াছেন আবার ভাবিতে ভাবিতে হাসাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হাস্যকৌতুকের সহিত চিন্তাভাবনা মিশিয়া থাকিলেও তিনি কখনও কোন বিশেষ মত ও দলের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন নাই। তিনি প্রগতিবাদী ছিলেন, কিন্তু অনুকরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যজীবনের উদার ও মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যজীবনের প্রতি অন্ধ ও বিকৃত আনুগত্যকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি স্বদেশকে যত ভালবাসিতেন স্বদেশের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে ঠিক ততই নিন্দা করিতেন। এই উদার, মুক্ত ও অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তিনি সকলের গায়েই পরিহাসের রঙ লাগাইতে পারিয়াছেন, আবার প্রত্যেকের প্রতিই উপহাসের বাণ নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গানের সমষ্টি প্রধানত 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। 'আষাঢ়ে' সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingolds by Legends অনুকরণে কতগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়া আষাঢ়ে নামে প্রকাশ করি।' কবিতাগুলিতে শিথিল ছন্দে নানা কৌতুকপূর্ণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি সামাজিক পটভূমিতে রচিত। সেজন্য উহাদের মধ্যে সমাজের বিচিত্র জীবনধারা ও মানসপ্রবণতা সম্বন্ধে কবির সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও নিছক কৌতুকসৃষ্টি এবং কোথাও বা বিশেষ কোন দোষসংশোধনের সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়। 'আষাঢ়ে'র মধ্যে গল্প ও হাসি পরস্পরের সহিত যুক্ত কিন্তু 'হাসির গানে' হাসিই প্রধান, গল্প অথবা বিষয়বস্তু ঐ গানগুলির মধ্যে উপলক্ষ্য মাত্র। উদ্ভট অবস্থা-বিপর্যয়, অতিরঞ্জিত পরিস্থিতি এবং অতিশয়িত চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়া গানগুলির মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। অনেকগুলি গানে বিলাতী সুর সংযোজিত হওয়াতে সেগুলির সরস চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকস্থলে ভাষার উদ্ভটত্বের ফলেও কৌতুকরসের প্রবলতা দেখা গিয়াছে।

উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙ্গালীকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।'

'আষাঢ়ে'র গল্পকবিতাগুলির মধ্যে কবির সচেতন উদ্দেশ্যময়তার জন্য গল্পরস্ জমিয়া উঠিতে পারে নাই। অদল বদল, ভট্টপল্লীতে সভা ও হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা শুধু এই তিনটি কবিতার মধ্যেই গল্পের রহস্যঘন সরসতা প্রকাশ পাইয়াছে। অদলবদলের স্ত্রীবিভ্রাটের কাহিনীটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ভট্টপল্লীতে সভা নামক কবিতাটির মধ্যে পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্রের মীমাংসার জন্য স্বর্গমর্ত্যের যে প্রচণ্ড আলোড়নের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে উদ্ভট অসম্ভাব্যতার জন্যই কৌতুকরস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রায় কল্পনাপ্রবণ ও পত্নীপ্রেমিক হরিনাথ গালের একদিকে সশ্মশ্রু অন্যদিকে বিশ্মশ্রু হইয়া শ্বশুরবাড়িতে যাইয়া যেরূপ লাঞ্ছিত হইল তাহার বর্ণনা দুর্দম কৌতুকরসাত্মক হওয়া সত্ত্বেও তাহা যেন করুণরসের ধারা স্পর্শ করিয়াছে। হাসির গানগুলির কয়েকটিতেও বিষয়বস্তুর উদ্ভটত্বের ফলে কৌতুকরস অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে অকস্মাৎ বর্তমান বাস্তববিষয়ের উল্লেখ করিয়া অথবা কল্পনাজগতের মধ্যে অতর্কিতভাবে রূঢ় বাস্তবের অবতারণা করিয়া আমাদের মনের উপর আচমকা আঘাত হানিয়া কবি কৌতুকরসের অনিয়ন্ত্রিত উদ্দামতা ঘটাইয়াছেন। রাম-বনবাসের মধ্যে রহিয়াছে—

ও রাম, দেখিস তোর বাপমাকে চিঠি লিখিস প্রতি ডাকে
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হোলে ওরে তুই এক ডোজ খাস
—একি হেরি সর্ব্বনাশ।

তানসান বিক্রমাদিত্য সংবাদ নামক প্রসিদ্ধ গানটির কথা ধরা যাক। ঐ গানের মধ্যেও স্থান ও কালের উদ্ভট অনৌচিত্য আনিয়া কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেমন—

যা হোক এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে রেলের গাড়ী,
আর হুগলী ব্রিজ পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী;

কোথাও কোথাও কবি খাদ্যবস্তু নিয়েও পরম উপভোগ্য কৌতুকরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। চা, পান, সন্দেশ ইত্যাদি কবিতাগুলির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চায়ের প্রশস্তি (রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ চা প্রশস্তি মনে করাইয়া দেয়) করিয়া কবি লিখিলেন—

শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট পোর্ট স্হেরি আর খাও যার খুনী যা—
কেড়ে কুড়ে শুধু নিওনা আমার

প্রাতে এক প্যালা চা।

অসার সংসার, কেবা বল কার, দারা সুত বাপ মা—

এ সংসারে দেখি যাহা কিছু সার—প্রাতে এক প্যালা চা।

সন্দেশভক্ত কবি সন্দেশের প্রতি নিরতিশয় আসক্তি জানাইয়া লিখিয়াছেন—

উহু কোথায় লাগে বা কুর্মা কাবাব বাব কোথায়
পোলাউ কালিয়া—
উহু খাই তাহা চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না
নড়িয়া।
আহা ক্ষীর হোত যদি ভারত জলধি, ছানা হত যদি
হিমালয়,
আহা পারিতাম কিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত
মহাশয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন হাসির গানগুলি লিখিতেছিলেন তখন বিবাহিত জীবনের প্রণয়রসে তাঁহার অন্তর উচ্ছল হইয়া ছিল। সেজন্য প্রেমের নানা বিচিত্রমুখিতা, মিলন-বিরহের বহু হাস্যকর দিক এই গানগুলির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'প্রতাপসিংহ' নাটকের ভূমিকায় একস্থানে লিখিয়াছেন, 'পৃথিবীতে হাস্য ও গাম্ভীর্য যেরূপ পাশাপাশি, আমি সেইরূপই চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।' প্রেম যত গুরুতর ও গম্ভীর ব্যাপারই হউক না কেন, ইহার চিন্তা, কল্পনা, আবেগ ও অশ্রুবেদনার পাশে ইহার নানা অসঙ্গতি ও আতিশয্যজনিত কৌতুকরসের দিকও রহিয়াছে। কয়েকটি গানে এই দিকটিই অত্যন্ত সরস ভঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে। বসন্ত, স্ত্রীর উমেদার, প্রেমতত্ত্ব, এস এস বঁধু এস, নয়নে নয়নে রাখি, সবই মিঠে, আমরা ও তোমরা, তোমরা ও আমরা, বিরহতত্ত্ব, অনুতাপ, তুমি বুঝি মনে ভাব, প্রেমালাপ প্রভৃতি গানগুলি এ প্রসঙ্গে সকলের মনে আসিবে। এই গানগুলিতে নিছক পরিহাসপ্রিয়তাও অবিচ্ছিন্ন আমোদের উদ্দেশ্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে তরল ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তব রোমান্টিকধর্মিতাকে কবি ঈষৎ শ্লেষের দ্বারা আঘাত করিয়াছেন হয়তো, কিন্তু নির্দোষ ঠাট্টা-তামাসা করিবার ঝোঁকই কবির মধ্যে প্রবল। স্ত্রীর উমেদারে কবি কিরকম স্ত্রী চান তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

বিম্বাধরা হোক'কি কাফ্রীবদোষ্ঠা ;

সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক ;
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্র দংষ্ট্রা ;
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক ;
—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন ;
তার উপর হয় যদি সুচারুরন্ধন ,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা।
তা'লে হাঃ হাঃ সেত সোনায় সোহাগা।

সবই মিঠে নামক গানে প্রিয়ার অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া মুগ্ধ প্রেমিক বলিলেন—

আহা—পিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন
গিঁটে গিঁটে ;
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি আহা যেন
পুলি পিঠে।
আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের
কানুটিটে ;
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জনী—আহা যখন
পড়ে পিঠে।

আমরা ও তোমরা এবং তোমরা ও আমরা কবিতা দুটিতে যথাক্রমে স্বামীপক্ষ ও স্ত্রীপক্ষের জীবন-বিড়ম্বনা বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীরা বলেন, তাহারা খাটিয়া খাটিয়া সারা হন আর স্ত্রীরা ঘরে বসিয়া বেশ মজা করিয়া ভোগ করেন। আবার স্ত্রীরা বলেন, তাহারা ঘরে বন্ধ হইয়া যত দুঃখ-জ্বালা ভোগ করেন আর স্বামীরা তো বেশ দুধের সরটি ক্ষীরটি খাইয়া ফুর্তি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। স্বামী-স্ত্রীর এই বিবাদ কবেই বা মিটিয়াছে! বিরহতত্ত্ব কবিতাটির মধ্যে বিরহের বাস্তব ।দকটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেমন—

বিরহ জিনিসটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি।
যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য,
বাজার খরচ ফর্দ করি দীর্ঘ নিত্য,

রজক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও
তখন কাতরভাবে তোমারে ডাকি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অম্ল-কটু-তিক্ত-কষায় ইত্যাদি নানাবিধ তীব্র রস ঐ কবিতাগুলির মধ্যে বর্তমান বলিয়া উহারা পাঠক ও শ্রোতাদের মন সজোরে নাড়া দিতে পারিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল নিরপেক্ষতার তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেজন্য একটু আধটু খোঁচা ও আঁচড় সহ্য করিয়াও সব দল ও মতের লোক তাঁহার কবিতা ও গানের রস উপভোগ করিত। তখনকার সমাজে একশ্রেণীর লোক পাশ্চাত্ত্যের প্রতি এক অন্ধ মোহ পোষণ করিত। বিলাত হইতে আগত সব কিছুই তাঁহারা লোলুপ আগ্রহে লুফিয়া লইত। তাঁহাদের বিলাতীপনাকে বিদ্রূপ করিয়া কবি লিখিলেন—

এই বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা রূপোর নয়,
তার আকাশেতে সূর্য ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।
তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর নদীগুলো ছোটে,
তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কচ্ছনাক মোটে,
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তালে তোমরাও বলতে তাই।

এই ধরণের গানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইল বিলাত ফের্তা নামক গানটি। ঐ গানটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল—

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

বাক্যবিলাসী, কর্মবিমুখ, ভীরু ও ভণ্ড বাঙালীদের প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ছিল অতিশয় প্রবল। সেজন্য বহুস্থানে তিনি ইহাদের হাস্যকর অসঙ্গতিগুলি বিদ্রূপকশাহত করিয়া তুলিয়াছেন। যে সব নব্যপন্থী নূতন কিছু করিবার

উৎসাহে মাতিয়া উঠিত তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো
দাড়ি কর খাটো, নাকগুলো কাটো,
পাগুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো।
বেলুনেতে চড়ো, আকাশেতে ওড়ো,
কিংবা চিৎপাত হোয়ে পাগুলো সব ছোড়ো।
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকিলে চড়ো।
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

'আষাঢ়ে'র বাঙ্গালী মহিমা কলিযজ্ঞ ও কর্ণবিমর্দন কাহিনী প্রভৃতি কবিতায় এবং 'হাসির গানে'র হতে পার্তাম, নন্দলাল প্রভৃতি গানে বাক্যবীর, ভীরু স্বদেশবিলাসী লোকেদের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। হতে পার্তাম কবিতায় কবি বলিলেন—

দেখ হোতে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির,
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ,
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,
তা নইলে খুব এক বড়—'হাঁ তা বটেইত তা বটেইত।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক হিন্দু-সমাজের প্রাচীন আচার ও প্রথাগুলি অতি উৎসাহের সহিত পুনঃপ্রবর্তন করিতে মাতিয়া গিয়াছিলেন। ইহারা অভিনব যুক্তি ও বিচারের দ্বারাই সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কারগুলি আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদিগকে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও কয়েকটি গানে ও কবিতায় ইহাদের হিন্দুয়ানাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন। বলি ত হাসব না নামক গানে কবি ইহাদের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়া লিখিলেন—

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙ্গে গড়ে,
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরে হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্—

তা সে হবে কেন?—গানে এক জায়গায় রহিয়াছে—

তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধর্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম
ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুঁড়োমিটা ধর্ম।
অমনি তাই, বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম,
—তা সে হবে কেন?

'আষাঢ়ে'র শ্রীহরিগোস্বামী ও নসীরাম পালের বক্তৃতায় কপট ধর্মধ্বজাধারী, স্ত্রী-স্বাধীনতা বিরোধী উৎসাহী সমাজনেতাদের চরিত্র নির্মমভাবে বিদ্রূপবিদ্ধ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কোন কোন স্থলে ভাষার মধ্যে শব্দসঙ্কর সৃষ্টি করিয়া, আবার কোথাও কোথাও প্রচলিত অর্থের বিপর্যয় ঘটাইয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। Reformed Hindoos নামক গানে ইংরেজী ও বাংলা শব্দের এক অদ্ভুত খিচুড়ি দেখা গিয়াছে, যথা—

From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা curious commodities, human oddities
denomiaated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু কাজের সব
ঢুঁ ঢুঁs ;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose

'আষাঢ়ে'র কলিযজ্ঞ নামক কবিতায় সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের কৌতুককর মিশ্রণ রহিয়াছে, যথা—

একদা তু বাঙালীর হইল বড় মুস্কিল ;
কূটতর্ক উঠে এক মহাদ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে ॥
উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ ॥
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে ॥

রজনীকান্ত সেন

রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের শিষ্য ও অনুবর্তী ছিলেন। হাসির ক্ষেত্রে ভাব ও ভঙ্গি উভয় দিক দিয়াই তাঁহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের মতই তিনি শুধু কবিমাত্র ছিলেন না, গীতিকার ও গায়কও ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি স্বদেশী ও ধর্মসঙ্গীত এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। একদিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অন্যদিকে স্বদেশ ও স্বদেশীর প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি ছিল। সেজন্য তাঁহার গানগুলির মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় আন্তরিকতার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। এই অকপট নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্যই তিনি কখনও অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিমতা এবং অসার অহংবাদ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সেজন্য ধর্মসঙ্গীত গাহিতে কিংবা জাতীয় উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিতে উঠিতে হঠাৎ তিনি তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের নানা দোষ ও অসঙ্গতি দেখিয়া অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছেন এবং অতর্কিতে সেই বেদনা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে।

রজনীকান্তের ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রাচীন ও নবীন উভয়পন্থী সমাজের প্রতিই বর্ষিত হইয়াছে। একদিকে যেমন পণপ্রথা, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহবাতিক, ভণ্ড পৌরোহিত্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া উপহাস করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে ইঙ্গবঙ্গী সমাজের যাবতীয় বিকৃতি এবং অন্ধ পাশ্চাত্যমোহ ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহারকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তৎকালীন সমাজের চলচ্চিত্র যেন ব্যঙ্গরসে মিশ্রিত হইয়া কবির লেখনীর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য জ্বালা ও গ্লানিমুক্ত নির্দোষ ও উতরোল হাসিও যে তিনি হাসিতে পারেন না তাহা নহে।

কয়েকটি গানে হাল্কা হাসির ফুলঝুরি যেন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রথমেই 'কল্যাণী'র ঔদরিক কবিতাটির কথা মনে পড়ে—উদরবিলাসী ব্যক্তির উদ্ভট ভোজনকল্পনা কবিতাটির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে রত,
পানতোয়া শত শত ;
আর সরষের মত হত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মত !

(প্রতি বিঘা বিশমণ ক'রে ফলত গো ;)
(আমি তুলে রাখিতাম) বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
(আমি তুলে রাখিতাম)
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে,)
ইত্যাদি

পুরাতত্ত্ববিৎ কবিতাটির মধ্যে আমার ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ থাকিলেও কৌতুকরসের প্রাবল্যই ইহাতে রহিয়াছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রসঙ্গে এমন এক একটি নিতান্ত তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যেগুলি আমাদের মানসিক প্রত্যাশার মধ্যে অতর্কিত বিপর্যয় আনিয়া কৌতুকবোধকে জাগ্রত করিয়াছে—

রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
আকবর শাহ কাছা দিত কিনা,
নুরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিম্বা পীনা,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নামক কবিতাটির মধ্যেও নাটকীয়ভাবে কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতায় শ্লেষ ও বিদ্রূপের খোঁচা একটু আধটু থাকিলেও প্রসন্ন পরিহাসের সুরটিই প্রধান। 'কল্যাণী'র খিচুড়ী নামক কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৎকালীন অনেক উদারচেতা নেতা সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলিতেন। সেই সর্বধর্মসমন্বয় লইয়া আলোচ্য কবিতাটিকে পরিহাস করা হইয়াছে। পরস্পরবিরোধী মত ও ধর্মাচরণের অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টার মধ্যেই কৌতুকরস নিহিত রহিয়াছে, যথা—

করো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে শুচি ;
খেয়ো শুকতুনী, ও ফাউল কারি, বিস্কুট ও লুচি
চাই, টিকিটে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
কর ইদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।

হুইস্কিতে তিলতুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' বলে গিলে করো পিতার তর্পণ,
করে কৃষ্ণে নিবেদন, করবে বীফষ্টিক ভোজন,
রেখ বদনা, কমোড, কোশাকুশী আদি সরঞ্জাম।

পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের ভাষা ও স্বভাব লইয়া রজনীকান্ত কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন। সেগুলির মধ্যেও ঈষৎ শ্লেষের স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও রঙ্গরসেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। ঐ কবিতাগুলির মধ্যে বুড়ো বাঙ্গাল নামক কবিতাটিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য বৃদ্ধ ও বিব্রত বাঙ্গাল লোকটির আপ্রাণ প্রয়াস বিশেষ কৌতুকাবহ। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত হইল—

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়,
তোমার লগে কেমতে পারুম, হৈয়া উঠছে দায়।
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্ধনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়
বেলোয়ারী চুরি দিচি, পাছাপাইর্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর্যা দিব্যার লাইগ্যা মনডা পাইন্যা
ওজন কৈরা ব্যাবাক দিচি, পুরাণ দিচি ফায়।
বুরা বুরা কৈরা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোরচ পাগল
যহন বিয়্যা কোরচ ফেলবা ক্যামতে কৈয়া দ্যাও আমায়।

বিয়ে পাগলা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর নামক কবিতায় উভয়ের কথোপকথনের মধ্যেও যথেষ্ট কৌতুকরসের সঞ্চার হইয়াছে। বুড়ো যখন কল্পিত ভাবী স্ত্রীর মান ভাঙাইবার সঙ্কল্প জানাইয়া বলিতেছে—

আর, কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,
পায়ের উপর প'ড়ে বলবো, 'তুটো খান ;'
তাতেও না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ,—

তখন প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুর সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই বলিতেছে—

করতা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাসী।

একটি শাক্ত ও একটি বৈষ্ণব বাঙ্গালের পারমার্থিক চিন্তা নেহাত পূর্ববঙ্গীয় ভাষার জন্যই গম্ভীর ভক্তিরসের পরিবর্তে লঘু হাস্যরসেরই সৃষ্টি করিয়াছে—

ভাল মতে পরক কইর্যা দ্যাখলাম আমি,
বৈষ্ণ্যাশে পাথর বাঁইন্যা বসচ তুমি ;

এত কাঁদব্যার লাগচি, মাথা ভাঙ্গব্যার লাগচি,
দ্যাখফার লাগ্‌চ তুমি দারাইয়্যা !

উপরের কথাগুলি যথেষ্ট ভক্তিরসাত্মক হওয়া সত্ত্বেও শুধু কেবল কৌতুকরসই উদ্রেক করে।

'বাণী'র বৈয়াকরণ দম্পতীর পাত্রের আদান-প্রদানের মধ্যে ব্যাকরণের নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া উহাদের মধ্য দিয়া বিরহবেদনার পরিচয় নিপুণ কৌতুক-চাতুর্যের দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহিণী স্ত্রী বলিতেছেন—

তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়,
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে স্মতি, স্যতঃ, স্মন্তির ঘুচে যাবে ভয়,
হবে বর্তমানের তি, তস, অন্তি !

উত্তরে স্বামী বলিতেছেন—

প্রিয়ে হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত,
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত।

রজনীকান্তের ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলির আলোচনা করিতে গেলে মনে হয়, সমাজের কোন প্রকার বিকৃতি ভণ্ডামি ও অসাধুতা তাঁহার সত্য-সন্ধানী সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ফাঁকি দিতে পারে নাই। মৌতাত, তিনকড়ি শর্মা, জেনে রাখ ইত্যাদি কবিতায় তিনি অসাধু আত্মম্ভরি ও নীচাশয় সমাজের বিচিত্র রূপ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শরে বিদ্ধ করিয়াছেন। জেনে রাখ কবিতাটিতে কবির অসহিষ্ণু প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে সেই সমাজের বিরুদ্ধে যেখানে—

ধার্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আসটা টানে,
নিষ্ঠাবান যে কুক্কুট মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাটবছরে আছে পঞ্চম পক্ষ,
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।

পুরোহিত, দেওয়ানী হাকিম, ডেপুটি, উকিল প্রভৃতি কবিতায় ঐ সব শ্রেণীর লোকেদের ভণ্ডামি ও নীচতা লইয়া কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন।

কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাইয়ের সুরে রচিত এবং উহাদের ভাষাতেও দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরেজী ও বাংলার মিশ্রিত ভাষার প্রভাব আছে। জাতীয় উন্নতি ও উঠে পড়ে লাগ প্রভৃতির মধ্যে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মার্গগামিতা কবির তীব্র কশাঘাত লাভ করিয়াছে। তাহাদের স্বভাবের চিত্র কিরূপ দেখুন—

কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ইঙ্গ বঙ্গ মিশ্র অদ্ভুত conversation
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা।

রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতায় কবির ব্যঙ্গবিদ্রূপের সহিত সীমাহীন সমবেদনামিশ্রিত অশ্রুকারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূর্খ পিতা ও পণ্ডিত পুত্রের পত্রের আদান প্রদানে একদিকে যেমন পুত্রের নির্মম ও ঘৃণ্য উক্তিতে আমাদের তীব্র বিরক্তি উদ্রিক্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি স্নেহান্ধ, মূর্খ ও দরিদ্র পিতার অশুদ্ধপত্র পড়িতে পড়িতে কৌতুকের হাসি কারুণ্যে বিগলিত হয়। বরের দর ও বেহায়া বেহাই কবিতা দুইটিতে কন্যাদায়গ্রস্ত অর্থহীন পিতার নিরুপায় দুঃখ এবং শ্বশুরগৃহে অসহায় কন্যার নির্বাক বেদনার বর্ণনা শুনিয়াও সমাজের এক সমাধানহীন সমস্যার প্রতিই আমাদের বেদনাভারাক্রান্ত দৃষ্টি জাগ্রত হয়। 'বাণী'র শেষ কবিতাটি বিদায়ের মধ্যে দৈনন্দিন সংসারের ঝঞ্ঝাটে বিব্রত পরিবারকর্তার যে সঙ্কটের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে কৌতুকের সহিত কিঞ্চিৎ বেদনার স্পর্শও আছে—

সবাই নিজেরটি বোঝে, যা পায় তাই ট্যাঁকে গোঁজে,
শুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল,
কান্ত বলে সবাই মিলে, একবার কৃষ্ণানন্দে হরিবোল
(দুবাহু তুলে)

ট্যাঁকে গোঁজা ও মাথায় ঘোল ঢালার কথা উল্লেখ করিয়া কবি মানুষের নীচ স্বার্থপরতার যে একটা তির্যক বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতেই এখানে কৌতুক-রসের উদ্রেক হইয়াছে।

আমাদের সকলেরই বোধ হয় সাংসারিক ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাটে বিব্রত হইয়া কান্তকবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া এই হরিবোল বলিতেই ইচ্ছা করে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার এমন একটি যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সূক্ষ্ম ও অন্তর্মুখী কাব্যধারার পাশাপাশি একটি তরল কৌতুকোচ্ছল কাব্যধারাও প্রবাহিত হইতেছিল। প্রথম ধারার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু দ্বিতীয় ধারার অসংশয়িত প্রাধান্য ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের। রজনীকান্ত, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথও দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুক-কবিতার বস্তু ও রীতি অবলম্বন করিয়া হাসির কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।[১] ভাবাদর্শ ও সৌন্দর্যচেতনার দিক দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শিষ্য কিন্তু যখন তাঁহার মধ্যে কবি অপেক্ষা বিদূষকসত্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অনুগামী। রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রবিরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালকে আঘাত করিতে যাইয়া তাঁহারই দেওয়া কৌতুকশাণিত অস্ত্রই তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যপ্রতিভা নদীধারার মত তাঁহার সৃষ্টিশক্তির উন্মেষকাল হইতে অবিরাম বহিয়া যায় নাই। তাহা জীবনের শেষ দিকে হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের সুদূরপ্রসারী ভাবমগ্ন দৃষ্টি অকস্মাৎ নবকুমারের তীক্ষ্ণ ও তির্যক দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইল।

'হসন্তিকা' এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'র কয়েকটি কবিতায় তাঁহার কৌতুকপ্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান। সারা জীবন তিনি ভাবিয়াছেন ও কাঁদিয়াছেন কিন্তু তাঁহার হাসি ছড়াইয়া আছে মৃত্যুর আগে ও পরে।

সত্যেন্দ্রনাথ হাসির কবিতা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু অত্যধিক তথ্য ও পাণ্ডিত্যমোহের জন্য তাঁহার হাসির অনাবিল ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। অবশ্য হাস্যরসের প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা 'হসন্তিকা'র হাস্যরসের প্রতি নামক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণত

১। সত্যেন্দ্রনাথের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সম্বন্ধে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র তাঁহার 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' নামক গ্রন্থে অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন (২০৮-২১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হাস্যরসকে যে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়া দেখা হইয়া থাকে তাহাকে যেন বিদ্রূপ করিয়াই কবি লিখিলেন—

শান্ত করুণ বীরের Chair
দখল করা নয়কো Fair,
মোটেই সহ্য করবে না ত কেউ সে ;
সিংহ ব্যাঘ্র তোমায় কে কয় ?
গোবাঘা কি নেকড়েও নয়,
হাস্যরসটা রসের মধ্যে ফেউ যে।

কিন্তু হাস্যরসের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যে আত্মবিলোপী, প্রশ্রয়-শিথিল সত্তা হইতে হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উৎসারিত হয় তাহা তাঁহার ছিল না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ ও বিভিন্ন ভাষাব্যবহারের প্রতি তাঁহার এমনি ঝোঁক ছিল যে, তাঁহার হাস্যরস শব্দ ও বাক্যের দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া সর্ব-সাধারণের মাঝে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। জবান-পঁচিশী, কাশ্মারী কীর্তন, কাশ্মারী ভাষা প্রভৃতি কবিতার কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ তো উল্লেখ করা যাইতে পারে। জবান-পঁচিশীতে তো উনত্রিশটি ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা নিছক বাড়াবাড়ি সন্দেহ নাই। নানা জ্ঞান ও তত্ত্বের অহেতুক আতিশয্যের জন্যও তাঁহার হাস্যরস অনেক স্থানে তাহার সাবলীল, প্রসন্ন রূপ হারাইয়া ফেলিয়াছে। অঃ, হুঁঃ প্রভৃতি কবিতার হাসি এ-জন্যই কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত মত, রুচি ও দলানুগত্যের ফলেও তাঁহার হাস্যরস কোনো কোনো স্থানে একটু অকারণ কঠোর ও পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।[১]

'হসন্তিকা' কাব্যের হসন্তিকা নামক কবিতাটিতে কবি নিজেই তাঁহার কাব্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

সেই স্পিরিটের একটুখানি
হসন্তিকায় আছে,
রঙ্গে ব্যঙ্গে কোলাকুলি
আরামে আর আঁচে !

অর্থাৎ কবির কাব্যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ মিশিয়া আছে। সেই কাব্য হইতে যেমন

১। তাই ব্যক্তিগত প্রীতি-অপ্রীতি তাড়িত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সংকীর্ণতার ভাব এ গ্রন্থের ('হসন্তিকা') আদ্যন্ত বিস্তারিত।

॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ॥

আরাম পাওয়া যায় তেমনি আঁচও পাওয়া যায়। হসন্তিকা কথাটির অর্থও হইতেছে অগ্নিপাত্র। সেই অগ্নিপাত্র যেমন শীতের দিনে আরাম দেয়, তেমনি আবার তাহার 'জ্বলদ্‌-বহুচ্ছিদ্র' হইতে উত্তাপও বিকীর্ণ হয়। অবশ্য আরাম ও উত্তাপ দুই থাকিলেও তাঁহার কাব্যে উত্তাপের ভাগই একটু প্রবল এবং সেই উত্তাপে যতখানি আরাম পাওয়া যায়, ঝলসিয়া যায় তাহা অপেক্ষা একটু বেশি। রঙ্গকবিতাগুলির কয়েকটিতে নিছক কৌতুকরসই প্রাধান্য পাইয়াছে। আদর্শ বিয়ের কবিতা, নাক ডাকার গান, ছাগল-দাড়ি প্রভৃতি কবিতাকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। খাদ্য, পানীয় ও মাদকদ্রব্যের প্রশস্তি সূচক যে কবিতাগুলি কবি লিখিয়াছেন সেগুলিকেও প্রবল কৌতুক-রসাত্মক বলা যায়। রামপাখী, অম্বল-সম্বরা কাব্য, কাশ্মীরী-কীর্তন, মদিরা-মঙ্গল, সিগার সঙ্গীত প্রভৃতি কবিতাকে এই শ্রেণীতে ফেলিতে হয়। এখানে তুচ্ছ ও নিত্য ব্যবহার্য বস্তুকে গুরুগম্ভীর ভাষা ও অলঙ্কারে মণ্ডিত করিবার ফলে বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে বৈপরীত্য ঘটিয়াছে তাহাই কৌতুক উদ্রেক করে। যেমন সিগারের মহিমা রচনা করিয়া কবি লিখিলেন—

হে সিগার! প্রেমাগার! সে সখা সিগার!
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre
তব গুণ তুলনায়; হে অনন্তরূপ!
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চুপ
এ দাস তোমার প্রভো!

প্যারডি অথবা অনুকরণমূলক কবিতারচনাতেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ছন্দরীতি ও ভাষা-পদ্ধতির মধ্যে কবি তাঁহার নিজস্ব তরল বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া অতি সরস প্যারডি রচনা করিয়াছেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের আরম্ভাংশ অনুকরণ করিয়া কবি লিখিলেন—

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র কুলোদ্ভব-মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন সময়ে আহা!

উর্বশী কবিতার অনুকরণে লিখিলেন—সর্বশী

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুন্যা চারিণী সর্বশী!

ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয় জিহ্বা সহ তোমারে বাখানি
তুমি কোনো হাঁড়ী প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গ আমার জননী আমার ও মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়! প্রভৃতি গান দুইটি অনুকরণ করিয়া কবি রচনা করিলেন মদিরা-মঙ্গল ও গন্ধ-মাদন। মদিরা-মঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে এইভাবে—

মদ্য আমার! পানীয় আমার;
সরাব আমার! আমার Peg;
কেন কোম্পানী নজর দিল গো?
কেন হল এই Duty plague?

সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি, বিদ্বেষপরায়ণতা, পদলেহীবৃত্তি সাহিত্যে বস্তুবাদ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়া কবি তাহার ব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন। (কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান সম্পদ তাঁহার ছন্দ, এই ছন্দকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। তাহার মধ্যে বিচিত্র তাল ও লয় সৃষ্টি করিয়া কবি তাঁহার কবিতা হাস্যরসাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন।) ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং পুরাতন ও প্রচলিত ছন্দের অভিনব গতিবৈচিত্র্যে কবি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে অনুভূতিচাঞ্চল্য জাগাইয়াছেন তাহা উদ্গত হাস্যোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়াই শান্ত হইয়াছে।

কালিদাস রায়

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস রায় তাঁহার অকপট আন্তরিকতা ও স্নিগ্ধ-মধুর সরসতার দ্বারা কাব্যক্ষেত্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে তাঁহার কবিতায় হাস্যকৌতুকের চপল প্রবাহও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা হয়তো সাধারণ পাঠকের সুবিদিত নহে। কবি-কালিদাস স্বভাবত ধীর, সংযত, গভীর ও চিন্তাশীল। সুতরাং হাস্যকৌতুকের প্রগল্‌ভ ধারা যে তাঁহার অটল-গম্ভীর বাহ্য আকৃতির গভীর গুহাতলে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিলে বুঝা যায় যে, ঐ ভারী ও ভরাট মানুষটির ভিতরে কত রঙ্গ ও পরিহাসের সঞ্চয় লুক্কায়িত রহিয়াছে। চিরকালের রসিক মানুষই তো এইরূপ গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকে।

কালিদাসের রঙ্গ ও ব্যঙ্গের কবিতাগুলি 'রসকদম্ব' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কবি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, রসকদম্ব নদীয়া মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি সন্দেশের নাম। সুতরাং কবিতাগুলির মধ্যে সেই সেরা মিষ্টান্নেরই আস্বাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু শুধু কেবল অবিমিশ্র মিষ্টতা নহে, এই রসকদম্বগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে একটু অন্য রসেরও মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার কৈফিয়ত কবির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। কবি বলিয়াছেন, 'প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলি আমার যৌবনকালের রচনা—ঐগুলি রঙ্গরচনা। যে কবিতাগুলি এই সংস্করণে সংযুক্ত হইল সেগুলি প্রধানত ব্যঙ্গরচনা। সামাজিক জীবনের বহুপ্রকারের কাপট্য, ইতরতা, নীচতা ও আত্মম্ভরিতা লক্ষ্য করিলে চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করা যায় না। অপ্রসন্ন চিত্তে অবিমিশ্র রঙ্গরসের উন্মেষ হয় না। তাই প্রৌঢ় বয়সের রচনায় রঙ্গরস ব্যঙ্গরসে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের দিক হইতে ইহাতে লাভ হয় নাই, ক্ষতিই হইয়াছে।' ব্যঙ্গরস অপেক্ষা রঙ্গরসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকরণের মধ্যে হাস্যরস সম্বন্ধে কবির যথার্থ বিচারবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির বিশুদ্ধ রঙ্গরসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে অন্যমনস্ক, ছত্রবিয়োগ জুতাবদল, মাল্যসঙ্কট, দন্তবিয়োগে ইত্যাদি কবিতায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে গল্পরসের ধারা বর্তমান থাকায় এগুলি এত সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। ছত্র, জুতা, দন্ত, ইত্যাদি বস্তুর বিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া যে ছদ্ম কারুণ্যের উদ্রেক করা হইয়াছে তাহাই রঙ্গরসকে বেশি প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। ছত্রের বিয়োগে কবি কাতর হইয়া বলিয়াছেন—

> বর্ষাসাথী আমার ছাতি, আজকে তুমি নাই,
> যাচ্ছে ফাটি হকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
> মাথায় পরে বাদল ঝরে, তার চেয়ে মোর চোখেই পড়ে,
> অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই?

ভোজরাজ, মিঠাই সুন্দরী ইত্যাদি কবিতায় মনোহর ভোজ্যবস্তুর রসচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মিঠাই সুন্দরীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া যে সৌন্দর্যের তিলোত্তমা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

> তোরে হেরি মন মজিয়াছে শোন মোদক দুহিতা সুন্দরী,
> পান্তুয়া-ঠোঁটে রস পিইবারে রসনা উঠিছে, গুঞ্জরি।

আমসন্দেশে কাল জাম দিয়ে
কে রচিল তব আঁখি যুগ, প্রিয়ে,
রচা তালশাঁসে চিবুক শোভে সে ফলারিয়া প্রাণমন হরি।

কয়েকটি কবিতায় ভাষার উদ্ভটত্ব অথবা শব্দের বিপর্যয় ঘটাইয়া কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ শুদ্ধকথা, নেশাখোরের অভিধান, অবিমিশ্র ভাষা, অনুত্রাস প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শুদ্ধ কথা বলার গর্ব যে করে তার ভাষার 'শুদ্ধতা' লক্ষ্য করুন—

আমেরে কই আম্র যেমন জামেরে কই জাম্র,
তামায় যেমন তাম্র কহি মামায় কহি মাম্র।
পাঠশালাকে পট্টশ্যালক আটচালাকে অষ্টচালক
কম্বলে কই অল্পশক্তি ভেবে ভেবে শেষটা।

কালিদাসের ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি আলোচনা করিতে গেলে কবির নিজস্ব বক্তব্য প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, 'ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে আমি কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করি নাই, শ্রেণী-বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা কিছু ভূয়ো, ভাঁওতা, মেকি ও ভণ্ডামি এই রচনাগুলির অভিযান তাহারই বিরুদ্ধে।' অবশ্য এই ব্যঙ্গ-কবিতাগুলির মধ্যেও কোথাও কোথাও ব্যঙ্গ একটু কোমল ও পরিহাসমিশ্রিত। সে সব স্থানে কবি আঘাত করিলেও তাঁহার একটু শিথিল ও সহিষ্ণু হসন-প্রবৃত্তিই প্রবল, এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে বিদ্যার জাহাজ, অপূর্ব অধ্যাপনা, মদন মোহন, আদর্শ লোক বিচার, কার্পণ্য ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব কবিতার মধ্যে লোক চিরত্রের সামান্য দোষ ও অসঙ্গতিই দেখানো হইয়াছে। বিদ্যার জাহাজ কবিতাটি হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইল—

পড়েছি পড়েছি হেমচন্দ্রের পলাশী যুদ্ধগান
গিরীশ ঘোষের বিষবৃক্ষ ও অমৃতের বলিদান।
বঙ্কিমকৃত মেবারপতন
গোলে, বকাওলী মনের মতন
নবীন সিংএর চন্দ্রকেশর, মৃণালিনী, সংসার।
দ্বিজুর পাঁচালি দাশুরই মতন ; খুড়োর ভাইপো বটে,
হরু ঠাকুরের বিদ্যে কি আছে রবি ঠাকুরের ঘটে ?

কালিদাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যঙ্গকবিতাগুলির মধ্যে কবির উষ্মা ও

বিরক্তির আধিক্যের ফলে হাস্যজনকতা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতি দেখিয়া কবি তাঁহার প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টিকে অবিচলিত রাখিতে পারেন নাই, তীব্র শ্লেষাত্মক রীতির মধ্য দিয়া তিক্ত ব্যঙ্গরসের ধারা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। লজ্জাহরণ, সমাজে, গোপন-কথা, হিংসা-বিষ, নব্যা, বাঙ্গালী সাহেব প্রভৃতি কবিতাকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা গোপনে পাপ করিয়া প্রকাশ্যে সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকে যাহারা হিংসা ও অসূয়ার বিষে অহরহ জর্জরিত হয়, এবং যাহারা মার্কটীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে চাহে তাহাদের প্রতি কবির অসন্তুষ্ট শাসন উদ্যত হইয়াছে। আত্মম্ভরি কবি ও মূর্খ সমালোচকদের প্রতিও কবি তীব্রভাষায় বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। বাংলা সাহিত্যে যে সব পণ্ডিত-মূর্খ ভালোভাবে লেখকদের সাহিত্য না পড়িয়া, না জানিয়া অসার সমালোচনার আবর্জনাপুঞ্জে সাহিত্যের আঙ্গিনা ভরিয়া ফেলে তাহাদের প্রতি কবির বিরক্তি একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। আদর্শ সমালোচনা, কঠোর-সমালোচনা, তারিফ, লেখক-বিচার প্রভৃতি একই ভাবাত্মক কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। লেখক-বিচারের মধ্যে বোধ হয় তিনি দুঃখের সঙ্গে নিজের কথাই বলিয়াছেন—

চুলগুলো তার খোঁচা খোঁচা সে কি কভু লিখতে পারে ?
একে মোটা তাতে কালো কেমনে ক'স লেখক তারে ?
যে জাতেতে জন্ম তাহার সে জাতে হয় লেখক কবে ?
ছেলে পড়ায় স্কুল-কলেজে তারো লেখা পড়তে হবে ?

সজনীকান্ত দাস

ব্যঙ্গরচনায় আধুনিক লেখকদের মধ্যে সজনীকান্তের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সজনীকান্ত সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কাছে যত প্রশংসা পাইয়াছেন নিন্দা পাইয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। তাহার কারণ তাঁহার লেখার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাণগুলি এমন শাণিত ও মর্মভেদী হইয়া উঠিয়াছে যে, সেগুলি কাহারও পক্ষে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে। অবশ্য অনেক স্থলেই তাঁহার বিরক্তি ও বিদ্বেষ যে আর্টের প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাও

সত্য। সেজন্ত তাঁহার আঘাত প্রায়ই শ্রেণীকে ভুলিয়া ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছে। এমন কি জীবিত ব্যক্তিদের নাম, আকৃতি ও প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তিনি স্থানে স্থানে যে অনাবৃতও নির্দয় আক্রমণ করিয়াছেন তাহা কখনই শোভন ও সঙ্গত হয় নাই। সকল আর্টের মত ব্যঙ্গের আর্টও প্রচ্ছন্নতা ও ছদ্ম আবরণের মধ্যেই অধিকতর সার্থক ও প্রভাবশালী হইয়া উঠে। যিনি ইহা বিস্মৃত হন তাঁহার ব্যঙ্গ গালাগালিতে পরিণত হয় মাত্র।

কিন্তু সজনীকান্ত তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁহার দেওয়া আঘাতকে তিনি নরম ও মোলায়েম করিতে চাহেন নাই বরং সেই আঘাতকে তিনি যতদূর সম্ভব কঠিন ও কষ্টদায়ক করিয়া তুলিতেই চাহিয়াছেন। সমাজের ন্যাকামি আর ভণ্ডামি, খোকামি আর জ্যাঠামি প্রভৃতিকে তিনি ক্ষমাহীন আঘাতে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] চাবুক নামক কবিতাটির মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

> দুষ্টে শাসিতে, বোকারে বোঝাতে, শিশুরে বাড়াতে জ্ঞান
> কঠিন হইতে হয় বা যদিও সেও তার কল্যাণ।
> আদরের সাথে চাবুকখানাও কাছে কাছে রাখা চাই—
> পস্তাবে শেষে মেনি বাঁদরেরে বেশী যদি দাও নাই।

সজনীকান্ত যে সমাজকে লইয়া উপহাস করিয়াছেন আজ বোধ হয় সেই সমাজের রূপান্তর ঘটিয়াছে। সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা শক্তির সংঘাতে ও প্রভাবে সমাজের পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটিতেছে। এককালে যে সব ভাব ও আচরণ উপহাস্য ছিল আজ হয়তো সেগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপহাসের বিশেষ বিশেষ উৎসও শুকাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের ভাবতরল প্রভাবে এককালে দেশের যুবকদের মধ্যে যে রোমাণ্টিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল, দুর্বল, কর্মবিমুখ ও উদ্ভট কল্পনাচারী তরুণদের মধ্যে যে স্বপ্নবিলোল প্রণয়মাদকতা অত্যন্ত সুলভ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের প্রতিই সজনীকান্তের বিদ্রূপবাণগুলি প্রধানত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রণয়পাগল যুবকদের প্রণয়সাধনার নানা গুহ্য উপায় ও দুর্নিবার অধ্যবসায়ের কথা লেখক

১। একজন সমালোচকের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'Satire, God be praised, is a purge, and a healthy man takes to it as naturally as a dog to grass, for the release of his humours.

Satire by Gilbert Cannan, P.39.

নিঃসঙ্কোচে বাস্তবনিষ্ঠার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, লেখকদের আঘাতগুলি মনের মধ্যে যতই জ্বালা ও গ্লানির উদ্রেক করুক না কেন উহাদের প্রবল হাস্যজনকতা এবং সরস উপভোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না।

সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আর একটি লক্ষ্য হইল প্রগতিচারী সমাজ ও সাহিত্য। শরৎচন্দ্র ও কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ও সাহিত্যাদর্শের প্রতি যে অনাস্থা দেখা গিয়াছিল, পতিত ও পীড়িত জনগণের প্রতি যে সীমাহীন করুণা ও সমবেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল সজনীকান্ত সেগুলি সমর্থন করিতে পারেন নাই। তৎকালীন নবীন সাহিত্যিকগণ প্রগতির নামে যে স্বেচ্ছাচারের জয়গান করিয়াছিলেন বাস্তবতার নামে যে অশ্লীতার আমদানী করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশ্য প্রগতির রথচক্র কোনদিন প্রতিকূল বাধা গ্রাহ্য করে না, সেদিনকার সাহিত্য-প্রগতিও তিনি ঠেকাইতে পারেন নাই। কিন্তু তখনকার প্রগতিবিলাসী তরুণ সাহিত্যিকগণ যে তাঁহার জন্য সতর্ক ও সংযত হইতেন তাহা সত্য।

সজনীকান্তের মত ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিতর্ক উঠিতে পারে কিন্তু তাঁহার শক্তি ও সুনিপুণ কলাকৌশল সম্বন্ধে দ্বিমতের সম্ভাবনা নাই। নির্ভুল ছন্দপ্রয়োগ, সুনির্বাচিত শব্দচাতুর্য, প্রচলিত শব্দ ও বাক্যাংশের অভিনব ব্যবহার, বাক্যবিন্যাস প্রণালীর উদ্ভট মৌলিকত্ব, গোপন ও লজ্জাকর বিষয়ের নির্বিকার উদ্‌ঘাটন ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যঙ্গরচনা এত সরস ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্যঙ্গকারের পক্ষে যে ভূয়োদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি, সুগভীর জ্ঞান ও প্রদীপ্ত বৈদগ্ধ্য থাকা প্রয়োজন সে-সব লেখকের যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়াই তাঁহার ব্যঙ্গ এত প্রখর ও মার্জিত হইতে পারিয়াছে।

সজনীকান্তের ব্যঙ্গকবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই প্যারডি অর্থাৎ অনুকরণ-কবিতাগুলির নাম উল্লেখ করিতে হয়। প্যারডিগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। যে-সব রচনা জনসাধারণের মধ্যে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে শুধু কেবল সেগুলি লইয়াই প্যারডি রচনা করা সম্ভব। প্যারডি লেখক উহাদের ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি অবিকৃত রাখিয়া উহাদের মধ্যে তুচ্ছ ও হাল্কা বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন। পাঠকগণের চিত্তে আসল রচনার সঞ্চিত সংস্কার ঐ ধরণের বিষয়বস্তুতে

রূঢ় আঘাত পায় এবং তাহাতেই হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়। সেজন্য আসল বিষয়বস্তুর সহিত প্যারডির বিষয়বস্তুর যত ব্যবধান হয় হাস্যরস ততই প্রবল হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রসিদ্ধ কবিতা যথা, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে, আজি হতে শতবর্ষ পরে, অশকে কুসুম না দিয়ো, ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে, ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, শুধু অকারণ পুলকে ইত্যাদি লইয়া সজনীকান্ত প্যারডি রচনা করিয়াছেন। সোনার তরীর অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন মানের তরী, যথা—

ভবনে গরজে প্রিয়া নাহি ভরসা—
কথন ঝরিবে জানি মান—বরষা—
করে বুঝি করে তাড়া,
রাশি রাশি ভারা ভারা
বরষিয়া গালিধারা খর—পরশা।
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে নাহি ভরসা।

—পৃঃ ১৬০ ॥

'বলাকা'র চঞ্চলা কবিতার প্যারডি করিলেন গদি নাম দিয়া—

হে প্রাচীন গদি,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব তল—
ছারপোকা দলে দল
চলে নিরবধি,
কামড়ে শিহরে কায়া, মারিবারে যাই রুদ্রবেগে,
ছিদ্রহীন খাটিয়ার কোন্ ফাঁকে যায় যেন ভেগে,
চুপ ক'রে বসি যবে, উঠে জেগে,
রহি রহি তীব্রগন্ধ পশে নাসিকার রন্ধ্রপথে,
জমে-যাওয়া তুলারাশি হ'তে—
খাঁজে খাঁজে উল্লাসে বিহরে—
থরে থরে
ধাড়িবাচ্ছা ডিম্ব যত
কর্বূরের মত।

॥ অঙ্গুষ্ঠ ॥

পত্র নামক কবিতাটির কিছু অংশে অলকে কুসুম না দিয়ো কবিতার যে প্যারডি করা হইয়াছে তাহা বিশেষ কৌতুকপ্রদ—

অলকে কল্‌প না দিয়ো—
খোঁপার ফাঁদ না ফাঁদিয়ো—
দন্তবিহীন শুষ্ক বদনে
ফোকলা কান্না কাঁদিয়ো।
সাড়ীর আঁচলে দোক্তা ও চূণ
সযতনে প্রিয়ে বাঁধিয়ো!

প্যারডি কবিতাগুলির মধ্যে কৌতুকরসসৃষ্টি ছাড়া যে-সব কবিতার প্যারডি করা হয় উহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষও বিদ্যমান থাকে। রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক ও গূঢ় ভাবাত্মক কবিতাগুলির প্রতি সজনীকান্তের মনোভাব কিছু বিদ্রূপমিশ্রিত ছিল বলিয়াই তিনি উহাদের লইয়া প্যারডি রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য প্যারডির নিছক আমোদপ্রিয়তাও যে তাঁহার রচনার প্রেরণা উৎস ছিল না তাহাও নহে।

সজনীকান্তের কতকগুলি কবিতা নিছক কৌতুকরসের পর্যায়ে পড়ে। ঐ কবিতাগুলির অনেকগুলিই নানা ভোজ্যবস্তু লইয়া রচিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় তিনিও যে বিশেষ ভোজনরসিক তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ কবিতাগুলিতে। মোরগের কালিয়া ও কাটলেটের প্রতি তাঁহার সতৃষ্ণ অনুরাগ, ঢাকাই পরোটার রস-আস্বাদনা, গোল আলুর মহিমা-কীর্তন, বেগুনের গুণবর্ণন, আলু ও পিঁয়াজের কথোপকথন ইত্যাদি বিষয় তাঁহার কবিতার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুক-রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। অশেষ কবিতার প্যারডি অভুক্ত নামক কবিতাতেও নানা রসনা-রোচক খাদ্যবস্তুর সরস বিবরণ রহিয়াছে, যথা—

লুচি ও বেগুন ভাজা আছে মালদহী খাজা
ইলিসের ডিম
কপির ডালনা আছে হয়েছে ত দ'য়ে মাছে
এতক্ষণ হিম!
রাবড়ী সন্দেশ দই ভেজেছে যশুরে কৈ
আছে দরবেশ
ফলমূল আছে কিছু এক প্লেট জন-পিছু;
বেশ ভায়া বেশ!

মানবজীবনের সুকোমল ও সুগভীর ভাবগুলিই ব্যঙ্গকারের দৃষ্টিতে অত্যন্ত তরল ও হাস্যাস্পদরূপে দেখা দেয়। সৌন্দর্য ও প্রেম হৃদয়ের অনুভূতির সামগ্রী। ইহাদিগকে যদি হৃদয়ের জগৎ হইতে বুদ্ধির জগতে স্থানান্তরিত করা যায় তবে ইহারা অনুভূতির পরিবর্তে অনেক স্থলেই কৌতুক উদ্রেক করিবে। বার্গসোঁ বলিয়াছেন যে, ভাবাবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই মানুষের গম্ভীর আচরণ কৌতুকজনক বলিয়া বোধ হইবে।[১] সজনীকান্তও শাণিত বুদ্ধির ঝলসানো আলোকে এই প্রেম ও সৌন্দর্যজগতের সব মায়া ও রহস্য দূর করিয়া উহাদের হাস্যকর দিকগুলিই প্রকটিত করিয়া তুলিলেন। কবিরা বর্ষার রূপে আকুল হইয়া বিরহের কাব্য লেখেন। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া আমাদের ব্যঙ্গপ্রিয় কবি লিখিলেন—

আমরা যেথায় দেখি কাদা, তোমরা দেখ পঙ্কজে
ফাটা ঘবেই গড়ছ মিনার তাজ—
হাজা পায়ে গিন্নী চটেন বোঝেন না তার মর্ম যে
মেঘে নয়ক চক্ষে তাঁহার বাজ।
হায় পুরাতন! বনের মাঝে সিমেণ্ট করা পথ বেয়ে
অভিসারিকা চলত অভিসারে
রহিম চাচার দল ছিল না আগলে ঘাঁটি পথ চেয়ে—
পুলিশ রোঁদে ফিরত নাত হারে।

॥ বর্ষাবিরহ—অঙ্গুষ্ঠ ॥

'কেডস ও স্যাণ্ডালে'র বর্ষার কাব্য নামক কবিতাতেও কবি বর্ষাদিনের তুচ্ছ ও বাস্তব ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া বর্ষার রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের প্রতি শ্লেষাত্মক ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমাজের তরুণ-তরুণীদের রোমাণ্টিক ভাববিলাসী প্রেমের প্রতি সজনীকান্তের বিদ্রূপ অতিশয় তীব্র ও ঝাঁঝালো। অবাধ মিশ্রণের ফলে প্রেম কিরূপ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সন্তর্পিত পথ করিয়া লয় তাহার অনেক বর্ণনা তিনি

১। Should we not see many of them suddenly pass from grave to gay, on isolating them from the accompanying music of sentiment? To produce the whole of its effect, then, the comic demands something like a momentary anesthesia of the heart. Its appeal is to intelligence, pure and simple.

—Laughter—Bergson.

দিয়াছেন। কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল নামক কবিতাটির কথা প্রথমেই মনে আসিবে। অবশ্য কবিতাটির পরিণতিতে বিয়োগবেদনার করুণ সুর আসিয়া পড়িয়াছে, তবে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া যেভাবে কবি শুধুমাত্র পা ও পাদুকার বর্ণনা দিয়া শ্লেষবিদ্ধ, কৌতুককাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ রসাল ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। 'কেডস ও স্যাণ্ডালে'র প্রতীক্ষায়, প্রাইভেট টিউটর, বিবাহের চেয়ে বড় ইত্যাদি এবং 'অঙ্গুষ্ঠ' কাব্যের হে অসূর্যম্পশ্যা তুমি অমাবস্যা মোর, প্রতীক্ষা, শেড রোড, ছাদবিহার ইত্যাদি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফাটা ফুসফুসে আমি আর হুতো চোপসান কাশি কাশি, কাঁটা ফোটা ইত্যাদি কবিতায় প্রেমের বিপাক ও বিপত্তির দিকটিই শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। কাঁটা ফোটা নামক কবিতায় বলা হইয়াছে—

কমল নিয়ে খেলতে গিয়ে ফুটল হাতে কাঁটা,
দেখনু শুধু মৃণালবাহু দেখিনি হায় ঝাঁটা!

সমাজ ও সাহিত্যের আবেগতরল প্রগতিবিলাসের প্রতি কবির বিদ্রূপ অনেক স্থানেই নির্মম হইয়া উঠিয়াছে। এসেছে নামক কবিতাটিতে কবি বলিলেন—

এসেছে তরুণ এসেছে নূতন ভরসা,
পতিত অতীত—বৃদ্ধের আশা ফরসা!
এসেছে তরুণ, ক্নুট হামসুন ধরমী,
Pan-Hunger মরমী!
এসেছে নবীন মৃত ও অতীতে দলিয়া,
বেদনা-অশ্রু দুই চোখে ছলছলিয়া—
এসেছে, তরুণ এসেছে,
শাড়ী ও সেমিজে পথে পথে ভালবেসেছে।

॥ অঙ্গুষ্ঠ ॥

আধুনিক কবি ও কবিতার বিদ্রোহী ভাব ও ছন্দের প্রতি সজনীকান্ত অনেক স্থানেই ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়াছেন। নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি কবির প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। নজরুলের বিপ্লবাত্মক কবিতার ভাব ও ভাষা ব্যঙ্গ করিয়া কাব্যি-ঝড় নামক কবিতায় সজনীকান্ত লিখিলেন—

ছন্দের কল্লোলে জাগে কেশের নর্তন ফর ফর—
বহিছে কাব্যের মহা ঝড়।
স্বজনের সুখে ঝরে আঁসু বন্যা ঝর ঝর ঝর,
ধর ধর ধর মোরে সখি তোরা ধর ধর ধর।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মোর বি-ভাষার তীক্ষ্ণ শব্দবাণ,
লেখনী-চামুণ্ডা ঢালে উল্কারূপী অগ্নিঅশ্রু
কাব্য-শ্মশ্রু
ভয়ে কম্পমান
[পাঠান্তর—কাব্য-শ্মশ্রু হয় বহ্নিমান]

আধুনিক কবিতার গদ্য ছন্দের প্রতি সজনীকান্ত সমর্থন জানাইতে পারেন নাই, অনেক স্থানেই এই ছন্দের কৌতুকজনক অনুকরণ করিয়া ইহার প্রতি শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'কেডস ও স্যাণ্ডালে'র কুমার অসম্ভব কবিতা হইতে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

পার্বতী কাঁদছে,
কাঁদছে পার্বতীরা।
বাংলার আকাশ বাতাস কিলবিলিয়ে উঠল,
শূন্যে শূন্যে ছুটে গেল একটা বরফ শীতল হাহাকার—
স্পাইনাল কর্ড বেয়ে যেন একটা সিরসিরে স্পর্শ।
চমকে ফিরে চাইল বাংলার পার্বতীরা,
প্রমথেশ পুড়ে ছাই হয়েছে।
তার দেহ-ভস্ম গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে উড়ছে হাওয়ায়,
পার্বতীরা কাঁদছে—
কাঁদুক।
মদনকে চানকে দিয়ে রতি সেই যে কেটে পড়েছে—
মদন বেকুবের মত একা প্যারাগন স্টোর্সে বসে শরবৎ খাচ্ছে,
ভাবের শরবৎ।

পরশুরাম

হাস্যরসসৃষ্টিতে পরশুরামের সমকক্ষ লেখক বর্তমান বাংলা সাহিত্যে আর কেহই নাই। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ভাষাবিৎ, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদক পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু পরশুরাম নামটির সহিত অদম্য কৌতুকরসের এক অবিচ্ছেদ্য ভাবানুষঙ্গ রহিয়াছে। নামটি প্রবাদের মতই আমাদের সার্বজনীন ভাবসংস্কারের সহিত যেন যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কৌতুকরস এত অবারিত ও উতরোল হইয়াও এত সাবলীল ও অনায়াসজাত, উদ্ভাবনীশক্তি এত মৌলিক ও অভাবনীয়, চরিত্রসৃষ্টি এত বাস্তব ও জীবন্ত যে তাঁহার গল্পগুলি প্রত্যেক পাঠককেই অফুরন্ত আমোদে উত্তেজিত করিতে থাকে। পরশুরামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হইল তাঁহার অদলীয় অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গি। (তাঁহার হাসির আঘাত কখনও তীব্র ও কঠোর হয় নাই, এবং সেই আঘাতের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিমত কখনও ধরা পড়ে নাই।) কোথাও শ্লেষের দু-একটি কাঁটা এবং কোথাও বা ব্যঙ্গের ঈষৎ জ্বালাই রহিয়াছে মাত্র, কিন্তু সেগুলির লক্ষ্য বহুবিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী সমাজ চরিত্র।) কচি ও বুড়া, সেকেলে ও একেলে সকলকে লইয়াই তিনি একটু হাস্য পরিহাস করিয়াছেন। সেজন্য সকলেই একটু আধটু ঘা ও খোঁচা খাইয়াছেন বটে কিন্তু কাহারও আপত্তি ও অভিযোগ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

(পরশুরামের কৌতুকরসের অসাধারণ উৎকর্ষের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে, তাঁহার পূর্ববর্তী আর একজন হাস্যরচয়িতার সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। তিনি হইলেন ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়) পরশুরাম যে গল্পগুলিতে অশরীরী ও অপ্রাকৃত চরিত্রের মধ্যে বাস্তব ও সামাজিক চরিত্রের ভাব ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়া উদ্ভট কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলির সহিত ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের অনেক গল্প ও উপন্যাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের মত পরশুরামও একটি আড্ডাধারী পরিবেশ অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ-ক্ষেপণী (flash back) রীতিতে কোন চরিত্রের মুখ দিয়া তাহার কোন অতীত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। খোসগল্প ও আড্ডার পরিবেশ না হইলে হাস্যকৌতুক কখনও জমিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল নিরবকাশ কর্মব্যস্ততার যুগে আলস্য ও অবকাশভরা

সরস আনন্দময় আড্ডা তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া হাস্যকৌতুকের উপাদানও আমাদের জীবন হইতে অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে। পরশুরামের গল্পেই বোধ হয় আমরা শেষবারের মত কর্মতাড়নামুক্ত আষাঢ়ে ও ভুতুড়ে গল্পজীবী রসাল আড্ডার চিত্র পাইলাম। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধর ও মহাদেববাবুর আড্ডার মত বংশলোচনবাবুর আড্ডাকেও আমরা পরশুরামের গল্পে বার বার দেখিয়াছি। সেই আড্ডার লোকগুলির সহিত আমাদের যেন একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। উদারচেতা, বন্ধুবৎসল বংশলোচনবাবু, মজাদার গল্পকার বৃদ্ধ, কেদার চাটুজ্যে, বোঁপাগল উদয় প্রভৃতি চরিত্র উজ্জ্বল রেখায় আমাদের মনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

(পরশুরামের প্রবলতম কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ভট ও অপ্রাকৃত পরিবেশে রচিতগল্পগুলিতে। 'গড্ডলিকা'র ভূশণ্ডীর মাঠে, 'কজ্জলী'র জাবালি; 'হনুমানের স্বপ্নে'র মহেশের মহাযাত্রা, প্রেমচক্র; 'ধুস্তরী মায়া'র দুই বুড়োর রূপকথা, ভরতের ঝুমঝুমি, রেবতীর পতিলাভ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট, ষষ্ঠীর কৃপা; 'গল্পকল্পে'র গামানুষ জাতির কথা, রামরাজ্য, তিন বিধাতা, চিরঞ্জীব এবং 'কৃষ্ণকলি'র জটাধর বকশী, বালখিল্যগণের উৎপত্তি ইত্যাদি গল্পের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপরিউক্ত গল্পগুলিতে লেখক কোন অশরীরী ভূতপ্রেতের ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করিয়া নিতান্ত অদ্ভুত কোন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, অথবা পৌরাণিক কোন ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখ করিয়া স্বকল্পিত কোন মৌলিক গল্পরস জমাইয়া তুলিয়াছেন। লেখকের উর্বর উদ্ভাবনীশক্তি হইতে এমন আত্যন্তিক উদ্ভট ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে যেগুলি আমাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উপর অতর্কিত রূঢ় আঘাত হানিয়া আমাদের অদম্য কৌতুকবৃত্তিকে অকস্মাৎ উত্তেজিত করিয়া তোলে।[১]

শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামীর ডবল ত্র্যহস্পর্শ যোগ, প্রেমচক্রে রাহুর মাখন মাখিয়া পূর্ণচন্দ্রকে একটু কামড় দেওয়া এবং গরম গরম সূয্যি খাওয়া যমপুরীতে তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভের মধ্যে দেবতা মুনিঋষি প্রভৃতির জীবন্ত সিদ্ধ হওয়া, মেনকার দেওয়া ভরতের ঝুমঝুমি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান হইবার পর দুর্বাসার দাড়ি হইতে বাহির হওয়া, বলরামের স্ত্রী রেবতীকে লাঙ্গল দিয়া টানিয়া ছোট করা আবার পা ধরিয়া

১। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য।'

টানিয়া বড় করা, পক্ষী ও জটিরামের কাটা মুণ্ডেরও বাঁচিয়া থাকা এবং পুনরায় জটিরামের ধড়ে পক্ষীর মুণ্ড ও পক্ষীর ধড়ে জটিরামের মুণ্ড লাগাইয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করা, অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান গামানুষ জাতির অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ, পাঁচহাজার পাঁচশ পঞ্চাশ বছরের লংকুস্বামী কর্বুরঙ্গ রেড্ডির চিত্তচমকানো জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি পড়িবার সময় কৌতুকের নির্দয় আঘাতে দেহ ও মন ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত জগৎকে যথাযথ রাখিলে কোন কৌতুকের উদ্রেক হয় না, ঐ জগৎকে যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক জগতের পাশাপাশি রাখা হয়, যখন দুই জগতের মধ্যে আমাদের মন দ্রুত ও অতর্কিতভাবে গমনাগমন করিতে থাকে তখনই কৌতুকপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। তেমনি সূক্ষ্ম ও অশরীরী সত্তাকে যথাযথভাবে দেখাইলেও তাহারা আমাদের ভয় ও রহস্য উৎপাদন করে, কিন্তু উহাদিগকে স্থূল ও শরীরী মানবের ন্যায় দেখাইলে উহারা কৌতুক উদ্রেক করে। ভৌতিক জগতের মধ্যেও যখন শিবু, কারিয়া পিরেত, যক্ষ ও নৃত্যকালীর মানবীয় স্বভাব ও আচরণ দেখি তখনই সে সব আমাদের কাছে কৌতুকপ্রদ মনে হয়। বদনচৌধুরীর শোকসভায় যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা দুই ভূতের দ্বারা চালিত হইয়া জোরাল বক্তৃতা সুরু করিয়া দেয় তখনই আমরা ভুতুড়ে কাণ্ড দেখিয়া মজা পাই। লেখক অবান্তর ও অবিশ্বাস্য ঘটনার অবতারণা করিয়া প্রবল কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, ঐ ঘটনার কোন বাস্তববুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা কিংবা ভাষ্য তিনি দিতে চাহেন নাই। বাস্তব কার্যকারণসূত্রের প্রতি তিনি অনেক স্থলেই নির্বিকার ও সাহসিক ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। সেজন্য অনেক সময়েই তাঁহার গল্প পড়িয়া আমরা বিস্মিত হতভম্ব হইয়া যাই। মহেশ সত্যই ভূত কিনা, বালখিল্যদের উৎপত্তির কথা সত্য কিনা, লংকুস্বামী রেড্ডির জীবনবৃত্তান্ত কতখানি বিশ্বাস করা চলে, জটাধর বকশী যথার্থই ভূত হইয়াছিল কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আসিয়া অনবরত আমাদের মনে ভিড় করিতে থাকে। সন্দেহ হয়, লেখক কি আমাদের মনকে সেই রামায়ণ-মহাভারত ও রূপকথার জগতে লইয়া যাইতে চান? আসলে লেখক অবাস্তব ও অবিশ্বাস্যের রহস্য ভেদ না করিয়া আমাদের সহিত সূক্ষ্ম রসিকতা করিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধি ও বিচারের সূত্র লইয়া ঘটনাগুলিকে গ্রথিত করিতে আমরা যত ব্যর্থ হই, ততই তিনি মজা বোধ করিয়াছেন।

বাস্তব সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও লেখক অনেক স্থলে অদ্ভুত কৌতুককর

ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিকিৎসা সংকট, লম্বকর্ণ, পরশ পাথর, দক্ষিণরায়, নিরামিষাশী বাঘ, স্বয়ংবরা, কচিসংসদ ও উলটপুরাণের নাম করা যাইতে পারে।) ঐ গল্পগুলিতে অতিরঞ্জন ও বুদ্ধিভ্রংশকারী অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশদ্বারা কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। হরেক রকম চিকিৎসকের হাতে সুস্থশরীর নন্দর নাস্তানাবুদ হওয়ার বৃত্তান্ত, সর্বভুক লম্বকর্ণের ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, ষ্টীলের করতাল ইত্যাদি নিঃশেষে হজম করার কাহিনী, পরশ পাথরের দৌলতে ভুবনবিখ্যাত হইবার বর্ণনা, বকুলালের ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিবার কৌতুককরুণ বিবরণ, ভারত-অধিকৃত ইউরোপের জাতীয় আন্দোলনের পরিচয় প্রভৃতি পড়িবার সময় কৌতুকের আঘাতে অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। লেখক সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে কোন সীমারেখা রাখেন নাই, ধনুকের জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া কৌতুকের বাণ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

লেখকের আর একপ্রকার গল্প আছে যেখানে হাস্যরস প্রবল ও উচ্ছ্বসিত নহে, মৃদু ও ঈষৎ-স্ফুরিত। এই শ্রেণীর গল্পে কাহিনী সম্ভাব্য বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে নাই এবং অনেক স্থলেই প্রেম অথবা অন্য কোন প্রকার সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি কাহিনীকে আশ্রয় করিয়াছে। উপেক্ষিতা, রটন্তীকুমার, রাজভোগ, কৃষ্ণকলি, বরনারীবরণ, নরলাক্ষ হোম, আতার পায়েস প্রভৃতি গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসিবে। এই সব গল্পে পরশুরামের স্নিগ্ধ-কোমল হিউমারের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সশব্দ অট্টহাসির উত্তেজক উপাদান নাই কিন্তু একটি প্রীতিপ্রদ ও উপভোগ্য রসের মধুর আস্বাদনা রহিয়াছে। কৃষ্ণকলি গল্পের কথক দাদু নিশ্চয়ই লেখক স্বয়ং—সরল স্নেহশীল উদারচিত্ত সেই বৃদ্ধ লোকটি। বরনারীবরণের মধ্যেও যে রসিক ও প্রীতিমান বৃদ্ধটিকে দেখিয়াছি তাহাকেও কখনও ভোলা যায় না। রটন্তীকুমার, আতার পায়েস প্রভৃতি গল্পের প্রীতিপ্রসন্ন রসিকতাও আমাদের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

(পরশুরামের শ্লেষ ও ব্যঙ্গমূলক গল্পগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, মহাবিদ্যা, বিরিঞ্চি বাবা, কচিসংসদ, রামধনের বৈরাগ্য, রামরাজ্য প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।) অবশ্য লেখকের শ্লেষ এত তীক্ষ্ণ নহে যে হাসির অন্তর ছিন্ন করিয়া দেয় এবং তাঁহার ব্যঙ্গও এত নির্মম নহে যে আমাদের মনে এক গ্লানিকর জ্বালা ধরাইয়া দিতে পারে। সামাজিক জীবনের ভণ্ডামি, জ্যাঠামি ও ন্যাকামি লইয়া তিনি একটু আধটু খোঁচা দিয়াছেন বটে কিন্তু

তাঁহার প্রসন্ন পরিহাসপ্রিয়তা ম্লান হয় নাই। ধর্মের নামে জুয়াচুরি ও প্রবঞ্চনা যাহারা চালায় তাহাদিগকে আঘাত করিয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, মহাবিদ্যা, বিরিঞ্চি বাবা ইত্যাদি গল্প লেখা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল বিরিঞ্চি বাবা গল্পটি। বিরিঞ্চি বাবার ভণ্ডামি অতি নিখুঁত, পরিপাটি ও নিপুণ কৌশলপূর্ণ। বিশ্বাসী ভক্তগণের ভক্তি ও আনুগত্য অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিবার দক্ষ ক্ষমতা তাঁহার আছে। এই ধরণের ভণ্ড ও প্রতারক চরিত্রের প্রতিও কিন্তু লেখকের কোন অতিশয়িত বিদ্বেষ নাই। সেজন্য ধরা পড়িবার পরও বিরিঞ্চি বাবার প্রতি কোন কঠোর শাস্তি বিধান তিনি করেন নাই। কচি-সংসদের মধ্যে রবীন্দ্রযুগের মেয়েলিভাবাপন্ন রোমান্টিক ভাববিলাসী তরুণদের প্রতি শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে। দক্ষিণ রায়, রামরাজ্য প্রভৃতি গল্পে রাজনৈতিক ভোটাভুটি ও নানা দল ও মতবাদ সম্বন্ধে লেখকের শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রগতিবাদী ও উন্মার্গবাদী সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি বিদ্রূপমিশ্রিত আঘাত বর্ষিত হইয়াছে রাতারাতি, রামধনের বৈরাগ্য প্রভৃতি গল্পে।

পরশুরামের হাস্যরস প্রধানত ঘটনাগত হইলেও স্বল্পপরিসর এবং পরিমিত কথার মধ্য দিয়া তিনি এমন কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেগুলি চির-জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই যশুরে কবিরাজ তারিণী, বৈজ্ঞানিক গবেষক ননী, ফরিদপুরী মৌলবী বছিরুদ্দি, সার্থকনামা রটন্তীকুমার, স্বাধীন প্রগতিবাদিনী জিগীষা দেবী এবং তাহার ভীত ও অনুগত স্বামী সুষেণ প্রভৃতি চরিত্র কখনও ভোলা যায় না। অনেকস্থলে চরিত্রগুলির অদ্ভুত নামকরণের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, যথা—গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, হাজিফউল মুলুক বিন লোকমান নুরুল্লা গজল ফরুলা অল হাকিম য়ুনানী, লুটবেহারী-গাঁট্টালাল-গবেশ্বর, শিহরণ সেন-বিগলিত ব্যানার্জী-অকিঞ্চিৎকর-হুতাশ হালদার-দোদুল দে-লালিমা পাল (পুং), চুকন্দর সিং, গামানুষ, গবর্ষি, বিপুলা মল্লিক, জিগীষা দেবী ইত্যাদি।

পরশুরামের হাস্যরসের একটি প্রধান উৎস হইল তাঁহার নিজস্ব নানা সরস মন্তব্য ও চমৎকারিত্বপূর্ণ টীকাটিপ্পনী। অনেক স্থানে তিনি এমন ধারাল উক্তি ও সংক্ষিপ্ত অথচ বিপর্যয়কারী মন্তব্য করিয়াছেন যে আমাদের হাস্যরস আকস্মিক বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভাষার উপর অপ্রতিহত অধিকার এবং বিচিত্র বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের ফলেই এরূপ হাস্যোদ্দীপক রচনা সৃষ্টি করা

তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার অনেক উক্তি তো প্রবাদের মতই আমাদের নিত্যব্যবহৃত সাধারণ ভাষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তারিণী কবিরাজের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি তো পরিহাসচ্ছলে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি, 'হয় Zানতি পার না'। স্বয়ংবরা গল্পটিতে চাটুয্যে মহাশয়ের নানা মন্তব্য অত্যন্ত কৌতুকজনক হইয়া উঠিয়াছে। মেমের বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'মুখ খানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা···পরনে একটি দেড়হাতী গামছা।' মেমের হাসিও তিনি বর্ণনা করিলেন, 'ফিক ক'রে হাসলেন, পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল, ঘাড় নেড়ে বললেন—গুৎ মর্ণিং।' মেম তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া চাটুয্যে মহাশয়ের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আই কেদার চাটুয্যে, নো জু-গার্ডেন।' পরিশেষে চাটুয্যে যে ভাষায় মেমকে আশীর্বাদ করিলেন তাহাও বেশ অভিনব, 'মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক।' মুন লাইট ভিলায় কচিসংসদের গানের বর্ণনা দিতে যাইয়া লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, 'গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম এক অচেনা অজানা অচিন্তনীয়া অরক্ষণীয়া বিশ্বতরুণীর উদ্দেশ্যে কচিগণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে।' উলট পুরাণের উড়িয়া সার্জেণ্ট ইংলণ্ডের জাতীয় নেতাদের শাসাইয়া যাহা বলিয়াছে তাহা পুলিসের ভাষার মধ্যে বোধ হয় অদ্বিতীয়, 'এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব ত ডণ্ডা খিব।' হরেক রকম ভাষার মিশ্রণ করিয়া পরশুরাম তাঁহার রচনাকে অত্যন্ত সরস করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দীভাষীর মুখে বাংলা যে কিরূপ অদ্ভুত হইয়া উঠে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি গণ্ডেরি বাটপারিয়া, অবধবিহারীলাল প্রভৃতির মুখে। সংস্কৃত, প্রাকৃত বাংলা ভাষার এক অদ্ভুত খিচুড়ি আমরা পাই জাবালি গল্পের হিন্দ্রলিনীর ভাষায়। ঘৃতাচীর প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সে বলিয়াছে, 'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচি, তোর আস্পর্দ্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস। আর ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে'। লেখক তথাকথিত সমালোচকদের অন্তঃসারশূন্য অথচ বড় বড় শব্দের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষাকেও নিষ্কৃতি দেন নাই। রাতারাতি গল্পের নেড়ি এক জাপানী কবি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য, 'এই লেখার কেমন একটা ঔদরিক ঔদার্য, যেন একটা হৃষ্ট হ্রেষা—ভারী অবাক লাগে

কিন্তু।' যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট নামক গল্পে পঞ্চীর মুণ্ড জটিরামের ধড়ে এবং জটিরামের মুণ্ড পঞ্চীর ধড়ে জোড়া লাগিবার পর কি যে অঘটন ঘটিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে গল্পটির সরস উপসংহারে, 'পঞ্চী তার মস্কিউলার মদ্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।'

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের চলমান জীবনের ফাঁকে ফাঁকে রসের মণিখণ্ডগুলি লুকাইয়া থাকে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে না। কিন্তু যিনি সেই মণিখণ্ডগুলি সুপটু হস্তে মার্জিত করিয়া প্রকাশ্য আলোকে তুলিয়া ধরিতে পারেন তিনিই তো যথার্থ রসিক। আমাদের বিশেষত্বহীন গতানুগতিক জীবনকে তিনি এমন এক বক্রভঙ্গিতে প্রকাশ করেন যে সেই জীবনের লুক্কায়িত ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলি এক হাস্যমধুর রূপ লইয়া আমাদের চোখে দেখা দেয়।

(এই রকম রসিক হইলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবন সম্বন্ধে যে বহুল অভিজ্ঞতা ও অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেষ্ঠ রসিক লোকের অবলম্বন সেগুলি কেদারনাথের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু তাঁহার রসিকতার প্রকাশ-রীতি ছিল একটু বিশিষ্ট রকমের। মানুষের রহস্যঘন জীবনের তলদেশে ঘটনার পাকে পাকে যে রস জড়াইয়া আছে তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের ঘটনার কোন জটিল ও অবিচ্ছিন্ন গতি নাই। তাঁহার চিত্রগুলি অতি চমৎকার। কিন্তু এই চিত্রগুলি পরস্পর-সংলগ্ন হইয়া যে একটি অবিচ্ছিন্ন রসপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে তাহার অভাব আছে তাঁহার সাহিত্যে। কেদারনাথ মানুষের জীবনের সমগ্র পরিচয়ের প্রতিও উদাসীন। পথ চলিতে যেটুকু তাঁহার চোখে পড়িয়াছে সেটুকু দেখাইয়াই তিনি সন্তুষ্ট। নিপুণ চরিত্র-স্রষ্টার ন্যায় চরিত্রের আলো আঁধারের সামগ্রিক দিকটি তিনি পরিস্ফুট করিতে চাহেন নাই। সেজন্য তাঁহার রসের উৎস চরিত্রের গভীর মূলে নহে। (সেই উৎসস্থল প্রধানত তাঁহার মুখের কথায় ও ক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশে।)

আমাদের সমাজের প্রাণখোলা, মজলিসী ও দিলদরিয়া লোকের প্রতিনিধি হইলেন কেদারনাথ। আজিকার এই ব্যস্ত ও দ্রুতগতিশীল সমাজে তাঁহার মত লোক বিরল হইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু একদিন অবকাশময় মন্থর সামাজিক জীবনে এরূপ লোকের কদর ছিল। তখনকার কর্মবিরল মুহূর্তগুলি তাম্বুল ও তামাকের সহযোগে মানুষের যে সরস প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিত আজিকার দিনে তাহা নিতান্তই দুর্লভ হইয়া আসিয়াছে। কেদারনাথ বিগত দিনের সেই সর্বজনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, আলাপচারী ব্যক্তিটি—পলিতকেশ, চলিতকলম দাদামহাশয়। তাঁহার রঙ্গ ও ব্যঙ্গগুলি সর্বত্রই একটি প্রীতিসুন্দর দৃষ্টি দিয়া

আমরা গ্রহণ করি এবং তাঁহার স্মৃতিসিক্ত কথাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার যে পরিহাসরসিক মমতা-করুণ সত্তাটির সাক্ষাৎ পাই তাহার সঙ্গে এক গভীর আত্মীয়তা-সূত্রে আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি।

কেদারনাথের হাস্যরস জমিয়া উঠিয়াছে তাঁহার কথার রকমারি সাজগোজ ও ভাবভঙ্গিতে। কথাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, বাঁকাইয়া ও মোচড় দিয়া এমনভাবে তিনি খাড়া করিয়াছেন যে, তাহা আমাদের কানের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে যাইয়া সুড়সুড়ি দিতে থাকে। একদিকে বিষম ও বিরোধের খোঁচা ও অন্যদিকে Pun ও Paradox এর গুঁতা—ইহার ফলে তাঁহার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমাদের অবারিত কৌতুকের অর্গল খুলিয়া যায়। কথার ক্রীড়াক্ষেত্র বাড়াইয়া দিবার জন্য তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজীর বিকৃতির ফলে কিরূপ হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার একটু পরিচয় 'আই হ্যাজ' নামক উপন্যাস হইতে দেওয়া যাক—

হরগোবিন্দবাবু বিচক্ষণ Subjudge ছিলেন—রায় বাহাদুর। ছেলে ননীগোপাল English-এ এম-এ—First class First.

—ছোটলাট সাহেব আসায়, ছেলেকে সঙ্গে ক'রে interview-এ গেলেন। প্রথমে নিজে ঢুকে ভূমি স্পর্শ ক'রে সেলামান্তে জানালেন—আপনাদের কৃপায় ছেলে এবার এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে 1st Class 1st হয়েছে। সে সঙ্গে এসেছে হুজুরের কাছে Deputy mountainship এর জন্যে ভিক্ষা প্রার্থী। লাটসাহেব ছেলেকে দেখতে চাইলেন। সে দোর গোড়াতেই ছিল। বাপের কথা তার কানে যাচ্ছিল আর ভ্রূ-নাক মুখ বিষম কোঁচকাচ্ছিল—হরগোবিন্দবাবু তাকে ডেকে এনে লাটকে দেখিয়ে বললেন—

—It is I son Sir.

লাটসাহেব বললেন—It is you son Haragobind, —very very good. I shall see—he gets Deputy mountainship.

হরগোবিন্দ সেলাম করে বললেন—'You see' and our 'done' same thing my Lord.

ছেলে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে লাল মারছিল আর ঘামছিল। বেরিয়ে এসে বাঁচলো। তার রুষ্ট বিরক্ত মুখ দেখে বাপ বললেন—

যদি হয়তো ওই I son-এই হবে। তুই তোর ছেলের বেলায় my son বলিস। তাতে চাপরাসিগিরিও জুটবে না।'

কেদারনাথ বহুদিন প্রবাসে ছিলেন, সেজন্য তাঁহার লেখায় হিন্দী বাক্যের প্রচুর আমদানী হয়েছে। বাঙালীর অনভ্যস্ত মুখে হিন্দী বাক্যের যে কিরূপ বিকৃতি হয় তাহার অনেক সরস দৃষ্টান্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার সাহিত্যে। দাদার দুরভিসন্ধি নামক গল্প হইতে একটু নিদর্শন দেওয়া যাক। শশীর বৌদি তাহাকে হিন্দুস্থানী চাকর ভাণ্টার মাইনের হিসাবটা করিতে বলিয়াছেন। শশী মুখে বড়াই করিলেও হিসাব মিলাইতে মহা ফাঁপরে পড়িল। ক্রমে ক্রমে তাহার এক ভাণ্টা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ভাণ্টা চাকরী ছাড়িল এবং তাহাও আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলায়—এমন মুস্কিলেও মানুষকে ফেলে! লেখকের বর্ণনাই শুনুন—

'বাইরে পা বাড়াতেই বারান্দায় ভাণ্টাকে দেখে প্রাণটা বিগড়ে গেল। এখানে কলেরায় এত লোক মরছে, আর এ বেটা! কিরে ভাণ্টা আসা হায় কেত্তা খন? এই তোমার কথাই ভাবতা থা—গরিব লোকের এক পয়সা না যায়। কিন্তু যো দিনমে কোই গরু জরু নেই ছোড় দেতা, আর তুমি কি বোলকে নোকরি, যা গরু জরুকা বাবা বললেই হয়, সেটা ছেড়ে দিলে? হিন্দুকা বাচ্চা একটু শাস্ত্রজ্ঞান তো থাকা উচিত—'

কেদারনাথের উক্তি ও বর্ণনার মধ্যে যে হাসির উচ্ছ্বাস আছে তাহা মাঝে মাঝে উতরোল হইয়া উঠিলেও ঘটনা ও চরিত্রের কোন উদ্ভট বিপর্যয় সাধারণত আশ্রয় করে না। মাত্র দুই একটি জায়গায় তাঁহার প্রবল কৌতুকরস অতিরঞ্জিত বর্ণনায় অবিরাম কেলিমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ একটি দৃষ্টান্ত হইল দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি নামক গল্পটি। জমিদার চৌধুরী মহাশয় হাল আমলের সব বইয়ের তেমন খোঁজখবর রাখেন না। তাঁহার পেয়ারের নাতি ইন্দু তাঁহাকে দুর্গেশনন্দিনী শুনাইতে আসিয়াছে—

'ইন্দু যেই বলেছে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ—চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন, চোখ বুজেই বলে উঠলেন বাস করো—গলতি হায়। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনও হতে পারে না। এই সব বই লেখা! মানসিংহ লোকটাই বা কে, কার পুত্র, কাদের দরোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে? তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন যে, সবচিন লোক, আবি কেটে দাও। লেখ ওলসিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচুসিংহ, তেকার পুত্র ঘেঁচুসিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও পাড়ার মেনকা ঠানদি মেয়েমানুষ হলে কি হবে—সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও

এসব জ্ঞান আছে। নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী। খুঁট ধরলেই তিনপুরুষ আপ্‌সে বেরিয়ে আসে, বই কি লিখলেই হল!'

(কেদারনাথের হাসিতে যে হুল আছে তাহা বিদ্ধ হইয়াছে মিথ্যা মেকি ও মর্কটের অন্তরে।) মানুষের প্রতি তাঁহার স্নেহ রহিয়াছে বলিয়াই মানুষের বিকৃতি তিনি মাঝে মাঝে নিন্দা না করিয়া পারেন নাই। অবশ্য সে-নিন্দার কাঁটা হাসির কমলের সঙ্গে মিশিয়া আছে, কিন্তু কমল তুলিতে গেলে দু'একটা কাঁটার খোঁচা যে হাতে লাগিয়া যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রবাসী লেখক বাঙালী সমাজের বিচিত্ররূপ রঙ্গব্যঙ্গের রসানে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইলেন তাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' নামক কাব্যগ্রন্থে। যুবাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন—

সেই ফ্যাশানের চুল ছাঁটা—সেই অলষ্টার বুকে,—
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে,—
হাতে ছড়ি চশমা পরা চোস্ত মোজা পায়—
যুবা যত চিমনির মত ধোঁ ছেড়ে বেড়ায়।
পাশ দিয়ে যাও শুনতে পাবে—তিন ভাগ ইংরাজী,
বুঝতে পাবে মানে তার—বহু ঘসি মাজি।
ব্যাকরণ বিভীষিকার হরদম বিষম লাগে,
ইংরাজের বীণাপাণি বেগ পার্ডন মাগে।

অবশ্য যুবতীদেরও তিনি বাদ দিলেন না—

আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বসে উল,
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল।
নভেলে নিমগ্ন কেউ, কেউবা খেলেন তাস,
কেউবা নিয়ে থাকেন শুধু নির্জ্জলা বিলাস,
করেন বটে তাতে তাঁরা একটা উপকার—
তুষ্ট আর পুষ্ট হন বদ্দী ও ডাক্তার।

কাশীতে মা বাপকে পাঠাইয়া অনেক ছেলে বৌ বেশ মজায় দিন কাটান আর দুঃখের জলে মা বাপের চোখ ভাসিতে থাকে, এই বর্ণনার মধ্যে ক্রোধের সহিত কারুণ্য মিশিয়াছে—

এটাও দেখতে পাবেন হেথা বিরল নয়ক সেটা,
পাপ এড়াতে মা বাপকে কাশী পাঠিয়ে বেটা—

দুচার মাস দিয়েই কিছু, তার পরেতেই চুপ,
দেশে কিন্তু ফুলকপি আর ফজলী চলে খুব।
এখানেতে বুড়োবুড়ী ভিক্ষে করে খায়,
সকাল সন্ধ্যে ছেলের তবু—মঙ্গলটা চায়!

কেদারনাথের লেখার মধ্যে এই কারুণ্যের সুর বড় স্পষ্ট। মাঝে মাঝে তাঁর লেখা পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি বুঝি হাসির অপেক্ষা কান্নার কথাই বেশি বলেন। আনন্দময়ীর দর্শন, থাকো, দূরের আলো প্রভৃতি গল্পের মধ্যে দাদামহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সঞ্চয় হইতে অশ্রুর উৎসমুখ যেন খুলিয়া দিয়াছেন। ধম্মা, ভোলা ও কালী ঘরামীর মত উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবনকেও তিনি এক সর্বব্যাপী সহানুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কারুণ্য তাঁহার সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কৌতুক ও কারুণ্যের মিশ্রণে—জলভরা মেঘের উপর সাতরঙা ইন্দ্রধনুর বিচিত্র:আলোকসম্পাতে।

হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে বাংলা নাটকের সূচনা হইল তাহা গম্ভীর রসাশ্রিত নাটক ও লঘুরসাত্মক প্রহসন এই দুই ধারায় প্রবাহিত হইল। বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল খুব বেশি এবং এই প্রভাব প্রধানত গম্ভীর রসাশ্রিত নাটকের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। সেজন্য অনুবাদ-যুগের পর যখন নাট্যকারগণ মৌলিক নাটক লেখা সুরু করিলেন তখনও তাঁহারা নাট্যরীতি, ভাষা ও রসসৃষ্টিতে সংস্কৃত নাটকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের পাত্রপাত্রীর ভাব ও আচরণ, কথা ও কাজ অনেকখানি আড়ষ্ট ও কৃত্রিম ছিল। নাট্যকারগণ অনেক যত্ন ও নিষ্ঠা লইয়া তাঁহাদের নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিকে বিশেষভাবে মার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রগুলি সজীব স্বাভাবিকতা লাভ করিতে পারে নাই এবং উহাদের ভাষাও শুধু শেখানো বুলি হইয়াছে মাত্র, প্রাণের বাহন হইতে পারে নাই। রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকগুলি বিচার করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। কিন্তু নাটকের পাশে যদি তখনকার প্রহসনগুলি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহাদের পাত্রপাত্রীগুলি খুবই জীবন্ত এবং তাহাদের ভাষাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার কারণ, প্রহসনগুলির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি কোন দূরস্থিত ভিন্নতর জগৎ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। প্রহসনরচয়িতাগণ যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন তাহাদের কথাই প্রহসনগুলির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রাণবস্তু ও ভাষারূপ অবিকল ও অপরিবর্তিত ভাবে প্রহসনগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রহসনকারগণ লঘু ও প্রশ্রয়শিথিল দৃষ্টি লইয়া প্রহসনগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সেজন্য কল্পনা, সৌন্দর্যবিলাস ও অতিশয়িত সহানুভূতি দ্বারা তাঁহারা প্রহসনগুলির বাস্তব ও স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করেন নাই। সেজন্য ইহা অকুণ্ঠচিত্তে বলা চলে যে, বাংলা নাটকের প্রথম যুগে নাটক অপেক্ষা প্রহসনই অধিকতর প্রাণময় ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তখনকার নাট্যকারগণ আমাদিগকে যেমন নিপুণভাবে হাসাইয়াছেন, তেমন নিপুণভাবে কাঁদাইতে পারেন নাই। এমনকি কাঁদাইবার

উদ্দেশ্য লইয়াও যখন তাঁহারা কোন নাটকের কোথাও একটু হাসির টুকরা ছড়াইয়াছেন তখনই আমাদের চিত্ত স্বস্তির আগ্রহে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন প্রহসনগুলি রচিত হইয়াছিল তখন বাংলার সমাজ নানা প্রকার সামাজিক আন্দোলনের ঘূর্ণ্যাবর্তে আলোড়িত হইতেছিল। শিক্ষিত নবজাগ্রত প্রগতিবাদী সম্প্রদায় ও ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজের বহুকালপোষিত নানা জীর্ণ প্রথা ও ক্ষতিকর রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, মদ্যাসক্তি ও লাম্পট্য প্রভৃতি সমাজের নানা বিগর্হিত অপরাধ যেমন তাঁহারা রোধ করিতে চাহিলেন তেমনি বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, শিক্ষা-বিস্তার, পুরুষ ও নারীর সাম্যপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সজাগ ও সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। অবশ্য রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াপন্থী লোকেদের কাছে তাঁহারা বাধাও পাইলেন প্রচুর। সমাজের নূতন ও পুরাতন শক্তির সংঘাতে তখন যে উত্তাপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিচয় যেমন তৎকালীন প্রহসনের মধ্যে পাওয়া যায় তেমন আর সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে পাওয়া যায় না। প্রহসনরচয়িতাগণ সমাজের সমসাময়িক সমস্যাগুলির সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া নিরপেক্ষ আসন হইতে হাস্যকৌতুকরস পরিবেষণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লোকশিক্ষা ও সমাজসংস্কারের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য তাঁহাদের হাস্যকৌতুকের উপাদানের মধ্যে মিশিয়া আছে।

বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে দীনবন্ধুর সময় পর্যন্ত নাটকের পরিবেশ গ্রাম্যসমাজকে আশ্রয় করিয়াছিল, যে সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রখর আলোকচ্ছটা প্রবেশ করিতে পারে নাই, নবতন চালচলন, রুচি ও রসবোধ যেখানে তখনও অজ্ঞাত ছিল সেই সমাজের নরনারীর লোভ ও বিকৃতি, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার প্রহসনগুলির মধ্যে উদঘাটিত হইল। গ্রামের তাম্রকূট ধূমে আচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপ, অলস গুঞ্জনমুখরিত বারোয়ারীতলা, কুৎসাকলিত পুকুরঘাট, ঈর্ষানিন্দার তির্যক হাস্যে উচ্ছল অন্তঃপুর প্রভৃতি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে প্রহসনগুলির মধ্যে। সেজন্য ইহাদের হাস্যকৌতুকের উপাদানের মধ্যে আধুনিক-পূর্ব গ্রাম্যসমাজের রুচি ও রসই প্রকাশ পাইয়াছে। পারিবারিক সম্বন্ধ হইতে উৎসারিত ঠাট্টা-রসিকতা, কর্মহীন পর্যাপ্ত অবকাশ হইতে উদ্ভূত অজস্র-উচ্ছ্বসিত কৌতুকপ্রবণতা, ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালী ও সঙ্গীত হইতে নির্গলিত অপরিমিত রসধারা প্রভৃতি প্রহসনগুলির সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছে। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া যে নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব হইল তাহা ধীরে ধীরে পরবর্তী প্রহসনগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। বিকৃত নাগরিক সমাজের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'সধবার একাদশীতে'। দীনবন্ধুর পরে নাটক ও প্রহসন মার্জিত রুচিসম্পন্ন আধুনিক নাগরিক সমাজকে অবলম্বন করিয়াছে। সেজন্য তখন হইতে হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসনে গ্রাম্যসমাজের অবারিত ও উতরোল কৌতুকহাস্য আর আমরা পাই নাই নাগরিক সমাজের সূক্ষ্ম ও সংযত, শ্লেষকণ্টকিত ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতময় হাসির রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে।

দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাট্যকার রামনারায়ণের নাটক ও প্রহসন আলোচনা করিলে তৎকালীন হাস্যরসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে আমরা সমর্থ হইব। রামনারায়ণ তাঁহার নাটকে করুণ ও গম্ভীর রসের আতিশয্য দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা স্বাভাবিক স্ফূর্তি পাইয়াছে প্রহসনে এবং হাস্যরসাত্মক নাটকীয় অংশে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটকে' কৌলীন্য ও বহুবিবাহের কুফল তিনি করুণ ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেই কারুণ্য আমাদের বিশ্বাস ও বেদনা উদ্রেক করে না। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির গুরুভার ও অসংযত উচ্ছ্বাসের ফলে যে ঘটনা বাস্তবে করুণ ছিল তাহাই নাটকে নির্জীব ও আবেদনহীন হইয়া পড়িল। কিন্তু নাটকের যেখানে যেখানে তিনি সাময়িক তরল পরিবেশের মধ্য দিয়া সমস্যার গুরুভার হইতে দর্শকের মনকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি দিয়াছেন সেখানে সেখানেই নাটকের ঘটনা ও চরিত্র আকস্মিক সজীবতা লাভ করিয়াছে। 'কুলীনকুলসর্বস্বে' করুণরস নাট্যকারের উদ্দিষ্ট বটে, কিন্তু নাটকটির সর্বত্র কৌতুকরসের প্রাবল্য বজায় রহিয়াছে। নাট্যকার যে চরিত্রগুলিকে নিন্দা করিতে চাহিয়াছেন তাহারাই কৌতুকরসের মধ্য দিয়া অত্যন্ত সরস ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র ইত্যাদি। রামনারায়ণ তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের কাহাকেও আর অব্যাহতি দেন নাই। মূর্খ ও লোভী ঘটক, বিবাহলোলুপ কুলীন ব্রাহ্মণ, ঔদারিক বিপ্র, নির্বোধ পুরোহিত সকলেই তাঁহার দ্বারা ব্যঙ্গবিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু রামনারায়ণ ব্যঙ্গ করিলেও রঙ্গেই তাঁহার অধিক প্রবণতা। সেজন্য চরিত্রগুলির কথা ও আচরণের মধ্য দিয়া একটি কৌতুকরসের উচ্ছল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। পুরোহিতপদের জন্য নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে যাইয়া অভব্যচন্দ্র শাস্ত্র,

পুরাণ ও ইতিহাসের যে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরাণে তাহার কি গভীর জ্ঞান!—

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান ॥
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার ॥
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন।

'নবনাটক'ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাটক এবং গুরুতত্ত্বকথা ও গম্ভীর উপদেশে বোঝাই করিয়া করুণরসের নদীতে ইহাকে ডুবাইতেই তিনি চাহিয়াছেন, কিন্তু পাঠক ও দর্শকের মন হাস্যকৌতুকের ভাসমান বুদ্বুদরাশির মধ্যেই সাঁতার কাটিয়া আনন্দ পায়।

নাটকের গুরু ও গম্ভীর প্রয়োজনে উহাতে রামনারায়ণের প্রতিভা বাধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু ঐ বাধা অপসারিত হইয়া গেল প্রহসনে। নাটকে তাঁহার সচেতন আদর্শ যেন চাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রহসনে তাঁহার সহজাত সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছে, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ও 'চক্ষুদানে' অবৈধ আসক্তির দোষ ও 'উভয় সঙ্কটে' সপত্নী-সমস্যার কৌতুককর পরিস্থিতি দেখানো হইয়াছে। ঘটনার জটিল ও রহস্যময় গতির মধ্য দিয়াই হাস্যরস উদ্ভূত হইয়াছে এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা মাঝে মাঝে থাকিলেও প্রবল কৌতুকরসের প্রবাহ প্রহসনগুলিকে সার্বজনীন উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

রামনারায়ণের পর সার্থক প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন মাইকেল মধুসূদন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া রামনারায়ণের প্রহসনের সহিত মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রহসনের সাধর্ম্য ছিল। কিন্তু আঙ্গিক ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন অনেক বেশি নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন এবং দীনবন্ধুর প্রহসনে এই নৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ পরিস্ফুট হইয়াছিল। মধুসূদনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য প্রহসন অনুসরণ করিয়া ঘটনাবস্তুর কেন্দ্রগত ঐক্য ও দৃঢ়সংহত বাঁধুনির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। প্রহসনের ধর্ম অনুযায়ী মধুসূদনের উভয় প্রহসনই আকারে সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনার জটিল উদ্ঘটত্ব হইতেই উহাদের কৌতুকরস সঞ্জাত হইয়াছে। কিন্তু

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়, ঘটনার রহস্যময় জটিলতা 'বুড়ো শালিকে'র মধ্যেই বেশি রহিয়াছে। 'একেই বলে সভ্যতা'র মধ্যে কৌতুকরস প্রবল ও উতরোল নহে। ইয়ংবেঙ্গলী কথা ও আচরণ হইতেই প্রধানত কৌতুকরস উদ্ভূত হইয়াছে। নবকুমার কালীনাথ প্রভৃতির সাহেবীকেতা ও ইংরেজী ভাষা, নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিদারুণ বিতৃষ্ণা, প্রমত্ত অবস্থায় অসঙ্গত বাক্য উচ্চারণ, অশোভন আচরণ এসবই কৌতুকরসের উপাদান হইয়াছে। সমাজ, পরিবেশ, সংস্কার ও ঐতিহ্যধারার সহিত ইয়ংবেঙ্গলদের বাক্য, স্বভাব ও আচরণের এমন একটি উদ্ভট বিরূপতা ও অসঙ্গতি দেখা গিয়াছিল যে তাহা যথেষ্ট কৌতুকরসোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছিল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মধ্যে ধার্মিক পরস্ত্রীলোলুপ ভক্তপ্রসাদের জবা হওয়ার কাহিনী প্রবল কৌতূহলোৎপাদক আখ্যানের মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্ন শিবমন্দিরের সম্মুখে কাহিনীর চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে কৌতুকরস সশব্দ বেগে আকস্মিক উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভক্তপ্রসাদের বয়স, সামাজিক মর্যাদা ও বাহ্য ধর্মনিষ্ঠার সহিত তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও মুসলমানী রমণীর প্রতি আসক্তির এমন একটি গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে যে তাহাই কৌতুকরসের কারণ হইয়াছে। কিন্তু 'বুড়ো শালিকে'র মধ্যে শুধু প্রবল কৌতুক নহে তাহার সহিত কঠোর ব্যঙ্গও মিশ্রিত রহিয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে ব্যঙ্গের স্পর্শ অত্যন্ত মৃদু ও সুসহ, লেখকের মানসিক পরিহাসপ্রিয় প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু 'বুড়ো শালিকে'র মধ্যে ব্যঙ্গের স্পর্শ শাণিত ছুরিকার ন্যায়। এখানে লেখক নির্মম ও ক্ষমাহীন। ভক্তপ্রাসাদের শাস্তিও যেন মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার পর্যায়েই পৌঁছিয়াছে।

মধুসূদনের ন্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথও গম্ভীর রসাশ্রিত নাটকে প্রতিভার পূর্ণতম শক্তি প্রকাশ করিলেও লঘুরসাত্মক প্রহসনের দিকেও একটু শিথিল দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারেন নাই। তিনি অল্প কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহসনের ক্ষেত্রে তিনি একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন। দীনবন্ধু পর্যন্ত সমাজের ক্লেদাক্ত বাস্তবতা অবলম্বন করিয়া প্রহসনরচয়িতাগণ প্রহসন রচনা করিতেন। সমসাময়িক সমাজের নানা দোষ ও গ্লানি দেখাইবার জন্য তাঁহারা নানা কদর্য ও কুৎসিত বিষয়ের অবতারণা করিতেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাজের পঙ্কিল বাস্তবতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। একটা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন রুচি লইয়া তিনি

জীবনের কৌতুককর উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। নাগরিক মানসের সূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্য ও সতর্ক শালীনতা তাঁহার প্রহসনে এক উজ্জ্বল দীপ্তি বিকিরণ করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রহসনের চরিত্রগুলি সমাজের চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কারলালিত খাঁটি মৃত্তিকাশ্রিত মানুষ নহে। তাহারা পরিশুদ্ধ সংস্কৃতিশীলিত, উন্নত আদর্শবাদী লোক, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোজগতে স্বাধীন চিন্তা ও উদ্দাম কল্পনাচারিতার ফলে যে রোমাণ্টিকতার প্লাবন আসিল তাহার পরিচয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের মধ্যেও চিহ্নিত হইল। তাঁহার প্রহসনের কৌতুকরস সাধারণত ঘটনার জটিলতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চরিত্রের দোষ ও বিকৃতি তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার ব্যঙ্গের আঘাত তীব্র হইয়া উঠে নাই। লেখকের পরিহাসপ্রিয়, স্নিগ্ধসহনশীল অন্তরের স্পর্শ সর্বত্রই পাওয়া যায়।

'কিঞ্চিৎ জলযোগে' মানুষের বাহ্য মত ও অন্তরপ্রকৃতির বৈষম্য দেখাইয়া লেখক কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও উদার মতবাদ লইয়া যে গর্ব করিয়াছে সেই যখন নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন বিশেষ কৌতুকের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু প্রহসনের উদ্দাম কৌতুকময়তা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যেখানে মধ্যযুগীয় বীরের ন্যায় পূর্ণচন্দ্র তরবারি হস্তে পেরুরামের পিছনে ধাবিত হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী বিধুমুখী আতঙ্কে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু একটি অপূর্ব চরিত্র। মিথ্যাভাষণ যে কতখানি আর্ট হইয়া উঠিতে পারে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় অলীকের সপ্রতিভ ও চটকদারী কথাবার্তায়। সরল, সহজবুদ্ধি ও বিশ্বাসপরায়ণ সত্যসিন্ধুকে সে তাহার কথার তোড় ও মিথ্যার ঘোরে বার বার কিভাবে বিস্মিত ও বিহ্বল করিয়া দিয়াছে তাহা দেখিয়া দর্শক খুবই কৌতুক বোধ করে। কিন্তু অলীক যত বড় অভিনেতাই হউক না কেন, গদাধরের অভিনয় ক্ষমতা বোধ হয় আরও অনেক বেশি। বিভিন্ন রূপসজ্জার সজ্জিত হইয়া আসিয়া সে যেভাবে বার বার অলীককে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে তাহার অসাধারণ উপস্থিতবুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রহসনের আর একটি ধারা উৎসারিত হইয়াছে রোমাণ্টিক নায়িকা হেমাঙ্গিনীর চরিত্র হইতে। বেশি পড়িয়া যেমন ডনকুইক্সোটের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বড় বেশি আসক্ত হইয়া হেমাঙ্গিনীও নিজের স্থান কাল পরিবেশ ভুলিয়া যাইয়া নিজেকে এক রোমাণ্টিক ভাববিহ্বলা

নায়িকারূপেই কল্পনা করিয়া বসিয়াছিল। তাহার চোখে অলীক হইল জগৎ-সিংহ আর সে নিজে হইল তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী আয়েষা। কুমার জগৎসিংহ যখন আদালতের পিয়াদার গুঁতা খাইয়া প্রেয়সী—প্রেয়সী বলিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন তখন ভোঁতা বঁটি হস্তে আয়েষারূপিণী হেমাঙ্গিনী রণস্থলে প্রবেশ করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলচি, এই বন্দী-ই আমার প্রাণেশ্বর—আমার কণ্ঠরত্ন। ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করব না—যদি এর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, তা হ'লে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জন করব।' 'হিতে বিপরীতে' এক কৃপণ বিবাহবাতিক বৃদ্ধের জব্দ হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও উষ্মা ও জ্বালা নাই। শোধনের সদিচ্ছা ও শাসনের কঠোরতাও নাই, পরিহাসোজ্জ্বল পরিবেশ ও কৌতুকপ্রফুল্ল সংগীতের মধ্য দিয়া সবকিছুই প্রীতিকর উপভোগ্যতায় পরিণত হইয়াছে। 'হঠাৎ নবাব' ও 'দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ' এই প্রহসন দুইখানি মলিয়েরের The Cit Turned Gentleman ও Marriage Force এর অনুবাদ।

প্রহসনরচনায় দীনবন্ধুর পরেই অমৃতলালের স্থান। দীনবন্ধুর ন্যায় অমৃতলালের প্রতিভাও করুণ ও গম্ভীর অপেক্ষা লঘু হাস্যরসের মধ্যেই সাবলীল স্বতঃস্ফূর্তবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু দীনবন্ধুর হাস্যরসের সহিত অমৃতলালের হাস্যরসের প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। দীনবন্ধুর হাস্যরস সমবেদনাকরুণ হিউমার কিন্তু অমৃতলালের হাস্যরস শাসনকঠোর স্যাটায়ার। দীনবন্ধু সমাজের দোষ ও বিকৃতি দেখাইয়া হাসির অর্গল মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই হাসির অজস্র উচ্ছ্বাসে সর্বপ্রকার ক্লেদ, গ্লানি, অপ্রীতি ও অসন্তোষ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই হাসির উদার ও প্রসন্ন জগতে দোষী ও নির্দোষ, ভ্রান্ত ও শুদ্ধ সব এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অমৃতলাল হাসির উচ্ছ্বাসে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। হাসিটি তাহার ছল মাত্র, সেই হাসির মধ্য দিয়া মানুষের স্থূল, বিকৃত ও বিভ্রান্ত অংশগুলি প্রকাশ্যে তুলিয়া ধরাই হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। অগভীর জলাশয়ের জল কিছুকালের জন্য বাতাসে ও আলোকে খেলা করিলেও শীঘ্রই তাহা শুকাইয়া যায় এবং তখন তাহার কদর্য পঙ্কস্তর বাহির হইয়া পড়ে। অমৃতলালের হাসিও সেরূপ ক্ষণকালের জন্য আনন্দহিল্লোলে প্রবহিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তখন মানুষের ক্লেদাক্ত রূপ প্রকাশিত হইয়া এক অস্বস্তিকর গ্লানিতে আমাদের মন

পূর্ণ করিয়া তোলে। হাস্যরসিকের পক্ষে যে অপক্ষপাতী, সামগ্রিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন তাহা অমৃতলালের ছিল না। একটি বিশেষ মত ও আদর্শই প্রবল হইয়া উঠিয়া সর্বত্র তাঁহার লেখনীকে চালিত করিয়াছে এবং সেই মত ও আদর্শ কখনই সর্বজনস্বীকৃত ছিল না। সেজন্য তাঁহার প্রহসনে তিনি জোর করিয়া তাঁহার যে নিজস্ব বক্তব্য চাপাইতে গিয়াছেন তাহা কখনই সকলে মানিয়া লইতে পারে না এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও মতবাদকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে বিদ্রূপাত্মক হাস্য উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে সার্বজনীন মন কখনও যোগ দিতে পারিবে না।

অমৃতলাল গিরিশযুগের প্রতিনিধি, গিরিশযুগের নব্য হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পৌরাণিক নীতি ও আদর্শের প্রতি একটি নবজাগ্রত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিল এবং পাশ্চাত্যভাবপোষিত মতবাদ ও আন্দোলনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রতিবাদ শিক্ষিত সাহিত্যসেবী অনেকের মধ্যেই দেখা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার ফলে সমাজের মধ্যে যে উন্নত ও প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, নারী-পুরুষের সাম্যবোধ, রাজনৈতিক অধিকারচেতনা ইত্যাদি দেখা গিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সে-সব উপেক্ষিত ও উপহসিত হইল, তখন শাস্ত্রীয় নীতিনিয়ন্ত্রিত পথ ও ধর্মনির্দেশিত পরিণতির দিকেই লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। গিরিশচন্দ্র করুণ ও গম্ভীর রসের মধ্য দিয়া ইহা দেখাইলেন এবং তাঁহার শিষ্য অমৃতলাল হাল্কা কৌতুকরসের মধ্য দিয়া ইহা ফুটাইয়া তুলিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক আন্দোলন, বর্ণ ও শ্রেণীভেদ দূরীকরণ, বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন প্রভৃতি অমৃতলাল কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং তীক্ষ্ণ ও অসহিষ্ণু ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাতে উহাদের অসারতা ও ব্যর্থতাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন।

দীনবন্ধুর ন্যায় অমৃতলালের উদ্ভাবনীপ্রতিভা ছিল না। কাহিনীর কৌতূহলোদ্দীপক উদ্ভটত্ব তিনি তেমন দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ প্রহসনের কাহিনীর ধারা খুবই শিথিল ও এলোমেলো। অনেক স্থলেই তিনি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন দৃশ্য গাঁথিয়া রঙ্গব্যঙ্গের আসর জমাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কাহিনীর অনিবার্য গতি ও রহস্যজনক জটিলতা না থাকিবার ফলে তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গ কোথাও স্থায়ী ও গভীর হইতে পারে নাই। 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস' ; 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার', এবং 'কৃপণের

ধন' এই প্রহসনগুলিই ঘটনাপ্রধান এবং সেজন্য ইহাদের মধ্যেই কৌতুকরসের অধিকতর স্বাভাবিকতা ও প্রাবল্য দেখা গিয়াছে। 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'কৃপণের ধনে' ব্যঙ্গের আঘাত আছে বটে কিন্তু কাহিনীর উদ্ভট রহস্যময়তার এবং কৌতুকের উতরোল উচ্ছ্বাসে সেই আঘাত দানা বাঁধিতে পারে নাই। কৌতুকের সর্বাধিক প্রচণ্ডতা বোধ হয় ফুটিয়াছে 'তাজ্জব ব্যাপারে'। প্রহসনটির মধ্যে পুরুষরা মেয়েদের কাজ এবং মেয়েরা পুরুষদের কাজ গ্রহণ করিয়া এমন একটি অদ্ভুত বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে যে কৌতুকের দুর্দমনীয় বেগ বাঁধভাঙা বন্যার মতই প্রবাহিত হইয়াছে।

অমৃতলালের অধিকতর খ্যাত প্রহসনগুলিতে কাহিনী অত্যন্ত দুর্বল ও শিথিল। 'বিবাহবিভ্রাট', 'বাবু', 'একাকার', 'বৌমা', প্রভৃতি প্রহসনে লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপগুলি শাণিত অস্ত্রের ন্যায় সমাজের সর্বপ্রকার আধুনিকতার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। লেখকের সর্বাপেক্ষা বেশি রাগ বোধ হয় শিক্ষিত স্বাবলম্বী ও প্রগতিবাদী নারীসমাজের প্রতি। বিলাসিনী কারফরমা, মৃণালিনী মিত্র, কর্ণেল নিতম্বিনী ভট্টাচার্য, হিড়িম্বা প্রভৃতি চরিত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। রোমান্টিক উপন্যাস পড়িয়া বাঙ্গালী সংসারের বধূ নিজেকে কিরূপ রোমান্টিক নায়িকাদের একজন মনে করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'বৌমা' প্রহসনের কিশোরীর মধ্যে। কিশোরী অথবা উলাঙ্গিনী (উলের মত অঙ্গ যার) যখন তাহার বন্দী প্রাণেশ্বরকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরাঙ্গনা রাজপুত রমণীর মত সখীপারবৃতা হইয়া 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গান গাহিতে গাহিতে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে তখনই চূড়ান্ত কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিশোরীর অনুরূপ চরিত্র হইল 'খাসদখলে'র মোক্ষদা। বিধবা-বিবাহের প্রতি মর্মান্তিক বিদ্রূপ করা হইয়াছে এই চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া। মোক্ষদা নিজের স্বামীকে মৃত ভাবিয়া দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিবার সময় পরলোকগত স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছে, 'O my Loken! Dear-dearest-darling husband that was! তোমার ভারত, যে ভারতকে তুমি তোমার মক্কেলের চেয়েও ভালবাসতে, যে ভারতের উন্নতির জন্য, যে বঙ্গের বিধবা ভগ্নীদিগের জন্য তুমি দ্বারে দ্বারে ভগ্নীপতি অন্বেষণ ক'রে বেড়াতে, সেই বঙ্গের উদ্ধারের জন্যই—আর তোমার, হে প্রিয়তম ভূতপূর্ব স্বামী! তোমার মুখ রক্ষা কর্বার জন্যই আমি আবার পতি পরিগ্রহ কর্তে যাচ্ছি।' ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ পরিস্ফুট হইয়াছে 'বৌমা',

বাবু 'প্রভৃতি প্রহসনে' অশ্লীল বলিয়া পিতার নাম উচ্চারণ করিতে সংকোচ চিত্তবিকারের ভয়ে চোখ বাঁধিয়া বাহিরে গমন, স্ত্রীকে কোমল কণ্ঠে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও আচরণের প্রতি কঠোর বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৈহিক বিকৃতি কিংবা বাগ্‌বিকৃতির মধ্য দিয়া অমৃতলাল কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'খাসদখলে'র ইজদি—বাইগ্রস্ত নিতাই, তোতলা পেয়ারী, খোনা নেপাল, 'কৃপণের ধনে'র হাবা প্রভৃতির কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে আসিবে।

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীপ্রমথনাথ বিশী অমৃত লালের প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী। অমৃতলালের ন্যায় প্রমথবাবুর লেখাতেও ব্যঙ্গের আধিক্য বেশি দেখা যায়। কিন্তু অমৃতলালের ন্যায় তাঁহার নাটক বিচ্ছিন্ন ও শিথিল ঘটনাযুক্ত নহে। কাহিনীর জটিল, দৃঢ়সংহত ও কৌতূহলোদ্দীপক গতি তাঁহার নাটককে অত্যন্ত সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার নাটকগুলিতে হাস্যকৌতুকের সুপ্রচুর উপাদান থাকিলেও উহাদিগকে ঠিক প্রহসন বলা চলে না। প্রহসনের ন্যায় ঐগুলি সংক্ষিপ্ত ও উদ্ভটঘটনাপ্রধান নিরবচ্ছিন্ন কৌতুকরসাত্মক নহে। উহাদিগকে প্রহসন না বলিয়া কমেডি বলাই সঙ্গত। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই বাধাবিপত্তি-কণ্টকিত রোমান্সের স্নিগ্ধ-মধুর ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু রোমান্সের কল্পনারঞ্জিত, আবেগগভীর দিকটি লেখক পরিহাসের তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রেম সম্বন্ধে তিনি সিনিক কিংবা নাস্তিকতাবাদী নহেন। কিন্তু প্রেমের ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা সন্দেহ ও কাল্পনিক অবিশ্বাস, অসঙ্গতি ও আতিশয্য প্রভৃতি লইয়া কৌতুক করিতে তিনি ভালোবাসেন। নারীবেশী পুনর্ণবাকে লইয়া ললিতকুমার ও মেজর গুপ্তর পরস্পরের প্রতি চ্যালেঞ্জ, বৃদ্ধ সাজিয়া সনৎকুমারের মঞ্জরীকে পাইবার চেষ্টা, নীরজানাথ ও মালবিকার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পটাসিয়াম সাইনাইডের পরিবর্তে পটাসিয়াম ব্রোমাইড খাওয়া, ভূতপূর্ব স্বামী পুরুষোত্তমের সহিত ঘটমান স্বামী চন্দ্রভানুর ভীষণ অসিযুদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃত প্রেমের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নহে সেই প্রসিদ্ধ কবিবাক্যের কৌতুকময় সত্যতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অনেকস্থলেই অভাবনীয় উদ্ভটত্ব আনিয়া লেখক কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াছেন। 'ঋণংকৃত্বা'র ঋণশোধের বিদ্যালয় ও উহার পাঠপ্রণালীর বর্ণনার মধ্যে উদ্ভট মৌলিকত্বের

পরিচয় পরিস্ফুট। নকল রায় বাহাদুর সর্বেশ্বর সিংহ, মহারাজকুমার রূপে পরিচিত মোটর ড্রাইভার ত্রিদিব-নারায়ণ, 'ভূতপূর্ব স্বামী'র হঠাৎ-অবতীর্ণ অনারী অপুরুষ প্যারাস্যুট সৈনিক প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাহিনীর আত্যন্তিক উদ্ভটত্ব 'মৌচাকে ঢিলে'র মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। মলিয়েরের রীতি অবলম্বন করিয়া বিশী মহাশয় চরিত্র ও সংলাপের যুগ্মতা ও পৌনঃপুনিকতা দেখাইয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরণের বৈশিষ্ট্য অথবা ঘটনাগত পরিণতি যখন পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি চরিত্রের মধ্যে একই সঙ্গে দেখা যায়, কিংবা একই ধরণের উক্তি যখন পর পর একই অবস্থাপন্ন দুইটি চরিত্রের মুখ দিয়া উচ্চারিত হয় তখন তাহা কৌতুকজনক হইয়া উঠে। সর্বশ্বের সিংহ-নগেন্দ্রনাথ ও ত্রিদিব নারায়ণ-বিজয়নারায়ণ, নৃপনাথ-মন্দাকিনী ও নীরজা-মালবিকা, সনৎকুমার-মঞ্জরী ও ললিতকুমার-মণিকা প্রভৃতি যুগল ও দ্বি-যুগল চরিত্রগুলি ভাব ও কাজের সমান্তরাল সাদৃশ্যের দ্বারা কৌতুক উৎপাদন করিয়াছে।

প্রমথবাবু ব্যঙ্গপ্রিয় লেখক, কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গে পক্ষপাতিত্ব নাই এবং ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শোধন ও শাস্তির কোন অহেতুক সদিচ্ছাও তাঁহার নাই। অমৃতলালের নিজস্ব সত্তা যেমন তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে অত্যন্ত উগ্রভাবে ধরা পড়িয়াছে প্রমথবাবু তেমনভাবে নিজেকে কখনও জোর করিয়া জাহির করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রতিভা পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে সমুজ্জ্বল, সেজন্য তাঁহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণধার তরবারির মত চোখঝলসান দীপ্তি বিকিরণ করিয়াছে। তাঁহার রসিকতার মধ্যে এমন একটি সুসংস্কৃত ও সুমার্জিত ভাব আছে যে তাহাতে আহত হইলেও না হাসিয়া পারা যায় না। বর্তমানে শিক্ষা ও কর্মপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে নানাপ্রকার বৃত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। বিশী মহাশয় উহাদের নানাপ্রকার অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দেখাইয়া উহাদের হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। 'পরিহাস বিজল্পিতমে'র মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি উপভোগ্য বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। অধ্যাপক, সাহিত্যিক সাংবাদিক, রাজনৈতিক, ডাক্তার, উকিল কেহই লেখকের বিদ্রূপ হইতে রক্ষা পান নাই। ইঁহাদের দুর্বল ও অসঙ্গত দিকগুলি সম্বন্ধে লেখকের বক্র ও অকাট্য মন্তব্য ঈষৎ অতিরঞ্জিত চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের দীর্ঘ-বিস্তৃত ও বিচিত্রগামী ইতিহাস-পরিক্রমা শেষ হইল। বাঙালীর মানস-প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক উপাদান সব যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা গেলেও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর রুচি ও রসবোধের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হস্যেরসের প্রকৃতিও রূপান্তরিত হইয়াছে। মধ্যযুগীয় বাঙালী-জীবনে ধর্মনির্ভরতার জন্য হাস্যরস সাহিত্যের মধ্যে সম্মানিত আসন পায় নাই। গতানুগতিক জীবনধারার কয়েকটি বাঁধাধরা চরিত্রের মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেষিত হইত। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের অশেষ বৈচিত্র্য এবং মানসিক চিন্তা ও রসবোধের বহু সূক্ষ্মতা ও বিচিত্রমুখীনতা দেখা গেল। সেই সময় হইতে হাস্যরসও স্থূল ও বাহ্য সংকীর্ণ পরিসর হইতে বহুধাব্যাপ্ত জটিল জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হইল। (পূর্বকালের হাস্যরস প্রধানত উদ্ভট ঘটনা ও চরিত্র আশ্রয় করিয়া উৎসারিত হইত। কখনও কখনও অলঙ্কৃত বাক্য অবলম্বন করিয়াও প্রকাশিত হইত। কিন্তু তখন কোথাও লেখকের মানস-প্রকৃতি ও জীবনবোধের সহিত সেই হাস্যরসের কোন যোগ ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী হইতে আধুনিক সাহিত্যে যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে হাস্যরসস্রষ্টা লেখকের ব্যক্তিমানস বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইল। বর্তমান লেখকদের মানসচিন্তা ও অনুভূতি তাঁহাদের হাস্যরসের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। জীবন সম্বন্ধে কেহ বা করুণ ও সমবেদনাশীল, কেহ বা কঠোর ও ক্ষমাহীন। কেহ বা আবেগ-অনুভূতির কোমল দর্পণ দিয়া জীবনকে দেখেন, কেহ বা বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের প্রখর আলোকে জীবনকে প্রকাশ করেন। এইরূপ বিচিত্র মানসপ্রবণতা জন্য হাস্যরসের মধ্যেও এত বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়)

বর্তমান সাহিত্যে গল্প ও নাটকে প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্রে হাস্যকৌতুকের বহু উপাদান ছড়াইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা হাস্যরসস্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন শুধু কেবল তাঁহাদের সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ লইয়াই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইল। ইঁহারা ব্যতীত এমন অনেক লেখক আছেন যাঁহারা মূলত হাস্যরসের লেখক না হইলেও মাঝেমাঝে তাঁহাদের সাহিত্যে হাস্যরসের

স্পর্শ পাওয়া যায়। সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সম্পাদক ও সাময়িকপত্রলেখকের নাম করা যায় যাঁহাদের অনেক সাময়িক লেখার মধ্যে হাস্যকৌতুকের বহু নিদর্শন সন্ধান কারয়া পাওয়া যায়। সংবাদপ্রভাকর, বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র ও শনিবারের চিঠির মধ্যে বহু বিস্মৃত ও স্বল্পজ্ঞাত লেখকের হাস্যকৌতুকের ইতস্তত:বিক্ষিপ্ত অনেক উপাদান সঞ্চিত হইয়া আছে। বর্তমানকালের ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকদের মধ্যে অনেকের লেখাতেই হাস্যরসের যথেষ্ট স্ফুরণ দেখা গিয়াছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যঙ্গরসাত্মক রচণায় শ্রীপরিমল গোস্বামীর কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্প, নাটিকা ও প্রবন্ধ সর্বত্রই ইহার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুসাহিত্যের মধ্যেও হাস্যকৌতুকের যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা যায়। শিশুর মনোরঞ্জন করিতে গেলে হাস্যকৌতুকের অবতারণা অপরিহার্য। সেজন্য শিশুসাহিত্য হাস্যরসপ্রধান হইয়া উঠে। শিশুসাহিত্যের দিকপাল যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু প্রভৃতির কথা প্রথমেই মনে আসিবে। সাম্প্রতিক কালের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-দের মধ্যে অনেকই কৌতুকরসাত্মক শিশুসাহিত্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে রম্যরচনা নামক ব্যক্তি-অনুভূতিপ্রধান রচনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রচার ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। রম্যরচনায় যে মৃদু, স্নিগ্ধ ও হাল্কা ধরণের রস পরিবেষিত হয় তাহাতে প্রীতিকর রমণীয়তা থাকিলেও তাহা ঠিক হাস্যকৌতুকরসের পর্যায়ে পড়ে না। সেজন্য আলোচ্য গ্রন্থে উহা লইয়া আলোচনা করা হইল না। কিন্তু তবুও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে রম্যরচনার অনেকস্থলেই মৃদুহাস্যরসের সূক্ষ্ম অনুভববেদ্য স্পর্শ আছে। রম্যরচনায় যাঁহারা হাস্যকৌতুকের আবরণটি পুরাপুরি উন্মোচন না করিলেও ঈষৎ নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী, যাযাবর, রঞ্জন, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, রূপদর্শী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা আজ বহুবিস্তারী হইলেও গভীর ও প্রবল নহে। অবশ্য এজন্য আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবনরূপও অনেকাংশে দায়ী।

বর্তমান জীবনের ব্যস্ততা ও বিক্ষোভ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সমস্যা জীবনের ভিতর হইতে শ্রীময় ও প্রসন্ন রূপটি হরণ করিয়া লইয়াছে। বহির্জীবনে মানুষের প্রয়োজনগত ও উদ্দেশ্যমূলক যোগ দেখা গেলেও সামাজিক জীবনের মেলামেশা ও হৃদয়গত যোগ বর্তমানে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। আগেকার দিনের বিশ্রান্ত অবকাশ এখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আড্ডা-মজলিস, গল্পগুজবের অফুরন্ত অবসর এখন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে হাস্যকৌতুকের উৎস ক্রমশ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। অধুনাতন লেখকদের মধ্যে হাস্যকৌতুকের একটি বিশেষ দৈন্য চোখে পড়িতেছে। তাঁহারা জীবনকে বড় গুরুতর, বড় প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের সাহিত্যে জীবনের তত্ত্ব ফুটিতেছে কিন্তু জীবনের রস ফুটিতেছে না। তাহাতে বিরস কাঠিন্যের রুক্ষ ভ্রূভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সরস কোমলতার স্নিগ্ধ চাহনির পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের মরুদগ্ধ জীবনে রস চাই, আনন্দ চাই। যেদিন সাহিত্যিকের উদার দক্ষিণ হস্ত হইতে রস ও আনন্দের অকৃপণ ধারা বর্ষিত হইবে সেদিন সাহিত্যক্ষেত্র আমাদের প্রাণের তীর্থে পরিণত হইবে।

পরিশিষ্ট

সমাজজীবন ও হাস্যরসের ধারা

বাঙালীর হাস্যবোধ লইয়া আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা বাঙালী জীবনের বিশিষ্ট চেতনা ও আদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কার ও পারস্পরিক সম্বন্ধবোধ হইতে হাস্যকৌতুকের ধারা কিভাবে উৎসারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। মানুষের সামাজিকতার সহিত তাহার হাস্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলিয়া সেই সামাজিকতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাস্যবোধেরও বিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন সমাজের হাস্যকৌতুকের যে পরিচয় আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পাই তাহার সহিত বর্তমান জীবনের হাস্যকৌতুকের প্রকৃতি ও প্রকাশরীতির অনেকখানি পার্থক্যই দেখা যাইবে। বস্তুত, হাস্যজনক বিষয় ও করুণ ও গম্ভীর বিষয়ের আবেদনে একটি সুস্পষ্ট প্রভেদ এইখানে দেখা যায় যে, করুণ ও গম্ভীর বিষয়ের আবেদন স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া একটি সর্বাত্মক রূপ লাভ করে, কিন্তু হাস্যজনক বিষয় কোথাও কোথাও নিত্যকালীন মানুষের মনে সাড়া জাগাইলেও অনেক স্থলে আবার পারিপার্শ্বিকের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এক কালের হাস্যপরিহাস অন্যকালে অশ্লীল, গ্রাম্য ও বিরক্তিকর বিবেচিত হইতে পারে। বেহুলার দুঃখভোগ, খুল্লনার বিরহবেদনা, রাধার প্রেমোন্মাদনা, হরগৌরীর দাম্পত্যজীবন আধুনিক মানুষের মনেও এক সুগভীর বেদনা ও ভাবোচ্ছ্বাস উদ্রেক করে। কিন্তু বেহুলার বিবাহ বাসরে বৃদ্ধাদের প্রেমনিবেদন, লহনা ও খুল্লনার মারামারি, বড়াইয়ের দূতীপনা, বিবাহার্থী শিবকে দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদি বিষয় এককালে যথেষ্ট হাস্যরসাত্মক হইলেও বর্তমানে অশ্লীল ও নিন্দনীয় বলিয়াই মনে হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক হাস্যবোধের এই তারতম্য বুঝিতে গেলে প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের বাহ্য ও আন্তর রূপের মধ্যে যে ব্যবধান ঘটিয়াছে তাহা সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সমাজ-জীবন যে মোটামুটি একই খাতে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা অন্তত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হইতে জানা যায়। রাজনৈতিক সংঘাত ও

সংক্ষোভ হইতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া তৎকালীন সমাজ-জীবন পল্লীমাটির বুকে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ধারায় বহিয়া চলিতেছিল। বহির্জগতের ঈর্ষা-দ্বন্দ্বমথিত ঘূর্ণিবাত্যা সেই জীবনধারাকে আলোড়িত করে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজ-জীবনের এই বৈচিত্র্যহীন, অপরিবর্তিত রূপের জন্য মধ্যযুগের সাহিত্যেও একটি একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ও বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতা দেখা দিয়াছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই এই উক্তির যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে।

প্রাচীন সমাজ-জীবন প্রকৃতির মধ্যেই লালিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকৃতির জলবায়ু, আকাশমাটি ও পশুপক্ষীর সহিত মানুষের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। বারমাস্যা প্রভৃতি ঋতুবর্ণনা ও বিভিন্ন পশুপক্ষীর সুবিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ শুধু কেবল সূক্ষ্ম আবেগ ও গূঢ় সৌন্দর্যরস সৃষ্টি করে নাই, ইহা নানা কৌতুকজনক ঘটনা ও পরিস্থিতিও রচনা করিয়াছে। টুনটুনি, কাক, বাঘ, শিয়াল, কুকুর প্রভৃতির সহিত মানুষের অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক সম্বন্ধ লইয়া অনেক সরস গল্প যে রচিত হইয়াছে তাহা পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, পশুপক্ষীদের মধ্যে যখন মানুষের বুদ্ধি, আচরণ, স্বভাব ও ভাষা আরোপ করা হয় তখনই কেবল তাহারা কৌতুক উদ্রেক করিতে পারে। পশুপক্ষীর আকৃতির মধ্যে মানবীয় ভাবের যে অসঙ্গতি তাহাই এখানে কৌতুক উৎপাদন করিয়া থাকে। অনেক সময় পশুপক্ষীর সহিত মানুষের কোন সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া মানুষের ভাব ও ভাষা আরোপ করিয়া উহাদের স্বরূপ বর্ণনাতেই কৌতুকরস সঞ্জাত হইয়াছে। Aesop's Fables অথবা হিতোপদেশের অনেক গল্পে এইরূপ মানবায়িত পশুপক্ষী যথেষ্ট হাস্যকৌতুকের উপাদান যোগাইয়াছে।

মধ্যযুগের সাহিত্য-লেখক দেবকাহিনী অথবা মানবকাহিনী, স্বর্গমহিমা অথবা মর্ত্যরহস্য যাহাই লিখিয়াছেন তাহাতেই তাহার সমকালীন বাস্তব সমাজের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সমাজের নরনারীর জীবনধারায় যে বিকৃতি ও অসঙ্গতি, অন্যায় ও অবিচার সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই কৌতুকের রঙে রঞ্জিত হইয়া কখনও দেবলীলা কিংবা কখনও দেবাশ্রিত মানবলীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভূমিজীবী একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনধারাই তখন হইতে বাংলার সমাজে চলিয়া আসিতেছে। এই জীবনধারা হইতে একদিকে

যেমন পরিতৃপ্ত জীবনের সরস প্রসন্নতা উদ্ভূত হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি অসন্তুষ্ট জীবনের তিক্ত প্রতিবাদও ধ্বনিত হইয়াছে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে যেখানে যেখানে হাস্যকৌতুকের উপাদান রহিয়াছে সেখানে সেখানে বস্তুজীবনের এই প্রসন্নতা অথবা তিক্ততাই মিশিয়া আছে। দেবর ও ভ্রাতৃবধূ কিংবা জামাতা ও শালা শালাবৌয়ের যে কৌতুকোচ্ছল সম্বন্ধ একান্নবর্তী বাঙালী জীবনে ছিল তাহা চিরকাল স্নিগ্ধ-মধুর রসে আমাদের রুক্ষ ও নিরানন্দ জীবনযাত্রাকে ভরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যখন চণ্ডী ও মনসা অথবা লহনা ও খুল্লনার যুদ্ধ দেখি, সপত্নীর ভয়ে ভীতা ফুল্লরার মুখে বারমাস্যা শুনি কিংবা ব্রতকথায় সতীনকে ধ্বংস করিবার সংকল্প ব্যক্ত হইতে দেখি তখন হাস্যকৌতুকের আপাততরল বর্ণনার ভিতর হইতে বহুবিবাহের অনিষ্টকর অসঙ্গতির দিকটিই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। বিবাহিতা নারীগণের পতিনিন্দা কিংবা বাসরঘরে বৃদ্ধাদের প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়া তৎকালীন সমাজের স্বামীসৌভাগ্যবঞ্চিতা উপেক্ষিতা নারীদের অবদমিত ইচ্ছা ও প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ প্রতিবাদই কি ব্যক্ত হয় নাই? প্রকৃতপক্ষে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বিবাহিতা নারীর স্থান চিরকাল কিরূপ কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্ষমাহীন শাসনে জড়িত ছিল তাহার পরিচয়ই হাস্যকৌতুকের নানা নিদর্শনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাশুড়ী ও ননদিনীর অত্যাচার কাহিনী কত ছড়া, প্রবাদ, গীতিকা ও কাহিনীর মধ্যেই না স্থান পাইয়াছে! অল্পবয়সী মেয়েকে যখন মা শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেন তখন শাশুড়ীকে ভুলাইবার জন্য কত কথাই না শিখাইয়া দিতেন। শাশুড়ীর মনোরঞ্জনের জন্য মা মেয়ের সঙ্গে নানা দ্রব্যও পাঠাইতেন। ছোট মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী যাইয়া শাশুড়ীকে খুশি করিবার শতপ্রকার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইত এবং নীরবে স্নেহশীল পিতামাতার কথা চিন্তা করিয়া অশ্রুজলে ভাসিত। এই কারুণ্যময় জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখকগণ যখন শাশুড়ীর নির্দয় অত্যাচারের দিকটিই বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়া হাস্যরসাত্মক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করিতেন তখন শ্রোতাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদই হাস্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণব সাহিত্যে জটিলা ও কুটিলার বার বার জব্দ হইবার মধ্যে শুধু কেবল রাধা নহে শাশুড়ী ও ননদিনী ভয়ভীতা সংখ্যাতীত বিবাহিতা নারীই এক স্বস্তিকর কৌতুক বোধ করিয়াছে।

মধ্যযুগের সমাজের আর্থিক অভাব অনটনের ফলে সাধারণ লোকের জীবনে

কিরূপ কৃচ্ছ্রতা ও দারিদ্র্য, গ্লানি ও তিক্ততা দেখা যাইত তাহার পরিচয়ও নানা কৌতুকরসাত্মক রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। শিব ও পার্বতীকে যখন সাংসারিক দারিদ্র্যের জন্য ঝগড়া করিতে দেখি তখন আমরা হাসি, কারণ স্বয়ং ত্রিলোকনাথ ও অন্নপূর্ণার আর কি অভাব থাকিতে পারে? এই অভাব তো তাঁহাদের মায়া মাত্র। কিন্তু কবি যখন এই বর্ণনা দিয়াছিলেন তখন শুধু দেবলীলার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হন নাই, তাঁহারই পরিচিত মানবসংসারের নিত্যকার রূপই তাঁহার মনে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। মহাদেবকে যখন বলদে চড়িয়া ভিক্ষা করিতে দেখি তখনও আমরা কৌতুক বোধ করি, কিন্তু কবি যে অভাবক্লিষ্ট মানুষের করুণ জীবনকাহিনীই কৌতুকের তুলিকায় রঙীন করিয়া ধরিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হাস্যরসিক এমনিভাবে জীবনের বেদনা ও সমস্যাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া একটু তির্যক ভঙ্গিতে তুলিয়া ধরেন। ইহাতে সমস্যা ও বেদনার সব ভার ও গুরুত্ব হাল্কা হইয়া যায় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবমুক্ত বস্তুর ন্যায় জীবনের সব সমস্যা ও বেদনা কৌতুকের কিরণসম্পাতে ভাসিতে থাকে। যে অভাবপীড়িত ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর সম্মার্জনী লাঞ্ছিত হইয়া মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহার কাহিনী আমাদের কৌতুক উদ্রেক করিলেও সেই কাহিনীর পিছনে দারিদ্র্যপিষ্ট মানুষের কত বড় দুঃখ রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ঘরজামাইকে অবলম্বন করিয়া কত কাহিনী ও প্রবাদই না রচিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাপন্ন শ্বশুরের অন্নভোজী, ভার্যা-তিরস্কৃত বেকার ও ভাগ্যহীন মানুষের কি গভীর অপমান লেখকগণ হাস্যকৌতুকের অন্তরালে অনুভব করিয়াছেন তাহা কল্পনা করা কষ্টকর নহে। লেখকদের সহানুভূতি এ-সব স্থলে হাস্যকৌতুকের রূপ কেন পাইল সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, লোকের সামান্য দুঃখ ও সামান্য ভাগ্য-বিপর্যয় চিরকাল হাস্যরসিক লেখকদের হাস্যকৌতুকের প্রেরণা যোগাইয়াছে। মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী জীবনযাপন করিবে তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে মানুষ স্ত্রীর হাতে লাঞ্ছিত হয় এবং নিজের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে সে স্বাভাবিক মানুষের ব্যতিক্রম। তাহার আচরণে পৌরুষের যে বিকৃতি দেখা যায় তাহাই হাস্যকৌতুকের আঘাতে পরিস্ফুট করিয়া লেখকগণ সমাজের পৌরুষ জাগ্রত করিতে চাহিতেন। পৌরুষের প্রতি মর্যাদাবোধের প্রতি তখনও সমাজে এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব বর্তমান ছিল।

নিস্তরঙ্গ ও নিরুপদ্রব সমাজজীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আঘাত আসিয়া পড়িত। অসহায়, বলহীন জনগণ প্রতিকারের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না। শুধু কেবল তাহাদের ঘরের দেবদেবীর কাছে তাহারা করুণ প্রার্থনা জানাইত, কিংবা গান, ছড়া ও কাহিনী রচনা করিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাতে তাহাদের অত্যাচারীর উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিত। মনসামঙ্গলের হাসান-হোসেনের পালা ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত দিল্লীতে ভূতের উৎপাত বৃত্তান্তে অত্যাচারপীড়িত হিন্দুগণ বিধর্মী অত্যাচারীর কৌতুকরসাত্মক লাঞ্ছনা দেখিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ করিয়াছে। রাজস্ব আদায় ও শাসন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত অনেক কর্মচারীদের হাতেও সাধারণ লোকেদের নিগ্রহ কম হইত না। কাজী, ফৌজদার, দেওয়ান, কারকুন প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক চরিত্র ছড়া, গীতিকা, মঙ্গলকাব্য ও চরিত-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের উৎপীড়নে সদাশঙ্কিত জনগণ যখন সরস ঘটনাশ্রিত কাহিনীর মধ্যে ইহাদের ভাগ্যবিপর্যয় দেখিত তখন তাহাদের দীর্ঘ-পোষিত প্রতিশোধস্পৃহা কৌতুকহাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হইতেই বাংলার সমাজজীবনে একটি পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাইতেছিল। মুসলমান শাসন অবসিত হইয়া আসিল, কিন্তু ইংরেজ শাসন তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই রাজনৈতিক অরাজকতার আমলে সমাজের মধ্যেও একটা আদর্শহীন অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিল। দৈবনির্ভরশীল নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার ভিত্তি টলিয়া গেল এবং একটা নিষ্ঠাহীন সংশয়ক্ষুব্ধ দৃষ্টি সমাজের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। যে দেবদেবী এতকাল প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাস্তব ধূলামাটির মধ্যে আনিয়া হাস্যকৌতুকের আঙ্গিনায় স্থাপন করা হইল। দেবদেবীর এই বাস্তবায়িত, কৌতুকতরল রূপ ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম দেখাইলেন। তাঁহার হাতে দেবদেবীর চরিত্র ভক্তি অপেক্ষা কৌতুকই উদ্রেক করিল বেশি। ভারতচন্দ্রের পরে পল্লীজীবনের শান্ত ও গতানুগতিক ধারা বিক্ষুব্ধ হইয়া গেল এবং লোকের অবিচল ভক্তির আদর্শও অক্ষুণ্ণ রহিল না সেইজন্য বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যনিয়ন্ত্রিত, ভক্তিরসাশ্রিত রূপও বজায় রহিল না, খণ্ড খণ্ড লৌকিক গান ও কবিতায় বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। যাত্রা, কবি, পাঁচালী, তর্জা, আখড়াই ইত্যাদি গানে বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যেরই খণ্ড ও বিকৃত পরিণতি দেখা গেল। ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বন করিলেও আমোদ

বিতরণই এই সব গানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রোতাদের চিত্ত বাস্তব সমাজের প্রতি ক্রমে ক্রমে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া এই সব গানের রচয়িতাগণ শুধু কেবল দেবদেবীর বাস্তব মৃত্তিকাশ্রিত লীলা দেখাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, দেবদেবীর লীলার সহিত সম্পর্কহীন বহু অপ্রাসঙ্গিক কৌতুকজনক বাস্তব ঘটনার অবতারণা করিতেন। কৌতুকপ্রিয়, তরলচিত্ত শ্রোতাগণ কৌতুকের অনুরোধে এই ধরণের ঘটনাগত অসঙ্গতির মধ্যে কোন দোষ খুঁজিয়া পাইত না। তাহারা কবিগানের উচ্চাঙ্গ আধ্যাত্মিকার প্রতি তেমন অনুরাগ দেখাইত না, কিন্তু যখন লহর ও খেউড়ের আসর আরম্ভ হইত তখন উল্লসিত হইয়া উঠিত। পাঁচালীগানের দেবলীলার মধ্যে যখন তাহারা প্রতিবেশী মানুষদের বিকৃত ও অসঙ্গতি দেখিত তখনই অত্যন্ত মজা পাইত। এখানে ভক্তিপ্রধান করুণরসের পরিবর্তে ভক্তিগৌণ কৌতুকেরই প্রবর্তন দেখা যায়। উপাদান একই, শুধু মিশ্রণ-প্রণালী বিভিন্ন। সাধারণ শ্রোতাদের এই রুচিবিকৃতির জন্য তখনকার লৌকিক গানগুলিও নিম্নগামী রসের স্রোতে নির্বিচারে আত্মসমর্পন করিয়া দিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে সমাজজীবনে বিচিত্রমুখী জটিলতা এবং কর্ম ও ভাবনার শতপ্রকার পথ যেমন উন্মুক্ত হইল জীবনের রসচেতনাও তেমনি বহুতর রীতি ও প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশের উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। পূর্বে হাস্যকৌতুকের ধারা কয়েকটি নির্দিষ্ট পথে শুধু প্রবাহিত হইত। কিন্তু জীবনের অজস্র সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যকৌতুকের প্রকাশও সূক্ষ্মতর ও গূঢ়তর বস্তুকে অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল। বিপরীতমুখী ভাব ও আদর্শের সংঘাতে সমাজের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ও জটিল বিক্ষোভ দেখা দিল তাহার স্বরূপ হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের মধ্যেও ধরা পড়িল। সেজন্য হাস্যরসের প্রকৃতিও অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল হইয়া উঠিল। প্রাচীন ও নবীন আদর্শের সংঘাত, সমাজের সংরক্ষণ-শক্তি ও প্রগতিবাদী শক্তির দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা—এই সবের মধ্যে যে আতিশয্য, গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা ও ভণ্ডামির উপাদান ছিল সেগুলি হাস্যরসিক লেখকদের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছিল। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এক শ্রেণীর হঠাৎ-ধনী, নীতিহীন, আদর্শহীন লোকেদের পুত্রগণ অপরিমিত আদর, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গের ফলে উন্মার্গগামী বাবু নামে পরিচিত হইয়া

পড়িয়াছিল। তাহাদের প্রতি ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্য রচনা করিলেন। একদিকে প্রাচীনপন্থী, অনুদার ও কপট সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া যেমন 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'নবনাটক', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি রচিত হইল তেমনি আবার নব্যপন্থী, উচ্ছৃঙ্খল ও আদর্শ-ভ্রষ্ট সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হইল। প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, সেজন্য তাঁহার কবিতায় উভয় যুগের বিকৃতি ও অসঙ্গতিই ধরা পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সহিত নব পরিচয়ের ফলে সমাজের দৃষ্টি প্রগতির পথে চালিত হইয়াছিল এবং সেজন্য রক্ষণশীল রীতিনীতির প্রতি একটা বিদ্রূপাত্মক মনোভাবই তখন প্রবল ছিল। সেজন্য বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিতেই লেখকগণ বিশেষ প্রবণতা দেখাইয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব্যহিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। প্রাচীন ও পৌরাণিক আদর্শের প্রতি নবজাগ্রত নিষ্ঠা, চিরাচরিত নীতি, প্রথা ও সামাজিক অনুশাসনগুলিকে নব বিচারবুদ্ধি ও শিক্ষিত যুক্তিদ্বারা পুনঃপ্রবর্তনের একটি প্রচেষ্টা দেখা গেল। ইংরেজীশিক্ষিত নব্যপন্থী সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজের মধ্যে যে সংস্কারমূলক ও প্রগতিপন্থী পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে উপহসিত হইল। পাশ্চাত্য রীতিনীতি, বেশভূষা, ভাষাও আচরণের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ বর্ষিত হইল এবং অসার ও কৃত্রিম জাতীয়তা ও স্বদেশউদ্ধারের হাস্যকর প্রচেষ্টাও বিদ্রূপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এই যুগের সাহিত্যনেতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি 'কমলা-কান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য' এবং উপন্যাসগুলির স্থানে স্থানে বিজাতীয়তা, অনুকরণ প্রবৃত্তি, নকল স্বাদেশিকতা, ভণ্ড আচরণ প্রভৃতিকে ক্ষমাহীন বিদ্রূপে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলবোধে অনুপ্রাণিত হইয়াই রঙ্গব্যঙ্গের আঘাতে বিপথগামী ও আদর্শচ্যুত স্বদেশবাসীদিগকে সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদারতা, ও বৃহত্তর কল্যাণচেতনা সকল প্রশ্ন ও বিতর্কের অতীত ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের দোষত্রুটি দেখাইতে যাইয়া মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা ও

পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। প্রহসনকার অমৃতলাল বসু এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা স্বাদেশিকতা, সামাজিক প্রগতি, স্ত্রী-পুরুষের সাম্যবোধ প্রভৃতি দুর্বল ও বিকৃত দিকগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া যে নির্মম ব্যঙ্গবিদ্রূপের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রকার সামাজিক অগ্রগতি ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধেই সংশয় প্রবল হইয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের গতি ঘড়ির দোলকের ন্যায় একবার সম্মুখে এবং একবার পশ্চাতে আন্দোলিত হইয়াছে; সামাজিক মান ও আদর্শের এই অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থিতভাবের জন্য রঙ্গব্যঙ্গের লক্ষ্যও বার বার পরিবর্তিত হইয়াছে। এক সময় যাহার জন্য ভাবোদ্দীপিত আন্দোলন হইয়াছে কয়েক বছরের মধ্যেই অন্য আর এক সময় তাহাই হাস্যের ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। লেখকগণ সামাজিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহারা যে সব বিষয় সমর্থন করিতেন সেগুলি গুরুগম্ভীর রচনায় স্থান দিতেন এবং যে সব বিষয় তাঁহারা সমর্থন করিতেন না সেগুলি রঙ্গব্যঙ্গের আসরে আনিয়া আঘাতের পর আঘাত হানিয়া মজা বোধ করিতেন। প্রত্যেক মহৎ আদর্শ ও বৃহৎ কর্মসাধনাকে যদি বক্র ও অতিরঞ্জিত দৃষ্টি দিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বহু হাস্যকর উপাদান আবিষ্কার করা সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দী এইরূপ আদর্শ ও কর্মসাধনার যুগ ছিল বলিয়া সেই আদর্শ ও কর্মসাধনার বিকৃত রূপ দেখাইয়া ব্যঙ্গপরিহাস করিবার অনুকূল অবস্থাও ছিল যথেষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সমাজের চিন্তাভাবনা একই নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচয়ের ফলে সমাজের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচিত্র আদর্শের প্রকাশ দেখা যায়। সেজন্য পরস্পরবিরোধী মত ও আদর্শ একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। আত্মপক্ষ সমর্থন এবং প্রতিপক্ষের মত ও পথ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে লঘু ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা সমাজের মধ্যে লক্ষিত হইল এবং তাহারই ফলে হাস্যরসাত্মক রচনায় উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তুর এত বিচিত্র বহুলত্ব দেখা গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর হাস্যরসাত্মক রচনায় যে তীব্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর রচনায় তাহা দেখা যায় না। কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিলে প্রতিপক্ষের মতবাদের ভ্রান্তি ও

অসারতা দেখাইবার একটা প্রবল আগ্রহ থাকে। বিংশ শতাব্দীতে বিপরীত সামাজিক মতবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের ফলে প্রতিপক্ষের মত লইয়া তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিবার আগ্রহ ও প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে। মানুষের চিরন্তন দোষ ও দুর্বলতা, বিকৃতি ও ভণ্ডামি লইয়াই হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস এখন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির হাস্যরস বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তি সমর্থিত হইবে। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তো হাস্যরস প্রায় বিলুপ্ত হইতেই বসিয়াছে। যে সামাজিকতা, পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা, আড্ডা ও মজলিসীভাব হইতে হাস্যকৌতুকের জন্ম হইতে পারে বর্তমান জীবনে সে সবের নিতান্তই অভাব দেখা যাইতেছে। জীবনের যে উদার অবকাশ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতা হইতে সর্বপ্রকার রসবোধের উদ্ভব আজিকার দিনে তাহার সুযোগ কোথায়? আজ মানুষ কর্মব্যস্ত, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক। সেজন্য হাস্যবোধ তাহার জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে। মানুষের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার ফলে শুধু কেবল ঐক্য ও মিলনই যে ঘটে তাহা নহে, ঝগড়া, দলাদলি, ঈর্ষা ও নিন্দা প্রভৃতিও ঘটিয়া থাকে। সাহিত্যক্ষেত্রে এগুলিই রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানকালে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ অনেকটা প্রতিবেশনিস্পৃহ বলিয়া এই সব দুর্বলতা হইতে একেবারেই মুক্ত, এবং সেজন্য তাহার সাহিত্যও ইহাদের অভাবে রঙ্গব্যঙ্গের আসর আর জমাইতে পারিতেছে না। আধুনিক মানুষ কোন সামাজিক মতের প্রতি আর দৃঢ় আস্থাশীল নহে বলিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার আগ্রহও তাহার নাই, সেজন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাতে কাহাকেও জব্দ করিবার প্রয়োজনও তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মতবাদের পার্থক্যই তীব্র আক্রমণের প্রেরণা যোগায় এবং হাস্যরস সৃষ্টি ইহারই একটা গৌণ ও আনুষঙ্গিক ফলরূপে দেখা যায়। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য সমালোচনা ও কল্লোলগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির সুপরিকল্পিত অভিযান আঘাতের চতুরতা ও অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্যই একপ্রকার কৌতুকরসের উদ্রেক করে। অধুনাতন রাজনৈতিক মতভেদ হাসি অপেক্ষা শ্লেষের উপাদানই যোগায় বেশী।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ ও শ্রেণীবৈচিত্র্য

হাস্যরসের যতগুলি শ্রেণী আছে তাহাদের মধ্যে কৌতুকরস সাধারণত ঘটনাকে আশ্রয় করে এবং ইহাতে হাসির প্রাবল্যও সর্বাপেক্ষা বেশি। সেজন্য শিশু ও অপরিণত মনের নিকট এই কৌতুকরসের আবেদন যতখানি ততখানি আর অন্য কোন শ্রেণীর হাস্যরসের নহে। প্রাচীন সাহিত্য যে অপরিণতবুদ্ধি শ্রোতাদের জন্য লিখিত হইয়াছিল তাহাদের কাছে কৌতুকরসই সমধিক প্রিয় ছিল। সেজন্য এই সাহিত্যে কৌতুকরসই প্রাধান্য পাইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের হাস্যরসাত্মক বর্ণনার মধ্যে এই কৌতুকরসের অবতারণাই বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্ভকর্ণ, হনুমান, ঘটোৎকচ ইত্যাদির বৃত্তান্তে কবিগণ যে উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত বর্ণনার আশ্রয় লইয়াছেন তাহাতে কৌতুকরসের অট্টহাস্যই উদ্রিক্ত হইয়াছে। অবশ্য জায়গায় জায়গায় কবিগণ সূক্ষ্মতর ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমূলক রসিকতার নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছেন। মন্দ ও নিন্দনীয় চরিত্রগুলির জব্দ হইবার ও শাস্তি পাইবার কাহিনী বর্ণনায় শ্রোতাদের সহিত মিলিত হইয়া কবিগণও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। অপরের ক্ষতি করিতে যাইয়া নিজেরই ক্ষতি করিয়া বসা, বার্গসোঁ ইহারই নাম দিয়াছেন Inversion.[১] কুঁজী, শূর্পনখা, শকুনি, কীচক ইত্যাদি এই Inversion-এর দৃষ্টান্ত। এই সব চরিত্রবর্ণনায় কবিদের সচেতন বিদ্রূপপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। অঙ্গদের রায়বার কিংবা লঙ্কার রমণীদের সহিত হনুমানের রসিকতার মধ্যে বাগ্‌চাতুর্যমূলক হাস্যরসের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

নাথ-সাহিত্য, শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির মধ্যে ঘটনার অতিরঞ্জিত ও উদ্ভটত্বের মধ্য দিয়া এই কৌতুকরসই সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিব-পার্বতীর বিবাহ, শিব-পার্বতীর কলহ, কোচনীদের প্রতি শিবের অবৈধ আসক্তি ইত্যাদি বিষয় কৌতুকরসই প্রেরণা যোগাইয়াছে। সাধারণত এ-বিষয়গুলির মধ্যে তেমন কিছু হাস্যকরত্ব নাই, কিন্তু দেবাদিদেব মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর লীলা সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চ প্রত্যাশা থাকে, তাঁহাদের ক্ষুদ্র মানবোচিত আচরণে তাহা রূঢ়ভাবে খণ্ডিত হয়, এবং তাহাতেই আমাদের হাস্যবেগ উত্তেজিত হইয়া

১। Laughter—P.94. দ্রষ্টব্য।

উঠে। কাণ্টের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণীয়—'Laughter is an expectation dwindled into nothing'.

আমাদের প্রত্যাশা ও বর্ণিত বস্তুর ব্যবধান যত বেশী হয় কৌতুকরস ততই প্রবল হইতে থাকে। সেজন্য অসাধারণ চরিত্রকে অকস্মাৎ সাধারণ স্তরে আনিলেই তাহা দুর্দমনীয় কৌতুক উদ্রেক করে। মহাদেব দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়াই কৌতুকরস উৎপাদনে কবিগণ তাঁহাকেই প্রধানত অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের প্রাবল্য শুধু কেবল বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে নাই, প্রধানত নির্ভর করিয়াছে বর্ণনাভঙ্গি ও চরিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যের উপর। রামেশ্বর, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র যখন শিবের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তখন বাস্তব সাংসারিক প্রতিবেশ অবিকল চিত্রিত করিয়া, সরস বাক্য ও অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া এবং মাঝে মাঝে নিজস্ব টীকাটিপ্পনী যোগ করিয়া কৌতুকরসের ধারাকে এত স্বাভাবিক ও চমকপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যের হাস্যরসাত্মক অংশগুলির মধ্যে কৌতুকরসই প্রাধান্য পাইয়াছে। কুরূপাদের বর্ণনায় শুধু দৈহিক বিকৃতির বর্ণনা দ্বারা স্থূল কৌতুকরস সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃদ্ধাদের ও গোধার বর্ণনায় শুধু দৈহিক বিকৃতি নহে, আরও গভীর উৎস হইতে কৌতুকরসের উদ্ভব হইয়াছে। বিগতযৌবন ও কুৎসিত আকৃতি সত্ত্বেও যখন তাহারা প্রেমনিবেদন করিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল তখন তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি দেখিয়া আমাদের কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। লহনা ও খুল্লনার মারামারি, কালকেতুর ভোজন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোটালদের স্ত্রীবেশ ধারণ, দিল্লীতে ভূতের উৎপাত দাসু-বাসুর খেদ এবং ধর্মমঙ্গলে কর্পূর ও ধুমসী চরিত্রের কীতিকলাপ সবই কৌতুকরসাত্মক। কৌতুকরস প্রধান হইলেও মঙ্গলকাব্যে অন্যপ্রকার হাস্যরসেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গীয় কবি মুকুন্দরাম ও কেতকাদাস ক্ষমানন্দ যখন বাঙাল মাঝিদের বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন তখন তাহার মধ্যে কবিদের ব্যঙ্গপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মনসামঙ্গলের হাসানহোসেন পালার তকাই মোল্লা, চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্ত ও অন্নদামঙ্গলের হীরামালিনী প্রভৃতি চরিত্র ব্যঙ্গরসাত্মক। ইহাদের চরিত্রচিত্রণে কবিদের মানসিক ভাব ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের শাস্তিবিধান করিয়া তাঁহারা তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন। অবশ্য ব্যঙ্গরসসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কেহই নহেন। ব্যঙ্গের জন্য যে কলাকুশলী বাগ্‌ভঙ্গি, মার্জিত ভাষা, সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিদগ্ধ

মন দরকার তাহা রাজসভার নাগরিক কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যেই থাকা স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, ধ্বন্যুক্তি প্রভৃতি শব্দালঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমূলক হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। শব্দালঙ্কারের আবেদন প্রধানত শ্রবণশক্তির কাছে এবং ইহা মনে রাখিতে হইবে, মঙ্গলকাব্য মূলত লিখিত হইয়াছিল শ্রোতাদের জন্য, পাঠকদের জন্য নহে, সেজন্য শব্দালঙ্কার প্রয়োগে শ্রোতাদের কর্ণে সুখকর চমৎকারিত্ব উৎপাদনের চেষ্টা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ধর্মমঙ্গলে কয়েকজন এয়ো রমণীর নাম এভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাময়ী ক্ষীণোদর খুদি।
সনাতনী সুলোচনী সুয়াগী সম্পদি॥
ভগবতী ভানুমতী ভাগ্যবতী রতি।
শঙ্করী সারদা সীতা সত্যভামা সতী।

এই নামগুলি তৎকালীন সমাজে অসাধারণ ছিল না। বিশেষত শেষ দুই পঙ্‌ক্তির নামগুলি তো খুবই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহাদের একত্রিত সমাবেশের মধ্যে কবির হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই সব নামের বর্ণনার মধ্যে কোন হাস্যকরত্ব নাই, কিন্তু যখন উচ্চারিত হয় তখন অনুপ্রাসযুক্ত শব্দগুলি কানের মধ্যে যে ঐকতান সুরু করে তাহাই বিশেষ আমোদজনক মনে হয়। অলঙ্কার-প্রয়োগ দ্বারা হাস্যরসসৃষ্টিতেও অবশ্য ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে হয়।

বৈষ্ণবসাহিত্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবমূলক হইলেও যেখানে যেখানে কবিগণ রাধাকৃষ্ণের ভাবাবেগময় প্রেমকে সাংসারিক জটিল সম্বন্ধ এবং ধূলিমলিন বাস্তব জীবনের ক্রিয়া ও আচরণের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন সেখানে সেখানেই হাস্যকৌতুকের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদ ও বড়াইয়ের দৈহিক আকৃতি বর্ণনায় স্থূল কৌতুকরসই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবশ্য বর্ণনানৈপুণ্য এই স্থূলতার মধ্যে কিছু সূক্ষ্মতার আভাস দিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মনা রাধার রন্ধন-বিপর্যয়ের বর্ণনাও কৌতুকরসাত্মক। কৃষ্ণকে রাধার ভার বহন করিতে এবং রাধার মাথায় ছত্রধারণ করিতে দেখিয়া আমরা হাসি। কারণ কৃষ্ণের ন্যায় দেবচরিত্রের সাধারণ মানুষের মত আচরণ আমাদের চোখে খুবই বিসদৃশ ও অসঙ্গত ঠেকে। প্রেমের জন্য এতখানি কষ্টস্বীকার, ইহার মধ্যে যে আতিশয্য আছে তাহাও বিশেষ হাস্যজনক হইয়াছে।

কৃষ্ণের জন্য রাধার আর্তি এবং ব্যাকুলতার মধ্যে কোন হাস্যকরত্ব নাই। কারণ কৃষ্ণ সকলের আরাধ্য দেবতা। কিন্তু রাধার জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুল সাধনা ও অনুরক্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক নীতির topsyturvydom রহিয়াছে। তাহাই বিশেষভাবে হাস্য উদ্রেক করে। মানভঞ্জনের পালার মধ্যে সেজন্য একটা হাস্যজনক ভাব রহিয়াছে। কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে যেখানে তিনি নানা ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া রাধার কাছে আসিয়াছেন, সেখানে পরিস্থিতিঘটিত কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে। হোরিখেলা প্রভৃতির মধ্যে উদ্দাম কৌতুকরস জমিয়া উঠিয়াছে। দানলীলা, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন প্রভৃতি পালায় কৃষ্ণ ও রাধার সখীগণের মধ্যে যে শ্লেষ, বক্রোক্তি, কুটিল ভাষণ প্রভৃতি চলিয়াছে সেসব যথেষ্ট হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে।

চৈতন্যচরিত-সাহিত্যে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতিকে দেবতার অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেজন্য তাঁহাদের প্রতি আমাদের একটি ভক্তিমিশ্রিত কৌতূহলের ভাব বজায় থাকে। তাঁহাদিগকে যখন আমরা নিতান্তই সাধারণ লোকের মত আচরণ করিতে দেখি তখন তাহা আমাদের নিকট খুবই কৌতুকজনক মনে হয়। নিমাইয়ের দুরন্তপনা সেজন্যই আমাদের কাছে এত অদ্ভুত লাগে। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য দুইজনেই আমাদের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া তাঁহাদের ঝগড়া আমাদের কাছে এত কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। কাজীদলন-বৃত্তান্তটির মধ্যে কবির ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যাচারিত হিন্দুদের সুচির-লালিত প্রতিশোধ-স্পৃহাই কাজীদমনের মধ্য দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

কথাসাহিত্যের কতকগুলি গল্প নিছক কৌতুকরসাত্মক। হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী, সওদাগরের সাতছেলে ও নূতন জামাই এই গল্পগুলির মধ্যে উদ্ভট পরিস্থিতি হইতে প্রবল কৌতুকরসের উদ্ভব হইয়াছে। শুধু কেবল কাহিনীর মধ্যে নহে, কাহিনী বলিবার অনবদ্য সরস ভঙ্গি হইতেও কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে। এমন একটি অন্তরঙ্গ ঢঙে গল্পগুলি বর্ণিত হইয়াছে, এবং মাঝে মাঝে এমন সব টীকাটিপ্পনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে কৌতুকের আঘাতে আঘাতে শ্রোতাকে বিপর্যস্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গল্পটিও চমকপ্রদ পরিস্থিতিগত কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু কৌতুকরসের সর্বাপেক্ষা আতিশয্য দেখা গিয়াছে দেড় আঙ্গুলে ও বাইশ জোয়ান আর তেইশ

জোয়ান নামক গল্পে। যাঁহাদের কল্পনা হইতে এই গল্পদুইটির উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহাদের রসবোধের তুলনা নাই। 'দেড় আঙ্গুলে হুটিং হুটিং করিয়া হাঁটে, ফটিং ফটিং করিয়া নাচে'—এই ধরণের বর্ণনার মধ্যে শব্দপ্রয়োগের যে চাতুর্য দেখা যায় তাহা হইতেই কৌতুকরসের সঞ্চার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাইশ জোয়ান ও তেইশ জোয়ানের মত কৌতুক রসাত্মক গল্প আর আছে কিনা সন্দেহ। কাহিনীর উদ্ভট মৌলিকতা, অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির সুকৌশলী গাঁথুনি এবং সরস বর্ণনাভঙ্গি প্রভৃতির ফলে গল্পটি এতখানি কৌতুকাবহ হইয়াছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'দাদা মহাশয়ের থলে'র ভূত ও রাক্ষসের গল্পগুলির উদ্দেশ্য শিশুচিত্তে শুধু ভয় নহে কৌতুক উৎপাদন করাও বটে। অবশ্য আতঙ্কজনক কাহিনী শুনিলে চিত্তের যে ভয়বিহ্বল উত্তেজনা হয় তাহা আতঙ্কের কারণ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে আকস্মিক স্বস্তিলাভের ফলে কৌতুকে ফাটিয়া পড়ে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পকার রাক্ষসের গল্প বলিবার সময় ভয় ও কৌতুক একই সঙ্গে শ্রোতাদের চিত্তে সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি, হাড়মুড়মুড়ি ব্যারাম, খোক্কসের গিরগিটির ছা-তে পরিণত হওয়া—ইত্যাদি বৃত্তান্ত গল্পকারের কৌতুকসৃষ্টির সচেতন চেষ্টা বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। রাক্ষসদের মুখে নাকী-ভাষা ব্যবহার করিয়া সেই ভাষাকেও কৌতুকময় করিয়া তোলা হইয়াছে, পশুপক্ষীর গল্পে কৌতুকসৃষ্টি তখনই হইয়াছে, যখন উহাদের উপর মানবিক প্রবণতা আরোপ করা হইয়াছে। বার্গসোঁর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'you may laugh at an animal, but only because you have detected in it some human attitude or expression'. শিয়ালকে যখন আমরা পাঠশালা খুলিয়া পণ্ডিতের আসনে বসিতে দেখি, বাঘকে যখন রাজকন্যা বিবাহ করিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত দেখি, কিংবা ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখীর মধ্যে মানবীয় বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করি তখনই আমরা বিশেষ কৌতুকবোধ করি। এইসব গল্পের গল্পকারগণ যে ভাবে গল্পের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কৌতুকসৃষ্টির খুবই অনুকূল হইয়াছে। নরহরি দাস, মজন্তালী সরকার ইত্যাদি নামকরণের মধ্যেই গল্পকারদের কৌতুকসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির মধ্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সুপ্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। গল্পগুলির হাস্যরস প্রধানত নির্ভর করিয়াছে গোপালের সুচতুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শাণিত শরসন্ধানী উক্তি এবং অব্যর্থ লক্ষ্য টীকাটিপ্পনীতে। গোপালের চেহারা কমিক কিন্তু তাঁহার কথা

witty।[১] তাহার দুই একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বিদ্যুৎ-বিভাসের ন্যায় হঠাৎ একটি অদৃষ্ট, অভাবনীয় জগৎকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, কিংবা নিমেষের মধ্যে কোন উচ্চ অবস্থাস্থিত ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। সুনিপুণ শরচালকের মত গোপাল অত্যন্ত অবিচলিত ও অনুত্তেজিত ভাবে শরচালনা করে কিন্তু তাঁহার লক্ষ্যস্থান তীক্ষ্ণ আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যায়। গোপালের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ধারাল কিন্তু অতিশয় মার্জিত। তাহাতে উষ্মা নাই, উত্তেজনা নাই, এবং কোন কদর্যতা নাই। কতকগুলি গল্পে অবশ্য পরিস্থিতিগত কৌতুকরস রহিয়াছে, যথা গোপালের অদ্ভুত রন্ধন, দ্বিতল বৈঠকখানা-নির্মাণ, খট্টাঙ্গপুরাণ-আলোচনা প্রভৃতি।

পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে বাংলার অতীত সমাজজীবনের রঙ্গরসিকতার অনেক নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এইগুলি প্রধানত করুণরসাত্মক হইলেও পল্লীকবিগণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য মাঝে মাঝে হাস্যকৌতুকের অনুকূল ঘটনা অথবা চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কোথাও তাঁহারা নির্দোষ ঠাট্টারসিকতার রমণীয় পরিবেশ রচনা করিয়াছেন এবং কোথাও বা কঠোর ব্যঙ্গবিদ্রূপেব বিদ্ধ করিয়া দোষী ও দুর্বত্ত চরিত্রের শাস্তিবিধান করিয়াছেন। মাঝে মাঝে, যথা মহুয়া ও নদেরচাঁদ, কিংবা কমলা ও চিকণ গোয়ালিনীর রসিকতায় শ্লেষ ও বক্রোক্তির ধারাল দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিয়াছে। তিনকড়ি কবিরাজ কিংবা রামগতির ন্যায় নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্র ও স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে। নীচ, স্তাবক, স্বার্থপর ও অনিষ্টকারী চরিত্রের প্রতি পল্লীকবিদের বিদ্রূপ অনেক স্থলেই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মহিষাল বন্ধু' পালার সুদখোর আমাঢ়িয়া মণ্ডলের নাম করা যাইতে পারে। পল্লীকবি ও তাহার শ্রোতাদের অনেকেই বোধ হয় এই ধরণের সুদখোর মহাজনের দ্বারা শোষিত হইয়াছিল; সেজন্য ইহার চরিত্র বর্ণনায় কবি নিজের উষ্মা ও বিতৃষ্ণা গোপন রাখিতে পারেন নাই, যথা—

> লেংটি পিন্ধ্যা থাকে শালা পাটি নাই ঘরে।
> দিনরাত শুইয়া বইয়া সুদের চিন্তা করে॥
> ট্যাকারে কুমইর ব্যাটা লোকে করজ দিলে।
> হিসাব কইরা সুদ লয় কড়া ক্রান্তি তিলে॥

১। 'A word is said to be comic when it makes us laugh at the person who utters it, and witty when it makes us laugh either at a third party or at ourselves.' Laughter—Bergson, P.104.

কুটনী জাতীয় স্ত্রীলোক পল্লীসমাজের অনেক পরিবারের সর্বনাশ করিত বলিয়া ইহারাও কবিদের ব্যঙ্গের একটি প্রধান লক্ষ্য স্থল ছিল। নেতাই কুটনী, চিকণ গোয়ালিনী, শ্যামপ্রিয়া ইত্যাদি চরিত্রের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের চরিত্রচিত্রণে কবিদের বর্ণনা অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং বক্র মন্তব্যের দ্বারা রসাল হইয়া উঠিয়াছে যথা—

গেরামে আছয়ে এক চিকণ গোয়ালিনী,
যৌবনে আছিল যেমন সবরি কলা চিনি ॥

কিংবা—

সদাই আনন্দ মন করে হাসি খুশী।
দই দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥

ছেলেভুলানো ছড়াগুলি শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই উদ্ভূত হইয়াছে। যে শিশু দুরন্ত, অবাধ্য, বায়নাদার তাহাকে ভুলাইবার জন্যই ছড়ার সৃষ্টি। মা যখন সুর করিয়া শিশুকে ছড়া শোনান, তখন শিশু তাহার কিছুটা অর্থ বোঝে এবং অনেকটাই বোঝে না। কিন্তু ছড়া শুনিয়া সে একটা বিশেষ ধরণের মজা পায়। ইহা ছড়ার অন্তর্নিহিত অর্থসঞ্জাত নহে, ইহা ছন্দের প্রভাবে শিশুমনের একপ্রকার স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র। ছন্দের দোলায় দোলায় তাহার অস্ফুট মানসিক অনুভূতিগুলির মধ্যে শিহরণ খেলিয়া যায়। শিশুর বোধশক্তি সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে কোন সীমারেখা টানিতে জানে না, সেজন্য একানোড়ে, কটকটে, জুজুমানা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা যখন তাহাকে শোনানো হয় তখন সে ভয় পায়। কিন্তু পরিণতবুদ্ধি বয়স্কলোকের কাছে ঐ প্রাণীগুলি অসম্ভব বলিয়া উহাদের উল্লেখ শুধু কৌতুকজনক বোধ হয়। হট্টিমা-টিমটিম, ফটিংটিং, হট্টমালার দেশ প্রভৃতি শিশুর মনে অবিমিশ্র কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু বয়স্ক লোকের কাছে ঐগুলি শুধু কেবল অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুক উৎপাদন করে। শিশুর বিবাহপ্রসঙ্গ লইয়া যে ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে সেগুলি শিশুর কাছে আনন্দজনক বটে, কিন্তু কৌতুকজনক নহে। কিন্তু শিশুর চারপাশে যে সব বয়স্কলোক থাকে তাহাদের কাছে সেগুলি কৌতুকজনক, কারণ বরের বয়সের সঙ্গে বড়মানুষের ঝিকে বিবাহ করার গুরুতর অসঙ্গতিটা শুধু কেবল তাহাদের কাছেই ধরা পড়ে। ছেলেভুলানো ছড়াগুলি শুধু কেবল কৌতুকহাস্য উদ্রেক করে নাই, মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক হাস্যও উদ্রেক করিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

মধ্যেও ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অপরকে হেয় করার প্রবৃত্তি যথেষ্ট দেখা যায়। বিদ্রূপাত্মক ছড়াগুলির মধ্যে দৈহিক বিকৃতির উল্লেখ এবং আমোদের অজুহাতে গালাগালিরই প্রবণতা দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে যাহারা এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করে এবং যাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয়, এই উভয় শ্রেণীর কাহারাও এই সব ছড়া হইতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করে না। বাঁশ বাগানের প্যারি, গোবর গাদার কালাচাঁদ ইত্যাদি আখ্যার মধ্যে এমন এক একটি ধারাল অব্যর্থলক্ষ্য অস্ত্র লুক্কায়িত আছে যে প্রয়োগ করা মাত্রই উহারা প্রতিপক্ষের হৃদয় একেবারে বিদ্ধ করিয়া দেয়।

প্রবাদের উপযোগিতা বাক্যের অলঙ্করণে, শব্দার্থের দ্যোতনায় এবং কোন আকস্মিক যুক্তি সমর্থনে। এজন্য প্রবাদের মধ্য হইতে যেখানে হাস্যরস উদ্ভূত হইয়াছে সেখানে তাহা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ঝলসান দীপ্তির আকারেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবাদের মধ্যে স্বল্পতম শব্দ প্রয়োগ করিয়া এমন একটি বৃহৎ সত্য কিংবা বিস্তৃত পরিবেশ রচনা করা সম্ভব যাহা হয়তো বহু বাক্য অথবা বিশদ ব্যাখ্যার দ্বারাই শুধু কেবল বুঝানো যাইতে পারে। প্রবাদগুলির এমন একটি সর্বজনস্বীকৃতি আছে যে, ইহাদের সুপ্রয়োগে সকলের মনের উপরেই তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। অনেকগুলি প্রবাদ অতিশয়োক্তি, অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে। প্রায়ই বক্তার কোন উক্তি অথবা ধারণা সমর্থনে প্রবাদগুলির প্রয়োগ হয়। শ্রোতাগণ বক্তার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এবং আপাত অপ্রাসঙ্গিক প্রবাদবাক্যের গূঢ় মিল আবিষ্কার করিতে পারিয়া কৌতুক বোধ করে। প্রবাদগুলির উদ্দেশ্য হাস্যের আচমকা আলোকে কোন প্রতিষ্ঠিত জীবন-সত্যকে তুলিয়া ধরা। সেজন্য প্রবাদবাক্যগুলির অধিকাংশ শ্লেষ ও তির্যক ভাষণের দ্বারা কৌতুক-কণ্টকিত করিয়া তোলা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে আবার ব্যঙ্গবিদ্রূপের খরতর স্পর্শ রহিয়াছে। কলহবিবাদে সেইগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় কাজ করে। মৌখিক বিবাদে যেখানে শুধু কেবল গালাগালি ব্যবহার হয় সেখানে একটা বিরক্তিকর কদর্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যেখানে প্রবাদবাক্যগুলি সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্রের মত প্রযুক্ত হয় সেখানে বিবাদও একটা উপভোগ্য আর্টে পরিণত হয়। যিনি বিবাদের ভাষাকে আর্টের পর্যায়ে তুলিতে পারেন জয়লাভ তাঁহার সুনিশ্চিত।

যাত্রাগানের হাস্যরসও প্রধানত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমূলক। যাত্রাগানের

বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন অভিনব বৈচিত্র্য ছিল না। সেজন্য ঘটনাগত হাস্যরস সৃষ্টির নূতন সুযোগ ইহাতে তেমন কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে যাত্রা-ওয়ালাগণ কৌতুকসৃষ্টির জন্য হয়তো অকারণেই দীর্ঘ লাঙ্গুল বিশিষ্ট হনুমান, লম্বমান শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত নারদমুনি কিংবা অতিবৃদ্ধা চলিতযষ্টি বড়াই বুড়ির মত চরিত্র আমদানী করিতেন। কিন্তু এরূপ চরিত্র আমদানী করিবার সুযোগ বেশি ছিল না; এবং যাত্রাওয়ালাদের হাস্যরস সৃষ্টির জন্য প্রধানত পরিচিত চরিত্রগুলির চাতুর্যময় বাগ্‌ভঙ্গির উপর নির্ভর করতে হইত। অধিকাংশ স্থলে রাধার সহিত সখীদের, কিংবা কৃষ্ণের সহিত সখীদের উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্যে হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যাইত। রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবিচ্ছিন্ন ও অকণ্টকিত নহে, তাহা কপট বিরাগ, কৃত্রিম অভিমান ও সাময়িক বিচ্ছেদে জটিল ও সমস্যাকীর্ণ। যাত্রাওয়ালাগণ এই সব স্থলে কৃষ্ণ ও রাধার সখীদের মধ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক উক্তি, গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ বক্রভাষণ, সূক্ষ্ম বিদ্রূপনিক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারা শ্রোতাদের রসিক চিত্তকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। এই বাগ্‌যুদ্ধে কৃষ্ণই অধিকাংশ স্থলে পরাজিত হইতেন এবং কৃষ্ণের এই পরাজয়ে শ্রোতারা বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন। যাঁহার কাছে সকলেই পরাজিত হয় তাঁহাকে যখন পরাজয় বরণ করিতে দেখি তখন প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপর্যয়ে দর্শকদের কৌতুক বোধ হইত। যাত্রার বিষয়বস্তুর মৌলিকতা ছিল না বলিয়াই রসসৃষ্টির জন্য যাত্রাওয়ালাদের প্রধানত শব্দ ও বাক্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। সেজন্য শব্দের অলঙ্করণ ও বাক্যের অভিনব প্রয়োগকৌশলের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি দিয়াছিলেন।

উক্তিপ্রত্যুক্তির লড়াই চূড়ান্ত রূপ লাভ করিল কবি ও তর্জা গানে। যাত্রাগানে তবুও সাজসজ্জার মধ্য দিয়া একটু আধটু রসসৃষ্টির সুযোগ ছিল। কিন্তু কবিগানে সেই সুযোগও ছিল না। সেজন্য কবিগানের হাস্যরস সম্পূর্ণরূপে শব্দ ও বাক্যাশ্রয়ী ছিল। কবিগণের বাদপ্রতিবাদ জমিয়া উঠিত লহর ও খেউড় অংশে। এই অংশই শ্রোতাদের কাছে প্রিয় ছিল। কবিয়ালগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে বাস্তব সংসারের প্রতিবেশ আনিয়া ফেলিতেন; গভীর ভাবাবেগ যখন কুৎসিত গালাগালিতে পরিণত হইত তখনই শ্রোতাগণ আকস্মিক রসপরিবর্তনের আঘাতে আমোদে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। কবিগানে অনেক স্থানে সোজাসুজি অনাবৃত গালিগালাজ বর্ষিত হইত, সে-সব স্থানে কোন হাস্যরসের শিল্পকৌশল ব্যক্ত হইত না।

কিন্তু যে সব স্থানে প্রচ্ছন্ন কটূক্তি ও গূঢ়ার্থমূলক শরনিক্ষেপ চলিত সে সব স্থানেই রসিক শ্রোতার চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠিত। রামবসু রামপ্রসাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া বলিলেন—

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন,
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজে নাক একটি দিন ॥
যেমন রাতভিখারীর ধামাবওয়া থাকে এক এক জন।
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন ॥

এখানে রামপ্রসাদের সহিত এক একটি হীনবস্তুর তুলনা করিবার ফলেই হাস্যরসের সঞ্চার হইয়াছে। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি কবিগানের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক সময় একটি শব্দ, যথা প্রতিপক্ষ কবিয়ালের নাম অথবা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহু বিচিত্র অর্থে এবং বিভিন্ন পরিবেশে তাহা চাতুর্যপূর্ণ উপায়ে প্রয়োগ করিয়া চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা হইয়াছে।

দাশরথি রায় পাঁচালী লিখিতে যাইয়া বিষয়বস্তুর দিক দিয়া যদিও প্রাচীন ও বহুপ্রচলিত আখ্যানগুলিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হাস্যরসের প্রধান উৎস ছিল তাঁহার সুগভীর বাস্তবতাবোধ ও সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি। তিনি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহার সমসাময়িক বাস্তব সমাজের বহু চিত্র ও চরিত্র ঢুকাইয়া দিয়াছেন এবং তাহারাই হাস্যরসের প্রধান বস্তু হইয়াছে। দাশরথির হাস্যরস প্রধানত চরিত্রগত। মূর্খ ও ঔদরিক ব্রাহ্মণ, অনুদার সংকীর্ণচেতা বৈষ্ণব, হাতুড়ে চিকিৎসক, বস্ত্রালঙ্কারলিপ্সু, ঈর্ষাকলহ-পরায়ণা অন্তঃপুরিকা রমণী ইত্যাদি বহু বিচিত্র চরিত্র লইয়া তিনি হাস্যরসের আসর জমাইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রচিত্রণে পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা, দোষ ও বিকৃতির প্রতি অভ্রান্ত দৃষ্টি, উপমাপ্রয়োগে পরিপক্ক কুশলতা ও তীক্ষ্ণধার টীকাটিপ্পনীর শরস্পর্শ রহিয়াছে। কখনও চরিত্রগুলি নিজেদের কথা ও আচরণের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কখনও বা কবি স্বয়ং ভাষ্যকার হইয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দোষত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। যেখানে তিনি নিজেই চরিত্রের অসঙ্গতি দেখাইয়াছেন সেখানে তাঁহার মন্তব্যগুলি একটু তীব্র হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু হাস্যরসের প্রাবল্যের জন্য বিদ্রূপের জ্বালা কোথাও অসহনীয় হয় নাই। চরিত্রগত হাস্যরস ছাড়া বাগ্‌বৈদগ্ধ্যসৃষ্টিতেও দাশরথির সমান পটুতা ছিল। ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশের অন্ত্যানুপ্রাসসৃষ্টিতে তাঁহার তুলনা ছিল না। দাশরথির উপমানবস্তু একটি

অপরটি হইতে এত দূরজগৎ হইতে গৃহীত যে, উপমাগুলি শ্রোতাদের কল্পনা-শক্তিতে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে এবং তাহার ফলে হাস্যবেগ উত্তেজিত হইয়া উঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবসংঘাত যখন স্থরু হইয়াছে তখন দুইজন ব্যঙ্গরচয়িতা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। ইহারা দুইজনেই সাময়িক পত্রের সম্পাদক, সেজন্য সমাজ সম্বন্ধে ইঁহাদের জ্ঞান ছিল প্রচুর এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিও ছিল গভীর। ইঁহারা দুইজনেই ভাবাদর্শে প্রাচীনপন্থী ছিলেন এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত দিয়া ভ্রান্ত ও বিপথগামী নব্যসমাজকে শোধন করাই ছিল ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ইঁহারা হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র ভোজ্যবস্তু, পালপার্বণ ও উৎসবের বর্ণনা যখন করিয়াছেন তখন তিনি কৌতুকহাস্য উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তিনি সামাজিক অবস্থা, ও নবীন, আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্বভাব ও আচরণ চিত্রিত করিয়াছেন সেখানে তাঁহার হাস্য ব্যঙ্গের স্পর্শে কঠিন ও নির্মম হইয়া উঠিয়াছে। কবির রঙ্গরসাত্মক কবিতাগুলি প্রধানত অলঙ্কৃত শব্দপ্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়াছে এবং ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতাগুলি শ্লেষাত্মক বাক্য এবং কবির নিজস্ব মন্তব্যে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ভবানীচরণ 'নবদূতী বিলাসে' নিছক রঙ্গরস প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাসে' ব্যঙ্গরসসৃষ্টিই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বর-গুপ্তের ন্যায় ভবানীচরণ ব্যঙ্গের মধ্যে কোথাও নিজেকে ধরা দেন নাই। তাঁহার ব্যঙ্গ বরাবর irony অর্থাৎ শ্লেষাত্মক রীতি অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা তাঁহার ব্যঙ্গের লক্ষ্য তাহাদের সম্বন্ধে তিনি একটিও তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, গুরুগম্ভীর ভাষায় তাঁহাদের স্বভাব ও আচরণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং কোথাও কোথাও প্রশস্তি রচনা করিয়া তাঁহাদের চরিত্র মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভবানীচরণ জানিতেন নিন্দনীয় চরিত্রকে যত মহৎরূপে দেখানো হইবে ততই ব্যঙ্গের আঘাত তীব্র ও স্থায়ী হইয়া উঠিবে।

ঈশ্বর গুপ্ত ও ভবানীচরণের পর আর দুইজন হাস্যরসিকের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করিতে হয়। ইঁহারা দুইজনেই কথ্যভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুইজনেই সমসাময়িক সমাজচিত্র-অঙ্কনে অসাধারণ পটুতা দেখাইয়াছেন এবং দুইজনেই ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখিয়াছেন। ইঁহারা হইলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিষয়বস্তু ও উপন্যাস রীতি উভয় দিক দিয়াই প্যারীচাঁদ

ভবানীচরণের কাছে ঋণী। বাবু সম্প্রদায়ের অধঃপতনের চিত্র উভয় লেখকই অঙ্কন করিয়াছেন। 'নববাবুবিলাসে'র পর উপন্যাসরচনার সার্থকতর প্রয়াস আমরা দেখিতে পাই 'আলালের ঘরের দুলালে'। 'নববাবুবিলাসে' উপন্যাসের মৌলিক ধর্মগুলি সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও সরস চিত্রের গ্রন্থন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অবিচ্ছিন্ন কাহিনীমূলক উপন্যাস। ভব.নীচরণের খণ্ড চিত্রগুলিতে হাসি বেপরোয়া ও উতরোল হইতে পারিয়াছে, কিন্তু প্যারীচাঁদকে ঘটনাপরিণতি ও চরিত্র পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার হাসি কিছুটা সংযত এবং ঘটনা ও চরিত্রের অন্তঃশায়ী। ভবানীচরণ যে বিকৃত ও কুক্রিয়াসক্ত পরিবেশ রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হাসি একটা দুর্দমনীয় উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু প্যারীচাঁদ গার্হস্থ্যজীবন এবং আইন আদালতের পরিবেশে তাঁহার হাসিকে অনেকখানি সূক্ষ্ম ও অন্তর্গূঢ় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য চারিত্রের আত্যন্তিক বিকৃতি ও অসঙ্গতি বর্ণনায় এবং কাহিনীর সহিত অসংশ্লিষ্ট সমাজ চিত্র উদ্‌ঘাটনে তাঁহার হাসিও উচ্ছল। প্যারীচাঁদ কাহিনীর বাঁধুনি ও অবিচ্ছিন্ন গতির দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। চলিবার সময় তিনি যেন পথের দু'পাশে এদিক ওদিক তাকাইয়া চলমান জীবনরূপগুলি অতি আগ্রহের সহিত দেখিতে চাহিয়াছেন। এই ক্ষণিক ও খণ্ডিত জীবনচিত্রগুলিই নানা দিক হইতে তাঁহার উপন্যাসে হাস্যকৌতুকের ধারা সঞ্চার করিয়াছে। ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রচিত্রণে প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতিলালের বিভিন্ন শিক্ষক, বক্রেশ্বর পণ্ডিত এবং বিশেষ করিয়া ঠকচাচার চরিত্র বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। ইহাদের মধ্য দিয়া তিনি তৎকালীন সমাজের মূর্খ ও অযোগ্য শিক্ষক এবং অনিষ্টান্বেষী স্বার্থপর চরিত্র সম্বন্ধে যে তত্ত্ব শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন তাহা পাঠকের মনে অনিবার্য বেগে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি কাহিনী ও চরিত্রের প্রয়োজন ভুলিয়া নিজেই নীতিকথা শুনাইয়াছেন সেখানে তাহা গ্রন্থকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করিয়াছে মাত্র। বরদাবাবু হয়তো লেখকের মুখপাত্র, কিন্তু তাঁহার চরিত্র উপন্যাসের মধ্যে অহেতুক প্রাধান্য পাইয়াছে। তাঁহার স্থূল উপদেশ অপেক্ষা ঘটনা ও চরিত্রগত হাস্যাবরণে প্রচ্ছন্ন উপদেশগুলি সমাজনীতি উন্নয়নে অনেক বেশি সহায়ক হইয়াছে।

প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের খণ্ড চিত্র অবলম্বনে জীবনের আনন্দ-

বেদনাময় রসরূপ বিশ্লেষণ করা, কিন্তু কালীপ্রসন্ন চাহিলেন শুধু কেবল সমাজচিত্রগুলিই কৌতুক ও ব্যঙ্গের রঙে প্রতিফলিত করিতে। প্যারীচাঁদ হাতে ছবির তুলি লইয়াছিলেন। তিনি ছবির চলচ্চিত্র ভরাইবার জন্য পিচকারীর রঙ প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু কালীপ্রসন্নের হাতে রঙের পিচকারীই প্রধান অস্ত্র। তিনি সেই পিকচারী দিয়াই ছবি আঁকিয়াছেন। অবিমিশ্র রঙ্গব্যঙ্গের নিদর্শন সেজন্য কালীপ্রসন্নের বইতেই বেশি পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদের নৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিশিষ্ট মতবাদ তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে সুপরিস্ফুট, কিন্তু কালীপ্রসন্ন কখনও নৈতিক তত্ত্বকে তাঁহার লেখার মধ্যে জোর করিয়া চাপান নাই এবং তাঁহার কোন বিশেষ মতানুগত্যও কোথাও ধরা পড়ে নাই। তাঁহার হাসিতে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্টকমুখগুলি মিশ্রিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই বিদ্রূপের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। এমনকি তিনি নিজেও নহেন। সেজন্য তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের চিত্রগুলি এমন সর্বজনভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালীপ্রসন্নের হাস্যরস যে এত স্বাভাবিক উজ্জ্বল ও চিত্তচমৎকারী হইয়াছে তাহার কারণ লেখকের ভাষা-কৌশল, বর্ণনাশক্তি ও রসসৃষ্টিনৈপুণ্য। সমাজের বাস্তব চিত্রগুলি তিনি আঁকিয়াছেন কিন্তু এই চিত্রগুলি প্রকাশরীতির কুশলতার ফলেই রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে চরিত্রগুলি তিনি চিত্রিত করিয়াছেন সেগুলি স্বল্পপরিসর-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কিন্তু কৌতুকোচ্ছল পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ বিচ্ছুরিত আলোর তীব্র দ্যুতিতে সেগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিতে হয়, হাস্যরসের শিল্প তাঁহাদের সাহিত্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাঁহাদের হাস্যরসের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ হইল না। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরে প্রখ্যাত হাস্যরসস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম করিতে হয়। হাস্যবেগের প্রচণ্ডতম আঘাতের দ্বারা পাঠকের চিত্তকে নির্দয়ভাবে উত্তেজিত করিতে যাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করিতে হয় দীনবন্ধু এবং তাহার পরেই বোধ হয় ত্রৈলোক্যনাথের স্থান। ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রবল কৌতুকরস প্রধানত আসিয়াছে তাঁহার অদ্বিতীয় উদ্ভাবনীশক্তি দ্বারা সৃজিত আত্যন্তিক উদ্ভট কাহিনী ও পরিস্থিতি হইতে। এই উদ্ভটত্ব দেখা গিয়াছে মানবিক জগতের সহিত ভৌতিক ও প্রাণীজগৎ

এমনকি জ্যোতিষ্কজগতের সম্বন্ধ-স্থাপনের ফলে। মানবিক জগতের মধ্যে যদি কোন ঘটনা ও চরিত্র স্বাভাবিক ও প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে আমাদের কৌতুক উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু যদি মানবিক জগতের মধ্যে কোন মানবেতর প্রাণী অথবা অতিমানবীয় সত্তা প্রবেশ করিয়া বিপর্যয় বাধায় তবে আমাদের কৌতুক প্রবলতর হইয়া উঠে। দুই দূর-ব্যবহিত বস্তু হঠাৎ যদি পরস্পরের কাছে চলিয়া আসিয়া ভাবের আদানপ্রদান করে তবে আমাদের সুবিন্যস্ত জীবনবোধ ও সুশৃঙ্খলিত কার্যকারণপরম্পরা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়, এবং আমাদের বিভ্রান্ত বুদ্ধি ও দিশাহারা যুক্তি শিলা-অবরোধমুক্ত ঝরণার ন্যায় তীব্র বেগে কৌতুকপথে প্রবাহিত হয়। লেখক ভূত-ভূতিনী, বাঘ, হাতী, ব্যাঙ, মশা ইত্যাদির অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু সকলের মধ্যেই মানবিক স্বভাব ও আচরণ আরোপ করিয়া তিনি উহাদের শুধু কৌতুকরসের উপাদান করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সুখদুঃখময় মানবীয় জগতের কাহিনী উদ্ঘাটন করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক রূপে তাঁহার শিল্পকৃতির পরিপূরক আঙ্গিকরূপে তিনি ভৌতিক জগৎ ও প্রাণীজগতের পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। মানবীয় জগতের দোষ ও বিকৃতি সোজাসুজি বর্ণনা করিলে তাহা এত চিত্তাকর্ষক হইত না, কিন্তু ভূত ও ইতরপ্রাণীর মধ্য দিয়া তিনি সেগুলি দেখাইয়াছেন বলিয়া সেগুলি কোনদিন ভোলা সম্ভব নহে। লেখকের প্রকৃত শিল্পকৌশল বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে ভূতপ্রেতের গল্প বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ভূতপ্রেতের গল্পের অবতারণা দ্বারা পাঠকের চিত্তকে কৌতূহলাবিষ্ট করিয়া এক একটি মানবীয় জীবনসত্যকে প্রকাশ করাই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প পড়িবার সময় মানবীয় কাহিনী অপেক্ষা ভূতের কাহিনী আমাদের চিত্তকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু গল্প শেষ করিয়া মনে হয় ভূতের কাহিনী Midsummer night's dream-এর মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থায়ী জীবনসত্য আরও স্পষ্টতর হইয়া আমাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন শিক্ষিত সমাজের মন নূতন আবেগ ও নিষ্ঠা লইয়া প্রাচীন ও পৌরাণিক আদর্শ ও সমাজনীতিসংস্করণে প্রবৃত্ত হইল তখন তিনজন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকারের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা হইলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও অমৃতলাল বসু। ব্যঙ্গের মর্মভেদী তীব্রতার দিক দিয়া ইঁহাদের সহিত অন্যসময়ের অপর কোন লেখক বোধ হয়

সমকক্ষ নহেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের ন্যায় নিপুণ ব্যঙ্গকলারসিক লেখকের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের ব্যঙ্গের মধ্যেও পূর্বোক্ত তিনজন লেখকের ন্যায় ঝাঁঝাল, জ্বালাময় তীব্রতা নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীলতা ও প্যারীচাঁদের নৈতিকতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উষ্মা ও সংকীর্ণ দলীয়তা দেখা যায় নাই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও অমৃতলালের ব্যঙ্গ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর সীমাবদ্ধ, যথা—ব্রাহ্মধর্ম, স্ত্রী স্বাধীনতা বিধবা-বিবাহ, নকল জাতীয়তা ইত্যাদি। তাঁহাদের সুপরিস্ফুট মতবাদের মধ্যে যুক্তি ও সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সর্বজনস্বীকৃত নহে এবং বিচার করিয়া দেখিলে তাহাতেও অনেক ভ্রান্তি ও দুর্বলতা ধরা পড়িবে। সমাজপ্রগতিতে স্থানে স্থানে আতিশয্য কিংবা বিপথগামিতা ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই প্রগতির চক্র বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিলেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আলোচ্য লেখকদের মতবাদ যাহাই হউক না কেন, ব্যঙ্গরস সৃষ্টিতে তাঁহাদের অসাধারণ নিপুণতা সম্বন্ধে কোন মতভেদের অবকাশ নাই। তাঁহারা ব্যঙ্গকলায় এত নিপুণ বলিয়াই তাঁহাদের ব্যঙ্গ এত অব্যর্থ ও অন্তর্ভেদী এবং সেজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এত প্রবল হইয়া উঠে। ব্যঙ্গের হাসি যত উচ্ছ্বসিত তাহার আঘাতও তত তীব্র।

ইন্দ্রনাথ উপন্যাস ও কাব্য লিখিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীরচনা-কৌশল ও কাব্যের সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রতিভা তাঁহার ছিল না। ব্যঙ্গসৃষ্টিই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, অথচ তাঁহার উপন্যাসের রসের সহিত তাঁহার ব্যঙ্গ একাত্ম হইয়া যায় নাই। তবে 'ভারত উদ্ধার' তাঁহার সার্থক কাব্য, কারণ ব্যঙ্গরসই এই কাব্যের মূল রস এবং এই রসের বিঘ্নজনক ও পরিপন্থী অপর কোন রসের অস্তিত্ব নাই। 'ভারত উদ্ধার' প্যারডি রচনা হিসাবে অতুলনীয়। প্যারডি সাধারণত mock heroie অথবা ছদ্মগম্ভীর রচনারীতি অবলম্বন করে।[১] 'ভারত উদ্ধার' একদিকে যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের প্যারডি, অন্যদিকে তেমনি ভীরু, দুর্বল নিরস্ত্র ভারতবাসীদের স্বদেশ উদ্ধার চেষ্টার নির্মম ব্যঙ্গ।

১। Parody is something pure burlesque, and sometimes a species of complimental irony, having between burlesque and mock heroic.

Wit & Himour by Leigh Hunt.

উদ্ভট পরিস্থিতিরচনা, অভিনব শব্দ ও ক্রিয়াপ্রয়োগ ও Anti-Climax-এর আকস্মিক ব্যবহারের দ্বারা লেখক 'ভারত-উদ্ধারে'র ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখক কোথাও গুরুগম্ভীর পরিবেশে নিতান্ত তুচ্ছ ও হাল্কা শব্দ ও ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া কিংবা লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় বর্ণনায় গুরুগম্ভীর ভাষা বর্ণনা করিয়া হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর সহিত বর্ণনারীতির যত ব্যবধান হইবে, হাস্যরস তত প্রবল হইয়া উঠিবে। হাস্যরসসৃষ্টির এই কলা-কৌশলটি ইন্দ্রনাথের রচনার বহু স্থানে দেখা যায়।

যোগেন্দ্রচন্দ্রও ছদ্মগম্ভীর ও ব্যাজস্তুতিমূলক শ্লেষাত্মক রীতি অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গরস উৎপাদন করিয়াছেন। মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন পুত্র, স্বেচ্ছা-চারিণী বধূ, মেকি জাতীয়তাবাদী, নীতিভ্রষ্ট স্বদেশকর্মী, সমাজপ্রগতিবাদী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী পুরুষ ও নারী প্রভৃতি যাহাকেই তিনি বিদ্রূপ করিতে চাহিয়াছেন তাহার ক্রিয়াকলাপ ও চরিত্র অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রশংসাসূচক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ব্যঙ্গরীতি অবলম্বন করিয়াও বোধ হয় লেখক সুখী হইতে পারেন নাই। সেজন্য প্রায়ই তিনি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্য স্থলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘ উপদেশ, কঠোর ধিক্কার এবং অসহিষ্ণু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি তাঁহার রচনায় শুধু কেবল অকারণ জবরদস্তি হইয়াই রহিয়াছে।

অমৃতলাল ভাবাদর্শে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমধর্মী হইলেও তিনি অপর দুইজন ব্যঙ্গকারের ন্যায় নিজের মত ও উদ্দেশ্য কারণে অকারণে জোর করিয়া তাঁহার লেখার মধ্যে ঢুকাইতে চান নাই। 'তাজ্জব ব্যাপার', 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস' প্রভৃতি অল্প কয়েকখানি প্রহসন ব্যতীত তাহার অধিকাংশ প্রহসনের হাস্যরস কাহিনীর উদ্ভট মৌলিকতা হইতে উৎসারিত হয় নাই। তাহা উৎসারিত হইয়াছে চরিত্রের অসঙ্গত আচরণ ও বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগ-কৌশল হইতে। বাঙালী সংসারের বধূকে যখন রোমান্টিক নায়িকা, বহিশ্চারিণী বীরাঙ্গনা কিংবা পুরুষোচিত কর্মে নিরতা দেখি তখন প্রতিবেশের সহিত এই ধরণের চরিত্রের এমন একটি অভাবনীয় অসঙ্গতি চোখে পড়ে যাহা বিশেষ হাস্যজনক হইয়া আমাদের চিত্তকে আঘাত করে। ইন্দ্রনাথের ন্যায় অমৃতলালও ভাষার পদসমষ্টির এমন বিসদৃশ বিন্যাস, সন্ধি ও সমাসের এমন উৎকট প্রয়োগ (যথা, উলের মত অঙ্গ যাহার—উলাঙ্গিনী) এবং শব্দালঙ্কারের

এমন চাতুর্যময় অবতারণা করিয়াছেন যে হাস্যরস আকস্মিক আবেগে উচ্ছল হইয়া উঠে।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজের প্রাচীন ও নবীন কিংবা হিন্দু ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়গত ভাবদ্বন্দ্ব অনেকটা কমিয়া আসিল, এবং মোটামুটি একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেজন্য হাস্যরসের মধ্যেও অসঙ্গতি ও বিকৃতি লইয়াই হাস্যরসাত্মক রচনা লেখা হইতে লাগিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের হাস্যরসে বিরোধী ধর্ম ও সমাজের প্রতি বিরাগজাত ব্যঙ্গের স্পর্শ রহিয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসে হয়তো প্রাচীনপন্থী সমাজের জড়তার প্রতি শ্লেষ আছে, কিন্তু ঐসব লেখকের মত ও আদর্শ কখনও তাঁহাদের লেখা ব্যঙ্গরচনার মধ্যে শৃঙ্খলিত হয় নাই। সাময়িক ও স্থানিককে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী চিরন্তন মানুষের মনে তাঁহাদের রসসংবেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

বর্তমান কালে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গপ্রিয় লেখকগণ, যথা—প্রমথ বিশী, সজনীকান্ত, পরিমল গোস্বামী প্রভৃতি দল ও মত নির্বিশেষে ব্যক্তিচরিত্রের ভ্রান্তি ও দোষ লইয়াই ব্যঙ্গ রচনা করিয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর পর হাস্যরসে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব হইল কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরশুরামের। উভয়েই গল্পলেখক, কিন্তু উভয়ের গল্পের পরিবেশ, বর্ণনারীতি ও রসপ্রকৃতি বিভিন্ন। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মজলিসী ঢঙে অনেক গল্প বলিয়াছেন এবং নিত্যপরিচিত বাস্তব জগতের নিতান্ত সাধারণ লোক লইয়াই তাঁহার কারবার পরশুরামও অবশ্য মজলিসী ঢঙে অনেক গল্প বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি বাস্তব জগতের চরিত্রের সহিত সুদূর পৌরাণিক জগৎ এবং অদৃশ্য ভৌতিক জগতের নানা অদ্ভুত চরিত্রের মিল ঘটাইয়া দিয়াছেন। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে কোন উদ্ভট উদ্ভাবনী শক্তি ও কাহিনীর নিটোল ও অবিচ্ছিন্ন রূপ নাই। গল্পগুলির মধ্যে আমরা সর্বত্র কথক দাদামহাশয়কেই দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার ব্যক্তিসত্তার স্নিগ্ধ স্পর্শে, ভূয়োদর্শনের আলোকে, এক প্রসঙ্গের সহিত অন্য প্রসঙ্গের সংযোগে গল্পগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরশুরাম কাহিনীর অন্তরালে নিজেকে সব সময়েই প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, ত্রৈলোক্যনাথের ন্যায় ভৌতিক জগৎকে মানবীয় জগতের মধ্যে আনিয়া কিংবা নিতান্ত সহজভাবে রামায়ণ, মহাভারতের জগৎ ও বর্তমান জগতের চরিত্রগুলির পারস্পরিক মিল সাধন করিয়া প্রবল কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্ভট

ঘটনা ও অদ্ভুত চরিত্র হইতে পরশুরামের হাস্য উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু খণ্ড চিত্র ও অভিনব শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাস হইতে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্য উদ্ভুত হইয়াছে। কেদারনাথের হাস্যরসে কারুণ্যের স্পর্শ প্রধান, কিন্তু পরশুরামের হাস্যরসে মাঝে মাঝে কারুণ্য থাকিলেও বিদ্বেষজ্বালাহীন ব্যঙ্গের প্রকাশই সুস্পষ্ট।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকমণ্ডলী

হাস্যরস অলঙ্কারশাস্ত্রের নয় প্রকার রসের অন্যতম এবং অন্যপ্রকার রসের ন্যায় ইহাও ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের মধ্য দিয়া সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী হইয়া উঠে। রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই থাকে। অনেকেই একই বস্তু লইয়া সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু যিনি কেবল বস্তু ও ভঙ্গি লইয়াই কারবার করেন, কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসসৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহার সাহিত্য অল্পকালের মধ্যেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সব দেশের সাহিত্যেই এক একটি যুগে বহু সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব হয়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শুধু দুই একজন মাত্র সর্বকালীন পাঠকের মনে বাঁচিয়া থাকেন, আর সকলের স্মৃতি শুধু কেবল সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এলিজাবেথীয় যুগে অনেক নাট্যকারের উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শুধু কেবল শেক্‌সপীয়রই কালজয়ী অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। দেশ ও কালের সীমা তিনিই অতিক্রম করিতে পারেন, যিনি সাময়িকের প্রয়োজন মিটাইয়াও শাশ্বতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন, যিনি স্ব-ভূমির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও সার্বভৌমের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং যিনি পরিচিত জনের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া সর্বজনীন কলাচিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। হাস্য-রসের কথাই ধরা যাক। বিশ্বের হাস্যরসিকদের কথা আলোচনা করিতে গেলেই শেক্‌সপীয়র, সারভ্যান্টিস, মলিয়ের প্রভৃতির কথা প্রথমেই মনে পড়িবে। ইহারা শুধু ইংলণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্সের লোকেদের আনন্দ দেন নাই, ইঁহারা জগতের সব দেশের সব কালের লোকেদের মনেই আনন্দ সঞ্চার করিয়াছেন। হাস্যরসের যে কোন প্রকার আলোচনা করিতে গেলেই ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। বিশ্বসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি বিশেষ দেশের সাহিত্য আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে, অনেক হাস্যরসিক লেখক বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শুধু কয়েকজন মাত্র চিরকাল সকলের চিত্তে সমান আবেদন জাগাইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে বহুতর হাস্যরচয়িতার নাম আমরা জানিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে চসার, শেক্‌সপীয়র, ড্রাইডেন, পোপ, সুইফ্‌ট, চার্লস ল্যাম্ব, চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতি কয়েকজনকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। ইঁহাদের আলোচনা দ্বারাই মোটামুটি ইংরেজী সাহিত্যের হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের আলোচনায় আমরা অনেক লেখকের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সকলকেই শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য বলা চলে না। অনেক লেখকই প্রায় একই রকম বিষয়বস্তু লইয়া একই ধরণের ঘটনা, চরিত্র ও বাক্য অবলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিল্পকুশলতার কথাই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। একই কাহিনী হয়তো অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কাহিনীর বিন্যাসপ্রণালীতে, বিভিন্ন গ্রন্থির সংযোজনায়, সরস টীকাটিপ্পনীর সুকৌশলী প্রয়োগে যিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। একই চরিত্র কাহারও হাতে বা এক নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়া চিরন্তন মানবচরিত্রের একটি অবিস্মরণীয় প্রতিনিধি হইয়া উঠে। একই ধরণের বাক্য কোথাও ক্ষীণশিখা দীপের মত স্তিমিত আলোক বিকিরণ করে এবং কোথাও বা চোখঝলসানো বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই পার্থক্যগুলি নির্ণয় করিয়া শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখকরূপে আমরা কয়েকজনের স্থান নির্দেশ করিতে পারি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী—ইঁহাদের হাস্যরসাত্মক রচনা লইয়া আলোচনা করিলে হাস্যরসের সর্বপ্রকার শ্রেণীর পরিচয়ই আমরা পাইব এবং কি কি গুণে ইঁহারা ইঁহাদের সমধর্মী সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহাও জানিতে পারিব।

প্রাচীন সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যেই হাস্যরসের উপাদান সর্বাপেক্ষা বেশি রহিয়াছে। এই মঙ্গলকাব্যের দুইজন কবির নাম আমরা উল্লেখ করিতে চাই, যাঁহাদের হাস্যরস সমসাময়িক কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া চিরন্তন রসিকচিত্তে স্থান পাইয়াছে। তাঁহারা হইলেন মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। যিনি শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা তিনি সাধারণত করুণ ও হাস্য উভয় প্রকার রসেই সমান নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। মুকুন্দরাম সম্বন্ধে এই সত্যই আমাদের বিশেষ করিয়া মনে আসিবে। তিনি করুণরসে সিদ্ধহস্ত কিন্তু হাস্যরসাত্মক ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণেও তিনি কম নিপুণ নহেন। জীবনে দুঃখ বেদনা পাইলেও তিনি গভীর জীবনরসরসিক ছিলেন, সেজন্য আঘাত ও বেদনার মধ্যেও তিনি মানুষের ভ্রান্তি ও দুর্বলতার প্রতি কৌতুকসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পশুদের খেদ ও ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যে আপাত-দৃশ্যমান কারুণ্যের ধারার মধ্যে কৌতুকের একটি চপল ও উচ্ছল স্রোতও মিশিয়া রহিয়াছে। পশুদের খেদ ও প্রার্থনার মধ্যে মানুষী সমাজের নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করাতে বুঝা

যায়, কবি শুধু দুঃখের চিত্রই অঙ্কন করিতে চাহেন নাই, মানুষী সমাজের প্রকৃতি ও প্রবণতা পশুসমাজের উপর আরোপ করিয়া কৌতুক সৃষ্টি করিতেও চাহিয়াছেন। ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যে শুধু কেবল আমরা দুঃখ ও দারিদ্র্যেরই সন্ধান করিয়াছি কিন্তু সপত্নী ভয়ে ভীত ফুল্লরার দুঃখবর্ণনার মধ্যে ভাবী সপত্নীকে নিরস্ত করিবার যে কৌতুকোদ্দীপক ব্যগ্রতা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। দেবচরিত্রের বর্ণনায় কবি যে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তিনি তেমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখান নাই, সেইদিকে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনেক বেশি। কিন্তু মুরারি শীল এবং বিশেষভাবে ভাঁড়ু দত্ত ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকচরিত্র অবলম্বনে তিনি যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এই সব চরিত্রগত হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াই তিনি তাঁহার হাস্যরসাত্মক রচনা চিরন্তন কালের সাহিত্য-দরবারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার যে ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা ছিল তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু চরিত্রগুলির স্বভাব ও আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, তাহাদের নীচ স্বার্থপরতা, তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি, মিথ্যা জাত্যাভিমান, অপর শ্রেণীর প্রতি ক্ষুদ্র বিদ্বেষপরায়ণতা, কপট আত্মীয়তা ইত্যাদির সরস ও কুশলী বর্ণনায় তাঁহার হাস্যরস সূক্ষ্ম কলাকৌশলে উন্নীত হইয়াছে। কালকেতুর রাজ্যে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সকলের চরিত্রগত দুর্বলতাই কবি বক্র দৃষ্টিতে সন্ধান করিয়াছেন। এই সব চরিত্রচিত্রণে কবির ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেই ব্যঙ্গ তীব্র নহে। বাঙ্গাল মাঝিদের বিলাপ বর্ণনায় কবির নিছক রঙ্গপ্রিয়তার নিদর্শনই পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে লক্ষণীয় যে বাঙ্গালদের ভাষার বিকৃতি কবি দেখান নাই। তাহাদের স্বভাবগত অসঙ্গতিই কবির কৌতুকরসের উপাদান হইয়াছে। গুরুতর সংকটের মধ্যে বাঙ্গাল মাঝিগণ যখন ভাত খাইবার পাতা, সুক্তার পাতা ও হলদীর গুঁড়ার জন্য কাঁদিয়া আকুল তখন এমন একটি Anti-Climax-এর সৃষ্টি হইয়াছে যাহা প্রবল কৌতুক উদ্রেক করিয়াছে। মুকুন্দরামের হাস্যরসের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র। এই দুইটিই হইল ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্র এবং ইহারা মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরন্তন রসের ক্ষেত্রে অমর হইয়া রহিয়াছে। মাংসের দাম দিতে হইবে বলিয়া হীন বণিক মুরারি শীলের আত্মগোপন করিয়া থাকা এবং তারপর কালকেতুর

অঙ্গুরীয়কের কথা শুনিয়া লোলুপ ব্যগ্রতায় বাহিরে আসা এবং কালকেতুকে একেবারে ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বোধনে আপ্যায়িত করার মধ্যে যে স্বার্থপর ভণ্ডামির পরিচয় রহিয়াছে তাহাই কবি নিখুঁতভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। মুকুন্দরামের ব্যঙ্গরসের সর্বাপেক্ষা সার্থক নিদর্শন হইল ভাঁড়ু দত্ত। ভাঁড়ু দত্ত ভণ্ডামিতে মলিয়েরের তারতুফের (Tartuffe) সহিত তুলনীয় এবং অনিষ্ট-কারিতায় ডিকেন্সের উরিয়া হিপের সমকক্ষ। কালকেতু উপাখ্যানের অনেকখানি স্থানই সে জুড়িয়া আছে এবং কাহিনীর গতিনিয়ন্ত্রণে সে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেজন্য কিছুটা সময় একটু হাল্কা রস বিতরণ করিবার জন্য সে কাব্যের মধ্যে আসে নাই, কাহিনীর শেষভাগে সর্বাপেক্ষা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া সকলের দৃষ্টি তাহারই দিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ভাঁড়ুর মুখের শিষ্ট ও একান্ত অন্তরঙ্গ বাক্যের সঙ্গে তাহার নীচ ও জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির এমন একটি প্রবল অসঙ্গতি রহিয়াছে, দোষক্ষালন ও আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য সে এমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সুচতুর ও সপ্রতিভ উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছে যে শেক্‌সপীয়রের ফলষ্টাফের মত তাহার প্রতি শুধু কেবল হাসির বাণ নিক্ষেপ করিয়া পারা যায় না, তাহার সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া হাসিতে হয়। সব ভণ্ড চরিত্রই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে এবং তাহাতে নীতি ও ন্যায়ের বিধান রক্ষিত হয়। ভাঁড়ু দত্তও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার প্রাপ্য শাস্তি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া জীবনের যে রস ও সত্যের পরিচয় পাইলাম তাহা কখনও মন হইতে মুছিয়া যাইবার নহে। মুকুন্দরামের হাস্যরসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বিশ্লেষণ করিলে এই কয়েকটি লক্ষণই পরিস্ফুট হয়, যথা—।১। রসিকতার প্রথাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি সমস্ত মানবসমাজের উপর তাঁহার কৌতুকময়, ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন ও যাহা তাঁহার পূর্বে কেহ লক্ষ্য করে নাই তাহাই তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ।২। তাঁহার প্রকাশভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা ও ব্যঙ্গের পিছনে এক প্রসন্নসরস স্নিগ্ধমনোভাবের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। ।৩। জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে তাঁহার হাস্যরসের সত্যনিষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছে; তাঁহার হাসি খেয়ালের বুদ্‌বুদ বা বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত নহে। মানুষের সর্বাঙ্গীণতার মধ্যে তাহা ঘনপিনদ্ধকায়। ।৪। তাঁহার হাস্যরস বিস্ফোরণের পিছনে একটা উদ্‌বৃত্ত শক্তি ও সংযমের অনুভব রহিয়াছে। তাঁহার হাসিতে একটা সঙ্কেতময়তা লক্ষ্য করা যায়। তিনি পাঠকের মনে এই

ধারণাই জন্মান যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে সব কিছু নিঃশেষ করেন নাই, তিনি অন্তর্নিরুদ্ধ হাস্যপ্রবাহের শীকরকণা দ্বারাই আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও প্রভাবশালী কবি। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের একেবারে শেষ যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন মঙ্গলকাব্য বহু কবির হাতে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। ভাব ও বিষয়ের দিক দিয়া কোন নূতনত্ব দেখাইবার সুযোগ তখন কিছু ছিল না। সেজন্য তখনকার কৃতী ও কুশলী কবিকে ভাব ও বিষয় অপেক্ষা form অথবা রচনারীতির দিকেই বেশি দৃষ্টি দিতে হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রও সেই দিকেই তাঁহার প্রতিভাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেজন্য কলানিপুণ, বৈদগ্ধ্যদীপ্ত রচনায় তিনি এমন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতচন্দ্র রাজসভার নাগরিক কবি ছিলেন বলিয়াই তাহার কাব্যে ব্যঙ্গ এরূপ সূক্ষ্ম ও মার্জিত এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এমন প্রখর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রের নিখুঁত ব্যঙ্গরসাত্মক রূপ সত্বের ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যঙ্গের সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা এবং বাক্যের সুপ্রখর হীরকদ্যুতি সৃষ্টি করিতে মুকুন্দরাম অপেক্ষা ভারতচন্দ্র অধিকতর কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরাম পল্লী সমাজ পরিবেশে বাস করিতেন, সেজন্য তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপে পল্লীজীবনের আর্দ্রতা ও কোমলতা মিশিয়াছিল। পল্লীজীবনের মানুষের মধ্যে কৃত্রিমতা ও কপটতা থাকিলেও সেই কৃত্রিমতা ও কপটতা সুমার্জিত ও নিখুঁত কেতাদুরস্ত নহে। কিন্তু ভারতচন্দ্র উন্নত ও সুসভ্য সমাজের মানুষ ছিলেন। সেই সমাজের আপাতমনোরম ছদ্মাবরণ, গোপন সুরঙ্গপথচারী লালসাস্রোত, পরিপাটি বৈদগ্ধ্যদীপ্ত কৃত্রিম বাক্যালাপ কবি দেখিয়াছিলেন। সেই সমাজকে উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য তাঁহার ব্যঙ্গের অস্ত্রগুলিকেও তীক্ষ্ণধার ও অব্যর্থসন্ধানী করিতে হইয়াছিল।[১] হ্যাজলিট শেক্‌সপীয়র ও বেনজনসের হাস্যরস লইয়া আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, শেক্‌সপীয়রের ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ ও কঠোর

১। সুসভ্য সমাজে সাহিত্যিক ব্যঙ্গ কিরূপ তীব্র হইয়া উঠে সে-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হ্যাজলিট লিখিয়াছেন—'The most pungent ridicule, is that which is directed to mortify vanity and to expose affection, but vanity and affection, in their most exorbitant and studied excesses, are the ruling principles of society, only in a highly advanced state of civilisation and manners—

Lectures on the Comic Writers—P. 35.

হইতে পারে নাই, কারণ তিনি উন্নত ও কৃত্রিম সমাজের রূপ দেখেন নাই। তাঁহার পরবর্তীকালের Genteel Comedy-র লেখকরা সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারা কৃত্রিম ও ভণ্ড সমাজকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের আর একজন ব্যঙ্গরসিক কবির সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি হইলেন প্রায় ভারতচন্দ্রেরই সমসাময়িক কবি পোপ। পোপের ন্যায় ভারতচন্দ্রের মধ্যে কবিত্ব ও ব্যঙ্গের অপরূপ সমাবেশ হইয়াছিল। ব্যঙ্গের বাস্তবভূমি এবং কবিত্বের উদার আকাশে তিনি সমানভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম ছিলেন।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যের পার্থক্য এইখানে যে, মুকুন্দরামের কাব্যে হাসির পিছনে ক্ষমাস্নিগ্ধ মনোভাবের শীতল স্পর্শ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে হাস্যরস এইরূপ কারুণ্য-ব্যঞ্জনাহীন। মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠতর কবি কিন্তু ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। মুকুন্দরাম মানুষকে অবলম্বন করিয়া দেবতার মহিমাকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র দেবতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের জীবনলীলাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে দেবলীলাকে তিনি মর্ত্যজগতের ধুলিমাটির স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন। দেবতার মাহাত্ম্য হীন করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নাই, কিন্তু মোহ, ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও দৈন্যপীড়িত জীবনের কুশ্রীতা রঙ্গব্যঙ্গের তুলিকায় চিত্রিত করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। প্রচলিত কাব্যরীতি অবলম্বন না করিয়া ভারতচন্দ্র পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার মন বাস্তব সংসারের কাহিনী বর্ণনা করিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়াছিল। সেজন্যই তিনি বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহের কাহিনীকে দেবলীলার কাব্যের মধ্যে অতখানি প্রাধান্য দিয়াছেন। আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। ভারতচন্দ্র কাব্য লিখিয়াছেন রসিক ও বিদগ্ধ রাজা ও সভাসদ্‌গণের জন্য। বেদনাশ্রিত ভক্তিরস পল্লীর সাধারণ শ্রোতার চিত্তে যতখানি প্রভাব বিস্তার করে রাজসভার রঙ্গরহস্যপ্রিয় শ্রোতাদের চিত্তে ততখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আদিরস ও বাক্‌চাতুর্যই তাঁহাদের চিত্তে আনন্দ দান করিতে পারে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রসবিশ্লেষণের সময় এই কথাগুলি স্মরণ রাখা উচিত।

'অন্নদামঙ্গলে'র অন্তর্গত হরগৌরীর কাহিনী তিনি মোটামুটি পূর্বপ্রচলিত ধারা অনুসরণ করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অন্নদা, ব্যাসদেবের হরিহোড়, ঈশ্বরী পাটনী ইত্যাদির চরিত্রচিত্রণে তিনি মৌলিকতার পরিচয়

দিয়াছেন। তবে তাঁহার হাস্তরসের প্রাণবন্ত প্রাচুর্য ছোট ছোট ঘটনার কৌতুক রসাত্মক বিবৃতির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। শিবের বিবাহ, শিব ও গৌরীর ঝগড়া, শিবের ভিক্ষা, শিবের ভোজন ইত্যাদি ঘটনা অন্যান্ত কবিদের দ্বারা বর্ণিত লইলেও তাহাদের কেহই ভারতচন্দ্রের মত অত্যন্ত উপভোগ্য বাস্তবরস সঞ্চার করিতে পারে নাই। এই বাস্তবরসের মূলে আছে খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার দিকে সদা-জাগ্রত দৃষ্টি, নিত্যব্যবহৃত তদ্ভব শব্দের এবং সামাজিক রসিকতা ও ঝগড়ায় ব্যবহৃত প্রবাদ ও বাগ্‌ধারার স্বপ্রচুর প্রয়োগ এবং তির্যক টীকাটিপ্পনীর স্বচতুর সমাবেশ। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও রসবোধের অদ্বিতীয় উৎকর্ষের ফলে জানা কাহিনী ও চিরপরিচিত দেব-চরিত্রের মানবোচিত বিকৃতি ভারতচন্দ্রের হাতে এক নূতন রসে উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিব-পার্বতীর কাহিনী আমরা প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই পাইয়াছি, কিন্তু আমরা মনে রাখিয়াছি শুধু কেবল ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রকে। নারীদের পতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যের বহু কবি বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাস্বন্দরের অন্তর্গত এই পতিনিন্দার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে বাস্তব চিত্রণ ও কৌতুকের যে প্রাবল্য দেখিয়াছি অন্য কোন কাব্যে সেরূপ দেখি নাই। মানসিংহ খণ্ডের অন্তর্গত দুই সতীনের ঝগড়ার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' ছাড়া আর কোথাও নাই। মুকুন্দরাম লহনা ও খুল্লনার মারামারির বর্ণনা দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদের কেহই চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর মত খররসনা ও জ্বালামুখী নহে। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী শ্রেষ্ঠ ও ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্র বটে, কিন্তু ইহার রস ক্রিয়াকলাপ ও ঘটনার উপর ততখানি নির্ভর করে নহে, যতখানি নির্ভর করিয়াছে ইহার ছলনাময়, রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ বাক্যের উপর। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ভারতচন্দ্র প্রাচীন সাহিত্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কত বাক্য যে বাংলাভাষায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, একটি বাক্য মাত্র তখনই প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইতে পারে, যখন তাহার মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্যতা, যুক্তিযুক্ততা ও প্রয়োগসৌকর্য এবং রসোদ্দীপকতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এই সব গুণ ভারতচন্দ্রের কত অসংখ্য বাক্যের মধ্যে রহিয়াছে তাহার হিসাব রাখা সম্ভব নহে। ভারতচন্দ্রের বাক্যের চমৎকারিত্ব আসিয়াছে বাক্যের কুশলী অলঙ্করণ হইতে। বাংলা সাহিত্যের

কোন কবি এত বিচিত্র অলঙ্কারের এরূপ সার্থক প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। শুধু কেবল ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই দৃষ্টান্ত লইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের সব অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করা চলে (লালমোহন বিদ্যানিধি প্রধানত তাহাই করিয়াছেন)। শব্দালঙ্কার হাস্যরসের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি ইত্যাদি অলঙ্কার হাস্যরসসৃষ্টিতে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা আছে। বিরোধমূলক অলঙ্কারগুলিও কৌতুকরসের উৎপাদনে যে কত সহায়ক তাহাও ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, অর্থান্তরন্যাস ইত্যাদি অলঙ্কারের অভিনব ও আচমকা প্রয়োগের ফলে যে হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত হাসির নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাও ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা জানিতে পারিলাম।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই তাঁহাকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যরচয়িতা রূপে গ্রহণ করিতে হয়—প্রথমত তাঁহার বাস্তবতাবোধ। তিনিই সর্বপ্রথম দেবাশ্রিত কাব্যকে মর্ত্যের ধূলামাটির মধ্যে আনয়ন করিয়া অফুরন্ত হাস্যরসের অকূল ক্ষেত্র রচনা করেন। বাস্তব নরনারীর বিকৃত ও অসঙ্গত জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির ফলেই তাঁহার হাস্যরসাত্মক চরিত্রগুলি এত সরস ও সত্য হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার সচেতন হাস্যরসপ্রবণতা। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত কাহিনীধারা অবলম্বন করিলেও তিনিই সর্বপ্রথম কৌতুক ও ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে দেখিলেন। গভীর ও গম্ভীর বিষয় তাঁহার তির্যক দৃষ্টিতে লঘু ও হাস্যকর হইয়া উঠিল। তৃতীয়ত, তাঁহার বর্ণনা-রীতি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। ছন্দপ্রয়োগের কুশলতা, অলঙ্কারপ্রয়োগের চাতুর্য এবং যথাযথ শব্দ ও বাক্যব্যবহারের অদ্ভুত ক্ষমতার ফলেই তাঁহার হাস্যরস চিরন্তন মানবমনের উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। আধুনিক সাহিত্যের তেমনি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের রচয়িতার সাহিত্য বিশদভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম দীনবন্ধুর নাম করিতে হয়। দীনবন্ধুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম করুণ হাস্যরসস্রষ্টা (Humorist)। বাংলা সাহিত্যের খাঁটি হিউমারধর্মী লেখক সংখ্যায়

খুব বেশি নহেন। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র (আংশিকভাবে), রবীন্দ্রনাথ (আংশিকভাবে), শরৎচন্দ্র, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্প কয়েকজনকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহাদের মধ্যে দীনবন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। দীনবন্ধুর হাস্যরসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু তাঁহার হাস্যরস শুধু কেবল সশব্দ ফেনিল, কলোচ্ছ্বাসে শেষ হইয়া যায় না, তাহার গভীরতর স্তরে জীবনের একটি সত্যোপলব্ধি, একটি ক্ষমাসুন্দর, মমতাকরুণ দৃষ্টি বিরাজ করে। এই যে জৈব উত্তেজনার মুক্তি ও জীবনের সূক্ষ্ম বুদ্ধিধর্মী রসচেতনা, ফরাসী ভাষায় ইহাদিগকেই humour of release এবং humour de finesse বলে এবং ইহাদের স্মিত মিলনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ হিউমারের প্রকাশ।[১] দীনবন্ধুর হিউমারেও ইহাদের সমন্বয় দেখা যায়। হিউমারের একটি সংজ্ঞার বলা হইয়াছে, thinking in fun while feeling in earnest—এই কৌতুক-চিন্তার সহিত গভীর অনুভূতির মিলনই আমরা দীনবন্ধুর মধ্যে দেখিতে পাই। চসার, শেক্‌সপীয়র, মলিয়েরে ও ডিকেন্সের ন্যায় তিনি মানুষের হাটের মধ্যে মিশিয়া সকলের সঙ্গে তামাশা করিয়াছেন। কিছুটা রঙ তিনি পরিহাসচ্ছলে অন্যের দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন, কিছুটা রঙ তিনি নিজে মাখিয়াছেন। কিন্তু শুধু কেবল হাটের মধ্যেই ইহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় শেষ হইয়া যায় নাই। ইহাদিগকে তাঁহার নিভৃত ভাবনা ও শিল্পসাধনার গৃহে লইয়া আসিয়াছেন এবং ইহাদিগকে সহানুভূতির রঙে প্রসাধিত ও শিল্পের ভূষণে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছেন।

দীনবন্ধুকে যদি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের আসন দিতে হয়, তবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক শেক্‌সপীয়র ও ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক মলিয়েরের সহিত তাঁহার তুলনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। দীনবন্ধু কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে যে ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট। শেক্‌সপীয়রের Merry-Wives of Windsor-এর কাহিনী অবলম্বনে তিনি জলধর ও মল্লিকা-মালতীর কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন এবং মলিয়েরের The Miser নাটকের ছায়া অবলম্বনে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নামক প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন।

১। 'It shades off, on one side, into the more irresponsible flow of animal spirits, and popular farce; on the other, into the artistic and intellectual elaboration of comic points.'

The Development of English Humour by L. Cazamian

শেক্‌সপীয়র ও মলিয়ের উভয়েরই জীবনদৃষ্টির সহিত দীনবন্ধুর সাদৃশ্য ছিল। মানুষ দুর্বল, সেজন্যই মানুষের জীবনে এত বিকৃতি ও অসঙ্গতি দেখা যায়। ফলস্টাফের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—Mortal men, mortal men ! শেক্‌সপীয়র দেখাইয়াছেন, এই পৃথিবীতে মানুষের নানা বিকৃতি ও অসঙ্গতিরও স্থান আছে। তাহারা আসে, ক্ষণকালের জন্য সূর্যালোকে আত্মপ্রকাশ করে এবং চলিয়া যায়, এবং তাহাদের স্বীকার করিয়া লইলেই পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে। শেক্‌সপীয়র জীবনের গভীরতম বেদনা ও কঠিনতম সমস্যার চিত্র আঁকিলেও তিনি আমাদের এই দুঃখবেদনাকীর্ণ জগৎ হইতে একটি হাস্যোৎফুল্ল জগতে লইয়া গিয়াছেন, যেখানে আকৃতিসাম্যে বার বার কৌতুকের সশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে, পুরুষের সহিত নারীও রঙ-তামাশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, গীতমুখরিত বনবীথিকায় মানুষের নাম ঝুলিতে থাকে আর গ্রীষ্মনিশীথে যত সব আজগুবি কাণ্ড ঘটিয়া চলে। এই জগৎ দীনবন্ধুরও জগৎ। শেক্‌সপীয়রের মত দীনবন্ধুও ভ্রান্ত ও দুর্বল মানুষকে পরিহাস করিয়া মানুষের মূল্য সম্বন্ধে এক নবতর ও গূঢ়তর সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আঘাতে জর্জরিত করিয়া ও কঠিন শাস্তি দিয়া মানুষের চরিত্র সংশোধন করিতে চাহেন নাই। শেক্‌সপীয়রের হাস্যরসের উৎস জটিল, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এবং ভ্রান্ত ও দুর্বল চরিত্র। দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনেও ঘটনা ও চরিত্র উভয়েরই হাস্যোদ্দীপকতা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ডিকেন্সের ন্যায় মলিয়েরের হাস্যরস প্রধানত চরিত্রাবলম্বী। মলিয়েরের হারপার্গ (Harpagons) তারতুফে (Tartuffe) ও অ্যালসেসটি (Alcestes) প্রভৃতি সমসাময়িক সমাজের দোষী ও বিকৃত চরিত্র মাত্র নহে, তাহারা চিরন্তন জীবনসত্যকে এক এক রূপে প্রকাশ করিয়াছে।[১] দীনবন্ধুরও নিমচাঁদ শুধুমাত্র অধঃপতিত মাতাল নহে, গোপীনাথ শুধু মাত্র নীচ, পদলেহী দেওয়ান নহে, রাজীবলোচন অতিক্রান্ত সমাজের একজন বিয়ে পাগল বুড়ো মাত্র নহে, তাহারা চিরন্তন মানবসমাজের নিত্যকার রূপ। তাহারা উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল, আজ আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

১। মলিয়েরের গ্রন্থাবলীর ভূমিকালেখক F. C. Green-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

'The author must seize and fix the universal and eternal truth which lies at the roots of human conduct. This Moliere achieved. He does more then reflect life, he interprets its hidden significance.

Introduction to Moliere's Comedies (Everyman's Library)

দীনবন্ধু কখনও হাস্যময় জীবন অবলম্বন করিয়াছেন আবার কখনও জীবনের হাস্যময় দিক উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার প্রহসনগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, উহাদের মধ্যে হাসিই মুখ্য, জীবনের অন্য রস গৌণ। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে তিনি জীবনের করুণ ও গম্ভীর রসের বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে হাস্যরসের প্রকাশ স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু করুণ ও গম্ভীর রসসৃষ্টিতে তাঁহার শক্তির দৈন্য এবং হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁহার অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের ফলে গৌণরসই অধিকতর চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে। ঘটনাগত কৌতুকরস ও চরিত্রগত করুণ হাস্যরস যে দীনবন্ধুর লেখায় মিলিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'জামাই বারিক' ও 'বিয়েপাগলা বুড়ো' কৌতুকাত্মক প্রহসন এবং আত্যন্তিক উদ্ভট ও জটিল ঘটনা হইতে ইহাদের কৌতুকরস উৎসারিত হইয়াছে। 'সধবার একাদশী' চরিত্র-প্রধান কমেডি এবং ইহার করুণ হাস্যরস উদ্ভূত হইয়াছে চরিত্র হইতে। 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর ও জগদম্বার কাহিনী কৌতুকরসাত্মক। করুণ হাস্যরসের সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইল নিমচাঁদ এবং বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করুণ হাস্যরসাত্মক চরিত্র নাই। নিছক কৌতুকরসাত্মক চরিত্র হইল আদুরী, পেঁচোর মা, হাবার মা, রবুয়া ইত্যাদি। মৃদু ব্যঙ্গের আঘাত আছে রাজীবলোচন, জলধর চরিত্রে। কঠিন ব্যঙ্গের পাত্র শুধু কেবল ঘটিরাম ডেপুটী ও ভোঁতারাম ভাট চরিত্র। নিমচাঁদ, গোপীনাথ ও শ্রীনাথের কথা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যময়, অথবা witty এবং রামমাণিক্য ও ভোলাচাঁদের কথা কমিক। দীনবন্ধু 'জামাই বারিক', 'বিয়ে পাগলা' প্রভৃতি প্রহসনে যে সব সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন সে সব সমস্যা রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং অন্যান্য লেখকদের লেখায় আমরা দেখিতে পাই কিন্তু সৃষ্টিশক্তির নৈপুণ্যের জন্যই দীনবন্ধু যেমন অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন তেমন আর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনে বর্ণিত সমাজ আজ আর নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্রগুলি ও তাহাদের অদ্ভুত আচরণ ও অসঙ্গত কথাগুলি আমরা কোনদিন ভুলিব না।

দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার পরিকল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা ও হাস্যকর অসঙ্গতির কথাই প্রধানত মনে পড়িবে। সেজন্যই তাঁহার হাস্যরসের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবারিত প্রাচুর্য রহিয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। তিনিই সর্বপ্রথম হাস্যরসকে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের পর্যায় হইতে

বেদনামিশ্রিত ও সহানুভূতিসিক্ত হিউমারের স্তরে উন্নীত করেন। চরিত্রাঙ্কণে তিনি যে বাস্তবতাবোধ ও সূক্ষ্ম তুলিকার স্পর্শ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রগুলি সমসাময়িক সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া নিত্যকালের রসক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। সংলাপের ভাষাকে নির্বিকার নিষ্ঠার সহিত চরিত্রানুগ করিয়া এবং এক একটি উদ্ভট ও মৌলিক মন্তব্য আকস্মিকভাবে চরিত্রের মুখে অবতারণা করিয়া হাসির আচমকা আলোকে তিনি চরিত্রকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন।

দীনবন্ধুকে আমরা হিউমারধর্মী রসস্রষ্টা বলিয়াছি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে অবিমিশ্র হিউমাররসিক লেখক বলা চলে না। তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসের গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'লোকরহস্যে' যথাক্রমে হিউমার ও ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। 'লোকরহস্য' তৎকালীন সমাজের বিকৃতি, ভণ্ডামি ও পরানুকরণ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটা সাময়িক ও পারিপার্শ্বিকের প্রেরণা রহিয়াছে, কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রেরণা একটা বৃহত্তর মানববেদনা ও গভীরতর জীবনবোধ হইতে উৎসারিত। তাহা হাসি ও কান্নার এক অপূর্ব মিলনতীর্থ। তাঁহার উপন্যাসের করুণ গম্ভীর পরিবেশে হাস্যরস শুধু কেবল relief -এর জন্য আসিয়াছে। উদ্ভট ঘটনাগত হাস্যরস তাঁহার উপন্যাসে খুব কমই আছে। কোথাও কোথাও চরিত্রগত হাস্যরস এবং অধিকাংশ স্থালেই লেখকের সরস টীকাটিপ্পনী, তুচ্ছ বাস্তব আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা এবং কোন কোন চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাসস্নিগ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য হইতে আসিয়াছে।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে হাস্যরস তাহা সশব্দ ও উতরোল নহে, তাহা মৃদু, কোমল ও অন্তঃশায়ী। মানুষের দোষত্রুটির কারুণ্যময় অনুভূতিতে তাহার পরিণতি। কোকিল, বিড়াল, ঢেঁকি, পতঙ্গ ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়ের গম্ভীর বর্ণনা কিংবা মানুষের ভাব ও স্বভাব উহাদের উপর আরোপের ফলে আমাদের হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু যখন একটি গভীর জীবনদর্শন উহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয় তখন আমাদের হাস্যরস এক তাৎপর্যপূর্ণ জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কমলাকান্ত হাসিতে হাসিতে কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে। এই কান্না অতীত গৌরবের জন্য, অতিক্রান্ত যৌবনের জন্য, আসন্ন বিদায়ের জন্য। সন্ধ্যাবেলার আকাশ যেমন অস্তগত সূর্যের রক্তিম স্মৃতি বুকে লইয়া রোদন করে, কমলাকান্তও তেমনি হারানো দিনের সুখসম্পদের কথা স্মরণ করিয়া

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মধ্যে অনুভূতির যে নিবিড় স্পর্শ এবং শিল্পসৃষ্টির যে অনবদ্য চমৎকারিত্ব রহিয়াছে 'লোকরহস্যে' তাহা নাই। 'লোকরহস্যে'র মধ্যে সমাজের সাময়িক দোষ ও স্খালনের বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছে এবং সেজন্য লেখকের হাস্যরসের অস্ত্রগুলি বিদ্রূপশাণিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এবং তাঁহার সমসাময়িক কালে অনুরূপ বিষয় লইয়া অনেকেই ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখিয়াছেন, কিন্তু ভাষাশিল্প, বর্ণনাচাতুর্য এবং রসসৃষ্টিতে তাঁহাদের কেহই বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। বাবু চরিত্র লইয়া ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত কেহই অত স্বল্প কথায় বাবুচরিত্রের এমন বহুধাব্যাপ্ত সামগ্রিক রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই এবং আর কাহারও ব্যঙ্গবিদ্রূপ এত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী হইয়া উঠে নাই। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আঘাত অত্যন্ত তীব্র এবং মতবাদ অতিশয় স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিন্দাচ্ছলে কিন্তু একটি কথাও বলেন নাই। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেই তাঁহার ব্যঙ্গের আর্ট irony অথবা শ্লেষাত্মক ব্যাজস্তুতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহারই চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ইংরাজস্তোত্র, বাবু প্রভৃতি রচনায়। কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি ব্যাঘ্র, হনুমান, গর্দভ ইত্যাদি পশুর রূপক গ্রহণ করিয়া নানা শ্রেণীর বিকৃতি, নির্বুদ্ধিতা ও পরানুকরণ প্রভৃতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। রূপকের আবরণে আবৃত বলিয়া এই সব রচনার ব্যঙ্গের উপভোগ্যতা বাড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। নিকৃষ্ট প্রাণীর রূপক গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মানুষী জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। রূপকের মধ্য দিয়া মানুষী জীবনের কোন দিক লইয়া বিদ্রূপ করা লেখকের আসল উদ্দেশ্য হইলেও রূপকবস্তুর যথাযথ চিত্রণে তিনি অবহেলা করেন নাই। ব্যাঘ্র, হনুমান কিংবা গর্দভের স্বভাব ও প্রবণতার নিখুঁত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই উহাদের সহিত মানুষী দোষ ও দুর্বলতার ব্যঞ্জিত সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া পাঠকের মনে কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়। 'লোকরহস্যে'র ব্যঙ্গরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহা যে, লেখক প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় ভাষা ও বর্ণনারীতির মধ্যে গাম্ভীর্য, আড়ম্বর ও মহিমান্বিত পরিবেশ বজায় রাখিয়াছেন। সমাসবদ্ধ শব্দগুলির বহুল প্রয়োগের ফলে ভাষার মধ্যে যে গুরুত্ব ও ওজস্বিতার সঞ্চার হইয়াছে তাহারই ফলে লেখকের এরূপ স্বতঃস্ফূর্তি ও তীব্রতা লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হাস্যরস করুণ ও গম্ভীর রসের অনুবর্তী ইহা সত্য, কিন্তু সেই হাস্যরস শুধু কেবল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও চরিত্রে সীমাবদ্ধ হয় নাই। হাস্যরস যে জীবনরসের অঙ্গীভূত, তাহা যে আমাদের কথায়, আচরণে, কর্মে ও ভাবনায় সর্বত্র বিরাজ করে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দেখাইলেন। শিশিরবিন্দুর উপর আলোকসম্পাতের ন্যায়, মেঘচারী বিদ্যুতের ন্যায়, অন্ধকার রজনীর স্নিগ্ধ নক্ষত্রাকিরণের ন্যায় হাসি যে জীবনের দুঃখবেদনাকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেই আমরা সর্বপ্রথম পাইলাম। কোথাও হঠাৎ একটা সরস মন্তব্য করিয়া, কোথাও একটা তুচ্ছ ঘটনা অথবা চরিত্রকে কৌতুকের রঙে রঞ্জিত করিয়া, কোথাও পাঠকপাঠিকাদের লইয়া একটু উপভোগ্য রসিকতা করিয়া, কোথাও বা ছদ্মগাম্ভীর্যে ও কৃত্রিম গুরুত্বে আমাদের মনের মধ্যে সোদ্বেগ কৌতূহল জাগাইয়া পরিশেষে আচমকা কৌতুকের আঘাতে সব কৌতূহল নিরসন করিয়া দেওয়া—এই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সর্বত্রসঞ্চারী হাস্যরস তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি লক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রথমত হাস্যরসকে গ্রাম্য, অমার্জিত ও অশ্লীল রূপ হইতে একটি মার্জিত, পরিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত রূপে সর্বপ্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার হাস্যরসে তাঁহার বিদগ্ধ সংযত ও রুচিসম্মত মনের পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট। দ্বিতীয়ত, হাস্যরসের ধারাকে সব স্থলে বিশেষ চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাহাকে সাহিত্যের সর্বাঙ্গে সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই সাহিত্যকে স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। তৃতীয়ত, জীবনের লঘু ও গুরুত্বহীন দিক উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেন নাই, হাস্যরসের মধ্য দিয়া কোন উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা কিংবা কোন গভীর জীবনদর্শনের তাৎপর্য পরিস্ফুট করাই হইল তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও জীবনের হাসিকান্নার পরিপূর্ণ মিলন ঘটাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই মিলন আরও সূক্ষ্মতর ও আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। নিছক হাস্যরসসৃষ্টির জন্য তিনি 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র ন্যায় দুইএকখানি পুস্তিকা ছাড়া আর কিছুই লেখেন নাই, আবার হাস্যরস বর্জন করিয়া কোন গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধও রচনা

করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের প্রাবল্য দেখা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কৌতুকরসের প্রাবল্য খুব কম। কৌতুকরসের স্থূল উপাদানগুলি তাঁহার সাহিত্যে প্রায় অদৃশ্য বলিলেই চলে। সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন পরিবেশে, বুদ্ধি মার্জিত ও বৈদগ্ধ্যদীপ্ত, সংযত অনুভূতিমিশ্রিত হাস্যরসই তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও স্থানে স্থানে ব্যঙ্গের যে তীব্র তীক্ষ্ণ রূপ, স্বীয় মতের যে উগ্র অভিব্যক্তি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের স্বল্পসীমায়িত রচনাক্ষেত্র ছাড়া তাহার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসে এক উদার, সংযত, সহনশীল ও ভূয়োদর্শী জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমাজজীবনকে গভীরভাবে দেখিয়াছিলেন কিন্তু এই জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন নাই। সেজন্য তাঁহার হাস্যরসে কোন দলীয়তা ও শ্রেণীস্বার্থ প্রধান হইয়া উঠে নাই। তাঁহার হাস্যরসের আবেদন এ-কারণেই সার্বজনীন ও চিরন্তন। স্থান ও সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তিনি শাশ্বত জীবনের ক্ষেত্র হইতে হাস্যরসের উৎস সন্ধান করিয়াছেন। তিনি হাস্যরসের মধ্যে নিজেকে ধরা দেন নাই বলিয়া আমরা হাসিবার সময় তাঁহাকে ঠিক আমাদের মধ্যে পাই না। তিনি আমাদের হাসাইয়াছেন; কিন্তু নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিয়াছেন। এই বুদ্ধিসচেতন, স্বাতন্ত্র্যবাদী, গূঢ়রসসন্ধানী দৃষ্টিই হইল আধুনিক রসদৃষ্টি। এই রসদৃষ্টির সর্বোত্তম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে।

হাস্যরসের কলানৈপুণ্য সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার রচনায়। উইট ও হিউমারের নিপুণতম প্রয়োগ সেখানে আমরা দেখি। প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে উইট অনেক স্থানে একটি অতিশয়িত আঙ্গিকবিলাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উইট জীবনের সহিত গভীরভাবে সংযুক্ত। উইটের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির কুশলী প্রকাশ এবং হিউমারের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় হিউমার ও শেষ-দিকের রচনায় উইটের প্রাধান্য দেখা গেলেও মোটামুটি তাঁহার সাহিত্যে এই দুইয়ের একত্রিত প্রকাশই দেখা যায়। উইট ও হিউমারের এই পরিপূর্ণ মিলনের জন্যই তাঁহার প্রহসনগুলি এমন উজ্জ্বল অথচ গভীর হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের সহিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় ছোট-গল্পে এবং সেই ছোটগল্পে তাঁহার সহানুভূতি সঞ্জাত হিউমারের পরিচয়ই বেশি পাওয়া যায়। জীবনের শেষ দিককার কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে

চলিত ভাষার চটুল চমকে ও বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গির সুনিপুণ প্রয়োগ তাঁহার সাহিত্য উইটধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'The greatest art is to conceal art'। রবীন্দ্রনাথের উইট অথবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি আরও সার্থক মনে হয়। তাঁহার শব্দ চয়ন ও শব্দযোজনারীতি স্থূল ও বহিঃসর্বস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ভাব ও রচনার সামগ্রিক সৌন্দর্যের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। এজন্যই নিপুণ রসশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও শিল্পকে গোপন করিয়া রসকেই তিনি প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরস আচমকা আঘাতে আমাদের মনকে উত্তেজিত করে না, বাস্তব জীবনের আত্যন্তিক বিকৃতি ও বিপর্যয়ের রূপ তাহাতে নাই, তীক্ষ্ণ কণ্টকের মত তাহা আঘাত করিবার জন্য উদ্যত নহে। সূর্যকিরণ গ্রহণ করিয়া বৃক্ষপত্র যেমন সবুজ ও সুন্দর হইয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথের হাস্যের কিরণে তাঁহার সাহিত্য তেমনি চিরনূতন ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অদৃশ্য রক্তধারা মানবদেহকে যেমন সজীব করিয়া তোলে, তাঁহার প্রচ্ছন্ন হাস্যধারা তেমনি তাঁহার সাহিত্যকে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

দীনবন্ধুর পর খাঁটি হিউমারশিল্পী হইলেন শরৎচন্দ্র। দীনবন্ধুর মতই হাস্যরসসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক ও সাবলীল নৈপুণ্য ছিল এবং দীনবন্ধুর কারুণ্য ও সমবেদনাও শরৎচন্দ্রের হাস্যরসে পাওয়া যায়। তবে দীনবন্ধুর লেখায় হাস্যরস প্রধান ও করুণ রস তাহার অনুবর্তী এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে করুণরস মুখ্য, হাস্যরস তাহার অধীন। বঙ্কিমচন্দ্রের হিউমার বিশেষ বিশেষ রচনায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের হিউমার সর্বত্রসঞ্চারী। রবীন্দ্রনাথের হিউমার গূঢ় ও অন্তঃশায়ী, তাঁহার হাসি অনুচ্চ ও নিয়ন্ত্রিত এবং সমবেদনাও শিল্পবোধের দ্বারা সংযত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হিউমার স্থানে স্থানে প্রবলতর হাস্যে প্রকাশিত এবং তাঁহার সমবেদনা শিল্পবোধের সংযম স্থানে স্থানে মানে নাই।

পল্লীপরিবেশে জীবনের বেদনাময় রূপ অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের তুলনা নাই। এই দিক দিয়া ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির সহিত তাঁহার মিল দেখা যায়। হার্ডির উপন্যাসে হতভাগ্য মানুষের যে সীমাহীন বেদনা, নারীজীবনের প্রতি তাঁহার যে অপরিমেয় সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার নিদর্শন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু হার্ডি প্রধানত করুণ রসশিল্পী এবং শরৎচন্দ্র করুণ রসের সহিত হাস্যরসের দিকও

উপেক্ষা করেন নাই। এই করুণরসের সহিত হাস্যরসের সম্মিলিত ধারা চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসে অতি সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। চার্লস ডিকেন্সের হাস্যরস প্রধানত চরিত্রাশ্রিত এবং শরৎচন্দ্রেরও তাহাই। ডিকেন্সের হাস্যরসে ব্যঙ্গ ও কারুণ্য উভয় দিকই আছে এবং শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এই উভয় দিকের সন্ধান পাই। ডিকেন্সের ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্রগুলি অপেক্ষা করুণ হাস্যরসাত্মক চরিত্রগুলিই অধিকতর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও ব্যঙ্গ-রসের নিদর্শন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যঙ্গরসের প্রেরণা কোন বিশেষ মত অথবা দলীয় উদ্দেশ্য হইতে আসে নাই, মানুষের দোষ ও দুর্বলতা দেখাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার সংকল্প হইতেও আসে নাই, আসিয়াছে পীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের বেদনাবোধ হইতে। গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও গোলোক চাটুয্যের নীচতা ও ভণ্ডামি দেখিয়া শুধু কেবল তাহাদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক হাসি নিক্ষেপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না, সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজের অসহায় ও লাঞ্ছিত মানুষের জন্যও আমাদের মন সমবেদনায় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। অবশ্য রাসবিহারী চরিত্রের সহিত পরিচয় লাভ করিবার সময় এই সমবেদনা উদ্রেকের কোন সুযোগ নাই। তাহার অপকারিতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, এবং সেই অপকারিতাও কোন জঘন্য অন্যায় কর্মে কলুষিত নহে। তবে ব্যঙ্গের দিক দিয়া বিচার করিলে রাসবিহারীর তুলনা বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে নাই।

শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসে কৌতুকরস স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধান হইয়া উঠে নাই। উদ্ভট ঘটনাগত কৌতুকরস শ্রীকান্ত ছাড়া অন্য কোথাও তেমন নাই। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও তাঁহার সাহিত্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করে নাই, কিন্তু তাঁহার ভাষা ভাব ও রসের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া আছে, তাহা কখনও অস্তিত্ব জাহির করিবার জন্য ব্যগ্র নহে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের রস সৃষ্টি করিবার জন্য শিল্পীর যে বুদ্ধিদীপ্ত স্তরে অবস্থানের প্রয়োজন, যে নিরপেক্ষ-দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক শরৎচন্দ্রের সে সব ছিল না। তিনি হৃদয়ের অনুভূতিতে তাঁহার সৃষ্টিকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া তুলিয়াছেন। নিজেকে তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র জীবনের কুশ্রী ও কদর্য দিক দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়রসে তাহারাও সুন্দর ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ডিকেন্সের করুণ হাস্যরস সম্বন্ধে প্রিস্টলী যাহা বলিয়াছেন তাহা

শরৎচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধেও বলা চলে—'How it has brightened the world with its pity and innocent laughter !'

আমরা বিভিন্ন প্রকার হাস্যরসের সার্থকতম শিল্পীদের লইয়া আলোচনা করিয়াছি। হিউমারে দীনবন্ধু ও শরৎচন্দ্র, হিউমার ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে বঙ্কিমচন্দ্র এবং হিউমার ও উইটে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু নিছক উইট অথবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দিতে হয় প্রমথ চৌধুরীকে। অবশ্য তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য স্থানে স্থানে বিশেষ অর্থযুক্ত ও কিঞ্চিৎ উদ্দেশ্যচালিত হইয়াছে। সে-সব ক্ষেত্রে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সহিত ব্যঙ্গরস মিলিত হইয়াছে। এই ব্যঙ্গ তাঁহার মানসিক গঠনের সঙ্গে যেন স্থায়ীভাবে যুক্ত হইয়াছে, সাময়িক বা কোন আংশিক সমাজসমস্যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইহা দেখা যায় নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতিও তাঁহার ব্যঙ্গ প্রযুক্ত হয় নাই। জাতির ভাবপ্রবণতা ও মানসধর্মই এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য শুধু মনোরঞ্জন বা তরল কৌতুকসৃষ্টি নহে, নূতন জীবননীতির প্রতিপাদন। একদিকে তিনি যেমন প্রাচীনের অন্ধ মোহ ও নিষ্ক্রিয় জড়তাকে আঘাত করিয়াছেন অন্যদিকে তেমনি জীবনের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও গুরুত্ববোধকেও খোঁচা দিয়াছেন। জীবনকে সচল ও সহজভাবে দেখাই ছিল তাঁহার আসল উদ্দেশ্য।

শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যগঠনের যতরকম বৈচিত্র্য ও বিপর্যয় ঘটাইয়া বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে সেগুলির প্রায় সবই তাঁহার সাহিত্যে দেখি। রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে জীবনরসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী জীবনরসের উপরে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে স্থাপন করিয়াছেন। সেজন্যই তাঁহার সাহিত্য অগভীর ও সচেতন আঙ্গিকবিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সাহিত্য পড়িবার সময় বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের পর্যাপ্ত অনুশীলন চলিতে থাকে। সেজন্য বুদ্ধিপ্রবণ, সংস্কৃতিমার্জিত মনের কাছে তাঁহার আবেদন কখনও কমিবার নহে। আধুনিক সাহিত্যিক মন যুক্তিবাদী রচনারীতির দিকেই বেশি আগ্রহশীল, সেজন্য এই মন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য হইতে বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বাগ্‌ভঙ্গি ও বুদ্ধিভিত্তিক জীবনদৃষ্টির উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সামান্য নহে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Essays : Scientific, Political and Speculative by Herbert Spencer (1872).
2. The Expressions of the Emotions by Charles Darwin.
3. Wit and Humour (English Comic Writers) by W. Hazlitt.
4. An Essay on Laughter by James Sully
5. Laughter by Bergson.
6. Wit and its relation to the Unconscious by S. Freud
7. The Emotions and the Will by A. Bain.
8. The Idea of Comedy by Meredith
9. The Theory of Drama by A. Nicoll.
10. English Humour by J. B. Priestly
11. Comedy by John Palmer
12. Satire by Gilbert Cannan.
13. The Development of English Humour by Louis Cazamian.
14. The English Comic Characters by J. B. Priestly.
15. Social Psychology by Mcdougall.
16. Wit and Humour by Leigh Hunt.
17. Bengali Literature in the 19th Century by Dr. S. K. De.
18. Glimpses of Bengal Life—D. C. Sen
19. Western Influence in Bengali Literature by P. R. Sen.

২০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন

২১। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—স্কুমার সেন (৪খণ্ড)

২২। সাহিত্য দর্পণ—বিশ্বনাথ কবিরাজ।

২৩। কাব্যালোক—স্থধীর দাশগুপ্ত

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য
২৬। বাংলার লোকসাহিত্য— ঐ
২৭। লোক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ
২৮। বাংলার ব্রতকথা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯। বাংলা প্রবাদ—ডঃ সুশীলকুমার দে
৩০। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু
৩১। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
৩২। রসগ্রন্থাবলী—(বসুমতী সাহিত্য মন্দির)
৩৩। প্রাচীন কবি সংগ্রহ (১ম খণ্ড)—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। গুপ্ত রত্নোদ্ধার—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র
৩৬। দীনবন্ধু জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র
৩৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার
৩৮। দীনবন্ধু মিত্র—ডঃ সুশীলকুমার দে
৩৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪০। বঙ্কিমচন্দ্র—অক্ষয় দত্তগুপ্ত
৪১। বঙ্কিমচন্দ্র—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত
৪২। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—প্রমথ বিশী
৪৩। কঙ্কাবতী—বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
৪৪। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৪৫। রবীন্দ্রজীবনী (৪ খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৬। রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস—সরোজকুমার বসু
৪৭। হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ
৪৮। দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী
৪৯। দ্বিজেন্দ্রলাল—নবকৃষ্ণ ঘোষ
৫০। আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ
৫১। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়।
৫২। শরৎচন্দ্র—ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত।

নির্দেশিকা

(ক) সাধারণ